কৃপাবাদ ও আত্ম-শক্তি

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

২ রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গসাহিত্য
৩ আমাদের লক্ষ্য

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি-এ

সম্পাদিত

[মূল্য—চারি আনা মাত্র]

কৃপাবাদ ও আত্মশক্তি

কলিযুগে ধর্ম্মসাধনার সুপ্রশস্ত পথ শুদ্ধা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বিশেষ করিয়া এই পথের আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য এই পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি-পথের পথিক বলিতেছেন—"কৃপাহি কেবলম্।" সকলি তাঁহার কৃপা;—সেই তিনি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্; সেই তিনি—শ্রীগোবিন্দ, হরি; তিনি পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; তিনি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, আপনার বলিবার এ-কূলে ও-কূলে আর কেহ নাই—অতএব, "শীতল বলিয়া শরণ লইনু, ওদুটি কমল পায়।" ইহাই আত্মনিবেদন, ভক্তি-সাধনার ইহাই শেষ কথা।

কথাটা খুব সহজ, কিন্তু ভারি কঠিন। শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে বিচার করিতে হইবে, একথার অর্থ কি এবং সাধন কি? সত্য করিয়া একথা কে বলিতে পারে, আর কখনই বা বলিতে পারে? মুখে বলাই তো সত্য করিয়া বলা নয়, সুতরাং বিচার আবশ্যক। যদি কেহ বলেন—আবার বিচার কেন? 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু' বিশ্বাস কর। আমরা বলি—বিশ্বাসই তো করিতে চাই, কিন্তু বিশ্বাস কি এতই সুলভ জিনিস, বিশ্বাস করিব বলিলেই কি বিশ্বাস করা যায়? যাঁহারা তাহা পারেন তাঁহারা আত্মজয়ী, তাঁহাদের চরণে দূর হইতে প্রণাম করিতেছি, তাঁহাদের নিকটে যাইবারও আমাদের অধিকার নাই—আমাদের শাস্ত্র লইয়া বিচার করা সাধন, এই সাধনের ফলে বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে। যাঁহারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংশয় নাই, জানিবারও কিছু নাই, বিচার করিবারও কিছু নাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি, তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া ও বুঝিয়া, মানুষের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় লইয়া, ধীরে ধীরে

সতর্কভাবে শাস্ত্রানুগত, সুযুক্তি-পূত ও প্রণালীবদ্ধ বিচারণায় প্রবেশ করিতে হইবে, ব্যস্ত হইলে চলিবে না।

আমরা, আমাদের চারিদিকে প্রতিনিয়ত যে হাজার হাজার মানুষ—পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিতেছি—ইহারা কোথায় ? মানবাত্মার ক্রমবিকাশের যে সোপানশ্রেণী, সুপ্রাচীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ইহারা বা ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই, সেই সোপানমালার কোন্ স্তরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ? ইহাই প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রারম্ভেই প্রয়োজন। কারণ, অধিকার নির্ণয় না করিয়া কোন কথা বলিলে, সে কথার কোন মূল্য থাকিবে না, সে কথায় লাভ হইবে না, ক্ষতি হইবে। অনধিকার-চর্চ্চা বড় রকমের পাপ, এই পাপে মানবজাতি শীঘ্র শীঘ্র অধঃপাতিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়!

মানুষ, বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের মানুষ, অধিকাংশই তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া শোক, মোহ, ভয়, নৈরাশ্য এবং অবসাদে ডুবিয়া রহিয়াছে। চারিদিকেই জড়তা, সর্ব্বত্রই নিশ্চেষ্টতা ও নিরুদ্যম। ইহা কি সত্য নহে ? একথায় কি কাহারও সন্দেহ আছে ? একথায় কি কেহ আপত্তি করিবেন ? আশা করি, কেহ আপত্তি করিবেন না। চিরদিন এমন ছিল না। কেন এমন হইল, তাহা লইয়া অকারণ বিতণ্ডা-সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। আমরা তমোগুণে ডুবিয়া গিয়াছি, ইহার কিছু ঔষধ আছে কি না, তাহাই এখন আলোচনার বিষয়।

অনেকেই জানে না, বোঝে না এবং বুঝিতে চেষ্টাও করে না যে—সে তমোগুণে আচ্ছন্ন, অন্তর্মুখী হইয়া ত্রিগুণের তত্ত্ব প্রত্যেককে আজ আলোচনা করিতে হইবে, প্রত্যেককে অবধারণ করিতে হইবে—তাহার প্রকৃতিতে এই তমোগুণ, কোথায় এবং কি প্রকারেই বা তাহা কার্য্য করিতেছে, আরও বুঝিতে হইবে—এই তমোগুণের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করা আবশ্যক। এই কথা, প্রত্যেক নরনারীকে বুঝাইয়া দেওয়া আচার্য্য-গণের উচিত। তমোগুণের স্বভাব এই যে, তমোগুণাচ্ছন্ন ব্যক্তি বুঝিতেই পারে না যে, সে তমোগুণে ডুবিয়া রহিয়াছে—তমোগুণের ধর্ম্ম, আবরণ ও মোহ। তাহাকে বুঝাইতে গেলে সে রাগ করে এবং অধীর হইয়া উঠে।

তমোগুণাচ্ছন্ন মানুষ মনে করে যে, সে একেবারে অসহায় ও শক্তিহীন। মনে করে, নিজের শক্তির দ্বারা সে কিছুই করিতে পারে না। আত্মশক্তির মহিমা ভুলাইয়া দেওয়াই

তমোগুণের প্রধান কার্য্য, ইহাই তমোগুণের বিশেষ লক্ষণ। বাহিরের জগতে অর্থাৎ অনাত্মের মধ্যে যাহা চলিতেছে বা যাহা রহিয়াছে, তামসিক মানুষ কোনরূপে চিন্তা না করিয়া, অবনতমস্তকে তাহা মানিয়া লইয়া চলিতে চায়—তাহার চিন্তা করিবার সাহসও নাই, সামর্থ্যও নাই। এই প্রকারে গতানুগতিকের ভিতর পড়িয়া অলস কল্পনার মধ্যেই সে আরাম পায়। প্রবলের তোষামোদ করিয়া, ধনবানের গুণগান করিয়া সে অনায়াসে ইহলোকে উত্তম অন্নের সংস্থান করে এবং পরলোকের জন্য কোন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ঐন্দ্রজালিকের অনুসন্ধান করে। ইহলোকে যখন তাহারা সুবিধা ভোগ করে, তখন আর তাহাদিগকে কে বুঝাইবে ? মূর্খ যদি বড় চাকুরী করে বা বেশী পয়সা রোজগার করে, তখন তাহাকে মূর্খ বলা বিড়ম্বনা। শুধু তাই নয়, অন্যকে সেই মূর্খের দল হইতে বাহির করিয়া আনাও কঠিন।

সংসারে যিনি প্রবল তিনি যতই অন্যায় করুন, যতই অত্যাচার করুন, তাহার বিপক্ষতাচরণ করা উচিত নহে, বরং তাঁহার পোষকতা করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লওয়াই সঙ্গত,—ইহাই তমোগুণের পরামর্শ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও প্রধান উপদেশ—"উত্তম হইবে" অর্থাৎ নিজের প্রকৃতি হইতে তমোগুণ যাহাতে উদ্গত হয় বা চলিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। তমোগুণ উদ্গত না হইলে বা উত্তম না হইলে, কিছুই হইবে না।

"উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।"

এই তমোগুণ কি, এবং ইহার হস্তে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ই বা কি ?

তমোগুণ কাহাকে বলে ? শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জন্মায়—অর্থাৎ আবরণ শক্তি-প্রধান যে প্রকৃতির অংশ, তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। উহা সকল জীবের ভ্রান্তি উৎপাদন করে এবং জীবকে অনবধান, অনুদ্যম, এবং চিত্তের অবসাদের দ্বারা আবদ্ধ করে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যকার্য্যে অনুসন্ধানরাহিত্য এবং মোহ জন্মিয়া থাকে।

"অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্"—তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।

তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।

জঘন্য গুণের বৃত্তিতে অবস্থিত তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয়।

এই যে তমোগুণ, ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করাই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

প্রচলিত ধর্ম্ম অনেক স্থলেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, বরং শাস্ত্রের বা সত্য-ধর্ম্মের বিপরীত। প্রচলিত ধর্ম্ম, বিশেষ বিশেষ মণ্ডলীর দ্বারা ব্যবস্থাপিত, মণ্ডলী সাধারণ মনুষ্যের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত, সুবিধাভোগী লোকেরা ইহার পৃষ্ঠপোষক। তমোগুণাচ্ছন্ন মানুষ, অবশ্য মণ্ডলীর বা সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা, শাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাহা বিচার করিতে সাহস করিবে না। আবার এরূপ বিচার করিতে গেলে পার্থিব স্বার্থেরও হানি হইবার আশঙ্কা আছে। তাহারা অন্ধভাবে প্রবল ব্যক্তির কথা শুনিয়া ভয়ের দ্বারা, লোভের দ্বারা, কলের মত বা নিরীহ মেষপালের মত, চালিত হইতেই ভালবাসে। মণ্ডলী প্রথমাবস্থায় মানুষকে কতকগুলি চিহ্ন ধারণ করিতে এবং নির্বিচারে কতকগুলি বিধি প্রতিপালন করিতে বলে। চিত্তের অবসাদ দূর করিয়া, উদ্যমশীল হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ দেয় না। সম্প্রদায় যখন একটি পার্থিব মণ্ডলী মাত্র এবং এই মণ্ডলীর সহিত যখন অনেক বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চতুর ও প্রবল লোকের পার্থিব স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তখন এই প্রকারের আধ্যাত্মিক নরহত্যা মণ্ডলীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য-ধর্ম্ম অন্যরূপ। আমরা ভগবদ্গীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সত্য-ধর্ম্মের পরিচয় পাইব।

তমোগুণের লক্ষণ ভগবদ্গীতা হইতে পাওয়া গেল, এইবার তমোগুণের সহিত সংগ্রাম কিরূপ, তাহার পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতে অতি উত্তমরূপেই পাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কথা, মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ব্রাহ্মণ কুমার শৃঙ্গী শাপ দিয়াছেন—সাতদিন পরে তক্ষক আসিয়া মহারাজকে দংশন করিবে, আর সেই

তক্ষকদংশনে মহারাজের মৃত্যু হইবে। শাপের কথা জানিতে পারিয়া মহারাজা উদ্বিগ্নচিত্তে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন এবং নির্ব্বিঘ্নচিত্তে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়াছেন। মহারাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সাধু আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত। আর সাত দিন মাত্র পরমায়ু আছে,—এখন কি করা যায়? নানাজনে নানারূপ পরামর্শ দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন প্রায়শ্চিত্ত করুন, কেহ বলিতেছেন যজ্ঞ করুন, কেহ বলিতেছেন দান করুন, কেহ বলিতেছেন প্রাণায়াম করুন, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার মিল হইতেছে না, আর মহারাজা পরীক্ষিতের কোন কথা বেশ মনঃপূত হইতেছে না। ক্রমশঃ তর্কের ঝড় আরম্ভ হইল। মহারাজ পরীক্ষিতের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। এমন সময়ে, ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীশুকদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তর্কের ঝড় থামিয়া গেল, সকলেই সসম্ভ্রমে শ্রীশুকদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজার চিন্তা দূর হইল। এখন শ্রীশুকদেব যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। তাঁহার কথায় কেহ আপত্তি করিবেন না।

শ্রীশুকদেব দেখিলেন, মহারাজা পরীক্ষিতের মনে ভয়, উদ্বেগ ও অবসাদ আসিয়াছে, অর্থাৎ মহারাজা তমোগুণে ডুবিয়া গিয়াছেন। তিনি মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন—"মহারাজ, ভীত হইবেন না, উদ্বিগ্ন হইবেন না। চিত্তের অবসাদ ত্যাগ করুন, কারণ নৈরাশ্যের ও অনুতাপের কোনই কারণ নাই।"

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষি র্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং॥
তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎসর্ব্বং তাবদ্ধি সাম্পরায়িকং॥
অন্তকালেতু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহে হনু যেচ তং॥

"আমার আর অধিক দিন পরমায়ু নাই, হায় হায় এই অল্প সময়ের মধ্যে কি আর করিব?"—এরূপ চিন্তা করিয়া শোক করিবেন না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের বহু বহু বৎসর

বৃথা কাটিয়া যায়, তাহাতে কি ফল হয়? মুহূর্ত্ত কালের জন্যও যদি মানুষের জ্ঞান হয় যে সময় বৃথা যাইতেছে, তাহা হইলেও খুব লাভ। কারণ, এইটুকু জানিতে পারিলেই মানুষ কল্যাণের জন্য যত্নবান্ হয়। খট্বাঙ্গ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দেবগণের পক্ষ হইয়া দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন ও জয়লাভ করেন। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া খট্বাঙ্গ রাজর্ষিকে বলেন—"মহরাজ! আমরা বড়ই তুষ্ট হইয়াছি, আপনি আমাদের নিকট আপনার ইচ্ছামত বরগ্রহণ করুন।" রাজর্ষি খট্বাঙ্গ দেবগণকে বলেন—"আমি আর কতদিন বাঁচিব দয়া করিয়া বলিয়া দিউন"। দেবতারা বলেন—"রাজন, আপনার আর মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ু অবশিষ্ট আছে।" তখন রাজর্ষি খট্বাঙ্গ, অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত রথে চড়িয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক অভয়-স্বরূপ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেন। তিনি বিচলিত হন নাই এবং তাঁহার জীবনও অধন্য হয় নাই। আপনার এখনও এক সপ্তাহ পরমায়ু আছে; অতএব আপনি আপনার পারমার্থিক কল্যাণ যথেষ্টরূপে সাধন করিতে পারিবেন। অন্তকাল উপস্থিত হইলে মানুষের উচিত মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করা। মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা, দৈহিক সুখেচ্ছা ও পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্নেহবন্ধন ছেদন করিতে হইবে।

তাহার পর শ্রীশুকদেব, মহারাজা পরীক্ষিৎকে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করিলেন এবং ভগবানের স্থূলরূপে মনের ধারণা কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। এই স্থূলরূপে মনের ধারণা হইলেই, মানুষ মনকে জয় করিতে পারে। এই স্থূলরূপে মনের ধারণা করিয়াই ব্রহ্মা, প্রলয়কালে তাঁহার যে স্মৃতি নষ্ট হইয়াছিল, সেই স্মৃতি পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার যে সৃষ্টি করিবার শক্তি, তাহাও এই ধারণার দ্বারাই হইয়াছিল। এই ধারণার দ্বারা বিশ্বসৃজন সামর্থ্যও হইতে পারে, ইহা শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন। ভগবানের স্থূলরূপে মনের ধারণা সিদ্ধ হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধেহ্যপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতিনোপসন্নান্ কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতঃ সন্নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র॥
কস্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তামৃতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপাঞ্ছুষাণং॥

পৃথিবী সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই শয়ন করা যায়, সুতরাং শুইবার জন্য শয্যার প্রয়াসের প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ দুইটি বাহু রহিয়াছে, তাহাতে মাথা রাখিয়া অনায়াসেই ঘুমাইতে পারা যায়, অতএব অন্য বালিশের প্রয়োজন কি? অঞ্জলি রহিয়াছে তাহাতে করিয়া বেশ খাইতে পারা যায়, অতএব ভোজনপাত্রের চেষ্টায় আবশ্যক কি? দিক্ ও বৃক্ষত্বক্ অনায়াস-লভ্য—এ সকল থাকিতে পট্টবস্ত্রের আবশ্যক কি? অবশ্য দিগ্বসন হওয়া কিছুই নহে, ইচ্ছা করিলেই পারা যায়, কিন্তু বল্কল, অন্নজল, বাসস্থান প্রভৃতি না চাহিলে পাওয়া যায় না। একথা সত্য, কিন্তু এ সকলের জন্য ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের সেবার প্রয়োজন কি? পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষসকল কি ফলদান করিয়া অন্যের পোষণ করে না? তাহাদের নিকট চাহিলে কি তাহারা ভিক্ষা দেয় না? সকল নদীই কি শুকাইয়া গিয়াছে? সকল পর্ব্বতেরই গুহা কি রুদ্ধ হইয়াছে? এ সকলও যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও ভগবান্ হরি কি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন না? এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মানুষকে বিষয়মাত্রেই বিরক্ত হইতে হইবে, এবং নিজের চিত্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহাতে মনের ধারণা করিতে হইবে। সেই আত্মাই সত্য, অন্যান্য অনাত্মপদার্থের তুল্য মিথ্যা নহেন। উপাস্যের যত গুণ থাকা আবশ্যক, এই আত্মায় তাহা সমস্তই আছে। তিনি অনন্ত ও নিত্যস্বরূপ। তাঁহাতে মনের ধারণা হইলে, তাঁহার অনুভবজাত যে আনন্দ, সেই আনন্দে মানব আত্মহারা হইবে এবং সংসারের হেতুরূপা অবিদ্যার উপরতি হইবে। পশু অর্থাৎ কর্ম্মজড় ভিন্ন অন্য কোন্ লোক ঐ প্রকার ভগবান্ হরির আরাধনায় অনাদর করিয়া বিষয় চিন্তা করিবে? বিষয় চিন্তায় রত হইলে সংসৃতিরূপ ভয়ানক বৈতরণী অর্থাৎ যমদ্বারস্থ নদীতে পতিত হইয়া নিজের কর্ম্মের জন্য আধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ইহা দেখিলে কোন ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশগুলি ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। একজন আপত্তি

করিতে পারেন, এই উপদেশ বড়ই ভয়ঙ্কর এবং নিতান্তই সেকালের কথা। মানবজাতির ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে। তাহার ফলে নূতন নূতন ভোগের জিনিস আবিষ্কৃত হইতেছে এবং মানুষের সুখ সুবিধাও, দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিতেছে। যাহারা কৃতী মানুষ, যাহারা কর্ম্মবীর, যাহারা মানবের হিতকারী ও সভ্যতার পতাকাবাহী, তাহারা মানবজাতির এই উন্নতির রথ সজোরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত যে শিক্ষা দিলেন, লোকে যদি সেই শিক্ষা অনুসারে চলে—অর্থাৎ বিছানায় শুইব না, মাটিতে শুইব, বালিশ মাথায় দিব না, হাতের উপর মাথা রাখিব, পাত্রে খাইব না, অঞ্জলিতে খাইব, কাপড় পরার দরকার নাই, বল্কল পরিলেই চলিবে—এই নীতি যদি সকলেই অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি হইবে? মানুষ সেকালে যেমন অসভ্য ছিল, বর্ব্বর ছিল, আবার সেইরূপ অসভ্য ও বর্ব্বর হইবে—তাহা হইলে বিকাশ বা উন্নতি হইল কি? সুতরাং, এ প্রকারের উপদেশকে যুগধর্ম্ম বলিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব?

এই আপত্তি যাঁহারা করেন, তাঁহারা অবশ্য চিন্তা করিয়াই করেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্র। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে ইহার প্রথম ও প্রধান উত্তরটি রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

"কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্"

যাহারা কবি অর্থাৎ সত্যের ও ন্যায়ের আলোক যাঁহাদের চক্ষুতে লাগিয়াছে, তাঁহারা "ধনদুর্ম্মদান্ধ" ব্যক্তির কেন উপাসনা করিবেন?

কলি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে—কলি-নিগ্রহই ভাগবত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। কলির এত প্রতাপ কেন? "ধনদুর্ম্মদান্ধ" ব্যক্তির সকলেই ভজনা করে, ইহাই কলির প্রবলতার কারণ। সঞ্চিত ও সদ্ব্যয়হীন বিপুলধন, যাহা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, যে ধনের অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, এই ধন ন্যায়ার্জ্জিত কিনা, সেই ধন কতকগুলি মানুষকে এক দুষ্ট অহঙ্কারে অতিমাত্রায় উদ্ধত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য করিয়াছে। তাহারাই জগতে প্রধান। "সংসারটা কার? সংসার টাকার"—ইহাই হইল নিয়ম। সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, লোকহিতৈষী—সকলেই গরু বাছুরের দামে আত্মবিক্রয় করিতেছেন, "ধনদুর্ম্মদান্ধ" ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে নিলামে ডাকিয়া খরিদ করিতেছে, ইহা কি সত্য নহে? এই যে অবস্থা, ইহার পরিণামই বা কি, আর প্রতিকারই বা কি? পরিণাম কি, তাহা বেশ

দেখা যাইতেছে ও বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া ও সকলের অপেক্ষা ভাল করিয়া এই কলির প্রভাব বুঝিতেছি, আর পরিণাম সম্বন্ধেও অনেকেই চিন্তা ও আলোচনা করিতেছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা না হয় মৌন রহিলাম। প্রতিকার কি? শাস্ত্রের সাহায্যে, সদ্‌যুক্তি অবলম্বন করিয়া, তাহাই আলোচনা করিতে হইবে।

চারিদিকেই শুনিতেছি—"উন্নতি উন্নতি।" কাহার উন্নতি, কিসের উন্নতি? একটু ভাল করিয়া ভাবিয়াই দেখা যাউক না কেন? সকলেই যাহা বলে ও যাহা ভাবে, তাহার স্রোতে গা ভাসাইয়া লাভ কি? একটি একটি করিয়া মানুষ ধরিয়া হিসাব করিলে বলিতে হইবে, উন্নতি নহে, অবনতি—অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবনতি। আমার কি উন্নতি হইয়াছে? আমি ভাল ভাল জামা গায়ে দিই, মোজা পায়ে দিই। কিন্তু যদি কোন দিন দু'এক ঘণ্টা এই মোজা ও জামা না জোটে, কার্ত্তিকের শিশির বা মাঘের শীত যদি দু'এক ঘণ্টা খোলা গায়ে, খোলা পায়ে, খোলা মাথায় সহিতে হয়, তাহা হইলে আমি কোথায়? তাহা হইলে আমি গিয়াছি—একেবারে সোজাসুজি যমের বাড়ীই গিয়াছি; কেবল যে সর্দ্দিজ্বরে প্রাণে মরিয়া গিয়াছি তাহা নহে, চিকিৎসকের দর্শনীতে আর ঔষধের দামে, ধনেও গিয়াছি। ভাবুন, আমি কত দুর্ব্বল, কত শক্তিহীন ও কত অসহায়! প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্য যে আমি একেবারেই হারাইয়াছি! জামা, জুতা বা মোজায় আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যে দুর্ব্বল হইয়া আত্মঘাতী হইলাম! সুতরাং—উন্নতি না অবনতি!!

উন্নতি হইয়াছে, সকালে উঠিয়াই দেখিতেছি, খাবার প্রস্তুত—অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য—নানাদেশের নানা জিনিস রসনার সুতৃপ্তি, দেহেরও পুষ্টি। কিন্তু যদি কোন দিন এই খাবার না জোটে—তাহা হইলেই চক্ষু স্থির, একেবারেই অকর্ম্মণ্য, উপবাস করিবার শক্তি নাই—অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিবার সামর্থ্য নাই। ইহার নাম—উন্নতি, না অবনতি!

উন্নতি হইয়াছে—সর্ব্বত্রই গাড়ী ঘোড়া—কষ্ট করিয়া হাঁটিতে হয় না—আর "ছয় দণ্ডে চলে যাই ছ' মাসের পথ"। কিন্তু যদি না জোটে, তাহা হইলে যে এক পদও চলিতে পারি না—উন্নতি না অবনতি!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটি একটি করিয়া মানুষ ধরিয়া হিসাব করিলে বলিতে হইবে,

উন্নতি নহে, অবনতি—অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবনতি—বিশেষ করিয়া আমাদের ভারতবর্ষে। নানা প্রকারের আলোচনার দ্বারা এই সত্য, প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কিন্তু আর কথা বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। যাঁহারা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন বা ধর্ম্ম-কথা বা শাস্ত্রকথা বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহারা ভাবিবেন—উন্নতি মিথ্যা নহে এবং যাহাকে লোকে উন্নতি বলিতেছে, তাহাও হয়ত সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু বিচার করিতে হইবে,—কাহার উন্নতি, কিসের উন্নতি!

অনাত্মের দ্বারা অনাত্মকে বহুল পরিমাণে আয়ত্ত করা হইয়াছে, ইহারই নাম উন্নতি, ইহারই নাম সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি।* ইহা যে মন্দ, তাহা নহে; কিন্তু মানুষ যে আত্মবস্তু, সুতরাং এই উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতি নহে। মানবের প্রকৃত উন্নতি অন্য প্রকারের ব্যাপার। এই উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতির সহায়কও হইতে পারে, প্রতিবন্ধকও হইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে, এই বাহ্য উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতির সহায়ক না হইয়া প্রতিবন্ধক হইয়াছে। পুরাণের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের কল্পব্যাপী ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই প্রকারের অবস্থা যে এই প্রথম হইল তাহা নহে, পূর্ব্বেও অনেক বার হইয়াছে। এই অবস্থা বড়ই ভয়ানক অবস্থা—দেবাসুর সংগ্রামের প্রকট অবস্থা। এই অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই শিখাইতেছেন। সুতরাং, শ্রীমদ্ভাগবত যুগ-ধর্ম্মের প্রচারক।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধ হইতে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য কি? শ্রীশুকদেব, নিরাশ-হৃদয় ও অবসাদগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের হৃদয়, নবীন আশায় আলোকিত করিয়া শ্রীভগবানের স্থূলরূপে বা বিরাট্‌রূপে মনোধারণ করিতে বলিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যতদূর পর্য্যন্ত মানুষ ভাবিতে পারে, তাহা সেই পুরুষের দেহ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, দূর ও নিকট, চেতন ও অচেতন, স্থূল ও সূক্ষ্ম—সমস্তই এক মহান্ ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সুমহান্ ঐক্য কল্পনামাত্র নহে, একটা বিরাট জড় বা অচেতন সত্ত্বাও নহে। ইহা মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমের স্থূলমূর্ত্তি। সেখানে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ও জ্ঞানশক্তি আছে মানুষ আত্মা, এই মানবাত্মাও অসীম, সেইজন্যই তাহার পক্ষে অসীমের ধরণা সম্ভব। এই অসীমের ধারণা বা উপলব্ধি লইয়া মানবকে সাধনপথে বা নিজের প্রকৃত উন্নতি বিধানের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই উন্নতি কি?

চৈতন্যের দ্বারা জড়কে, আত্মার প্রবুদ্ধশক্তির দ্বারা এই বিশাল অনাত্মকে পরাজিত করিতে হইবে—আয়ত্ত করিতে হইবে।

অনন্তের ধারণায় যাঁহারা চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাঁহারাই ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারিবেন; নতুবা ছলধর্ম্ম বা ধর্ম্মাভাস লইয়া বঞ্চিত হইবেন—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায়। অনন্তে মনোধারণা যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা কবি। তাঁহারা যে সংসার ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইবেন, তাহা একেবারেই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় নহে। সংসার কিছুই নহে বলিয়া ইহা ছাড়িয়া যাওয়া লীলাবাদীর ধর্ম্ম নহে—এই বিশ্বকেই শ্রীকৃষ্ণের লীলায় পরিণত করাই লীলাবাদ বা ভাগবতধর্ম্ম। তাই শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—অনন্তে যাঁহারা মনোধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কবি। তাঁহারা প্রথমতঃ এক কার্য্য করুন, তাঁহারা ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিগণের ভজনা একেবারে পরিত্যাগ করুন। নতুবা ভাগবতধর্ম্মের সাধনা বা কলিনিগ্রহ একেবারেই অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তি বলিবেন—আমার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বস্তু রহিয়াছে—আমার ভজনা না করিলে তোমার পৃথিবীতে প্রাণধারণ করাই অসম্ভব। তুমি খাইবে কি? তুমি পরিবে কি? তোমার অন্নবস্ত্র শয্যাগৃহ প্রভৃতি সমস্তই আমার করায়ত্ত—সুতরাং যতই সাধু হও আর যতই পণ্ডিত হও, আমার দুয়ারে তোমাকে আসিতেই হইবে, আমার জয়গান তোমাকে করিতেই হইবে—ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তি ইহাই বলিবে। বলিবে কেন, যদি চোখ থাকে, চাহিয়া দেখুন, তাহাই বলিতেছে, আর অমনি কবি কাতর হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিতেছেন। এ অবস্থায় উপায় কি? যাঁহারা ভাগবতধর্ম্মের উপাসক, তাঁহারা যে শ্রীভগবানের সৈনিক, তাঁহারা যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ভার লইয়াছেন—তাঁহারা যাহা করিবেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ পালন করিলে, অনাত্মের বাধ্যতা যাহা তমোগুণ হইতে জন্মায়, যাহা মানুষকে সর্ব্বদাই বাহিরের সাহায্য অন্বেষণে নিযুক্ত করে, সেই বাধ্যতা অপগত হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—"এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মানুষকে বিষয়মাত্রেই বিরক্ত হইতে হইবে এবং নিজের চিত্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মা রহিয়াছেন, তাঁহার সেবা করিতে হইবে।" এক কথায় বলিলে এই দাঁড়ায় যে, আত্মশক্তিতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই—এই আত্মশক্তির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই প্রথম কথা। এই প্রসঙ্গে

শ্রীমদ্ভাগবত আর একটি কথা বলিয়াছেন, সেই কথাটির অর্থ জানিলেই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। আত্মশক্তির মহিমা যে এই প্রকারে বুঝিতে পারে নাই, সে পশু। শ্রীধরস্বামী এই 'পশু'-কথার অর্থ করিয়াছেন—কর্ম্মজড়। পশু কি, তাহা বুঝাইবার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"পশুরেব স দেবানামিতি শ্রুতেঃ"—অর্থাৎ বেদে আছে সে দেবগণের পশু মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ও স্বামীপাদের উদ্ধৃত এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং, এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম নির্ণয় করা আবশ্যক।

সুখের বিষয়, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়, তাঁহার বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্যে, এই শ্রুতি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা সেই ব্যাখ্যারই আলোচনা করিতেছি। (বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের সপ্তমসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি
ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানামিতি বৃহদারণ্যকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, এবং উপাস্য দেবতা, বা নিজের তত্ত্ব অবগত নহে সে উপাস্য দেবের পশু।" আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে চন্দ্রলোক-গত জীব 'সোমরাজ' নামে খ্যাত এবং ঐ জীব দেবগণের খাদ্য, দেবতারা ঐ জীবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রুতির মীমাংসা করিয়া গোবিন্দভাষ্যে কথিত হইয়াছে—অন্ন যেরূপ ভোজনের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ ভাবে ভক্ষিত হওয়া অবশ্য জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার অর্থ, অন্ন যেরূপ ভোগের বস্তু, জীবও সেইরূপ দেবতাদিগের ভোগের বস্তু। গোবিন্দভাষ্য আরও ভাল করিয়া বুঝাইলেন—

"বিশোঽন্নং রাজ্ঞঃ পশবোঽন্নং বিশামিত্যৌপচারিক প্রয়োগদর্শনাচ্চ।"

রাজার সম্বন্ধে প্রজা যেরূপ অন্ন, এবং প্রজার সম্বন্ধে পশু যেরূপ অন্ন বলিয়া কথিত হয়, জীবও দেবগণের সম্বন্ধে সেইরূপ।

"অন্নবৎ তদ্ ভোগহেতুত্বাদুপচরিতমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বং তৎসেবকত্বাৎ। তচ্চানাত্মবিত্ত্বাৎ। শ্রুতিরপ্যনাত্মজ্ঞস্য দেবসেবকতাং দর্শয়তি।"

দেবগণের ভোগের হেতু বলিয়াই জীবগণ অন্ন বলিয়া কথিত হয়। দেবগণের সেবক

বলিয়াই জীবকে অন্ন বলা হইয়াছে। যখন জীবের আত্মজ্ঞান না থাকে, তখন জীব দেবগণের সেবক—শ্রুতি আত্মজ্ঞানশূন্য জীবকে দেবসেবক বলিয়াছেন।

"পশু"-কথাটি, শ্রীমদ্ভাগবত কেন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল। যে মানুষের নিজত্ব বিকশিত হয় নাই, 'আমি, আমি' এই বোধে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, আমার হৃদয়-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্বপাত হয়, আমি অনন্তের, আমার নিজের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে—এই অনন্ত দেশ, অনন্ত কাল ও অনন্ত বৈচিত্র্যকে আয়ত্ত করিতে পারি—এই বোধ এখনও যাহার হয় নাই, বৈদিক ঋষির মতানুসারে, সে মানুষ এখনও মানুষ হয় নাই, সে এখনও পশু হইয়া রহিয়াছে। এই পশু, দেবতাদের সেবক অর্থাৎ যেখানে ভয়ের কারণ আছে বা লোভের কারণ আছে, সেইখানেই সে মাথা নোয়াইয়া যুক্তকরে তোষামোদ করিতেছে।

ভাগবত-ধর্ম্ম যাহা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার শেষ কথা জীবকে বুঝিতে হইবে—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।" প্রশ্ন এই, এই জীব, যিনি 'নিত্য কৃষ্ণদাস' বলিয়া নিজেকে বুঝিবেন, তিনি কোন্ জীব? আত্মজ্ঞানহীন ও তমোগুণাচ্ছন্ন পশু-জীবের কথা বলা হইল, সেই কি কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য? যাহার আত্মজ্ঞান হয় নাই, আত্মজ্ঞানের সাহায্যে যাহার পশুত্ব এখনও মোচন হয় নাই, সে কি ভাগবত-ধর্ম্মের অধিকারী? ইহার উত্তর,—সে একেবারেই অধিকারী নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের যে শ্লোকগুলি আলোচিত হইল তাহা ভাগবত-ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহার সাহায্যে ইহা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারা গেল।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই "ব্রজেশতনয়" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীবৃন্দাবন-লীলার প্রধান কথা—দেবতাদিগের পরাজয়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মদন একে একে বৃন্দাবনে পরাজিত হইয়াছেন। গোবর্দ্ধন যজ্ঞে ইন্দ্রপূজা নিবারণের জন্য, নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আলোচনা করিলে, পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রপূজা উঠাইয়া দিতে বলিলেন কেন, ইহা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সেখানকার শ্লোকগুলি অতিশয় স্পষ্ট—আত্মজ্ঞানহীন মানব দেবতাদিগের

খাদ্য—সেই মানুষ, পশু-মানুষ। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ—যিনি আজ বাহিরে প্রকট হইয়াছেন, কিন্তু স্বরূপে আত্মার আত্মা, তাঁহার আরাধনা করিবার অধিকার এই পশু-মানুষের নাই। পশু-মানুষ যদি দলে মিলিয়া এই আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা যে কেবল নিষ্ফল হইবে তাহা নহে, অনধিকার-চর্চ্চার জন্য সে ব্যক্তি অধঃপাতিত হইবে। বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দের আরাধনা আত্মজ্ঞানহীন পশুর ধর্ম্ম নহে, ইহা আত্মজ্ঞানের পরিপক্কতার ধর্ম্ম। এসম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য এতই সুস্পষ্ট যে, কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই।

এইবার আলোচনা করুন—"কৃপাহি কেবলম্"—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই মূল। শ্রীমদ্ভাগবতের ইহাই শেষ কথা এবং ইহাই মর্ম্মকথা। এখন ভাবিতে হইবে, এই কৃষ্ণ কৃপা বস্তুই বা কিরূপ এবং ইহা কার্য্যই বা করে কিরূপে? আরও বুঝিতে হইবে জীবের আত্মশক্তি, যাহার কথা এতক্ষণ বলা হইল, সেই আত্মশক্তি স্ফুরণের সহিত এই কৃপার সম্বন্ধই বা কিরূপ।

শেষের দিক্ হইতেই বিষয়টির আলোচনা করা যাউক।

"ভগবানের কৃপা" ও "মানবের আত্মশক্তি"—ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রশ্নটি মোটেই কঠিন নহে। 'ভগবান্'-সম্বন্ধে একটা সঠিক্ ধারণা মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিলে, আপনা হইতেই এই প্রশ্নের সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। ভগবান্ আছেন, এবং যাহা কিছু হইতেছে, সমস্তই তিনি করিতেছেন। কিন্তু ভগবান্ যে আছেন, কি প্রকারে তিনি আছেন? তুমি যে প্রকারে আছ, আমি যে প্রকারে আছি, ঐ পাহাড়, নদী, সমুদ্র বা সূর্য্য চন্দ্র তারকা যে প্রকারে, একটি অন্যটি হইতে পৃথক্ হইয়া, প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় এবং নিজের জায়গায় অন্য কাহাকেও থাকিতে না দিয়া যে প্রকারে আছে, ভগবান্ও কি সেই প্রকারে দূরে বা নিকটে, কোন একটি স্থান জুড়িয়া দাঁড়াইয়া, বসিয়া বা শুইয়া আছেন?

ভগবান্কে কর্ত্তা করিয়া, তাহার পর 'আছেন' এই ক্রিয়াটি আমরা সকল সময়েই ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু উপনিষদ্ ভাগবতাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে চিন্তা করিতে হইবে, ভগবানের এই থাকাটা কি প্রকারের থাকা, তাঁহার সত্তার লক্ষণ কি, বৈশিষ্ট্য কি? আমি, (আত্মা-আমি নহে, দেহ-আমি) আছি। কি প্রকারে

আছি, তাহা আমি মোটামুটি বুঝি বা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি। অন্য সকলের সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে আমি আছি—সে স্থানে আর কেহ আসিতে পারে না। ভগবানের থাকা, এ প্রকারের থাকা নহে। তিনি আছেন, তিনিই আছেন,—অন্য কাহারও থাকার প্রতিবন্ধক হইয়া নহে, অন্য কাহারও সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া নহে, তিনি আছেন, তিনিই আছেন,—সকল দেশ ও সকল কাল জুড়িয়া একমাত্র তিনিই আছেন। আমি মনে করিতেছি আমি আছি, তুমি মনে করিতেছ তুমি আছ, এই যে আমার ও তোমার থাকা, ইহা একটা মনে করা মাত্র অর্থাৎ প্রতীতি। আমাদের সকলের এই যে 'আছি' বলিয়া মনে করা, এই মনে করার মূলে, এই মনে করাকে সম্ভব করিয়া, সত্য করিয়া, অর্থাৎ এই প্রতীতির অধিষ্ঠানরূপে তিনিই একমাত্র আছেন। আমরা সকলেই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, তাঁহার চেতনায় চৈতন্যবান্, তাঁহার আনন্দে আনন্দবান্। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অভিপ্রায়।

তাঁহার থাকাও যেমন, তাঁহার করাও তেমন। তিনিই করিতেছেন, সকলই তিনিই করিতেছেন, তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। কিন্তু আমাদের করার ব্যাঘাত করিয়া নহে, আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য, নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবাপন্ন করিয়া নহে,—পরন্তু আমাদিগের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমাদিগের কর্ম্মশক্তি স্ফুরিত করিয়া, আমার এই যে 'আমি করি' বলিয়া মনে করা, এই মনে করার মূলে সত্য করিয়া তিনিই করেন। তাঁহার করাতে আমাদের প্রত্যেকের মনে হইতেছে—'আমি করিতেছি।'

প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। আমরা নানাস্থানে নানাআকারে এই কথা বলিয়া থাকি। তরঙ্গ ও সমুদ্রের উদাহরণ, যাত্রাদলের অধিকারীর উদাহরণ প্রভৃতি বলিয়া বলিয়া পুরাতন হইয়া গিয়াছে—আসল কথা, একটু গভীরভাবে চিন্তা না করিলে, এই তত্ত্বটুকু সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু ধর্ম্মসাধনার প্রারম্ভে, এই তত্ত্বটি বেশ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই তত্ত্বটি না বুঝিলে, শ্রীমদ্ভাগবতের বা শ্রীভগবানের লীলার কিছুই বুঝিবেন না, যাহা বুঝিবেন তাহা একেবারে ভুল বুঝা হইবে। আমরা এইবার সুবোধ্য উদাহরণের দ্বারা তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কৃপা বড়ই পবিত্র জিনিস। মহাকবির উক্তি আছে, যিনি কৃপা করেন, তিনিও ধন্য,

আর যিনি কৃপা গ্রহণ করেন, তিনিও ধন্য। কৃপা একটি দৈবী সম্পৎ। কিন্তু এই কৃপা যে বড়ই দুর্ল্লভ। আমরা আমাদের সংসারে যে কৃপা দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃত কৃপা-পদবাচ্য নহে। আত্মশক্তির মহিমা সম্বন্ধে যাহারা একেবারে অজ্ঞ, নিজের শক্তির স্ফুরণের জন্য যাহাদের চেষ্টাও নাই, ইচ্ছাও নাই, তাহারা কৃপাবাদী অর্থাৎ তাহারা বাহিরে কোন একজন প্রবল ব্যক্তির কৃপার প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিয়াছে। এই প্রকারের কৃপা-অন্বেষণ আত্মহত্যা। ভগবান্ কৃপা করেন এবং তাঁহার কৃপাই জীবের একমাত্র সম্বল। একথায় কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কি প্রকারে কৃপা করিবেন? তিনি কি আমাকে নিশ্চেষ্ট ও জড়ভাবাপন্ন করিয়া আমার বাহির হইতে আমাকে কৃপা করিবেন? উত্তর—না, তিনি আমার ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি আমার কর্ণের কর্ণ, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তিনি হৃষীকেশ অর্থাৎ আমার এই ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক ও অধিষ্ঠাতা, তিনি আত্মার অন্তর্যামী। অতএব, ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিবার সময় আমাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে থাকিবে না, ভিতরের দিকে থাকিবে। আমরা অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিব এবং তিনি আমার ভিতর হইতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমার আত্মশক্তি স্ফুরিত করিয়া, আমাকে প্রকৃত বিজয়ে লইয়া যাইবেন। ইহাই ভগবানের কৃপার রহস্য। অতএব কৃপা-বাদীর নিশ্চেষ্ট হইবার উপায় নাই, ভগবানের দেওয়া দেহেন্দ্রিয় মনপ্রাণ লইয়া, তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের সেবায় পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার বিশ্রাম নাই, বিশ্রাম করিবার আকাঙ্ক্ষাও নাই, তিনি সর্ব্বদাই অতন্দ্রিতভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে আমরা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কিরূপ, তাহার অতি সুন্দর পরিচয় পাই। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক অর্ব্বুদ সশস্ত্র নারায়ণী-সেনা পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন—আর অর্জ্জুন পাইলেন একা শ্রীকৃষ্ণকে, তাও আবার তিনি নিরস্ত্র এবং যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু অর্জ্জুনও অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। দুর্য্যোধন সৈন্য লইয়া চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, তুমি জান যে আমি যুদ্ধ করিব না, তথাপি তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন?" অর্জ্জুন বলিলেন—"ভগবন্! আপনি সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিতে সমর্থ, আপনার কীর্ত্তি ত্রিলোকবিখ্যাত। কিন্তু আমি একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া অসীম যশোলাভ করিব, এই বাসনায় আপনাকে সমর-পরাঙ্মুখ জানিয়াও বরণ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, আপনি আমার রথে সারথী হইবেন।"

এই অংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহার আত্মশক্তি বা আত্মনির্ভরতা জাগিয়া উঠিয়াছে, দুর্য্যোধন সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অজামিলের উপাখ্যান অনেকেরই পরিচিত। শ্রীমদ্ভাগবতে এই উপাখ্যান সুবিস্তৃত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপাখ্যান বলিবার পূর্ব্বে আমরা, 'শ্রীশ্রীভক্ত-মাল'-গ্রন্থ হইতে অজামিলের উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি। ভক্তমালের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা একবার তুলনা করিয়া দেখা দরকার। তুলনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, ভাগবতের কথা ভক্তমালে আসিয়া বদলাইয়া গিয়াছে। যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা অবশ্য চিন্তা করিবেন, কেন বদ্‌লাইয়া গেল—আর যাঁহারা সত্য ধর্ম্মের সেবক, অর্থাৎ ধর্ম্মের নামে বাজার চল্‌তি যাহা হয় একটা কিছু লইয়া যাঁহারা জগৎকে ও নিজেকে ভুলাইতে চাহেন না, যাঁহারা সত্য সত্য ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে চাহেন, তাঁহারা আলোচনা করিবেন, উপাখ্যানাংশ এই প্রকারে বদ্‌লাইয়া যাওয়ায় জগতের কিরূপ কল্যাণ বা অকল্যাণ হইয়াছে বা হইতে পারে।

'ভক্তমাল'-গ্রন্থের বর্ণনা এইরূপ। অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল না, কেবল পাপাচরণ করিত। সে গোব্রাহ্মণদ্রোহী, মদ্যপায়ী ও মাংসাশী ছিল, ব্যাধের আচার, রাশি রাশি হত্যা করিত। গৃহত্যাগী ও স্ত্রীত্যাগী হইয়া সে বেশ্যার সহিত বনে বাস করিত। বেশ্যার গর্ভে তাহার চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দৈবযোগে এক সাধু আসিয়া তাহার গৃহে অতিথি হইলেন। অজামিলের রক্ষিতা বেশ্যা ভক্তিভাবে অতিথির সেবা করায় সাধু দয়ার্দ্র হইলেন। তিনি ভাবিলেন ইহারা ঘোর পাপী, ইহাদিগকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে না। তখন সাধু এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বেশ্যাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে ভোজন করাইয়া তুষ্ট করিয়াছ, আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। তোমার গর্ভে এইবার একটি পুত্র জন্মিলে, তুমি তাহার নাম রাখিও—নারায়ণ"। সাধুর কথায় ছেলের নাম রাখা হইল—"নারায়ণ"। তাহার পর অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। অজামিল পাপিষ্ঠ, কাজেই যমদূতেরা দণ্ডপাশ লইয়া মুমূর্ষু অজামিলের নিকট উপস্থিত হইল। যমদূত দেখিয়া অজামিল ভয় পাইয়া নিজের পুত্রকে "নারায়ণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ফেলিল। যেই "নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছে, অমনি—

"সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন।"

আর দুইজন শ্যামলসুন্দর বৈকুণ্ঠের দূত—"হায় হায় যমদূতগণ হরিভক্তকে দণ্ড দিতেছে!"—এই কথা বলিতে বলিতে অজামিলের মৃত্যুশয্যার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈকুণ্ঠের দূতেরা গদার প্রহারে যমদূতদিগকে প্রহার করিয়া তাহাদের হাত পা ভাঙ্গিয়া দিল এবং তাড়না ও ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিল—

"নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এহেন জনেরে দণ্ড! কি তোর শকতি?"

গদার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া যমদূতেরা বলিতেছে,—"আমরা ধর্ম্মরাজের দূত, তোমরা কে? আমাদের অপমান করিতেছ কেন? আর পাপীকে কাড়িয়াই বা লইতেছ কেন"?

বিষ্ণুদূতেরা বলিলেন—"তোমাদের ধর্ম্মরাজ বেশ ধর্ম্ম জানে দেখিতেছি। তাহার বড় অহঙ্কার হইয়াছে। যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সমগ্র জীবনে একবার 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকে, সে কদাচ পাপী নহে। ধর্ম্মরাজ যখন তাহাকেই পাপী বলে, তখন সে ধর্ম্মের কিছুই জানে না।"

যমদূতগণ পরাজিত, অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া যমালয়ে ফিরিয়া গেল এবং যমরাজের সম্মুখে অভিমান-সহকারে দণ্ড ও পাশ আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

"কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার।
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর॥"

ধর্ম্মরাজ বিস্মিত হইয়া দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি এমন অন্যায় কার্য্য হইয়াছে"? দূতেরা বলিল—"আমাদের নাক কাটা গিয়াছে। অজামিল মহাপাপী, তাহার পুণ্যের লেশমাত্র ছিল না। তাহার মৃত্যুকাল, আমরা তাহাকে আনিতে গিয়াছিলাম। কাহার নাম "নারায়ণ," আমরা তাহা জানিনা। সে ব্যক্তি তাহার পুত্রকে এই নামে ডাকিয়াছিল। যেমন ডাকা, আর অমনি দুইজন মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন মেঘের তুল্য তাঁহাদের অঙ্গকান্তি, তাঁহারা কমলনয়ন। তাঁহারা আসিয়াই অজামিলের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। আর আমাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব, এই প্রত্যক্ষ দর্শন করুন।"

দূতগণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজের মনে যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য, স্বরভেদ প্রভৃতি প্রেমের সাত্বিক বিকার জাগিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি দূতগণকে কহিলেন—"বৎসগণ, তোমরা করিয়াছ কি! তোমরা কোথায় গিয়াছিলে? তোমরা আমার মাথা খাইয়া একি কার্য্য করিয়া আসিলে! শুন, অতিশয় গুহ্য কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। সে ব্যক্তি আমার প্রভুর নাম লইয়াছিল,—তোমরা সেখানে কেন গিয়াছিলে?

"ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম লৈল সেই, মুক্তি যাঁর দাস॥
কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়।
অগ্নি-কণে তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয়॥"

ধর্ম্মরাজের এই কথা শুনিয়া দূতগণ অতিশয় বিস্মিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভো, এই সব কথা আমাদিগকে পূর্ব্বে কেন বলেন নাই?"

তাহার পর যমরাজ দূতগণকে বলিয়া দিলেন—

"হরিনাম গুণ কথা যথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা, ভালে তিলক দেখিবে॥"

সেখানে নমস্কার করিয়া দূরে অন্য পথে চলিয়া যাইবে। আমার একথা না শুনিলে অনুতাপ করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া "দূত কহে বুঝিলাম আর নারে বাপ!"

'ভক্তমাল'-গ্রন্থে অজামিলের পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই—এইখানেই উপাখ্যানের শেষ। গ্রন্থকার উপাখ্যানের উপসংহারে ভক্তগণের চরণ স্মরণ করিয়াছেন।

এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আলোচনা করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও উপাখ্যান আলোচনা করিতে হইলে, সেই আলোচনার একটি রীতি আছে। সেই রীতি আমাদের অন্যস্থান হইতে শিখিতে হইবে না, মূল ভাগবতে এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকাতেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্কন্ধের আলোচ্য বিষয়ের নাম—পোষণ। 'পোষণ' কথার অর্থ—শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। পঞ্চম স্কন্ধে 'স্থান' বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামী তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—জীব-সমূহ বিসর্গ-সম্ভূত। এই জীব নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত

থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তার বিষ্ণু তাঁহার বিবিধ রূপের দ্বারা তাদিগকে রক্ষা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহারই নাম—'স্থান'। পঞ্চম স্কন্ধে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জীব সকল সময়ে নিজ নিজ মর্য্যাদা পালন করিয়া চলে না। অনেক সময়েই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে। যাহারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারা অধোগামী ও নরকস্থ হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভক্তিপথ প্রাপ্ত হয়, ভগবান তাহাদিগকে রক্ষা করেন। ইহারই নাম—'পোষণ'। অজামিল মনুষ্যদিগের মধ্যে মহাপাপী,—আবার বিশ্বরূপ প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রও পাপ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ স্কন্ধে প্রথমে অজামিলের কথা—তাহার পর ইন্দ্রের কথা, বৃত্রবধ ও মরুদ্গণের উপাখ্যান আলোচিত হইয়াছে। এই পোষণ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামীর মতে অজামিলের উপাখ্যানের প্রারম্ভে ভূমিকারূপে এই কথাটি জানা আবশ্যক।

এইবার প্রসঙ্গের আরম্ভ। ধর্ম্মাচরণের দুই পথ—নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গে আর্চ্চিরাদি লোকের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ, আর প্রবৃত্তিমার্গে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ও পুনঃ পুনঃ ভোগসাধন দেহলাভ। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধে এই সব কথা আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর অধর্ম্ম, অধর্ম্মের ফলে নরক-যন্ত্রণা। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে। এখন মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? মানুষ পাপ করিয়া শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে, কিন্তু তাহাতে পাপের মূল উৎপাটিত হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার পাপাচরণ করে। সুতরাং উপায় কি?

শ্রীশুকদেব বলিলেন—চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, অবিদ্বান্ ব্যক্তির জন্য। উহাতে পাপের মূলোচ্ছেদ হয় না। মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত—জ্ঞান। নিয়ম করিয়া প্রতিনিয়ত যত্ন করিলে এই জ্ঞান লাভ হয়। আবার ভক্তিমার্গ, জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করিয়া ভক্তের সেবা করিলে যে পবিত্রতা জন্মায়, তপস্যাদি দ্বারা তাহা জন্মায় না। ভক্তি পথে বিঘ্ন নাই, অভাব নাই, ভয় নাই। ভক্তিপথের সাধন অল্পমাত্র করিলে পবিত্রতা জন্মায়।

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে একবার মাত্র নিজের মন নিবেশিত করেন, তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের গুণ আকৃষ্ট মাত্রই হয়, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। কিন্তু তাহারই ফলে যম ও পাশহস্ত যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি শ্রীভগবানে একবার মনোনিবেশ করেন, তাঁহার তদ্দ্বারা সমুদয় প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হয়।

এই শ্লোকটির পরেই অজামিলের উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। অজামিলের কথা একটি পুরাতন কথা, এই কথার দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকের যাহা তাৎপর্য্য তাহাই উদাহৃত হইয়াছে। সুতরাং, অজামিলের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য বেশ ভালরূপ চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে একবার মাত্র মন নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন—এই প্রকারে একবার মনোনিবেশ কি প্রকারে হইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হওয়া চাই। অবশ্য এই প্রকারে আকৃষ্ট বা অনুরাগযুক্ত বলিলে যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন বুঝায় তাহা নহে। জ্ঞান তাহার পর হইতে পারে। হইতে পারে কেন, নিশ্চয়ই হইবে। তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে একবার মাত্র মন নিবেশিত হইলে, সে মন আর শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া বিপথগামী বা পতিত হইবে না—তাহারও প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানেই আছে। এইবার অজামিলের উপাখ্যান।

কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণকুমার ছিল। সৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম, প্রথম বয়সে অজামিল বেদবিদ্যায় পারদর্শী, মৃদু, সৎস্বভাব, সদাচার-সম্পন্ন ও ক্ষমাশীল। সে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক ব্রতধারী হইয়া থাকিত, তাহার তুল্য সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ ও শুচি আর কেহ ছিল না। সে অহঙ্কারশূন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি, বৃদ্ধ প্রভৃতির সেবা করিত, সকল প্রাণীতে তাহার সৌহার্দ্দ ছিল, অতি সাধু ও পরিমিতভাষী, অসূয়া কাহাকে বলে তাহা জানিত না, কখনও কাহারও নিন্দা করিত না। এই প্রকারের চরিত্রের লোক ছিল অজামিল—প্রথম যৌবনে তাহার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর যৌবন কালে অজামিল, তাহার পিতার আদেশে বনে গিয়াছিল, বন হইতে ফুল, যজ্ঞের কাষ্ঠ ও কুশ সংগ্রহ করিয়া বাড়ী আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে দেখিল—একটি নিম্নশ্রেণীর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মদ্যপান করিয়াছে, মত্ততা-প্রযুক্ত তাহার চক্ষু আরক্ত

ও ঘৃণিত। আর একজন নিম্নজাতীয় পুরুষ, সুরাপান নিবন্ধন লজ্জাহীন হইয়া, প্রকাশ্যেই সেই দাসীকে আলিঙ্গন করিতেছিল ও কাম-ক্রীড়া করিতেছিল। তরুণ ও সরলমতি ব্রাহ্মণ-কুমার অজামিল এই দৃশ্য দেখিল। দেখিবামাত্র তাহার মনে মোহের সঞ্চার হইল এবং হৃদয়মধ্যে কুচিন্তা জাগিয়া উঠিল। প্রথমাবস্থায় হতভাগ্য যুবক, এই মোহ ও কন্দর্পপীড়ার সহিত ধৈর্য্য ও জ্ঞানের দ্বারা সংগ্রাম করিল, কিন্তু সংগ্রামে পারিল না। হতভাগ্য যুবক অজামিল পরাজিত ও পাপের পিচ্ছিলপথে লুণ্ঠিত হইল। হায়, হায়, একটি সাধু আত্মা বিনষ্ট হইল। কিন্তু বাহিরে বা তাহার চারিদিকে তাহাকে সাহায্য করিতে কেহই ছিল না। সে সময়ে কেহ আসিয়া তাহাকে সুদুপদেশ ও সৎসঙ্গ দিয়া এই অনভিজ্ঞ যুবককে সংশোধন করিতে চেষ্টা করে নাই। সমাজ, সামাজিক মানুষ, দুর্ব্বলকে ঘৃণা করিয়া, পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারে, দুর্ব্বল ও অনভিজ্ঞ জনের একগুণ ত্রুটি শতগুণ করিয়া বাড়াইয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে, তাহাকে ধিক্কার দিতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বলকে বল দিয়া তুলিয়া লয় কে? অন্ধকে হাতে ধরিয়া সুপথ-গামী করে কে?

অজামিল অধঃপাতিত হইল, অজামিল স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইল। এই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকটি তাহার চিত্ত অধিকার করিল—সেই কামিনীকে কেমন করিয়া সন্তুষ্ট করিব, ইহাই অজামিলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পৈতৃক ধন দিয়া, নানারূপ ভোগের সামগ্রী দিয়া অজামিল এই স্ত্রীলোকের সেবা করিতে লাগিল। অজামিলের আর সব গেল, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিল না, বেদমন্ত্রে যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, সেই পতিব্রতা সৎকুলজাতা অবলা যুবতী সতীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিল না। কোথায় কুলধর্ম্ম, কোথায় লোকাচার, কোথায় বেদবিদ্যা, আর কোথায় সদাচার!—অল্পদিনের মধ্যেই অজামিলের সব গেল। সেই দাসীর গৃহে বাস করে, দাসীর কুটুম্বদিগের ভরণ করে, দাসীর অন্ন ভোজন করে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের চরম সীমায় আসিয়া অজামিল অচিরে উপনীত হইল। সে সর্ব্বদাই অশুচি অবস্থায় থাকিত। পণ রাখিয়া পাশ-ক্রীড়া, বঞ্চনা, চৌর্য্য প্রভৃতি গর্হিত কার্য্য, তাহার জীবিকার উপায় হইল।

এই প্রকারে অধঃপতিত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত অজামিল, সমগ্র যৌবনকাল অসৎসর্গে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছে। যৌবন চিরস্থায়ী নহে। যৌবন চলিয়া গেল,

ইন্দ্রিয়ের আর সে সবলতা নাই, দেহের আর সে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য নাই, নানারূপ ব্যাধি আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু অজামিলের চৈতন্যোদয় হইল না। প্রৌঢ়কাল আসিল, কিন্তু অজামিল সেই অসৎপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। প্রৌঢ়কাল চলিয়া গেল, আজ অজামিল বৃদ্ধ—তাহার বয়স আশি বৎসর। সে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ঐ দাসীর গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র জন্মাইয়াছে—জরা আসিয়া দেহ আশ্রয় করিয়াছে, তথাপি অজামিল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অন্বেষণে সেই পাপভবনে, সেই দুষ্কৃতি ও অসৎসংসর্গের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। শৈশবের আত্মীয় স্বজনেরা কেহই আর নাই, জ্ঞাতি কুটুম্ব, যাহারা ছিল, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। পাপীর পরিচয়ে অ র কে নিজের পরিচয় দিবে? এই প্রকারে পদাহত, বিতাড়িত ও উপেক্ষিত অজামিল, পাপপঙ্কে একাকী পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দাসীর গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র জন্মাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যেটি সকলের কনিষ্ঠ, অজামিল তাহার নাম রাখিয়াছিল—নারায়ণ। শিশু বলিয়া পিতা মাতা উভয়েই, এই ছেলেটিকে বড় ভালবাসিত ও আদর করিত। এই ছেলেটি বৃদ্ধ অজামিলের একমাত্র আনন্দের বস্তু ছিল। শিশুটিও বড় মধুরভাষী, পাপভবনে এমন শিশু বড়ই দুর্লভ। অজামিলের হৃদয় ক্রমশঃ এই শিশুটিতে আসক্ত হইল—এই ছেলেটিকে দেখিতে, তাহার শিশুসুলভ ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে, অজামিলকে বড়ই ভাল লাগিত, এই ছেলেটিকে লইয়া এতই আনন্দ পাইত যে আপনাকে ভুলিয়া যাইত। খাইবার সময় ছেলেটিকে লইয়া একত্রে খাইত, তাহাকে না খাওয়াইলে অজামিলের যেন নিজের খাইয়া তৃপ্তি হইত না। সকল সময়েই অজামিল এই ছেলেটিকেই লইয়া থাকিত।

এই প্রকারে অজামিলের দিন কাটিতেছে, ক্রমশঃ তাহার অন্তকাল উপস্থিত হইল।

স এবং বর্ত্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে॥

অজ্ঞ অজামিল এই প্রকারে জীবন যাপন করিতেছিল, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও 'নারায়ণ' নামক সেই বালকেই আপনার মন নিবেশিত করিল।

আজ মহাপাপী অজামিল মরিতেছে। সমগ্র জীবন অসৎসংসর্গের, অসৎ চিন্তায় ও

অসৎকার্য্যে যে যাপন করিয়াছে, জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া অশেষ উন্নতিলাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াও যে একেবারেই তাহার সদ্ব্যবহার করে নাই—হেলায় সব হারাইয়াছে—সমগ্র জীবন ধরিয়া যে কেবলই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছে—সেই পাপী, মহাপাপী অজামিল আজ মরিতেছে। পাপীর মরণ কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! পৃথিবীর আলোক একে একে নিভিয়া যাইতেছে, অতি ভীষণ অতিগভীর আঁধার দশদিশ ঘেরিয়াছে, জগতের শব্দ একে একে থামিয়া যাইতেছে, এ কি বিভীষিকাময় স্তব্ধতা! পিপাসা, দারুণ দুর্ব্বিষহ পিপাসা, জিহ্বা, কণ্ঠ, বক্ষ, উদর—সব যেন শুকাইয়া গিয়া আগুনে জ্বলিতেছে—আর যাতনা, একেবারে অনির্ব্বচনীয় যাতনা, কে যেন লোমকূপে লোমকূপে কালকূট বিষ ঢালিয়া দিতেছে! অতি মলিন, দীন ছিন্ন শয্যা, সেই শয্যায় জরাগ্রস্ত শীর্ণদেহ অজামিল—আজ মরিতেছে। নিকটে কেহ নাই যে, এক বিন্দু জল মুখে দিয়া পিপাসার উপশম করে। মধ্যে মধ্যে নরকের চিত্র দেখিতে পাইতেছে—তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নরকে ঘোর অন্ধকারে কতপাপী মূর্চ্ছিত অবস্থায় বিকট যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও দণ্ডিত হইতেছে। রৌরব ও মহারৌরব নরকে হিংস্র পাতকিগণ, অতিশয় ক্রূর সর্পগণ কর্ত্তৃক অসহায়ভাবে দংশিত হইতেছে। তাহার পর কুম্ভীপাকে তপ্ত তৈলে, কালসূত্রে তাম্রময় অতি উষ্ণ সমভূমির উপর পাতকিগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। পর পর নরকের শ্রেণী—শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সংদংশ, তপ্তশূর্ম্মি, বজ্রকণ্টক, শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপান, ক্ষারকর্দ্দম রক্ষোগণভোজন, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটনিরোধন, পর্য্যাবর্ত্তন, সূচীমুখ। এই সকল নরক দেখিয়া, নরকে পতিত ও পথভ্রষ্ট নরনারীর যাতনাভোগ দেখিয়া অজামিল ভয়ে কম্পিত হইতেছে, নিজেরও অতীত জীবন-কথা ক্রমে ক্রমে মনে জাগিয়া উঠিতেছে; হায়, সকলি মলিন সকলি কদর্য্য। পাপ, কেবলি পাপ! সে যাতনার সীমা নাই। সে অন্ধকার ও যাতনার মধ্যে পাপী দেখে—তিন জন যমদূত, অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি, বক্রবদন, ঊর্দ্ধরোমাঞ্চিত, হস্তে পাশ, অজামিলের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। মানুষ দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা পাপাচরণ করে বলিয়াই তিনজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া অজামিলের হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইল। এমন সময়ে, কি তাহার সুকৃতি ছিল, কেহই জানে না—পৃথিবীর আলো, যাহা তাহার নিকটে একেবারেই নিভিয়া গিয়াছিল, সেই আলো আবার ক্ষণেকের জন্য প্রকাশিত

হইল, অজামিল সেই আলোকে চক্ষু খুলিয়া দেখিল—তাহার সেই প্রিয় শিশু পুত্র, আদর করিয়া যাহার নাম রাখিয়াছিল—'নারায়ণ', সেই পুত্রটি খেলনা লইয়া খেলা করিতেছে; সেই ছেলেটিকে দেখিয়া ভীত, যাতনাকাতর ও কম্পিত অজামিল, তাহাকে ডাকিবার জন্য ডাকিয়া উঠিল—"নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ"।

যেই চতুরক্ষর নাম উচ্চারিত হইল, অমনি সে গভীর আঁধার কোথায় দূরে চলিয়া গেল। কোথা লাগে শত পূর্ণিমার চাঁদের কিরণ; এমন বিমল ও স্নিগ্ধ আলোকে সেই গৃহতল পরিপূর্ণ হইল! নন্দনবনের বিকশিত ফুলে যে সৌরভ আছে, তাহা অপেক্ষাও মধুর অপূর্ব্ব ফুল-গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইল, আর সেই আলোক ও সৌরভের মধ্যে বিষ্ণুদূত, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল সুন্দর সুস্নিগ্ধ কোমল তনু, গলদেশে পদ্মমালা, পরিধান সুপীত বসন, প্রত্যেকেরই চারি চারি বাহু, পদ্মপলাশের তুল্য আঁখি, সে আঁখিতে করুণা-লহরী, আর বদনে মধুর হাসি,—"মাভৈঃ মাভৈঃ, ভয় নাই ভয় নাই" বলিতে বলিতে পাপীর শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

তখন যমদূতগণ, দাসীপতি অজামিলের আত্মাকে হৃদয়ের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল, বিষ্ণুদূতেরা আসিয়াই যমদূতগণকে নিবারণ করিলেন।

যমদূতগণ স্বকার্য্য সাধনে এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল—'মহাশয়গণ, আপনারা কে, ধর্ম্মরাজের আদেশ পালনে নিষেধ করেন কেন? আপনারা কাহার লোক? আমরা দুরাচার পাপীকে যমপুরে লইয়া যাইতেছি, আপনারা তাহাতে বাধা দিতেছেন কেন? আপনারা কি দেবতা, না উপদেবতা, না সিদ্ধপুরুষ'?

তাহার পর যমদূতেরা, বিষ্ণুদূতগণের সুন্দর মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তরে ভক্তির উদয় হইল, এবং আরও বিনীতভাবে বলিলেন—'আমাদের কথায় রাগ করিবেন না, আমরা ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর, তাহারই আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। আপনাদের আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনারা পরম শিষ্ট, কিন্তু আপনাদের কার্য্য অশিষ্টের মত বোধ হইতেছে। আপনারা আমাদিগকে কর্ত্তব্যপালনে বাধা দিতেছেন, এরূপ কার্য্য আপনাদের উপযুক্ত নহে'।

এইখানে একটি কথা ভাবিতে হইবে। এখন অজামিলের অবস্থা কি? ইতঃপূর্ব্ব অর্থাৎ বিষ্ণুদূতগণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অকথ্য যন্ত্রণায় একান্ত কাতর ও প্রায় সংজ্ঞাহীন

অবস্থায় অজামিল পড়িয়াছিল, বিষ্ণুদূতেরা যেমন আসিলেন, অমনি তাহার অবস্থা বদ্‌লাইয়া গেল। বিষ্ণুদূতগণের অঙ্গের ছটায় যেমন বাহিরের অন্ধকার দূর হইয়া গেল, তেমনি তাহার ভিতরের মোহের অন্ধকারও দূরগত হইল। দারুণ গ্রীষ্মে রুদ্ধ ঘরের ভিতরে ঘামে ও তৃষ্ণায় শ্বাস বন্ধ হইয়া একটি লোক যেন মরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দক্ষিণের জানালা যদি হঠাৎ খুলিয়া যায়, আর সেই জানালা দিয়া যদি স্নিগ্ধ শীতল মলয় হিল্লোল আসিয়া পীড়িতের অঙ্গে লাগে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা যেমন হয়, অজামিলের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের ঠিক্ সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদূতগণের গায়ের হাওয়া গায়ে লাগায় অজামিল নবজীবন লাভ করিলেন,—শান্তি, শান্তি, শান্তি। নববল, নবীন হর্ষ, আবার নবীন আশা—দুঃখক্লেশ একেবারে দূর হইয়া গেল। অজামিল, আনন্দ-পরিপ্লুত নয়নে বিষ্ণুদূতগণের সেই অভয়দায়ী শান্তি ও করুণা দিয়া গঠিত অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, আর বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছে, তাহা শুনিতেছেন। অতীত জীবন-কথা—একে একে সব মনে পড়িয়া যাইতেছে। সেই সুপবিত্র ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণের গৃহ, সেই নিত্য হোম, দেবপূজা, নিত্য বেদপাঠ, সেই নিয়ত অতিথি-সেবা। পুণ্যের সংসার, তপস্যার শান্ত মূর্ত্তি সেই পিতা মাতা, সেই সব অতীতের কথা—একে একে অজামিলের অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে যে সব শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, তাহাও সব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিন মোহাচ্ছন্ন হইয়া এ সব কথা ভুলিয়াছিলেন। তাহার পর সেই পতনের দশা, মোহ, ভ্রান্তি, পরাজয়, পাপ, মহাপাপ, একেবারে মলিন, অতিশয় মলিন। তার পর অনুতাপ, দারুণ, অতি ভীষণ! হায়, করিয়াছি কি! এত সুযোগ হেলায় হারাইলাম! যাতনার সীমা নাই। তার পর, বিষ্ণুদূতদের দেখিতেছেন, নবীন আশার রশ্মি, হৃদয়ভরা গভীর আঁধারের ভিতর জ্বলিয়া উঠিতেছে—কি কৃপা! নিখিল বিশ্ব করুণার অমৃতসাগরে ভাসিতেছে। সুনীল গগন সেই করুণায় চিরদিন উচ্ছ্বসিত, এ বায়ুমণ্ডল সেই করুণার রসে সরস, শীতল। আসিতেছেন, সেই অনন্ত করুণাময়, চির জোয়ারে উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রের মত, আপন আনন্দে আপনি বিহ্বল, ঢেউ তুলিয়া অবিরাম নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, হায় আমি করিয়াছি কি? এমন জগৎ, করুণার ধাম, এমন জীবন, ভারতবর্ষে দুর্লভ মানব জীবন, অতীতের শত শত ঋষি, সাধু, তপস্বীর সাধন-

স্মৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া, জগতে আসিয়া এমন সুযোগ একেবারে হেলায় হারাইলাম,—হায়, করিয়াছি কি? আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই করুণা সাক্ষ্য দিতে এই করুণার উপযুক্ত হইবার জন্য আবার বাঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোথা আমি দুরাচার, পাপী, মহাপাপী,—আর কোথা করুণাঘন-মূর্ত্তি এই নীলেন্দিবরশ্যাম বিষ্ণুদূতগণ! অজামিল বিস্ময় বিস্ফারিত ও আনন্দালোকপূর্ণ নয়নে এই বিষ্ণুদূতগণকে দেখিতেছেন ও এই সব কথা ভাবিতেছেন।

এই গেল একদিক্, অজামিলের ভিতরের কথা অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রকারে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই—কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা এই প্রকারেই বুঝিতে হইবে।

এইবার দ্বিতীয় কথা। যমদূতেরা আসিলেন, অজামিলের মুখে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারিত হইল, আর অমনি "মাভৈঃ—মাভৈঃ" বলিতে বলিতে বিষ্ণুদূতেরা আসিলেন, তাহার পর যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে কথোপকথন হইল—অজামিল এই সব দেখিলেন, শুনিলেন। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, ইহা কেবল অজামিলই দেখিলেন ও শুনিলেন—সেখানে অবশ্য আরও লোক ছিল। অজামিল তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখিয়াছিল, অন্যান্য লোক বা অন্যান্য পুত্র প্রভৃতি যে সেখানে ছিল, তাহা একরূপ নিশ্চয়। কিন্তু এই যমদূত ও বিষ্ণুদূত অন্য কেহ দেখিতে পায় নাই, ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। পুরাণের কোন ঘটনা ঠিক্‌মত অর্থাৎ 'তত্ত্বতঃ' বুঝিতে হইলে, সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—এই ঘটনার সাক্ষী কে? অর্থাৎ, কাহার জ্ঞানের নিকট এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই প্রশ্নটি সকল সময়েই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তর না পাইলে পুরাণের রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে না।

এইবার যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে কথোপকথন—অজামিল এই সব কথা শুনিতেছেন। বিষ্ণুদূতগণ প্রশ্ন কর্ত্তা, তাঁহারা নিম্নের প্রশ্নগুলি যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১। ধর্ম্মের স্বরূপ কি?
২। ধর্ম্মের প্রমাণ কি?
৩। কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয়?
৪। দণ্ডের ঈপ্সিত স্থান কি?

৫। যাহারা দণ্ডনীয় তাহাদের কর্ম্ম কি ?

৬। কর্ম্মিমনুষ্যদের মধ্যে কে কে দণ্ডনীয় ?

ব্রূত ধর্ম্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চ ধর্ম্মস্য লক্ষণং।
কথং স্বিদ্ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতং।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্ব্বে আহোস্বিৎ কতিচিন্নৃণাং॥

যমদূতগণের উত্তর—

১। বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম, আর বেদে যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া, নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই অধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্মের স্বরূপ।

২। বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ। যদি বলেন, বেদের প্রামাণ্য কি ? তাহার উত্তর—বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ। বেদ স্বয়ম্ভু পরমেশ্বরের নিশ্বাস মাত্রে স্বয়ং উদ্ভূত। যদি বলেন নারায়ণ কে ? তাহার উত্তর—

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃ সত্ত্ব তমোময়াঃ।
গুণ নাম ক্রিয়ারূপৈ র্বিভাব্যন্তে যথাতথং॥

যিনি আপনার স্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় প্রাণিসকলকে শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা ব্যক্ত করেন তিনিই নারায়ণ।

৩। মানুষ অধর্ম্ম করিল, ইহা কিরূপে জানা যায় ? উত্তর—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, পবন, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃথিবী, জল এবং ধর্ম্ম, ইঁহারা জীব সকলের আচরণের সাক্ষী। ইঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, উভয়ই জানা যায়।

৪। অধর্ম্মই দণ্ডের স্থান।

৫। দণ্ডার্হ কর্ম্মী লোক, যাহার যেমন পাপ সে সেইরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

৬। যাঁহার গুণসঙ্গ আছে, অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণে যিনি বদ্ধ, তাঁহাকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে গেলেই ভদ্র ও অভদ্র, উভয়ই সম্ভব। কর্ম্মশূন্য হইলে অভদ্র হয় না। কর্ম্মশূন্য জীব নাই, সকলেই কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ম্মিদের পাপ অবশ্যই হয়; অতএব সকল কর্ম্মীই দণ্ডার্হ।

কেবল সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিই যে কর্ম্মের সাক্ষী তাহা নহে, জীবকে দেখিয়া যুক্তির দ্বারাও তাহার কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বেশ অনুমান করা যায়। অনুমানের দ্বারা কিছু কিছু নির্দ্ধারণ

করিবার সামর্থ্য অল্প বিস্তর পরিমাণে সকলেরই আছে। আমাদের যিনি রাজা, ধর্ম্মরাজ যম—তাঁহাতে এই শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। তিনি আপন পুরী সংযমনীতে বসিয়া মনের দ্বারা যাবতীয় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষরূপে অবলোকন করেন এবং অপূর্ব্বরূপে যথাযথ বিচার করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং ব্রহ্মারই তুল্য।

তাহার পর যমদূতগণ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—জীব প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে প্রাপ্ত এই বর্ত্তমান দেহকেই 'আমি' বলিয়া বিবেচনা করে—তাহার জন্মান্তরীয় স্মৃতি নাই। প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ জীবের এই বিপর্য্যয় ঘটে—যদি সে ঈশ-সঙ্গ করে, তাহা হইলেই পরিত্রাণ পায়। অতঃপর যমদূতগণ অজামিলের জীবন-কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন—

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষং।
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুদ্ধ্যতি॥

এই কারণে এই দুরাত্মাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। এ ব্যক্তি পাপ করিয়া তাহার নিষ্কৃতি নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। দণ্ডিত হইলেই এ ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিবে।

যমদূতগণের এই সকল কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ যাহা বলিলেন, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় তাহার সারমর্ম্ম নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন—

দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবৈর্যাম্যান্নামমাহাত্ম্যমদ্ভুতং।
শ্রাবয়িত্বা দ্বিজো বিষ্ণুলোকং নীত ইতীর্য্যতে॥

ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতদিগকে অদ্ভুত নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইলেন, দ্বিজ (অজামিল) বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুলোকে নীত হইলেন, ইহাই কথিত হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামীর এই কথাগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিধানানুসারে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে দেখিতে পাইবেন, বিষ্ণুদূতেরা তখনই অজামিলকে রথে তুলিয়া ত্রিশূন্যে অবস্থিত বিষ্ণুলোক নামক একটা স্থানে লইয়া যান নাই। সুতরাং 'বিষ্ণুলোকে লইয়া যাওয়া' বলিয়া যে একটা ব্যাপার, তাহা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে 'লইয়া যাওয়া'র অনুরূপ নহে। আমরা 'লইয়া যাওয়া' বলিতে, কোন সীমাবদ্ধ স্থূল পদার্থকে দেশের এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে অপসারণ বুঝি।

এ প্রকারে অজামিলের দেহ অপসারিত হয় নাই এবং অজামিল তখন মরিয়াও যান নাই। তাহা হইলে কি হইল? বিষ্ণুলোকে লইয়া যাওয়া হইল,—ইহার অর্থ কি? শ্রীধরস্বামীর শ্লোকে "দ্বিজ" এই পদটি রহিয়াছে। অজামিল ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কারও হইয়াছিল, সুতরাং সামাজিক 'দ্বিজত্ব' তাঁহার ছিল, কিন্তু তিনি নিজের কর্ম্মদোষে এই 'দ্বিজত্ব' হারাইয়াছিলেন। এখন, বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহার মধ্যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই 'নির্ব্বেদ' কথাটি, এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন) সুতরাং এবারে কেবল সামাজিক নহে, অজামিল পারমার্থিক দ্বিজত্ব লাভ করিলেন। এই দ্বিজত্ব লাভই, অজামিলকে বিষ্ণুলোকে গ্রহণ। ইহা পরে আমরা বুঝিতে পারিব।

ভাগবতধর্ম্ম ও নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুদূতগণ যাহা বলিলেন, প্রাচীন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা-সহ আমরা তাহা প্রবন্ধান্তরে বর্ণনা করিব। আপাততঃ কি হইল? বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। যমদূতেরাও চলিয়া গেলেন, বিষ্ণুদূতেরাও চলিয়া গেলেন। অজামিল গতভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন, তাঁহার কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু বলিবার সময় পাইলেন না—বিষ্ণুদূতগণ অন্তর্হিত হইলেন।

এইবার বাহির হইতে, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভূমি হইতে, ঘটনাটি আলোচনা করুন। বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত অজামিল, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই; অসৎসংসর্গী দরিদ্র ও পাপী, তেমন চিকিৎসাও নাই, শুশ্রূষাও নাই। সকলেই জানে, এবার সে নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু মরিল না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার শিশু পুত্রের নাম ধরিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ডাকিয়াছিল, তাহার পর আর কোন কথা কহে নাই, চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর এ কি হইল! একেবারে অঘটন ঘটিল, অজামিলের রোগ সারিয়া উঠিল,—বাহিরের লোক যাহারা দেখিল, একেবারে অবাক্ হইয়া গেল! এ কি হইল, চক্ষুতে দেখিয়াও যে বিশ্বাস হয় না! অজামিলের বেশ জ্ঞান হইয়াছে, শরীরে বেশ স্বাস্থ্য যেন ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার যেন পুনর্জন্ম হইল। কিন্তু এ কি, সে কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না! চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে, আর শরীর পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে। এ কি হইল! কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছে না!

অজামিলের ভিতরের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। যমদূতগণের মুখে আনুপূর্ব্বিক বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য সগুণধর্ম্ম, আর বিষ্ণুদূতগণের মুখে ভগবৎ-প্রণীত বিশুদ্ধ নির্গুণ ধর্ম্ম অজামিল জানিতে পারিয়াছে। শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাহার শ্রীভগবানে ভক্তি জন্মিল। সুতরাং, পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরে দারুণ অনুতাপের উদয় হইল। "ইন্দ্রিয়-জয় করিতে না পারিয়া কি মহাপাতকই করিয়াছি! আমি নরকে যাইতেছিলাম। হঠাৎ কি হইল? কি দেখিলাম! শুধু আভাসে "নারায়ণ" বলিয়াছিলাম, তাহাতেই এই হইল! ভগবান্, দয়াময়, পতিতপাবন! সময় দাও, সুবিধা দাও, প্রাণমন ও ইন্দ্রিয়-সংযমন পূর্ব্বক তোমার সেবা করিব, আর যেন অন্ধকারে না পতিত হই"।

ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ॥
স তস্মিন্ দেবসদনে আসীনো যোগমাস্থিতঃ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যযোজ মন আত্মনি॥
ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা।
যযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি॥

অজামিলের ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। অজামিল পুত্রস্নেহাদি সমুদয় বন্ধন মোচন করিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। তথায় এক দেবমন্দিরে আসন করিয়া যোগ ধারণা করিলেন। প্রথম, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর আত্মাতে মনসংযোগ করিলেন। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আত্মাকে বিশেষরূপে শোধন করিয়া, চিত্ত একাগ্র করিয়া জ্ঞানময় পরব্রহ্মস্বরূপ যে ভগবান্, তাহাতে আত্মার সংযোগ করিলেন।

তখন অজামিল সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূতগণকে আবার দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের চিনিতে পারিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিলেন। অজামিলের দেহ গঙ্গায় পড়িয়া রহিল, আর অজামিল ভগবৎপার্ষদদিগের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে ভগবানের সমীপে গমন করিলেন। এতক্ষণে অজামিল বিষ্ণুলোকে গেলেন,—সঙ্গে সঙ্গে নহে।

তাহার পরের অধ্যায়ে যমরাজ তাঁহার দূতগণের মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইলেন, ও বলিয়া দিলেন—তোমরা বৈষ্ণবজনের কিঙ্কর। এই অধ্যায়ও আমরা পরে আলোচনা করিব। ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম তিন অধ্যায়ে অজামিলের এই বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। ইহা একটি প্রাচীন ইতিহাস, পূর্ব্বকালে কোন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য মলয়াচলে বসিয়া একাগ্রমনে ভগবানের পাদপদ্ম পূজা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য, ভগবানের চরণ স্পর্শ করিয়া এই গুহ্য ইতিহাস বলিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী অজামিলের উপাখ্যান আলোচিত হইল। 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে অতিশয় সংক্ষেপে এই ঘটনা বিবরিত হইয়াছে। অবশ্য 'ভক্তমাল'-গ্রন্থের কোন দোষ নাই—কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহারা অনেকেই অজামিলের উপাখ্যান একটু অন্যরূপে বুঝিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ এমনভাবে বুঝেন, যাহাতে "নামবলে পাপ প্রবৃত্তি" রূপ নামাপরাধের সম্ভাবনা। আবার অনেকে এমনভাবে বুঝেন বা বুঝাইয়া থাকেন, যাহাতে মানুষ নিজের চরিত্রাদি সংশোধনের চেষ্টা করার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ বুঝিয়া কেবল নিয়ম করিয়া নাম করেন এবং এই প্রকারে ঠাকুর মহাশয়কে কিছু উৎকোচ দিয়া যমকে ঠকাইবার চেষ্টা করেন। উভয়ত্রই ভাগবতধর্ম্মের অপলাপ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভগবানের কৃপা, জীবের আত্মশক্তিকে সঙ্কুচিত বা ধ্বংশ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে না, আত্মশক্তির স্ফুরণের মধ্য দিয়াই কৃপা কার্য্য করে, তমোগুণাচ্ছন্ন ও ভীরু ব্যক্তি এই কৃপাবাদ-ধর্ম্মের অধিকারী নহে। কৃপাবাদের সাধন সকলেই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ইহার তত্ত্ব জানা আবশ্যক। সুতরাং আমরা বুঝিলাম, আত্মশক্তির ভূমি নির্ণয় করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, নতুবা মানুষ পশু হইয়া যাইবে। ইহসংসারে চতুর তোষামোদকারী যেমন প্রবলকে তোষামোদের দ্বারা তুষ্ট করিয়া আইনকে ফাঁকি দিয়া অন্যায় সুবিধা লাভ করে, পরমার্থ-রাজ্যে তাহা হইবার উপায় নাই—ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য

একশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য যেরূপ উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এই সাহিত্য এখন আয়তনে বিপুল ও সৌষ্ঠবে সুন্দর। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মন বিচিত্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। এক সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা করিতেন না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য তাঁহারা এবং পাশ্চাত্য-বিদ্যায় যাঁহারা যশস্বী তাঁহারা, উভয়েই বাঙ্গলা-সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। এখন আর সে দিন নাই। মাতৃভাষার ও সাহিত্যের গৌরবে আমরা সকলেই এখন গৌরবান্বিত। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ও অনুসন্ধান বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। গদ্য-সাহিত্যের যাবতীয় বিভাগে উপযুক্ত লেখকগণ পরিশ্রম করিতেছেন। এই নবযুগে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বিস্ময়াবহ ও অতীব প্রশংসনীয়।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের যে মূর্ত্তি ছিল, এখন আর সে মূর্ত্তি নাই। রচনা-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও যাঁহারা সুলেখক, তাঁহাদের সকলের রচনা-পদ্ধতি একরূপ নহে। কথ্য-ভাষার সাহিত্য যখন বিপুলায়তন হয়, বহু শিল্পী বহু দিক্ হইতে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী যখন রচনাকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তখন সাহিত্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করে—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্য যে মূর্ত্তিই ধারণ করুক, প্রত্যেক মূর্ত্তি-বিকাশেরই ইতিহাস আছে। ক্রমে ক্রমে সুনির্দ্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া সে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। গদ্য-সাহিত্যের এই মূর্ত্তি-বিকাশের ইতিহাস বিশেষরূপে আলোচনার বিষয়।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এবং রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে, অনেকেই বাঙ্গলা গদ্য লিখিয়াছিলেন। এই গদ্যগ্রন্থগুলি প্রধানতঃ বিদেশীয়দিগকে বাঙ্গলা-ভাষা শিখাইবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। দুই শ্রেণীর কর্ম্মী এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা। আমাদের দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য যে-সকল বিদেশীয় যুবক এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা-ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতেরা এই যুবকগণকে কার্য্যোপযোগী বাঙ্গলাভাষা শিখাইবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই-প্রকারের সীমাবদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ

উদ্দেশ্য লইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। তবে, লেখকগণ সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই, মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রস-সৃষ্টি যে একবারেই হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই রস-সৃষ্টি আনুসঙ্গিক রূপেই হইয়াছিল।

জনসাধারণের উন্নয়ন ও উন্নততর রসাস্বাদনের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহাই প্রাণময় সাহিত্য। ফোর্ট্ উইলিয়মের পণ্ডিতী-সাহিত্যের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীরামপুরের 'খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের' বাঙ্গলা-ভাষায় গ্রন্থরচনার দুই-প্রকারের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা একদিকে বিদেশীয়দিগকে, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগকে এ-দেশীয় ভাষা শিখাইতে চাহিয়াছিলেন; আর একদিকে দেশের লোককে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী ভাব, চিন্তা ও ধর্ম্মের দ্বারা উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের উন্নয়ন-চেষ্টা 'খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের' উদ্দেশ্যের ভিতর ছিল। সাহিত্য-সাধনার এই দুইটি ধারা যে সময়ে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে মহামনা রাজা রামমোহন রায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশবাসী-গণের উন্নয়ন-চেষ্টাই তাঁহারও মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদেশের যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; দেশবাসিগণের চিত্তে বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে জড়তা পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে; নবযুগের যে গৌরবময় আদর্শ, প্রতীচ্য-জগতের সাধনা আশ্রয় করিয়া আমাদের পুরোদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই আদর্শের অভিমুখে দেশকে চালাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য অন্ধ অনুকরণ মাত্র নহে। দেশীয় সাধনার ভূমিতে দাঁড়াইয়া অতীতের সাহায্যে ভারতের স্বপ্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই প্রকৃতির অনুবর্ত্তনে মাতৃভাষার সাহায্যে এই কার্য্য করিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ভারতের আত্ম-প্রকৃতি নির্দ্ধারণে ভুল করিয়াছিলেন কি না, বৈদেশিক ভাবের দ্বারা কিছু বেশী রকম বাহিত হইয়াছিলেন কি না, সে কথার আলোচনা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত। কারণ, আমরা সাহিত্যের আলোচনা করিতেছি। দেশবাসিগণের উন্নয়নই যে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই-প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া যে সাধনা, সেই সাধনাই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। ইহা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা প্রমাণী-কৃত হইবে।

অন্য দেশের গদ্য-সাহিত্যের সহিত, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের তুলনা করিলে দুইটি কথা স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রথমতঃ, এই সাহিত্য তাহার উদ্ভবের প্রথমাবস্থা হইতেই উন্নততর ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি সুস্পষ্ট মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলা-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ইহার হেতু। বাঙ্গলা-ভাষার অবশ্য একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের শব্দ-বৈভব, ভাব-সম্পদ্, রচনারীতি প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিপদে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইবার যে সুযোগ পাইয়াছে, সে সুযোগ অন্য কোন ভাষা ও সাহিত্য এত অধিক পরিমাণে পায় নাই।

তাহার পর গদ্য-সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বাঙ্গলার পদ্য-সাহিত্য অতিশয় সমুন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতার ভাষা প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, ও অলঙ্কার-বৈভবে আজিও অতুলনীয়। বৈষ্ণব-কবিতার প্রাণময়তা, স্বচ্ছতা ও মাধুর্য্য বিশ্বসাহিত্যের গৌরবের বস্তু। তাহার পর এই বাঙ্গালী জাতি, সংস্কৃত-ভাষার সাহায্যে কাব্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি উন্নততর চিন্তারাজ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশের মনীষার জ্যোতি সমগ্র ভারতবর্ষকে চমৎকৃত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভক্তিতত্ত্বের রসসৃষ্টি, রসশাস্ত্রের অতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, নব্যন্যায়ের বিচারকুশলতা, স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মীমাংসা-কৌশল—এই সকলের মধ্য দিয়া যে জাতীয় চিত্ত বিকশিত হইতেছিল, সেই চিত্তই বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতবড় সুবিধা আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে?

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতি যেরূপ দ্রুতবেগে সাধিত হইয়াছে, অল্পকালের মধ্যে এই সাহিত্য যেরূপ শক্তিশালী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও বিস্ময়াবহ। পূর্ব্বোক্ত কারণ ব্যতীত, আর-একটি কারণ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে, আধুনিক উন্নতিশীল জগতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উৎঘাটিত হইল। সে এক সুবিপুল বন্যার মত! পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক জাতি, তাহাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা লইয়া ভারতের পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইল। আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনা, বাদানুবাদ, চিন্তারাজ্যে বিবিধ প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত—এই সংঘর্ষের মধ্যে নব্যভারতের জন্ম হইল। বাঙ্গালায় রামমোহন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পতাকা হস্তে, এই নব্যভারতের অগ্রদূত হইলেন এবং বাঙ্গালী জাতি নব্যভারতের গুরুর আসন লাভ করিল। আমরা রাজা রামমোহন রায়কেই, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা না হউন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে গ্রহণ করিলাম।

আমাদের সাহিত্যালোচনার প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজা রামমোহন রায়ের উপযুক্ত পূজা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাজা রামমোহন রায়, ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক রূপে, তাঁহার যুগে বহু আক্রমণ সহ্য করিয়াছিলেন। সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যের উদার মিলন-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, সে দিনের সেই বিরোধের স্মৃতি একবারে মুছিয়া ফেলা আবশ্যক এবং তাঁহার সাধনার প্রকৃত মূল্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। সুদূর প্রবাসে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ করার পর নব্বই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সংস্কারক রামমোহনকে লইয়া যে বিতণ্ডাময় আলোচনা তাঁহার জীবিতকালে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই আলোচনার বিতণ্ডার অংশ এখন অপসৃত হইয়াছে। তাহার পর এই সুদীর্ঘকালে সমগ্র পৃথিবীর এবং ভারতবর্ষের জ্ঞান-রাজ্যে ও কর্ম্মরাজ্যে বহুপ্রকারের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, সেদিন অনেকে যে-চক্ষুতে রামমোহনকে দেখিয়াছিলেন এবং যে-ভাবে তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন, আজ আর সে বিরোধীভাবের কোন

সার্থকতা নাই। এখন আমরা নিরপেক্ষভাবে নানা দিক্ হইতে রাজা রামমোহন রায়ের স্বরূপ এবং তাঁহার সাধনার প্রভাব আলোচনা করিতে পারি।

রাজা রামমোহন রায় মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলে, রাজা রামমোহন রায় ঔৎসুক্য ও আহ্লাদের সহিত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেন এবং তাহাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ইংরেজ জাতির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধার কারণ, তিনি এই ইংরেজকে স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মানবের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এই স্বাধীনতার মহামন্ত্রের সাধনায় রাজা রামমোহন রায় যে-দিন উদ্বোধিত হইয়াছিলেন, তাহার পর এই এক শতাব্দীকালের নানারূপ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দ্বারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের কেবল জনসাধারণ নহে, বিজ্ঞব্যক্তিগণও সে দিন যে-স্বাধীনতার কথা শুনিয়া ভীত হইতেন, আজ সেই স্বাধীনতার জন্য তাঁহারাও বা তাঁহাদের বংশধরেরাও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমগ্র মানব জাতির চিন্তার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা ও আলোচনা, আজ আমাদের এক নূতন-প্রকারের অনুরাগ লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা-কামী মানব কোন বিশেষ মতের দ্বারা বাহিত হইবে না—সকল-প্রকারের মতই সে আলোচনা করিবে। কিন্তু জীবনের পথে চলিবার সময় সে নিজের মতের দ্বারা নিজের ভিতর যে অন্তর্য্যামী ভগবান্ রহিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিয়া বীরের মত নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইবে—এই-প্রকারের আত্মসংস্থ মানব গঠন করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-বিধানের উদ্দেশ্য। এই বিধানের নাম—'উদার শিক্ষা-বিধান' (Liberal culture)। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের কোন বিশেষ মত সম্বন্ধে দেশের বহু বহু মানবের যদি আপত্তি থাকে, তাহা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ, তাঁহার ঐ মতের আলোচনা করিতে বঞ্চিত হইবে না, এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পরবর্ত্তী গদ্য-সাহিত্যে যে চেষ্টাকৃত ও সাধনালব্ধ শিল্পচাতুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় তাহা না থাকিলেও, তিনি একজন স্বাভাবিক সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন। এখনকার উচ্চ-শ্রেণীর উপন্যাস বা প্রবন্ধ-পুস্তক যে-ধরণে লিখিত হয়, তাহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের রচনার ভঙ্গী বা রীতির (Style) প্রভেদ অনেক। কিন্তু, এখনকার মাপকাঠি দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের শিল্পনৈপুণ্যের পরীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে রাজা রামমোহন রায়, গদ্য-সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, গদ্য-সাহিত্য কেমন করিয়া পড়িতে হয়, পাঠকগণকে তাহা শিখাইয়া লই।, সেই সাহিত্যের সাহায্যে দেশবাসিগণকে তাঁহার ভাব ও চিন্তা দান করিয়াছেন। রাজা

রামমোহন রায় ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা ললিতপ্রবন্ধ-লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারক। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি প্রভৃতির দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া, তিনি লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক তর্কবিতর্ক করিয়া উপদেষ্টার কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা একালে যাঁহাদিগকে সাহিত্য-শিল্পী বলি, তাঁহারা যে সংস্কারক বা উপদেষ্টা নহেন, তাহা নহে। তবে তাঁহারা এই কার্য্য গৌণভাবে করিয়া থাকেন। মুখ্যভাবে তাঁহারা আনন্দদায়ক বন্ধু, হৃদয় ও মনের সাথী—তাঁহারা সৌন্দর্য্য ও রসের স্রষ্টা।

আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-সাহিত্যে দেখিতে পাই—বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের দুইটি বিভিন্ন ধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সুন্দর ও স্বাভাবিক সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ধারা সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত-গণের ভাষা—আর-একটি ধারা কথোপকথনের ভাষা। এই দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাতে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতুম পেঁচার নক্সা' লিখিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময়ে এই দুইটি ধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার গৌরব এই যে, তাঁহার ভাষাতে এই উভয় ধারার একটি প্রাথমিক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। রামমোহন রায়ের পর এই দুইটি ধারা বিভক্ত হইয়া দুই মুখে অগ্রসর হইল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া আবার একটি উন্নততর সামঞ্জস্য (higher synthesis) লাভ করিয়াছে—

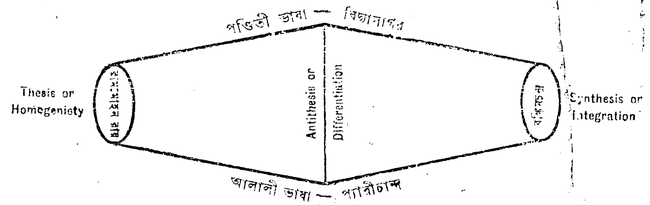

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে, সে সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে। তাহাতেও এই দুই ধারার সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের গতি—মানবীয় চিন্তা ও সাধনার যাবতীয় গতির ন্যায়—এই সনাতন পথে ক্রমবিকাশেয় অভিমুখী।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার রীতিতে যেমন বিচ্ছিন্নতা বা শ্রেণীবিভাগ (differentiation) হয় নাই, তাঁহার চিন্তাতেও ঠিক্ তাহাই। তিনি শাস্ত্রসর্ব্বস্ব জাতিকে শাস্ত্রের বিচার দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিচারের ভিতর সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে। তখনও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সুস্পষ্ট বিভিন্নতা সাধিত হয় নাই। এই বিভিন্নতা-সাধন (specialization) পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষায় বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তৎসম্পাদিত

সংবাদপত্রগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলি পাইলে হয়ত তাঁহার রাজনীতিক রচনা কিছু কিছু পাওয়া যাইত। তাঁহার ইংরেজী রচনায় অতি উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র মনীষা শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়াই পরিব্যক্ত হয় নাই। সে সময়ে বাঙ্গলা ভাষায়, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ জনশ্রেণীর নিকট, রাজনীতিক আলোচনার কোন সার্থকতা ছিল না বলিয়াই মনে হয়। আজিকার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে সে-দিন রাজা রামমোহন রায়কে কত অসুবিধার মধ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার ও সাধনার বিশিষ্টতা এই যে পরবর্ত্তী সময়ে যে-সমুদয় বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্য-সেবক ও কর্ম্মিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যে-সমুদয় বিভাগে তাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় তাহার সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মিগণের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—ইহা তাঁহার অসাধারণতার পরিচায়ক।

রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনের ইতিহাস, বিশেষরূপে আলোচনার বিষয়। নব্যভারতের আকঙ্ক্ষার ও তপস্যার মূল-প্রেরণা, এই ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। প্রাচীনযুগের যে-সমুদয় চিন্তাপ্রণালী ও শাস্ত্র রাজা রামমোহন রায় আলোচনা করিয়াছিলেন, তিনি যে-সময়ের লোক, সে-সময়ে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাক্ষেত্র যে-সমুদয় নেতা শাসন করিতেছিলেন, তাহার একটি স্থূল পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান—এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের সাহিত্যের ও সভ্যতার ধারা, ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায়, রাজা রামমোহনের মানস-জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের পিতার বংশ বৈষ্ণব, আর মাতার বংশ শাক্ত। উভয় বংশই শাস্ত্র-আলোচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন দেশীয় ও বিদেশীয় জীবনচরিত-লেখক, শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহবন্ধন দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন! ইহার কারণ, তাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহ হিন্দুসমাজে একটি নিতান্ত প্রচলিত ব্যাপার।

যাহা হউক, এই দুই প্রকারের মত ও সাধন-পথ, রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তকে যে তুলনামূলক-সমালোচনা কার্য্যে জীবনের প্রথম অবস্থাতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলনা-মূলক ধর্ম্মালোচনা ও বিভিন্নপ্রকারের ধর্ম্মমতের সমন্বয়-সাধনের প্রেরণা, রাজা রামমোহন রায় বাহিরের বা বিদেশের কোন শিক্ষা হইতে যে প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তুলনা ও সমন্বয়-মূলক 'কালিকাবিলাস,' 'সারদাতিলক' ও 'প্রপঞ্চসার' প্রভৃতি তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষ চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের তুলনা ও সমন্বয় করিয়াছে; সুতরাং, রাজা রামমোহন রায়ের এই প্রবৃত্তির বা উদ্যমের বৈদেশিক বা বিজাতীয় প্রভাবের অন্বেষণ করার প্রয়োজন নাই। তবে মুসলমান ধর্ম্মের আলোচনা, তিব্বতযাত্রা, তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী, এই চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী যুবকের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল। তন্ত্র ও স্মৃতি লইয়া বাঙ্গলার

ব্রাহ্মণসমাজ যে সময়ে অভিভূত, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের আলোক এবং বৈদান্তিক মত ও উপনিষদের সারসত্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার পর খৃষ্টীয় সমাজের নানাবিধ মতের সহিত পরিচয়, ডিগ্‌বী সাহেবের সংসর্গে তৎকালীন ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ,—এতগুলি শক্তি, রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণের চিন্তা ও তাহার বিবিধরূপ সমালোচনা দ্বারা ইউরোপের চিত্ত উন্মথিত হইতেছিল। এই চিন্তা-সংঘর্ষের প্রভাব, রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রুসো ভল্‌টেয়ারের সহিত একটা বিশেষ-রকমের প্রভেদও আলোচনার বিষয়। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ, মানবতার যে গৌরব-গীতি গাহিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় উল্লাসের সহিত তাহা শুনিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতর যে সংস্কারমুক্ত সংযত স্বাধীনতার বার্ত্তা ছিল, তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ যখন অতীতকে ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে অনাদর করিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় সেই যুগে, তাঁহাদের চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াও, শাস্ত্র এবং অতীতকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া নবযুগের প্রয়োজনীয় উন্নতিশীল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে এবং তাঁহার জাতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে! অবশ্য এ কার্য্যেও মনীষী বার্কের সংরক্ষণ ও সংস্কার নীতির (conservation and reform) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এখন কোন জাতি বা কোন দেশ বিভিন্ন নহে। মনোজগতে সকলেই মিলিয়া গিয়াছে। এই মহামিলনের প্রথম সুর আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—অথবা প্রাচীন বা আধুনিক—এই উভয় প্রকারের চিন্তার ও সাধনার সংঘর্ষ ও সমন্বয় আলোচনা করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার স্বদেশের বিশিষ্টতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিশিষ্টতা ভারতের ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক জীবন। এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপলব্ধিতে ভারতবর্ষ তাহার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই ভারতবর্ষকে নবযুগে সগৌরবে জাগিয়া উঠিতে হইবে। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার মর্ম্মকথা বলিয়া মনে হয়। বেদান্তে তিনি ভারতের এই আধ্যাত্মিক তার সর্ব্বোত্তম পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথম বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধারণতঃ পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ঠিক প্রাচীন জগতের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। এই ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন এবং এই ধর্ম্মে যুক্তি-প্রয়োগ ও স্বাধীন চিন্তা নিরঙ্কুশ ও অক্ষুণ্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় সাহিত্যের ও ধর্ম্মের বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সম্মিলিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন—কেবল হিন্দুশাস্ত্র নহে, হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টানের শাস্ত্র

স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র স্বীকার করিয়াও মানবের স্বাধীন-চিন্তার অধিকার সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম ঠিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, তাহার আলোচনা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত। কিন্তু একথা অতিশয় সত্য যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, মানুষকে এক সুদূরবর্ত্তী ও অজ্ঞাত পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই উদ্বুদ্ধ করে না—সংসারের সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রকে এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং মানবের সর্ব্বতোমুখ উন্নতিসাধন এই ধর্ম্মের লক্ষণ। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম, সাহিত্যসাধনা হইতে একবারে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা নহে।

ভারতের প্রাচীনতম ও উন্নততম জ্ঞানভাণ্ডার বেদান্তশাস্ত্র। এই বেদান্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই রাজা রামমোহন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন ভাবে মানুষ যাহাতে চিন্তা করিতে পারে, নিজেদের দেশীয় সাধনার যাহা প্রাণপ্রদ তাহা রক্ষা করিয়া, বাহিরের পুষ্টিকর ও কল্যাণপ্রদ ভাবসমূহ এই প্রাচীন জাতি যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, নিজের বক্তব্য বিষয় সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারের সহিত যাহাতে তাহাদের পরিচয় হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য রামমোহন রায়, গদ্য-সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার আরম্ভ করিলেন।

বিশুদ্ধ সাহিত্য কি, সাহিত্যকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কোন্ শ্রেণীর কি লক্ষণ—এ-সমুদয় নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। আমরা এই স্থানে বিশুদ্ধ সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতেছি। মানুষ নানা প্রকারে মানুষ হইতে পৃথক্। জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, আবার এমন কি, গায়ের বর্ণ পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে এই পার্থক্য ছাড়াইয়া উঠা যায় না। কিন্তু মানব-চৈতন্যের বা মানবহৃদয়ের এমন একটি জাগরণের অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মানুষ তাহার এই স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠে এবং ভাবে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, সুখে-দুঃখে, সৌন্দর্য্য-বোধে ও রসাস্বাদনে অতীত অনাগত, দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী যাবতীয় মানবের সহিত এক হইয়া যায়। মহামানব বা নিত্যমানবের জীবন, ক্ষুদ্র মানবের জীবনে সেই সময়ে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থার যে শব্দময় ও রসবৎ-প্রকাশ—গদ্য বা পদ্য যাহাতেই হউক—তাহাই বিশুদ্ধ-সাহিত্য-পদবাচ্য। সাহিত্যের ভূমি, মহামিলনের ভূমি। যাহা নিত্য সত্য ও নিত্য সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের আত্মা।

সাহিত্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিলে, দর্শন ও ধর্ম্মের সহিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রভেদ অতি অল্পই থাকে। কাজেই সেই প্রভেদটুকু সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই জাগরণ যদি বিচার-মূলক জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহা উচ্চতম দর্শনশাস্ত্র। আর, এই জাগরণ যদি মানবের জীবনের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা হইলে

তাহা ধর্ম্ম। আর, এই জাগরণ যদি প্রধানতঃ হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করিয়া রসাস্বাদনের সাহায্যে সুবিশুদ্ধ আনন্দ দানের সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহা সাহিত্যপদবাচ্য। প্রভেদ অতিশয় অল্প; কিন্তু বাঙ্গলা দেশে একদিন, অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের যুগে, ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রায় এক হইয়া গিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রকারের উদারতত্ত্বমূলক সংজ্ঞা-নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞার সাহায্যে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এই নিত্যসত্য ও নিত্যসুন্দর যে রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই বিশুদ্ধ সাহিত্য বা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। অন্যান্য শ্রেণীতে বিচার-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, এই সত্য ও সুন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ না করিলেও, মানবহৃদয় সেই রচনার দ্বারা, ঐ সত্য ও সুন্দরের অভিমুখে কি পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ ও বাধাহীন যুক্তিপ্রয়োগ—যাহা মানবহৃদয়কে সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন করিয়া মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে লইয়া আইসে, তাহাও—সাহিত্যপদবাচ্য। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিক্ষা যদি এরূপভাবে ব্যাখ্যাত হয় যে, এতদিন যাহা দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি বলিয়া মনে হইত, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সার্ব্বজনীন, তাহা হইলে ঐ ব্যাখ্যাও সাহিত্যপদবাচ্য হইবে। এই-প্রকারে দেশ-বিশেষে প্রচলিত আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান এমন কি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, যদি মানবহৃদয়ের কোন সনাতন ও বিশ্বজনীন মহাসত্যের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলেও ঐ বর্ণনাও সাহিত্য-পদবাচ্য। এক কথায়, মানবতাই সাহিত্যের পরিচায়ক এবং মানবতার প্রতিষ্ঠা ও মানবতার অভিমুখীনতা, সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের অভ্রান্ত লক্ষণ।

সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইল, উহা একেবারে আধুনিক যুগের চিন্তা ও ধারণার উপযোগী। পূর্ব্বে সাহিত্য, পণ্ডিতগণের সামাজিক সম্মেলনে আনন্দভোগের সামগ্রী ছিল। রাজসভার সাহিত্য, বেশভূষা ও অলঙ্কার-পারিপাট্যের দ্বারা এবং কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিয়া, ধনী মানী ও পদস্থ ব্যক্তি-গণের সেবা করিত। আবার সাহিত্য, কখনও নিম্নশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল মানবের ইন্দ্রিয়ভোগের স্থূল উপকরণও জোগাইয়াছে। কিন্তু এখন আর মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ নাই। এখনকার সাহিত্য সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহে। মানবতার গৌরব ও মানব-আত্মার অসীম মহিমা সকলেই বুঝিবার অধিকারী। এই বোধের উপর মানবের মহামিলন হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা হইয়াছে। তবে তখন গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই আদিম প্রাণপ্রতিষ্ঠার কালে এই মানবতার গৌরব এবং প্রত্যেক নরনারীর উচ্চতম পরমার্থ বস্তুতে সমান অধিকার সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। সেই অভয়দান ও অমৃতবিতরণের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিশিষ্টতা, তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। বৈষ্ণব কবিতা অতি প্রাঞ্জল, সরল এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দেই রচিত। কোন কোন কবির রচনায় কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে সত্য। কিন্তু কীর্ত্তনের গানের দ্বারা এই পদাবলী ব্যাখ্যাত ও আস্বাদিত হইয়া

আপামর সাধারণের দ্বারে দ্বারে তাহার অমৃত বিতরণ করিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্য জনসাধারণের মহামিলনের সাহিত্য।

সাহিত্যকে যথার্থরূপে জাতীয় সাহিত্য করিতে হইলে, অতীতের সাধকগণের সাধনার সহিত একটি জীবন্ত যোগ রক্ষা করিয়া, পরবর্ত্তী কর্ম্মিগণের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। রাজা রামমোহন রায় কি কি সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তৎসমুদয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় যিনি লাভ করেন নাই, নব্যবঙ্গের জাগরণ ও সাধনার মূল সূত্র তিনি ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। কাজেই রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে, সাহিত্য-সভায় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে নানা দিক্ হইতে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দ্বারা এই মহাপুরুষকে যাঁহারা ভীত চিত্তে দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা স্বদেশের প্রতি বড়ই অবিচার করেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ব্বাচিত করিয়া সেই অংশগুলি উচ্চশিক্ষার্থিগণ যাহাতে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, সেজন্য দেশের তৎকালীন অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের সাধনা ও তৎকালীন বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সহ প্রকাশিত করিয়া, পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রকৃত আলোচনা, এই কার্য্যের দ্বারাই আরব্ধ হইবে।

রচনা-ভঙ্গী বা রচনা-রীতি (style), শব্দ বা পদবিন্যাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন বিশিষ্ট লেখকের রচনা রীতির আলোচনায়, শব্দের ব্যাকরণ-শুদ্ধি বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলেই চলিবে না। এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু উহা গৌণ। সাহিত্যের রচনা-রীতি, তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, লেখকের মানসিক প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং, রচনা-রীতির উন্নততর ও গভীরতর আলোচনা আবশ্যক।

একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে Organology of writing বলিয়াছেন। ভিতরের প্রয়োজনের তাড়নায় বা বাহ্যপ্রকৃতির সহিত নিত্যসমুত্থিত সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক প্রেরণায়, জীব-জীবনে নব নব কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে গড়িয়া উঠে। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। কোন কোন জীব-জীবনের কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে, সেই জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। কোন সাহিত্যের রচনা-রীতির পারম্পর্য্য বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে, আমরা বাহিরের দিকে যেমন শব্দবিজ্ঞানের ও অলঙ্কারশাস্ত্রের কতকগুলি সঙ্কেত বা সন্ধান পাই, তেমনি ভিতরের দিকে সেই সাহিত্য যে জাতির, সেই জাতির মানস-জীবনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের পরিচয় পাই। অতএব রচনা-রীতি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে, লেখকের ভাব ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, তাঁহার মানসিক প্রকৃতির স্থায়ী সুর এবং সেই স্থায়ীভাবের উপর নানারূপ সঞ্চারীভাবের বিলাস-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। মানস-ক্ষেত্রে নব নব চিন্তার তরঙ্গ

জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে, শব্দের সাহায্যে তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মানসিক জীবনের উপর আবার ক্রিয়া করিতেছে—বাহিরের সহিত ভিতরের এই প্রকারের আদান প্রদান ও ঘাত প্রতিঘাত, রচনা-রীতির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অনুভব শক্তির অনুশীলন ব্যতিরেকে রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্যিক, বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া যান, তাঁহাদের প্রত্যেকের একটি নিজত্ব থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজত্ব আছে—তবে, কাহারও বিকশিত হয়, কাহারও হয় না। এই নিজত্বকে বিকশিত ও পরিস্ফুট করিয়া যিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহা দান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই বরেণ্য। এই নিজত্ব যেমন ভাব, চিন্তা ও অনুভব-বৈচিত্র্য বা কল্পনার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়, তেমনি যে ভাষায় ঐ ভাব পরিব্যক্ত হয়, সেই ভাষার ছন্দ, ভঙ্গী বা রচনা-রীতির মধ্য দিয়াও তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ইহাকে আমরা সাহিত্যিক চরিত্র বা মানসিক প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। রচনা-রীতির নির্দ্ধারণ, বাক্যবিশেষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডের বিচারণা বা বিশ্লেষণের দ্বারা হইবার নহে। রচনা-রীতির প্রাণ আছে। সমগ্র অখণ্ড অনুভবের দ্বারা সেই প্রাণের উপলব্ধি করিতে হইবে। রচনা-রীতির মধ্যে নিজের মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত করা, সাহিত্যসেবক মাত্রেরই সাধনার বিষয় হওয়া উচিত। সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-রীতির পর্য্যালোচনার সময়, এই সত্যটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি বুঝিবার জন্য, তাঁহার জীবন ও সাধনা বুঝিতে হইবে। তাঁহার সাধনায় ধ্বংস ও গঠন—এই দুই প্রকারের উপকরণ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে—'খণ্ডন' ও 'মণ্ডন' বলে। এই ভাঙ্গাগড়া সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা, সেকালের রক্ষণশীল পণ্ডিত ও সমাজপতিগণের নেতৃত্বে, রাজা রামমোহন রায়ের সুমহৎ সাধনার এই ধ্বংসের দিক্‌ই দেখিয়াছিলেন—গঠনের দিক্ অধিকাংশ লোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নততর আলোচনার প্রারম্ভে, শিক্ষার্থিগণের সমক্ষে এই সুবিধা আনিয়া দেওয়া অবশ্যক। রাজা রামমোহন রায় ধ্বংসকামী বিপ্লববাদী ছিলেন না। ইহা তাঁহার রচনা-রীতির দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া অনায়াসে নির্দ্ধারণ করা কঠিন। কারণ, তাঁহার রচনার গতি একেবারেই সরল ও স্বচ্ছন্দ নহে। মানুষকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষিপ্রবেগে কোনও সিদ্ধান্ত বিশেষে লইয়া যাইবার উষ্ণতা, রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে ছিল না। তাঁহার মানসিক চরিত্রের ধৈর্য্য ও সর্ব্বতোমুখীনতা ও সকলের প্রতি সুবিচার করিবার প্রয়াস, তাঁহার রচনা-রীতি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রতিপক্ষকে তিনি সর্ব্বদাই অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মানুষের উপর তাঁহার অটল শ্রদ্ধা ছিল। মানবজাতির

অতীতের সাধনা যে অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী, তাহা তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি হইতে এই সত্যগুলি অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এক শ্রেণীর লেখকের মানসিক উষ্ণতা বা উগ্রতা খুব বেশী। তাঁহারা বিহ্বলভাবে একটি বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার জন্য সবেগে ধাবমান হন। ঐ মতের বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সেগুলিকে ওজন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে তাঁহারা অসম্মত। এই শ্রেণীর লেখকগণের ভাষার গতি স্বভাবতঃ স্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত পাঠকগণ ভাষার প্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া যান। রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক চরিত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই প্রকারের স্বচ্ছন্দ ও প্রবাহময় ভাষা, তাঁহার রচনায় আশা করিতে পারেন না। চিন্তার প্রত্যেক পদক্ষেপে, তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অপর পক্ষে কি বলা যাইতে বা ভাবা যাইতে পারে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেছেন, এবং তাহাদের মর্ম্ম অবধারণ করিয়া তাহাদের প্রতি সুবিচার করিয়া, ধীর মন্থর গতিতে বহু প্রকারের চিন্তা ও মতবাদপরিপূর্ণ পথহীন অরণ্যের মধ্য দিয়া নিজের চিন্তার রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন। এই কারণে চিন্তার গতি হঠাৎ থামিয়া যাইতেছে, সর্ব্বদাই বক্র ও বন্ধুর পথে আলোড়িত হইতেছে। তিনি একটি প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ কাল সেই নূতন প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিতেছেন। এই নূতন প্রসঙ্গের অবতারণাই বা কেন হইল, আর ইহার আলোচনা দ্বারা মূল প্রসঙ্গের পুষ্টিই বা কিরূপে হইল, সাধারণ পাঠক অনেক সময়ে তাহা ধরিতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ পাঠক যদি সঠিকরূপে তাহা ধরিতে চাহেন, তাহা হইলে রাজা যাঁহাদের জন্য গ্রন্থ লিখিতেছেন, বা যাঁহাদের সহিত তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও মানসিক প্রকৃতি উত্তমরূপে অনুভব করা প্রয়োজন হইবে। পাঠক যদি ধৈর্য্যের সহিত, তাঁহার চিন্তার গতি এই-প্রকারে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে কিছুক্ষণ ক্লান্তভাবে পর্য্যটন করিতে করিতে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ঋজু পথে আসিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষার এই জটিল ও বঙ্কিম গতি, রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে যে স্বাভাবিক তাহা, তাঁহার মানসিক চরিত্র অনুভব না করিলে, হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

ভাষা ভাবানুযায়ী হইলে যাঁহারা ভাবগ্রাহী তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়। লেখক যে ভাব পরিস্ফুরণ বা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, সেই ভাব পরিস্ফুরণের একটি পথ বা প্রণালী আছে। এই পথ সকল সময় ঋজু পথ নহে। আবার এই পথে অগ্রসর হইবার কালে সকল সময় ক্ষিপ্রবেগে যাওয়া যায় না। সুতরাং ভাবস্ফুরণের প্রণালীর অনুরোধেই, ভাষা অনেক সময় জটিল ও মন্থরগতি হইয়া পড়ে। কিন্তু লেখক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হন, তাহা হইলে ভাষার জটিলতা সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর না হইয়া সুখদায়ক হইয়া থাকে।

রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্র বিশ্বাস করিতেন এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার এই শাস্ত্র-বিশ্বাস, কি প্রকারের বিশ্বাস তাহা বলা বড়ই কঠিন। তিনি যাঁহাদের সহিত

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা নিজেদের শাস্ত্রবিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রামমোহন রায় প্রতিপক্ষগণের এই শাস্ত্রবিশ্বাস স্বীকার করিয়া লইলেন এবং আলোচনা-রাজ্যে প্রতি পদক্ষেপেই শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় মীমাংসার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই কারণেই, তাঁহার রচনা অতিশয় দুরূহ ও বক্রগতিবিশিষ্ট বা অসরল হইল। নিজের যাহা ব্যক্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য, যদি পদে পদে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিতে হয়, এবং নানা শাস্ত্রের বিরোধী বচনসমূহের সমন্বয় মীমাংসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে ঐ রচনা স্বভাবতঃই অত্যন্ত গুরুভার হইয়া পড়ে। দুরারোহ ও দুর্গম পথে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিবার সময় পথিকের যেরূপ অবস্থা হয়, এই প্রকারের রচনা পাঠ করিতে পাঠকেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃগণ, অতীতকে ও মানবের সুবদ্ধ সংস্কারসমূহকে উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া যে ভাবে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় যদি সেরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা সুগম ও সুবোধ্য হইত; এবং বর্ত্তমান যুগের আরামপ্রিয় পাঠকেরাও তাঁহার গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন। রাজা রামমোহন রায় যদি মানুষের জ্ঞান ও বিচারশক্তির নিকট শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ নিজের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত না করিয়া, তাহাদের নিম্নতর রিপুসমূহকে উত্তেজিত করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল চিত্রাবলীর সাহায্যে অনাদর ও উপহাসের ভাষায় পাঠকগণকে চালাইয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তেজস্বী অশ্বের আরোহী যেমন কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী মানব, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকে চরণে দলন করিয়া সজোরে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনাও পাঠককে ঠিক্ সেই প্রকারে আপন সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়া দিতে পারিত। এই প্রকারের সাহিত্য রচনা করিবার যাহা উপকরণ, রাজা রামমোহন রায়ের অধিকারে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। বিরোধী শাস্ত্রের বিবিধ প্রকারের বচন প্রমাণ তিনি এত জানিতেন যে, সেগুলিকে লইয়া তিনি ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস প্রচুর পরিমাণেই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু এই প্রকারের ভাবোচ্ছ্বাসময় ঝটিকা সৃষ্টি, রাজা রামমোহন রায়ের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। ইংরেজ লেখক লর্ড মেকলের রচনা পাঠ করিলে, এই ঝটিকা-সৃষ্টি বা তেজস্বী অশ্বারোহণ যে কি প্রকারের ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রাজা রামমোহন রায়ের পর, আমাদের বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের রচনায় ও বক্তৃতায়, এই প্রকারের চঞ্চল ও মসৃণ গতির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। রচনারীতি যে মানসিক চরিত্রের অভিব্যক্তি, ইহাই তাহার প্রমাণ।

রাজা রামমোহন রায়কে যে কিরূপ দুর্গম, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা আজ বেশ ভাল করিয়াই আমাদের জানা আবশ্যক। পৃথিবীর দুইটি অংশ পূর্ব্বদেশ ও পশ্চিম দেশ—ইহারা উভয়ে সাধনপথে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বদেশ দেশ যেন ভগবানের কৃপায় সুগম পথে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর পশ্চিম দেশ নানা অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে

চলিল। কিন্তু পূর্ব্বদেশের এই সৌভাগ্যই, তাহার দুর্দ্দশার হেতু হইল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে আরামে নিদ্রাগত হইয়া কেবল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল! পশ্চিম তখন উদ্যমশীল, এখন সে পূর্ব্বদেশের ঘাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদেশের নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায়ের উপর, এই ঘুম ভাঙ্গাইবার ভার পড়িয়া ছিল। সুদীর্ঘকালের নিদ্রার পর মানুষ যখন প্রথম জাগিয়া উঠে তখন তাহাদের যেরূপ অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের সময় আমাদের দেশের অবস্থাও সেইরূপ ছিল। সে সময়ের ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশ কি বাহিরের জগতে, কি ভিতরের জগতে, অমিত উল্লাস ও উৎসাহের সহিত নানাদিকে সংগ্রাম করিয়া উন্নতিপথে সবেগে ছুটিতেছিল। কিন্তু সুপ্তোত্থিত মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ যেরূপ সম্মুখবর্ত্তী বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন কিছু দেখিয়াও দেখিতে পায় না, এবং দেখিলেও বুঝিতে পারে না, নিজের ভিতরের আলস্যের টানে ও সুপ্তাবস্থার স্বপ্নের ঝোঁকে নিশ্চেষ্টবৎ পরিলক্ষিত হয়, রাজা রামমোহন রায়ের যুগে বাঙ্গালা ভাষার পাঠকগণের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। এই কারণে তাঁহার রচনায় সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ, সাহিত্য বা রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংগ্রামের কথা এত অল্প। একমাত্র 'সংবাদ-কৌমুদী'তে সরল ভাষায় লিখিত ছোট ছোট প্রবন্ধের সাহায্যে, তিনি দেশের লোককে বাহিরের অধ্যবসায়শীল ও উন্নতিমুখ জগতের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দেশের লোক তখন শাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই জানিত না। আবার এই শাস্ত্র নিতান্ত আংশিকরূপে জানিত। নব্যন্যায়ের আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রতিভা যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক, পরবর্ত্তী সময়ে এই নব্যন্যায়ের আলোচনায় যে এই 'বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার' করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ন্যায়দর্শনে—বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প—এই তিন প্রকার তর্ক বা আলোচনার কথা আছে। উভয় পক্ষ যেখানে সত্য জানিতে উৎসুক, কেহ কাহাকেও তর্কে পরাস্ত করিতে চাহে না, সেই অবস্থায় যে আলোচনা বা বিচার, তাহার নাম—'বাদ'। আর, অপরের মত না শুনিয়া ও না বুঝিয়া, কেবল তর্কনৈপুণ্য ও বাক্‌চাতুরীর দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার যে চেষ্টা তাহার নাম—'জল্প'। আর, প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া অপদস্থ করিবার যে অবস্থা, তাহার নাম—'বিতণ্ডা'।

নবদ্বীপের নব্যন্যায় প্রধানতঃ এই জল্প, ও বিতণ্ডার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চরিত্রের যে অধোগতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এযুগে বলিলাম—মানসিক চরিত্রের অধোগতি; কিন্তু রাজা রামমোহন রায় সে কথা বলেন নাই। সে সময়ের পণ্ডিতদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংস্কার ও বিশ্বাস মানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদেরই প্রণালী অনুসারে তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণেই রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনায় শাস্ত্রীয় আলোচনার বাহুল্য ঘটিয়াছে। কেবল শাস্ত্রের বাক্য ও শাস্ত্রের মীমাংসা লইয়া যদি রাজা রামমোহন রায়কে বিব্রত হইতে না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান

সময়ে হৃদ্য ও সুপাঠ্য অনেক সামগ্রী তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া, জনসংঘের চিন্তা-গত মুক্তিপথ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, তাঁহার গদ্য-রচনাকে দুরূহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা-রীতি, তাঁহার মানসিক প্রকৃতিরই পরিচায়ক।

ভাষা বা সাহিত্য ভাবগোপনের জন্য নহে—ভাব প্রকাশের জন্য। কিন্তু যখন জাতিবিশেষের জীবন ভাবহীন নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্যের যাহা লক্ষ্য, তাহার প্রতি মনোযোগ থাকে না, কেবল ভাষার মূর্ত্তি লইয়াই লেখকেরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও অকারণ বাদানুবাদ করেন। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় এবং তাহার অনুকরণে রচিত অনেক বাঙ্গলা কবিতায় এই দুর্দ্দশা পরিলক্ষিত হয়। পণ্ডিতেরা এমন একটি শ্লোক রচনা করিলেন, যাহার পাঁচ বা সাত প্রকার অর্থ হয়। এই-প্রকারের রচনায় শব্দ-শাস্ত্রের উপর অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই রচনা ভাবসংক্রমণের উপযোগী নহে। সুতরাং এই-প্রকারের রচনাকে প্রকৃত প্রাণময় সাহিত্য বলা যায় না। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্য করিলেন—বড় বড় পণ্ডিতদের সহিত বিচার করা বড়ই কঠিন। তাঁহারা ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির সাহায্যে একটি শব্দ বা একটি বাক্যকে নানা সময়ে নানারূপে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং কথা লইয়াই মারামারি হয়—কথার যে কি অর্থ, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই প্রকারের নিষ্ফল তর্কের ঝটিকা, মানবের মনোবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের একেবারেই অনুপযোগী। বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকাতেই রাজা রামমোহন রায়, এই-প্রকারের তর্কপ্রিয় ও শব্দসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণকে এমনি ভাবে শব্দ লইয়া ব্যায়ামচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং ব্যবহৃত বাক্য মাত্রেরই একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিচিত অর্থ গ্রহণ করিয়া শব্দের আবরণ ভেদ পূর্ব্বক, অর্থরাজ্যে বা ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। সৎ-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই সূত্রপাত।

রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতগণের সহিত অতীব নিপুণভাবে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত-গুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিচার মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত এই অতি প্রাচীন দেশে, মানবের অধিকার ও রুচিভেদে নানা যুগে নানা শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের শাস্ত্রেরই চর্চ্চা করেন। প্রয়োজন-মত অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তর্ক বা বিতণ্ডা করেন বটে, কিন্তু অপরের যাহা যুক্তি, তাহা শ্রদ্ধার সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন না। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপনাদিগকে বেদানুগত বলিয়া স্বীকার করেন। এই-প্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কারণ, ইহাতে বিরোধ ও দলাদলির নিষ্পত্তি হইবার উপায় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিভার নিদর্শন এই যে, তিনি অনেকটা অপক্ষপাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র লইয়া বিচার করিতে

পারিতেন; সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী হয়, প্রত্যেক সম্প্রদায় সাধুভাবে নিজেদের শাস্ত্রীয় ও সম্প্রদায়িক উপদেশ অনুসারে চলিয়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিদ্বেষসম্পন্ন না হইয়া, অপরের সহিত তাঁহাদের যে মিলনের ভূমি রহিয়াছে, সেই ভূমি যাহাতে দেখিতে পান, রাজা রামমোহন রায় সেজন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল যে হিন্দুসমাজের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তিনি এই মিলনের ভূমি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নহে, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা খৃষ্টীয়ানদিগকেও এই উদার মতসহিষ্ণুতায় ও মৈত্রীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার ভাবজীবনে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রচলিত মত অনুকরণও করেন নাই। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রকৃতিসিদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়া, কি প্রকারে অপরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইতে পারে, রাজা রামমোহন রায় তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের দেশে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এখন আর পক্ষাপক্ষের দিন নাই। আমরা স্বীকার করি বা না করি, তিনি বহুল পরিমাণে আমাদের ভাব-জীবনের ও কর্ম্মজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য এবং বিচারপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া লাভবান্ হইবার জন্য, এখন বিচারণার সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। প্রণালী নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে আলোচনা ফলপ্রদ হইবে না। রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টীয় বা বিদেশীয়গণের সহিত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম ও সাধনা লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, এখনকার দিনে আমরা যদি সেই আলোচনাগুলি মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব তিনি আমাদের কে। এই ভারতবর্ষকে সর্ব্বপ্রকারে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, এই ভারতবর্ষকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে উচ্চতম সিংহাসনে বসাইবার জন্য, তিনি কিরূপ আগ্রহান্বিত ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিলে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরতম প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিব। রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার এই নিগূঢ় মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইলে, তাঁহার অন্যান্য আলোচনা ও মতামত আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে এবং আমরা রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত আদর্শ বুঝিতে পারিব।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ গ্রন্থ ছাপাইয়া ও বক্তৃতা করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের নিন্দা প্রচার করিতেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি মানবের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে বিচারপূর্ব্বক নিজ নিজ ধর্ম্মমত গঠন করিবার অধিকারী, ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল। ইংরেজ জাতির উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস ছিল। তিনি বিবেচনা করিতেন,—ইংরেজ সকল সময়েই নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী। তিনি খৃষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

কিন্তু খৃষ্টীয় প্রচারকগণ বিচারে আসিলেন না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, হিন্দু বা মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিষয়ক ধারণায় যে-সমুদয় ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা ভীষণতর ভ্রান্তি তাঁহাদের নিজেদেরই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যে রহিয়াছে। যদি সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মমণ্ডলীরই সংশোধন আবশ্যক। কেবল নিন্দা করিয়া বা লোক দেখাইয়া, একজন লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্‌লাইয়া দেওয়া বা এক ধর্ম্ম হইতে অপরধর্ম্মে দীক্ষিত করা, কিছুতেই সঙ্গত নহে। নিরপেক্ষভাবে ও বন্ধুর ন্যায় সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করুন, জন-সাধারণ এই আলোচনার সহিত পরিচিত হউক; এই প্রকারের আলোচনা করিতে করিতে মানবমাত্রেরই হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মতামত গঠন করিতে পারিবে। রাজা রামমোহন রায় এই মত, সজোরে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাজা হিন্দুদের প্রাচীনতম উন্নততম বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে, এই মত সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তিনি জোর করিয়া কাহাকেও তাঁহার মতে আসিয়া দল বাঁধিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, সকলে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনুক ও শুনিয়া চিন্তা করুক—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি নিজেকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। প্রতিপক্ষের মত, সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন এবং আশা করিতেন—অন্যে তাঁহার মত, সুযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করুক। কিন্তু কি দেশীয় পণ্ডিতগণ, কি বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, কেহই তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। দেশীয় পণ্ডিতগণ বাক্‌ছল, জল্প ও বিতণ্ডায় অতিমাত্র অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার পর যে কারণেই হউক, রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত অভিপ্রায় তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না—সর্ব্বদাই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। স্বার্থহানীর আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে।

এখন, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব, জ্ঞানহীন অথচ শক্তিশালী বৈদেশিকগণ, আমাদের দেশের সামগ্রীর প্রতি যখন অবিচার করিতেন, তখন রাজা রামমোহন রায়, কিরূপ সিংহ-বিক্রমে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। তাঁহারা অবশ্য, রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তির দ্বারা নিরস্ত হন নাই; কিন্তু দেশের যাঁহারা তখনকার বা ভবিষ্যতের শ্রদ্ধালু লোক, তাঁহারা নব্যভারতের সমস্যা কি, এবং এই দারুণ সমস্যার মধ্যে, আমাদিগকে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া সগৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা তাঁহারা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র ও পরাজিত—অতএব তাহার ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য সমস্তই উপেক্ষণীয়—এই ধারণার বশবর্ত্তী বৈদেশিকগণ, রাজা রামমোহনের দ্বারা বহুল পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মত, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণকে অভিভূত করিতে পারে নাই; তাহার প্রধান কারণ, রাজা রামমোহন রায়ের সাধনা ও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বৈদেশিকগণের সহিত বিচার। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজা রামমোহন রায় দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ভাসাইয়া দেন নাই।

বৈদেশিক চিন্তা ও সাধনার তরঙ্গসমূহ, বিপুল ও প্রচণ্ডবেগে যে সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষ-নিবন্ধন যে সুবিপুল ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, রাজা রামমোহন রায়, সেই সংঘর্ষ-তরঙ্গের শীর্ষদেশে অকুতোভয়ে বীরের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, ভারতবর্ষকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। আত্ম-প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় না পাইলে, এই সংঘর্ষে আত্মরক্ষা অসম্ভব। ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম কার্য্য। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে ও সমাজে অনেক অবাঞ্ছনীয় আবর্জ্জনা জমিয়াছে, যাহা অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা দূর করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনায় দেখা যায় যে, দেশের ধর্ম্ম বা সমাজ-সংস্কারকার্য্যে তিনি বিদেশের শাস্ত্র-অভিজ্ঞতা বা সাধনার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশীয় শাস্ত্রের সাহায্যে এবং দেশীয় বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই সংস্কারকার্য্যে দেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বৈদেশিক সাহিত্য, ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দেশীয় জনসাধারণকে সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারে আহ্বান করিবার সময়, তিনি ঐ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। আমাদের ব্যাধি, আমরাই তাহার নিদান নির্ণয় করিব—আমাদেরই নিজেদের ঔষধের দ্বারা, আমরাই তাহার আরোগ্য বিধান করিব। বৈদেশিকগণকে তিনি যেন বলিলেন—'বন্ধুগণ, আমাদের ব্যাধি আমরা বুঝিতেছি, তোমাদের ব্যাধি তোমরা নির্ণয় কর। নিজেদের ব্যধির খবর না লইয়া, সময়ে অসময়ে অজ্ঞতাবশে আমাদের হিতৈষণা করিও না। যদি তেমনভাবে মিশিতে পার, সকলেরই মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও প্রত্যেক সমাজ, নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে।"

তবেই দেখিতেছি, রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেন নাই—অন্ধভাবে প্রাচ্যকেও গ্রহণ করেন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—উভয়েরই ঊর্দ্ধে এক সুনির্ম্মল শাশ্বত কল্যাণ, তিনি তাঁহার মানস-নেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। বেদান্তের শিক্ষার দ্বারা তিনি এই আদর্শ সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং দেশীয় ও বিদেশীয়গণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমিক ও পণ্ডিতগণ সে সময়ে যদি রাজা রামমোহন রায়কে যথার্থরূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে নব্যভারতের সাধন-পথ হয়ত অন্যরূপ হইত। কিন্তু সেজন্য এখন বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই।

নব্য-ভারতের আদিগুরু রাজা রামমোহন রায়, কেবল ভারতবর্ষের সাধন-ক্ষেত্রে নহে—সমগ্র মানবজাতির সাধন-রাজ্যে কত উচ্চস্থানের অধিকারী তাহা না বুঝিলে, এ কালের লোকে তাঁহার বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকারে সম্মত হইবে না। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য-রচনায় অতি গভীর রস আছে এবং এমন আলোক আছে, যাহা পাইলে আমরা বিশেষরূপে ধন্য ও লাভবান্ হইব। কিন্তু পরিশ্রম না করিলে, একটু বিশেষ রকমের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হইলে, এই রসের আস্বাদন হইবে না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত অতি উত্তম রূপে

পরিচিত হওয়া আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। কি করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর বিস্তৃতরূপ পঠন পাঠন প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। তাঁহার রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত পৃথক্ করিয়া, সেই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিগুলি এবং প্রতিপক্ষের আপত্তি ও তাহার খণ্ডনসমূহ যদি উত্তমরূপে সাজাইয়া শিক্ষার্থিগণের নিকট ধরিতে পারা যায়, এবং বর্ত্তমানযুগের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত তাঁহার সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রয়োগের সম্বন্ধ, যদি ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের ও বঙ্গ দেশের অভাবনীয় উপকার হয়।

গতানুগতিকতা বর্জ্জন করিয়া, সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ও অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রানুগ যুক্তির সাহায্যে, প্রত্যেক নরনারী সংযত ও স্বাধীনভাবে আত্মোপলব্ধি করিবে—ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলন, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্‌গত মৈত্রী স্থাপন, রামমোহনের সাধ্য বিষয় ছিল। মানবতার উন্নততম উদারবার্ত্তা, রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই বঙ্গদেশে ঘোষিত হইয়াছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি, সে সময়ের উপযোগী আকারে এই-সকল কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার কথা গ্রহণ করিবার ও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার সামর্থ্য কেবল ভারতের নহে, মানবজাতিরই ভালরূপ ছিল না। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। আজ মহামানবের এই অভাবনীয় জাগরণের দিনে জগৎবাসী ও রাজার স্বদেশবাসিগণ, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। তাহাতে সমগ্র জগতেরই কল্যাণ হইবে এবং নব্যভারতও তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে।*

শ্রীশিবরতন মিত্র

---

* লেখকের—'মোহন-সুধা' (রাজা রামমোহন রায়ের রচনা-সংগ্রহ) নামক গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত। ১৩২৯ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

আমাদের লক্ষ্য

মাসিক পত্রিকার যাহা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—জ্ঞান-প্রচারের যে অংশ, মাসিক পত্রিকার দ্বারা সাধিত হয় বা সাধিত হওয়া আবশ্যক, তাহা ছাড়া 'বীরভূমি'র একটী বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুরাতন লেখা হইতে, সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইল।

প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'বীরভূমি'তে দুইটী বিশেষ কথা লিখিত হইয়াছিল। সেই দুইটী কথা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত করা হয়। সেই অংশ দুইটী এবারেও উদ্ধৃত করিলাম।

"নব্য বঙ্গের জাতীয় সাধনা, সাহিত্যের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সময়ে এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সব নূতনতর প্রয়োজন আমাদের পুরোবর্ত্তী হইয়াছে, যে এখন রাজধানীর বাহিরে মফঃস্বলে স্বাধীন সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। এখন এককে বহু হইতে হইবে,—ভবিষ্যতে বহুর মধ্য দিয়া এক, আপনার সত্তা পূর্ণতররূপে বুঝিতে পারিবেন। চেতন জীবের সমষ্টির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি, অংশী বা সমষ্টির ধর্ম্ম, চেতনভাবে উপলব্ধি করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় তাহার অনুবর্ত্তন করে। বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ইহা সত্ত্বগুণাত্মক। আমাদের দেশকে এই সাম্যে লইয়া যাইতে হইলে, প্রত্যেক জেলাকে এখন স্বাধীন-ভাবে আত্ম-উপলব্ধি করিতে হইবে'।

আর একটী কথা বলিয়াছিলাম, তাহাও পুনরায় বলা প্রয়োজন। "এখনও সাহিত্যের যে অবস্থা, তাহাতে ব্যবসায়ের উপকরণ স্বরূপে সাহিত্যকে ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। * * এখনও আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহিত মাতৃভাষার যে সম্বন্ধ, তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যকে লইয়া দীর্ঘকাল যাচকভাবে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাঁহাদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিতে হইবে।"

পূর্ব্বের উদ্ধৃত অংশ দুইটীর বিশদ ব্যাখ্যা এবং বর্ত্তমান সময়ের দেশের অধিকাংশ লোক যাহা প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছে, সেই প্রয়োজন সাধনে উহাদের প্রয়োগ কোথায়, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে আলোচনা পরে করা যাইবে।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় "আমাদের লক্ষ্য" সম্বন্ধে আরও যাহা বলা হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। এই অংশটুকুর সাহায্যেই আমাদের উদ্দেশ্য অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

"পৃথিবীর ইতিহাসে এখন এক অভিনব যুগ আরম্ভ হইয়াছে— নিজেকে লইয়া নিশ্চিন্তভাবে কাহারও বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—অন্যান্য সমস্ত জাতি যে সাধনার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে— ঠিক্ সেই স্রোতে অন্ধভাবে তাহাদের যে অনুবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা নহে, তবে এই সাধনার স্রোতে

যে স্বাস্থ্যকর বেগ ও পুষ্টি আছে, তাহা সকল জাতিকেই, অবশ্য, আত্মপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগত আজ মিলিত হইয়াছে—ব্রহ্মের সহিত কর্ম্মের, আত্মার সহিত দেহের, অন্তর্নিমগ্নতার সহিত বাহ্য পটুতার এই সম্মিলন উৎসব—মানব জাতির ইতিহাসে এক অভাবনীয় ব্যাপার! প্রতীচ্য জগতের আদর্শে জাপান পার্থিব মহত্ত্বের উন্নত শিখরে উঠিয়াছে, চীন ও পারস্য বিক্ষুব্ধ, তুরস্কও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতির সাহিত্যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাহারা যেন বিশ্বমানবের সভ্যতার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশের নানা জাতি যাহা কিছু করিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যে সমস্তই পাওয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবী—তাহাদের সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত—তাই তাহাদের কবি, তাহাদের দার্শনিক, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ কেমন নির্ভয়ে নব নব তত্ত্বের অমৃতরসে স্বদেশবাসী জনগণের হৃদয় ও মনের পুষ্টিসাধন করিতেছে—নব নব উদ্দীপনা জাগাইয়া, নব নব আশার স্বপ্ন উদ্বোধিত করিয়া, স্বদেশবাসিগণকে নব নব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে। আবার নিজের দেশ সম্বন্ধেই বা তাহাদের আলোচনা কত! তাহারা স্বদেশকে ভাল বাসিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের এই স্বদেশপ্রাণতাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য, কত বড় বিরাট ও শক্তিশালী সাহিত্য কার্য্য করিতেছে, সে সংবাদটাও রাখা দরকার। এই সমস্ত উন্নত জাতির সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতেছি—কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, কি অনির্ব্বচনীয় অধ্যবসায়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত শত সাহিত্য-সেবক, নিজের হৃদয়ের রক্ত দিয়া এই সাহিত্যেরর পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রাণদান করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। তাঁহারা কত অভাব, কত উপেক্ষা, কত অনাদর, দারিদ্র্যের কত তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। আজ যাহাদের সাহিত্য উন্নত, সাহিত্য-সেবকগণ সম্মানিত ও বৈভবশালী, তাহাদের এই সার্থকতার পশ্চাতে, প্রতিবন্ধকতার সহিত যে প্রচণ্ড সংগ্রামের স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে যত্নের সহিত এখন তাহারই সংবাদ রাখিতে হইবে।"

"আমাদের সাহিত্যে এখন সেই নীরব ও আপাতঅবজ্ঞাত সাধনার প্রয়োজন। আমাদের দেশের সহিত, দেশবাসিগণের সহিত আমাদের পরিচয় কত অল্প! আমরা বলিয়া থাকি আমাদের অতীত খুব গৌরবময়, কিন্তু কৈ সে অতীত? তাহার সহিত আমাদের পরিচয় কতখানি? তাহার শোণিত আমাদের ভাব-জীবনের শিরা উপশিরায় কতটুকু প্রবাহিত হয়? বোধ হয় নব্য জাপানের চিন্তায় ও সাধনায় ভারতের দর্শন ও সাহিত্য যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, আমাদের নিজের সাহিত্যে তাহার কিছুই করে নাই। মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু—এই তিনটি মহতী সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ আজ গঙ্গার এই পবিত্র উপত্যকায়, একটা মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে—বিধাতার কৃপায় এ স্বপ্ন সফল হউক, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এই তিনটী সাধন-প্রবাহের ত্রিবেণী সঙ্গম হইল কৈ?

"আমরা ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি, হেগেল দর্শনের অনুবাদ করিতেছি, কিন্তু ঐ যে

দরিদ্র কৃষক হলকর্ষণ করিতেছে, দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, মহাজনের ঋণে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে,—সে এই সাহিত্যের নিকট তাহার অন্তর্জীবনের কতটুকু উপজীব্য পাইতেছে? তাহার কি জীবনের এমন একটা দিন নাই, সাহিত্য যাহা স্পর্শ করিতে পারে? এক দিন কি এই দেশেরই প্রাচীন সভ্যতা তাহার জীবনে সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করে নাই? সে কি গান গাহে না, সে কি কবি, পাঁচালি, মনসামঙ্গল, যাত্রা, কথকতা শোনে না, সে কি তর্ক করে না, উপদেশ দেয় না, বৃহত্তর জীবনের একটা ছায়াপাত কি তাহার হৃদয়ে হয় না? আমরা জানি বা না জানি, সেখানেও সাহিত্য আছে, তাহার চর্চ্চা আছে, সাহিত্যিকও আছে। সেখানে আমরা যাই না, যাইতে পারি না, যাইবার চেষ্টাও করিনা। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে দেশের বৃহত্তর অংশটারই স্থান নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যে "সাধারণের কৌতূহলের যুগ" আসিতেছে, সাহিত্য সবল হইবে, জাতীয় চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এখন দেখিতেছি চক্র বুঝি বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে; "পৃষ্ঠপোষকতার যুগ" বুঝি আর শেষ হয় না। হায় আমাদের দুর্ভাগ্য!

"সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত, তাহার প্রতিষ্ঠারও একটা বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে হইতেছে না, তাহা নহে, কিন্তু এই চেষ্টার মূলে ব্যবসায়-বুদ্ধি অপেক্ষা একটা উন্নততর বৃত্তির প্রয়োজন। দেশের সকল লোককে স্বল্পাধিক পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতিমুখী গতির সহিত বাঁধিতে হইবে। দেশে কত লোক যথার্থ ও স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ লইয়া আসিতেছে, কিন্তু শিক্ষা, সদুপদেশ, সাহায্য ও সৎসংসর্গের অভাবে, অথবা চাতুর্য্যের অসৎ প্রতিযোগিতায়, তাহাদের শক্তি-বীজ বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। এই সমস্ত অজ্ঞাত কুসুমের অর্ঘ্য আহরণ করিয়া, বঙ্গবাণীর পূজার ডালায় উপস্থিত করা প্রয়োজন।

"সাধু সাহিত্য-সেবক চাই, যথার্থ ত্যাগশীল ও পরার্থপর লোককে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনিতে হইবে। নগরের অসৎ প্রতিযোগিতার মধ্যে তাঁহাদের যাইতে দেওয়া হইবে না, তাঁহারা গ্রামে বসিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিবেন—অথচ দেশের ও জগতের উন্নতিমুখী গতির সহিত অসংশ্লিষ্ট থাকিবেন না—গ্রামবাসিগন এই সমস্ত সাহিত্যিকগণের পুণ্য-প্রভাব অনুভব করিবে। এই জন্যই গত বৎসর বলিয়াছিলাম—"বীরভূমেও সাহিত্যিক শক্তি বলিয়া একটা পদার্থ আছে, আজ তাহা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত; সেই শক্তি এই 'বীরভূমি'তে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হউক, এই 'বীরভূমি' বিশ্বসাহিত্য ও সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের সহিত, বীরভূমবাসীর সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনার প্রবাহের মিলন-ক্ষেত্র হইয়া, পুণ্য-প্রয়াগে পরিণত হউক, তাহা হইলেই আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইব।" কিন্তু এই সমস্ত পল্লীবাসী সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবে কে? তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি? এই কার্য্যের জন্যই মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপনার প্রয়াস।"

বিজ্ঞাপন

"বীরভূমি" মাসিক পত্রিকা, পূর্ব্বে চারি বৎসর ছয় মাস কাল পরিচালনা করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহির হওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়া লওয়া হইত। শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, অন্যান্য কার্য্যের ভার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট মূল্য লওয়া হয় নাই। আমি এখন অন্যান্য কর্ম্ম হইতে বহুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে পুনর্ব্বার 'বীরভূমি' প্রচার আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে যাঁহারা 'বীরভূমি'তে লিখিতেন, তাঁহারা অনেকেই এখন জ্ঞানরাজ্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহারাও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত ভাবে লিখিবেন। সিউড়ীর 'রতন-লাইব্রেরী'তে অসংখ্য প্রাচীন ও অপ্রকাশিত মূল্যবান বাঙ্গালা পুঁথি আছে। সেই পুঁথিগুলি ক্রমে ক্রমে এই কাগজে প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের যাবতীয় সমস্যা এই কাগজে আলোচিত হইবে। কাগজখানি যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হয়, তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটী হইবে না। বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইবে। গত বৎসর 'বীরভূমি' বাহির করিব বলিয়া, পর পর ছয় খানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যা ষষ্ঠ ভাগ প্রথম সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে। বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র। পূর্ব্বে 'বীরভূমি'র যাহা লক্ষ্য ছিল, এখনও তাহাই লক্ষ্য। সহৃদয় বন্ধুগণ সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন ইতি।

সিউড়ী—বীরভূম।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

ধর্ম্মের গ্লানি ও দেবজন্ম

পৌরাণিকগণ মানব জাতিকে এই আশা দিয়া গিয়াছেন যে যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হইবে, তখনই দেবজন্মের দ্বারা এই গ্লানি দূরীভূত হইবে। ধর্ম্মের গ্লানি কি, তাহা পুরাণের সাহায্যে আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে দেবজন্মের রহস্যও বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের কোন বাহ্য কারণ নাই এবং থাকিতেও পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে, তাঁহার আবির্ভাবের কারণ বলিয়া যাহা পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ বা জনসমাজে পরিচিত, সেই কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। দৈত্য বা অসুরের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। এই গ্লানি, বিশ্বব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি মধ্যে মধ্যে হইবে। বিশ্বব্যবস্থায় অসুর বা দৈত্যদিগের একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। অসুরেরা যে সময় তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করে, সে সময় সমুদয় ব্যাপার সুশৃঙ্খলায় চলিয়া যায়। নিজের স্থান পরিত্যাগ করিয়া অসুরেরা যে সময় অন্যের অধিকার কাড়িয়া লয়, সেই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। সকল যুগেই ধর্ম্মের গ্লানি হয়। কিন্তু এক এক যুগের গ্লানি এক এক প্রকার। দৈত্যেরা বা অসুরেরা বিনষ্ট হইয়াও বিনষ্ট হয় না। তাহারা রূপান্তর গ্রহণ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সংহার, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ও বিবিধরূপ সংমিশ্রণের ফলে বিশ্বব্যাপার চলিতেছে। সত্ত্বগুণের শাসন বহির্ভূত অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অসুর ও দৈত্যের জন্ম। পাতাল ইহাদের স্বস্থান। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই, দেবী অসুরদিগকে বলিলেন,—তোমরা যদি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, পাতালে চলিয়া যাও।

কোনও যুগে, পৃথিবীর সমস্ত লোক যে ধার্ম্মিক ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দেহসর্ব্বস্ব ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব লোক সকল যুগেই আছে। এই সমুদয় লোক যখন অনাদৃত অবস্থায় সমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকে

যাঁহারা ত্যাগী, সাধু ও ব্রহ্মবিৎ—তাঁহারা যে সময়ে সমাজে পূজ্য ও তাঁহাদেরই শক্তিতে সমাজ পরিচালিত হয়, সেই সময় সমাজের প্রকৃত কল্যাণের যুগ বা সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত হয়। পুরাণের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি, ত্রেতাযুগেই সামাজিক জীবনের ভারকেন্দ্র কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য; কিন্তু এই প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য, অন্যেও লুব্ধ এবং চেষ্টান্বিত হইয়াছে। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব ত্রেতাযুগের ঘটনা। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বিনাশ এবং তাহার হেতুভূত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধ—ইহাও ত্রেতাযুগের ঘটনা। শূদ্র তপস্যা করিতেছে, রাজা রামচন্দ্র তাহার মস্তক ছেদন করিলেন—ইহাও ত্রেতাযুগে ঘটিয়াছিল। সুতরাং, যদিও ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং ত্রেতাযুগের আদর্শ নরপতি শ্রীরামচন্দ্র, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি একথা সত্য যে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য খর্ব্ব করার জন্য সমাজের ভিতরে একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ত্রেতাযুগের অসুর বা ধর্ম্মনাশক রাক্ষস রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই পুত্র।

দ্বাপর যুগ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের যুগ। ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, আর দ্বাপর যুগে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থমা—ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ্যকামী শূদ্রের মস্তক, শ্রীরামচন্দ্র ছেদন করিয়াছিলেন; আর দ্বাপর যুগে ক্ষাত্র্যকামী একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ, দ্রোণাচার্য্য গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিযুগ বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সকলেই বৈশ্যের নিকট এই যুগে আত্মবিক্রয় করিবে। শূদ্রগণ বৈশ্যের সেবা করিয়া বৈশ্যের পুষ্টিসাধন করিবে। কলিযুগ যখন শেষ হইয়া আসিবে, তখন বৈশ্যের সহিত শূদ্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। এই সংঘর্ষের পর শূদ্র-প্রাধান্য। শূদ্র-প্রাধান্যের পরেই আবার সত্যযুগ আসিবে। পুরাণের আলোচনায়, সমাজ-বিজ্ঞানের এই নিয়মগুলির ক্রিয়া, বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই কারণে সে সময়ে অসুরেরা ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজা হইয়া সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের যাহা প্রসিদ্ধ কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—"দৃপ্ত নৃপতির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য দৈত্য পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবী তাহাদের ভার বহনে অক্ষম হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইল।"

ভূমের্দৃপ্ত নৃপব্যাজ দৈত্যানীক শতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরি ভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য প্রাচীন আচার্য্যেরা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপে বুঝিয়া লইলে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিব। মানবকে যিনি পালন করেন ও রক্ষা করেন, তিনিই 'নৃপ'। নৃপের যাহা কার্য্য অর্থাৎ ন্যায়তঃ দণ্ড ধারণ করিয়া মানব সমাজকে প্রকৃত উন্নতির অভিমুখে পরিচালনা, তাহা ব্রহ্মবিৎ ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারে না,—একথা প্রাচীন শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন—কাম, ক্রোধ, লালসা প্রভৃতি যাঁহার প্রকৃতিতে নাই, তিনিই দণ্ড ধারণের অধিকারী। অষ্টদিক্‌পালের অংশে তাঁহার জন্ম, তিনিই 'নৃপ' বা প্রকৃত রাজা। দৈত্যেরা শক্তিমান এবং প্রবল। কিন্তু তাহারা রাজা হইতে পারে না। কারণ তাহারা দেহাত্মবাদী। বেদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে বলা হইয়াছে, দেহাত্মবাদীরাই অসুর। দেহাত্মবাদ কি, তাহা কংশের চরিত্র আলোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। দৈত্যেরা নৃপ বা রাজা হইতে পারে না। এই কারণে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিলেন,—"নৃপব্যাজ" অর্থাৎ দৈত্যেরা রাজা হইবার যোগ্য নহে, কিন্তু জোর করিয়াই হউক, কাল প্রভাবেই হউক, অথবা মানব-সমাজের সমষ্টি-কর্ম্মের ফলেই হউক, কিম্বা ভগবানের কোনও বিশেষ লীলা অভিনয়ের জন্যই হউক দৈত্যেরা রাজা হইয়া বসিল। তাহারা প্রকৃত রাজা নহে। "নৃপব্যাজ" অর্থাৎ রাজাগিরি তাহাদের ছদ্মবেশ বা ছলনা। তাহারা নিজেদের ভোগ, সুখ ও স্বার্থ চাহে, রাজাসন দখল করিয়া সেই স্বার্থ সাধনে তাহারা নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা রাজা নহে, ছল-রাজা ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য "দৃপ্ত" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব তোষণী টীকায় "দৃপ্ত" কথাটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "দর্পস্বভাব নির্দ্দেশাৎ স্থানাস্থান বিবেকাভাবেন সদবমানাদিজ্ঞাপকত্বং দৈত্যত্ব লক্ষণং।" ইহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যে দৃপ্ত বা অহঙ্কারী তাহার বিবেক নাই, সে স্থান অস্থান বুঝিতে পারে না। কে সাধু কে অসাধু, কে সত্যবাদী, ত্যাগশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরোপকারী তাহা বুঝিতে পারে না, বা বুঝিতে পারিলেও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে তাঁহাদিগকে বুঝিতে চাহে না, ফলে সজ্জনের অপমান হয়। দৈত্য যখন রাজা হইবে তখন ইহাই স্বাভাবিক। এই অবস্থার নাম ধর্ম্মের গ্লানি। অন্য যুগে অন্যরূপে ধর্ম্মের গ্লানি হইতে পারে, তাহা আমরা

পরে দেখাইব। দ্বাপর যুগে এই প্রকারে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল। ধর্ম্মের গ্লানি কি প্রকারে নিবারণ হইল, তাহাও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "দৈত্য নৃপতিগণের ভারে পৃথিবী আক্রান্তা হইলেন,"—ইহার অর্থ কি? পৃথিবী বুঝিলেন যে তিনি আক্রান্তা হইয়াছেন। পৃথিবীর এই বোধ, আমাদের আলোচনার বিষয়। অনেক সময়ে দৈত্যের উদ্ভব হয়, দৈত্যেরা এবং দৈত্যের আশ্রিত ও অনুগত লোকেরা, চারিদিকে দর্প করিয়া লম্ফ ঝম্ফ করে। যদিও তাহারা নিন্দিত ও ঘৃণিত, সর্ব্বদাই জঘন্য পাপকর্ম্ম করিতেছে এবং পাপাচরণের দ্বারা বিলাস ব্যসনে দিন যাপন করিতেছে—কিন্তু সে কথা বোঝে কে এবং বলেই বা কে? তাহারাই যে সমাজে প্রধান! মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে; যাহাদের কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবুদ্ধি আছে, তাহারা ভীরু, শক্তিহীন ও অসহায়। যাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি মলিন বা লুপ্ত, তাহারা পাপাচরণকে পাপ বলিয়া বুঝিতেই পারে না এবং পার্থিব স্বার্থের অনুরোধে বুঝিতে চেষ্টাও করে না। কেহ বুঝাইলে, শুনিয়াও শোনে না। যাহারা কিছু কিছু বোঝে, তাহারা সাহসহীন ও ভীরু। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণের কোনই উপায় নাই। পৃথিবী বুঝিলেন যে, তিনি দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—একদিকে যেমন দৈত্যগণ ও তাহাদের অনুচরগণ, রাজপদ অধিকার করিয়া ধর্ম্মতঃ রাজ্য পালন না করিয়া, নিজেদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতেছে, সেইরূপ আর একদিকে কতকগুলি সাধু, তাঁহাদের সুনির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে দৈত্যদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাদের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং সমাজের এই দুরবস্থা ও ধর্ম্মহীনতা দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহারা দুর্ব্বল ও নিরুপায় হইলেও আশাহীন বা উদ্যমহীন নহেন। তাহাদের যাহা বোধ অর্থাৎ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের যাহা ধারণা, তাহা সকলের ভিতর জাগাইবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। ইহাই পৃথিবীর ভার-বোধ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—মানুষ কর্ম্মের দ্বারা দৈত্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা অনেকদিন রাজ্য শাসন করিয়াছেন। শক্তি বড় কঠিন জিনিস। ইহা লাভ করিতে যে তপস্যার প্রয়োজন, ইহা রক্ষা করিতেও তদপেক্ষা অধিক তপস্যার প্রয়োজন। যাহার শক্তি নাই সে বুঝিতে পারে, শক্তিশালী লোকেরা শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। সে শক্তিলাভের জন্য তপস্যা করে। তপস্যার ফলে শক্তি লাভ করিয়া হয়ত কিছুদিন

সে শক্তির সদ্ব্যবহার করে, কিন্তু আবার অপব্যবহার আরম্ভ হয়। সামাজিক সমস্যার একটা চরম নিষ্পত্তি নাই। যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে, আর যুগে যুগে নূতন নূতন মীমাংসারও আবশ্যক হয়। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—পৃথিবী সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছিলেন। পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিয়া করুণ-ভাষায় বলিলেন—অগ্নি সুবর্ণের গুরু, সূর্য্য গো-সমূহের পরম গুরু, আর নারায়ণ আমার ও লোক সমূহের পরম গুরু। নারায়ণ প্রজাপতিগণেরও পতি, আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ হইতে সমুদ্ভূত। আদিত্য, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বী, বহ্নি, পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তৃগণ সেই অপ্রমেয় বিষ্ণুরই রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ—সকলেই বিষ্ণুর রূপ; সমগ্র জগত বিষ্ণুময়।

তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে॥

বিষ্ণু বহুরূপ। কিন্তু এই বহুরূপের মধ্যে কাহারও যথেচ্ছাচারের পথে যাইবার অধিকার নাই। সমুদ্র বক্ষে নিত্য-সমুত্থিত তরঙ্গসমূহ যেমন, বাধ্য-বাধকতা সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ নিজ নিজ মর্য্যাদা পালনে বাধ্য, বিষ্ণুর বা স্থিতিশক্তির সাধনে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই সেইরূপ নিজ নিজ স্থানে থাকিতে বাধ্য।

আমরা পূর্ব্বে, "দৃপ্ত" এই কথাটীর ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছি, বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটীর দ্বারা তাহাই সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইল। প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এই সনাতন বাধ্য-বাধকতার বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজী ভাষায় এই নিয়মকে The Law Eternal Interdependence বলা যায়। নারায়ণ কথার অর্থ সূত্রান্তর্যামী বিরাট্। সূত্রে যেমন মনিগণ বদ্ধ থাকে, সেইরূপ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই সেই নারায়ণে বদ্ধ। মানব সমাজে এই বিধানের প্রতিচ্ছবি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম পুরুষের দেহ,—এই কথা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। দেহের একটী অঙ্গ যেমন অপরকে উপেক্ষা করিয়া বা ঘৃণা করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় কেহই স্বতন্ত্র নহে। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক। ব্রাহ্মণ যদি বলেন, আমি শূদ্রকে চাহি না, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবস্থা কবন্ধের মস্তকের ন্যায় হইবে। ক্ষত্রিয় বাহু। বৈশ্য উদর, আর শূদ্র চরণ। যে যাহাই হউক,

প্রত্যেককেই নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা সমগ্র দেহের সেবা করিতে হইবে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায়, কোন বর্ণ বা কোন আশ্রম মনে করিবে না যে, সে সেব্য অর্থাৎ তাহার সুবিধার জন্য অন্যান্য বর্ণ ও আশ্রম রহিয়াছে। প্রত্যেকেই ভাবিবে—আমি সেবক। ব্রাহ্মণ তাহার তপস্যা ও জ্ঞানের দ্বারা, ক্ষত্রিয় তাহার বাহুবল ও বীর্য্যের দ্বারা, বৈশ্য তাহার সঞ্চিত ধনের দ্বারা, আর শূদ্র তাহার দৈহিক সামর্থ্যের দ্বারা, সেই পুরুষের বা নারায়ণের অর্থাৎ সমাজ-দেহের সেবা করিবে। ইহাই বর্ণাশ্রম। অন্তর্মুখী হইয়া প্রত্যেকেই নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবে। বহির্মুখ হইয়া অধিকারের দাবী করিবে না। অধিকারের দাবী করিলেই বর্ণাশ্রমের বিপর্য্যয় বা ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ভারতবর্ষ বাধ্য-বাধকতার যে সনাতন বিধি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বিধির উপর আমাদের সামাজিক জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিধানে দর্পের স্থান নাই। দৈত্য-ভাবাপন্ন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ যে সময়ে দৃপ্ত হইলেন, সেই সময়ে দ্বাপরযুগের শেষে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিযুগের শেষে বৈশ্য ও শূদ্রের সংঘর্ষ হইবে এবং এই সংঘর্ষে শূদ্র-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃত শূদ্র-প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠায় এত প্রকারের বিঘ্ন আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; সুতরাং অনেক সংগ্রাম হইবে। কিন্তু শূদ্র-প্রাধান্য যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিবে। কারণ, পূর্ণাঙ্গ শূদ্র-প্রাধান্যের যুগে, প্রত্যেকেই অনুভব করিতে বাধ্য হইবে যে, সে সেব্য নহে সেবক! এই বোধই বর্ণাশ্রমের প্রাণ। সুতরাং প্রেম, ভক্তি বা নিষ্কাম সেবা-ধর্ম্ম কলির যুগধর্ম্ম।

বিষ্ণুপুরাণে পৃথিবীর কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে দ্বাপর যুগের গ্লানির পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ অনেকেই বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পৃথিবী বলিলেন,—

তৎসাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকং সমাক্রম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ॥
কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেন সুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ॥

অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোঽসুরস্তথাত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ॥
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে॥
অক্ষৌহিণ্যোঽত্র বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাঃ সুরাঃ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি॥
তদ্ভূরিভার পীড়ার্ত্তান শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ॥
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মিতি বিহ্বলা॥

সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ পৃথিবী অধিকার করিয়া সর্ব্বদাই প্রজা পীড়ন করিতেছে। কালনেমী পূর্ব্বে প্রভাবশীল বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। সে এখন উগ্রসেনের পুত্র কংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অতি ভয়ঙ্কর বাণাসুর ও অন্যান্য সুপ্রবল দুষ্টগণ, রাজাদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহাদের সংখ্যা গণনা করিতে অক্ষম। দিব্যমূর্ত্তিধর ও মহাবলদৃপ্ত দৈত্যপতিগণের বহু বহু অক্ষৌহিণী সেনা, আমার বক্ষে বিরাজ করিতেছে। আমি তাহাদিগের গুরুভারে পীড়িতা হইয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছি। আপনারা ভারাবতরণ করুন, নতুবা হে মহাভাগগণ, আমি বিহ্বলা হইয়া রসাতলে গমন করিব।

যে সমুদয় দৈত্য বা অসুরের নাম কথিত হইয়াছে, তাহাদিগের পৌরাণিক বিবরণ আলোচনা করিলে আমরা অসুর-প্রকৃতির রহস্য কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিব। কিন্তু সে আলোচনা পরে হইবে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। সে সময়েও ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল। সেই গ্লানি কিরূপ তাহারই আলোচনা করিতেছি। যুগভেদে ধর্ম্মগ্লানির কিরূপ মূর্ত্তিভেদ হয়, বা অসুরগণের কিরূপ রূপান্তর হয়, এই আলোচনার সাহায্যে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

কলিশব্দের অর্থ কলহ। স্বতন্ত্র-বুদ্ধি হইতেই কলহের উৎপত্তি। সুতরাং কলিযুগকে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ বলা যায়। প্রথম যুগের নাম ব্রাহ্মণের যুগ, দ্বিতীয় যুগ

ক্ষত্রিয়ের যুগ। দ্বাপর যুগের শেষে কুরুক্ষেত্রে। মহাযুদ্ধে, ক্ষত্রিয় রাজাদের আধিপত্য ও প্রাধান্য নষ্ট হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের পর ক্ষত্রিয়েরাই রাজা হইয়াছিলেন সত্য, ব্রাহ্মণদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন তাহাও সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়গণ, পূর্ব্বে অন্যান্য জনসাধারণের হৃদয় ও মনের উপর যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কলিযুগ আরম্ভ হইলে তাহা কমিতে আরম্ভ হইলে। অবশ্য, কলিযুগের যাহা বিশিষ্টতা, তাহার সম্পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠা সময় সাপেক্ষ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ সমূহের পুঞ্জীভূত কর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার ও ধারণা, এক দিনে বা দুই চারি শতাব্দীতে ক্ষয় হইবার নহে। সুতরাং সংগ্রাম সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহা লক্ষ্য, তাহার অন্যথা হইবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে। ঐতিহাসিক প্রাক্তন (Historical antecedents) আমাদের হৃদয়বৃত্তির ও মনোবৃত্তির গঠন করিয়াছে। সুতরাং এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আমরা সকল সময়ে পছন্দ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা হইবেই। আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কলি-যুগ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। কাজেই, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যখন কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানি বর্ণনা করিলেন, তখন রাজাদের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে রাজা, রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজকর্ম্মচারীদের কথা মধ্যে মধ্যে কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা গৌণরূপে—মুখ্যরূপে নহে। কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ, পণ্ডিত সমাজের প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষক জন সাধারণের কথাই বর্ণনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে, দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। দেশ অতিশয় সুসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন, লক্ষ্মীর কৃপায় সকলেই সুখে বাস করিতেছে। শাস্ত্রচর্চ্চাও যথেষ্ট। বাহির হইতে দেখিলে, সে সময় বেশ উন্নতি ও মঙ্গলের সময়। অথচ, সেই সময়ে অতি ভয়ঙ্কর ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। অসংখ্য ছাত্র, অসংখ্য অধ্যাপক, লক্ষ্মীর কৃপা যথেষ্ট, কিন্তু—

ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।

ইহার অর্থ কি? ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা, যাহা আর্য্য ঋষিগণের সাধনায় তপোবনে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তা না জানিলে ইহার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে না। ব্যবহার ও পরমার্থ, জড় ও চেতন—ইহা লইয়াই সংসার। এক দিকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, আর এক দিকে বুদ্ধি

ও আত্মা। এই দুইএর মধ্যে মানুষ তাহার কর্ম্ম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মানুষ যখন আত্মার কথা ভুলিয়া যায়, মানুষ অনন্তের অংশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বাঁধা হইয়া রহিয়াছে, একথা যখন তাহার মনে থাকে না, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুখকে একমাত্র সত্য ভাবিয়া মানুষ যখন তাহাতেই ডুবিয়া যায়, তখনই বলা হয় যে মানুষ ব্যবহাররসে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহারই নাম ধর্ম্মের গ্লানি। দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয় রাজারা দৃপ্ত হইয়া বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার অন্যথা করিয়াছিলেন, আর কলিযুগে অধিকাংশ নরনারী ব্যবহার-রসে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থ ভুলিয়া ধর্ম্মের গ্লানি ও সামাজিক দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে। অসুরেরা দেহাত্মবাদী। সুতরাং, মানুষ ব্যবহার-রসে ডুবিয়া গেলে আসুরিক ভাবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর লইয়া আমোদ প্রমোদে অতি হীনভাবে দিন যাপন করে।

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥
দেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাহো না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিযুগ জনসাধারণের যুগ বা পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থা বৈশ্যযুগ বা কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগ অর্থই পরমার্থ হইয়াছে। যে প্রকারে হউক অর্থ সঞ্চয় কর। সকলেই অর্থের পূজা করিতেছে ধর্ম্মও যেন অর্থের দাস হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে যে ধনবান্ ব্যক্তিরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিষহরির পূজা করিতেছেন। এই পূজায় ভক্তি বা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন নাই। গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিয়া কতকগুলি লোক লইয়া রাত্রি জাগরণ আর অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের বৈভব প্রদর্শন। সুতরাং ধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়াছে। যাহাদের ধন আছে তাহাদের দম্ভের সীমা নাই। তাহারা ভাবিতেছে টাকা খরচ করিলেই ধর্ম্ম করা হইল। প্রকাণ্ড মন্দির করিলাম, মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লিখিলাম, গান হইল, বাজনা হইল,

অনেক টাকা খরচ হইল, যথেষ্ট ধর্ম্ম করা হইল। এই প্রকারের অসদ্ব্যয়ে দাম্ভিক ধনশালী ব্যক্তিগণ দিন যাপন করিতেছে। কে তাহাদিগকে শাসন করে? রাজা বৈদেশিক ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। সমাজ তখনও ভিতরের শাসনে শাসিত ছিল। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজা তখন সমাজের বাহিরে। সুতরাং সমাজ-শাসনের ভার ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীগণের উপর ছিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র প্রভৃতি শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন, ব্যাখ্যাও করিতেন কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করিবার শক্তি ছিল না। শাস্ত্রের সাহায্যে যুগ-ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইবে। সমাজ গতিশীল। পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া মানবসমাজ অগ্রসর হইতেছে। মানবের অধিকার ও কর্ত্তব্য সকল যুগে ঠিক একরূপ নহে। কালের প্রভাবে ও পরিবর্ত্তনের ফলে মানবের হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম সনাতন; অর্থাৎ ধর্ম্মের যাহ মূলীভূত ও অন্তরতম সিদ্ধান্ত তাহা চিরকালই একরূপ কিন্তু সাধনক্ষেত্রে যুগ-ধর্ম্মের সাহায্যে সেই সনাতনের অনুশীলন করিতে হইবে। যুগে যুগে মানুষ যেমন বদ্‌লাইতেছে, যুগধর্ম্মও সেইরূপ বদ্‌লাইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অনুভব যাঁহাদের আছে তাঁহারাই যুগধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। যুগের লক্ষণ ও প্রয়োজন বুঝিবার শক্তি যাঁহার নাই, শাস্ত্রচর্চ্চা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা ও পণ্ডশ্রম। ধর্ম্মাচার্য্যগণ এতদিন সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, এবারে তাঁহারাও কিছু করিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে

শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম পাশে বান্ধি মরে॥

এই প্রকারে সমাজ দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। মানুষের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।

দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন।

যে সমাজে মানুষ মাত্রেই পরের নিন্দা করে, বৃথা তর্ক করিবার ও সমালোচনা করিবার শক্তি যে সমাজে মানুষের অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায়, সে সমাজের আর কল্যাণ নাই। এই প্রকারের চরিত্রসম্পন্ন লোক দুই জনে একযোগে কোনও কাজ করিতে পারে না। ইহারা কেবল ঝগড়া করে। একে অপরের নিন্দা করে ও দোষ কীর্ত্তন করে। ইহার

ফল অনৈক্য ও দলাদলি। সে দিনও দেশে অন্ন ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, অর্থ ছিল—কিন্তু বৈদেশিকের আগমন হইয়াছে। বৈদেশিকগণ আসিয়াছে, আসুক তাহাতে ক্ষতি নাই লাভ আছে, কিন্তু আমাদিগকে সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকালে যে মহাসত্য পাইয়াছিলেন, যে মহাসত্যের ভিত্তির উপর আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই মহাসত্যের আলোক উজ্জ্বলভাবে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা যদি তাহা করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হইবে। অসুরভাবাপন্ন লোকেরা লোভের তাড়নায় এই কর্ম্ম-ভূমিতে আসিয়া তাহাদের আসুরভাব পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আমাদিগকে আত্মপ্রকৃতি রক্ষা করিয়া গৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—সংঘশক্তি কলিযুগে বিশেষভাবে প্রয়োজন। উন্নততর উদ্দেশ্য লইয়া বহুমানবের মধ্যে যে একতাবন্ধন তাহারই নাম সংঘশক্তি। কলিতে এই সংঘশক্তির প্রয়োজন। এখন একা একা পৃথক হইয়া ধার্ম্মিক হইলে চলিবে না। সকলকে লইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু যাহারা পরের দোষ ছাড়া গুণ দেখিতে পায় না, তাহারা অন্যের সহিত মিলিয়া চলিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত আর এক কথা বলিয়াছেন—

নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।

কোনও সমাজে প্রত্যেক লোক যদি নিজের প্রশংসা করে বা পয়সা দিয়া লোক ভাড়া করিয়া নিজের গুণগান করায়, সকলেই যদি বলে আমার ন্যায় বিদ্বান্ কেহ নাই, আমার ন্যায় বংশগৌরব কাহারও নাই, তাহা হইলে সে সমাজে কি হয়! সে সমাজে ঐক্য থাকিতে পারে না। সে সমাজ দলাদলিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষক তাঁহারা যুগধর্ম্ম অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং সমাজের নেতৃত্ব করিবার তাঁহাদের যোগ্যতা ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের নেতৃত্বপদ কাড়িয়া লয় কে? আর, বহুদিন হইতে যাঁহারা সমাজের উচ্চাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা কোনও সময়ে দরকার হইলে নিজেদের অযোগ্যতা বুঝিয়া যদি ঐ স্থান পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে সংঘর্ষময় বিপ্লব ব্যতীত সংশোধন অসম্ভব। ধর্ম্মা-চার্য্যেরা যুগধর্ম্ম বুঝিতেন না। দাম্ভিক বিষয়ীর আনুগত্য করিয়া নিজের ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থ

যাহাতে সিদ্ধ হয় নিরন্তর তাহারই চেষ্টা করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মের নামে দম্ভ, কাপট্য, ভোগবিলাস ও নানারূপ ব্যাভিচার অবাধে সমাজ বক্ষে প্রবাহিত হইতেছিল।

বাশুলি পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানি এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ কবিকর্ণপুর, তাঁহার শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকে এই ধর্ম্ম-গ্লানি ও সমাজ-বিপ্লব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সেদিনের অবস্থা দেখিয়া অনুভব করিলেন বৈরাগ্যই ভারতবর্ষীয় সমাজের গৌরবের ও কল্যাণের ভিত্তি। বর্ণাশ্রমরূপ আদর্শ সমাজ ভারতবর্ষের ঋষিগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ প্রকারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু ঐ ব্যবস্থার ভিত্তি কি? বৈরাগ্যই ঐ ব্যবস্থার ভিত্তি। একদিন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই বৈরাগ্য পথের পথিক ছিলেন। তাঁহারা যে সংসার করিতেন না, তাহা নহে, খুব জোরের সঙ্গেই সংসার করিতেন। কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরে একটা অনাসক্ত পরার্থপরতার ভাব ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের দৈনিক জীবন এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন যে, সংসারে থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতে করিতে ভোগবাসনার দ্বারা জড়াইয়া পড়িতেন না। ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আসিত। সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি মানুষের জীবনকে কর্ম্ম ও ভোগের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্য ও ত্যাগে লইয়া যাইত। অতএব বৈরাগ্যই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বা ভারতবর্ষীয় সাধনার প্রাণ। মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাধি, এই বৈরাগ্যের দ্বারাই আরোগ্য হয়।

এই কারণে নাট্যকার কবিকর্ণপুর, সেদিনের ধর্ম্মগ্লানি বুঝাইবার জন্য প্রথমেই বৈরাগ্যকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বৈরাগ্য আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বহির্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ বাহিরের সুখ ও সুবিধা, ইহাই সকলের কামনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। নিজের ভিতরে কেহই দৃষ্টিপাত করে না, মানব-জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য মানুষ যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

ন শৌচং ন সত্যং নচ শমদমৌ নাপি নিয়মৌ।
ন শান্তি র্নক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী নচ দয়া॥
অহো মে নির্ব্বাজপ্রণয়ি সুজদোঽমী কিল জনৈঃ।
কিমুন্মূলী ভূতা বিদধতি কিমজ্ঞাতবসতিং॥

শৌচ নাই, সত্য নাই, শম, দম, নিয়ম নাই। শান্তি নাই, ক্ষান্তি নাই, হায় হায় মৈত্রী নাই, দয়া নাই। আমার সুহৃদগণ কোথায় গেলেন। কলিকালের মানুষেরা তাহাদের উন্মূলিত করিয়াছে। তাহারা কোথায় অজ্ঞাত বাস করিতেছে।

সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৈরাগ্য বলিতেছেন,

যজ্ঞে কর্ম্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ।
সংজ্ঞামাত্র বিশেষতো ভুজভুবো বৈশ্যাস্তু বৌদ্ধাইব॥
শূদ্রাঃ পণ্ডিত মানিনো গুরুভরা ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা।
বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হাহন্ত সম্পাদিতা॥

ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীত চিহ্ন ধারণ করিয়া কি করিয়া দান পাইব, তাহারই জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণ কেবলমাত্র নামেই ক্ষত্রিয়, রাজ্য-পালনাদি কার্য্য তাঁহাদের হাতে নাই। বৈশ্যগণ বৌদ্ধের ন্যায়। ফলে শূদ্রেরা পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছে। কলির প্রবেশে জগতের এই দুর্দ্দশা।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীনকালের সামাজিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ম্ম স্বাভাবিক। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। এই ছয়টি কর্ম্মের মধ্যে তিনটী আত্ম-মুখী অর্থাৎ কর্ত্তব্য, আর তিনটী সমাজমুখী অর্থাৎ অধিকার। কর্ত্তব্য পালন না করিলে কাহারও অধিকার থাকে না আমি কিছু করিব না, আর লোকে আমায় অকারণ সম্মান করিবে, এ প্রকারের আশা নিতান্তই অসঙ্গত। ব্রাহ্মণ নিজে যজ্ঞাদি করিতেন কাজেই অন্যে তাঁহাকে যাজকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিত। নিজে যজ্ঞ না করিলে পরের বাড়ীতে পুরোহিত হইয়া দক্ষিণা লইবার অধিকার থাকে না। ব্রাহ্মণ সারাজীবন বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যুগধর্ম্ম অনুভব করিবার তাঁহাদের শক্তি ছিল। কাজেই লোকে তাঁহাদের নিকট আদর করিয়া পড়িত এবং তাঁহারা অধ্যাপক-রূপে সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণ নিজের জন্য কখনই ধন সঞ্চয় করিতেন না। কাজেই লোকে তাঁহাকে দান করিত। ব্রাহ্মণের এই যে দান গ্রহণ—ইহার নাম প্রতিগ্রহ। সেকালে মানবের তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানবোধ কিরূপ ছিল তাহা যাহারা জানে না, তাহারা মনে করে যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতেন। কিন্তু তাহা সত্য নহে। অসহায় দুর্ব্বল

লোক যাহা ভিক্ষা করিয়া লয়, তাহার নাম ভরণ দান। ব্রাহ্মণ ভরণ দান লইতেন না। দাতা দান করিয়া কৃতার্থ হন, এই প্রকারের দানের যে গ্রহণ তাহারই নাম প্রতিগ্রহ। শাস্ত্রে আছে, যে ব্রাহ্মণ সঞ্চয় করে তাহাকে দান করিলে দাতার পাপ হয়। পূর্ব্বের শ্লোকে বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা ষষ্ঠকর্ম্মে অর্থাৎ দান গ্রহণেই নিপুণ। কলিযুগে চারিবর্ণ যখন নিজ নিজ কর্ত্তব্য পরিভ্রষ্ট হইল, তখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে, বৈশ্যগণ বৌদ্ধের মত হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ চিন্তা করা উচিত। প্রাচীন সমাজে এমন ব্যবস্থা ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠানের এমন প্রণালী ছিল, যে প্রত্যেককেই সমাজের অন্যান্য সকলের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইত। নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য অবৈধ ও অনিয়মিত ধন সঞ্চয় একেবারেই অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নীতিমূলক ও জ্ঞানমূলক। যাহারা ধনসঞ্চয় করে তাহারা কৃপণ। অর্থব্যয় করিতে তাহারা কুণ্ঠিত; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে চলিলে তাহারা অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য। এই জন্য কৃপণ ও ধনলিপ্সু ব্যক্তিগণ ব্যয়সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে অর্থ-ব্যয় না হয়, এই প্রকারের ছল-ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কিন্তু ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান নহে। ইহা ছলধর্ম্ম।

বর্ণচতুষ্টয়ের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া আশ্রমচতুষ্টয়ের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা বিবাহ করিতে অক্ষম তাহারা ব্রহ্মচারী সাজিয়াছে। গৃহস্থগণ ধর্ম্মহীন, স্ত্রী পুত্রের উদর ভরণ ব্যতীত তাহাদের অন্য কর্ম্ম নাই। বাণপ্রস্থাশ্রম একেবারেই লুপ্ত। সন্ন্যাসীর কেবল বেশভূষাই আছে। পণ্ডিতেরা কেবল তর্ক করিতেই পারেন, কল্পনাই তাঁহাদের শাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা মায়াবাদী তাহারা ভগবানের বিগ্রহ বিশ্বাস করে না এবং শ্রীবিগ্রহে তাহাদের অনুরাগ নাই। কপিল, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতির মত লইয়া নিষ্ফল তর্ক করাই পাণ্ডিত্য। জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি নানারূপ বিরোধী মতে সমাজ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কতলোক সাধু সাজিয়া কামিনীকাঞ্চন সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়া শত শত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি লোক ঠকাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যাহারা তপস্বী বলিয়া পরিচিত, তাহারা কেবল বাহ্য আড়ম্বরের দ্বারা সরলচিত্ত নর নারীকে বঞ্চনা করিতেছে। ধারণা, ধ্যান, একাগ্রচিত্ততা, শাস্ত্রাভ্যাসে পরিশ্রম, জপ, তপস্যা ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি নাটাশিক্ষা প্রণালীর ন্যায়

উদর পূরণের উপায় মাত্র হইয়াছে। কবিকর্ণপূর এই প্রকারে সে দিনের ধর্ম্মগ্লানি বর্ণন করিয়াছেন।

এইবার দেখা যাউক, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার কি প্রকারে হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগের ধর্ম্মগ্লানি কি প্রকারে নিবারিত বা সংশোধিত হইয়াছিল? পৃথিবী পীড়িতা হইয়া গো-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন এবং আপনার দুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি যে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারাই, গ্লানি নিবারণের এবং দেবজন্মের প্রথম সোপান। পৃথিবীর বোধ, পৃথিবী-পৃষ্ঠের অধিবাসিগণের বা পৃথিবীমাতার সন্তানগণের বোধের দ্বারাই হইয়া থাকে। পৃথিবীর অধিবাসিগণের মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং পৃথিবীর যাহা উন্নততর জ্ঞান, তাহা মানবশ্রেষ্ঠগণের জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। পৃথিবী যে অসুরভাবে পীড়িতা হইয়াছেন, মানবের যাহা উন্নততর স্বার্থ বা মহত্তর কল্যাণ, যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, সেই ধর্ম্ম যে নষ্ট হইতে বসিয়াছে, ইহা সে সময়ের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। এই সাধুপুরুষেরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন, গভীরতর সত্য সমূহ তাঁহাদের নির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। তাঁহারা বুঝিলেন সমাজ সুস্থ অবস্থায় নাই। সাধারণ জনশ্রেণী অজ্ঞান ও অসহায়। তাহারা নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারে না। যাহা অহিতকর তাহাকে হিতকর বলিয়া বিবেচনা করে, যাহা হিতকর তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, সে সময়ে এই গ্লানি নিবারণ করিতে হইলে, প্রথমেই এমন একদল লোক চাই, যাঁহারা যথার্থরূপে বুঝিতে পারিবেন যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত সাধু নিজেদের কোনরূপ পার্থিব স্বার্থ যাঁহারা চাহেন না, হৃদয় যাঁহাদের নির্ম্মল, সত্য নির্দ্ধারণ করিতে যাঁহাদের কখনও ভ্রান্তি হয় না, তাঁহারা যখন বুঝিবেন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমাজ না বুঝিয়া ধ্বংসের অভিমুখী হইয়াছে সেই সময়ে দেবজন্মের সূত্রপাত হইবে। পৃথিবী কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সত্য সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের গ্লানি যথার্থরূপে বুঝিয়া সাধু-প্রকৃতি সম্পন্ন একদল লোক যখন সত্য সত্যই ব্যথিত হইবেন, তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে এই গ্লানি নিবারিত হইবে।

কলিযুগের ধর্ম্মগ্লানির প্রতিকার শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহা আলোচনা করিলে আমরা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে পৃথিবীর গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে যাওয়া ও নিজের দুঃখ নিবারণ করার যে অর্থ বা তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বলা হইল, তাহাই পুরাণের প্রকৃত অর্থ। কলিযুগে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল, সেই সময়ে অল্প কয়েকজন নিঃস্বার্থ লোক সমাজের অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের এই যে ব্যথা তাহার সহিত নিজেদের স্বার্থের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। এই লোকগুলি ভক্ত। তাঁহারা সংসারিক স্বার্থের সহিত একেবারে সম্বন্ধহীন। মানবের পারমার্থিক হিতসাধন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, আর একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন, ভগবান্ কৃপা করুন। অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই ভক্তগণের নেতা ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভক্তি-যোগের অভাবই এই ধর্ম্মগ্লানির হেতু। সকলের মধ্যে ভক্তিপথ প্রবর্ত্তিত হইলে মানবের কল্যাণ হইবে। অদ্বৈতাচার্য্য বড়ই দয়ালু। তিনি সদয় হৃদয়ে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছেন—কি প্রকারে জীবের উদ্ধার হইবে। তিনি বুঝিলেন এই সময়ে যদি ভগবানের অবতার হয়, তাহা হইলেই জীবের উদ্ধার সম্ভব। সাধনার দ্বারা সকলই সম্ভব; তপস্যার প্রভাবে বৈকুণ্ঠনাথকেও জগতে আনিতে পারা যায় এবং তাঁহার দ্বারা জীবের উদ্ধারও করা যায়। অদ্বৈতাচার্য্য তপস্বী ব্রাহ্মণ। জীবের কল্যাণের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সঙ্কল্প করিয়া একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণের পূজা করিতেছেন, তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল দিয়া আশান্বিত হৃদয়ে কৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে, তাঁহার দেহে এক মহাশক্তির আবির্ভাব তিনি স্বয়ং বুঝিলেন, অপরেও অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মহারা বা ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। এই অবস্থায় তিনি হুঙ্কার করিতেন এবং সকলকেই বলিতেন, তোমরা অবসাদ ও নৈরাশ্য পরিত্যাগ কর। সুসময় আসিতেছে, অবিলম্বে ভগবান্ আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং মানবের দুঃখ ও সমাজের দুর্গতি দূরীভূত হইবে। অদ্বৈতের কথায় ভক্তগণ উৎসাহিত ও একতাবদ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল ভগবান্ আসিতেছেন, অচিরেই জগতের দুঃখ দূরীভূত হইবে। ইহাই দেবজন্মের বা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের সূচনা। অদ্বৈত প্রভুর হৃদয়েই তাহার প্রথম জন্ম। অদ্বৈতের হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সাধনশীল ভক্তগণের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া

ভাবরূপে তিনি পুষ্ট হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের তপস্যা ও বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের দ্বারা নির্ম্মল-চিত্ত ভক্তগণের গোষ্ঠিগঠন দেবজন্মের প্রথম স্তর।

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাস নবদ্বীপ। তাঁহারা চারি ভাই। তাঁহারা চারি জনেই এক মতাবলম্বী এবং অদ্বৈত প্রভুর ভক্ত-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা অপরাপর ভক্তের সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের সভায় যান এবং সেখান হইতে যথাকালে বাড়ী ফিরিয়া আসেন। একদিন তাঁহাদের মনে হইল—আমরা চারি ভাই রাত্রিকাল আলস্যে যাপন করি কেন? এইরূপ ভাবিয়া চারি ভাই একত্র হইয়া নিজেদের বাড়ীতে সারারাত্রি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ধর্ম্মের গ্লানি যখন উপস্থিত হয় তখন কয়েক জন লোকের সত্যরূপে বুঝা চাই যে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। কেবল গ্লানি বুঝিলেই হইবে না, এই গ্লানির প্রতিকার কি তাহাও বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সাধারণ লোকের কর্ম্ম নহে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ধর্ম্মের গ্লানি বুঝিয়াছিলেন, আর বুঝিয়াছিলেন এই গ্লানির প্রতিকার কি। হরিনাম সংকীর্ত্তনই এই প্রতিকার। অবশ্য সকল যুগে এই গ্লানি একরূপ নহে, প্রতিকারও একরূপ নহে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার যুগে যে গ্লানি দেখিয়াছিলেন হরিনাম-সংকীর্ত্তনের তাহার নিবারণ হইবে ইহা বুঝিয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উপদিষ্ট এই নাম-সংকীর্ত্তন অনলস ভাবে নিজেদের গৃহে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে রাত্রিকালে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন যেমন আরম্ভ হইয়াছে অমনই চারিদিক হইতে তাহার বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ হইল। যাহারা পাষণ্ডী বা বিপক্ষদল তাহারা শ্রীবাসকে ভয় দেখাইতে লাগিল। নবদ্বীপের ভক্তগণ তখনও দুর্ব্বল, কাজেই তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভু ইহা শুনিলেন, ভক্তগণকে ডাকিলেন ও ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তপস্বী ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,

শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যবে নাহি পারো তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ, চক্র লইমু হাতে॥

পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যখন ভক্তগণকে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি এতদূর বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার পরিধানের বস্ত্রখানি খসিয়া পড়িয়াছে সে জ্ঞানও তাঁহার নাই। অদ্বৈত প্রভুর কথায় ভক্তগণ আশান্বিত হইলেন এবং সকলেই কাতর প্রাণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কখন সেই শুভদিন আসিবে। সেই চিন্তায় ভক্তগণের এমন অবস্থা হইল যে তাঁহারা সর্ব্বদাই কাঁদিতে লাগিলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, আহার নিদ্রা দূর হইয়া গেল। ভক্তগণের আর কোনরূপ সুখভোগ থাকিল না ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইলেন। ভক্তগণের এবং জগতের দুঃখ দূর হইল।

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধর্ম্মগ্লানি এবং সেই গ্লানি নিবারণের জন্য দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় প্রাচীন কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার সাহায্যে বুঝিতে হইবে। নতুবা আমরা ঐ সমুদয় কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিব না। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে পৃথিবীর গো-মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার সভায় গমনের তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। যাঁহারা পুরাণ ব্যাখ্যার পদ্ধতি না জানিয়া, গল্পরূপে পুরাণ বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা পড়িয়া বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া পড়িলে দেবজন্মের প্রণালী বুঝিতে পারিবেন। ঐ প্রণালীর দ্বারা ব্যাখ্যা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যাই যে প্রকৃত ও সঙ্গত ব্যাখ্যা তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না।

দ্বাপরযুগে কি প্রকারে আবির্ভাব হইল, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। গো-মূর্ত্তিধারিণী পৃথিবীর দুঃখের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, ত্রিলোচন, পৃথিবী ও অন্যান্য দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করিলেন। এই ক্ষীরোদ সাগরে শ্বেতদ্বীপ। তথায় ভগবান বিষ্ণুরূপে বিরাজমান। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের পালক। শ্বেতদ্বীপ যাওয়া বড়ই কঠিন। ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া ক্ষীরোদ সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পাদ্মোত্তর খণ্ডে এবং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয় উপাখ্যানে এই

ক্ষীরোদ সাগর ও শ্বেতদ্বীপের কথা আছে। পরম গোলকাধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ভগবান্ যাঁহার নাম বাসুদেব, তিনি প্রথম ব্যূহ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ। এই সঙ্কর্ষণের যিনি অংশের অংশ তিনি কারণার্ণবশায়ী। তিনি মহতের স্রষ্টা তাঁহারও নাম সঙ্কর্ষণ। তাঁহার চতুর্ব্যূহের অনিরুদ্ধের অংশ গর্ব্ভোদশায়ী। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় কারণার্ণবশায়ীর রোমবিবরে বিরাজমান। তাঁহারও নাম অনিরুদ্ধ। তাঁহার অংশ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। ইনিই ব্যষ্টির অন্তর্যামী সর্ব্বভূতস্থ পুরুষ। বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় ক্ষীরোদশায়ীর এইরূপ পরিচয় আছে।

যাহা হউক, ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গিয়া বৈদিক পুরুষসুক্তের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই দৈববাণী হইল। ব্রহ্মা সেই বাণী শুনিলেন ও দেবতাগণকে জানাইলেন। পৃথিবীর সন্তাপ হইয়াছে, ইহা আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, হে দেবগণ! তোমরা যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর, বসুদেবের গৃহে ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন। দেব স্ত্রীগণও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুক। বাসুদেবের অংশ সহস্রবদন অনন্তদেবও পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। যোগমায়াও আবির্ভূতা হইয়া দেবলীলার আয়োজন করিবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়েও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের লীলায় যাঁহারা লীলার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা সকলে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতারাও অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপই হইয়া থাকে। মানুষ কর্ম্মদোষে অসুর হইয়া যায়—রাক্ষস ও পশু হইয়া যায়। সেই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। কোটী কোটী লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু বা অসুরের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাহারা সন্তুষ্ট। জীবনে কোনও উচ্চ আদর্শ নাই, কোনও মহৎ লক্ষ্য নাই, মানবাত্মার গৌরব ও মহিমা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক জাতি ও সমাজ ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এই প্রকারের দুর্দ্দশা অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও তাহার সনাতন ধর্ম্ম ধ্বংশ হয় নাই। যে সময়ে এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছে, সেই সময়েই দেবজন্ম হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ দুর্দ্দশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার সৌভাগ্যের নবসূর্য্যালোকে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যে সময় লক্ষ লক্ষ লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট ও অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, সেই সময়ে কয়েকজন লোকের নির্ম্মল হৃদয়ে চির আলোক-

রাজ্যের রশ্মিরেখা নিপতিত হইয়াছে। সেই আলোকে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহারা বীরের মত হুঙ্কার করিয়াছেন এবং বিশাল সমাজের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া সত্যের জন্য তপস্যা করিয়াছেন। তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে বুঝিয়াছেন মানুষ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহা মঙ্গলের অবস্থা নহে। অজ্ঞান মানুষ মনে করিতেছে তাহারা বেশ সুখে ও আরামে আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা মনুষত্বের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোচনীয় ধ্বংশের পথে অন্ধভাবে ধাবিত হইতেছে। এই অজ্ঞানীদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে যে তাহারা অজ্ঞান? একথা তাহাদিগকে বলিলে তাহারা দলবদ্ধ ভাবে বিরুদ্ধতাচরণ করিবে। কিন্তু একথা বলা আবশ্যক। বীরহৃদয় সাধু পুরুষ যিনি তপস্যার দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি ও তাহার প্রতিকার বুঝিয়াছেন, তিনি সাধারণ মানুষের মতামতের দিকে চাহেন না নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলেন এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এই তপস্যার প্রভাবে দেবলোক আলোড়িত হয় এবং দেবতার অংশে নূতন রকমের মানুষ আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আজ যে কথা কেহ শোনে না, শুনিলেও বোঝে না, সেই কথা শুনিবার ও বুঝিবার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। দেবজন্মের দ্বারা জনসমাজে এই প্রকারেই সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য বিষয়ের প্রধান কথা এই যে, দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার নিয়ম ও প্রণালী আছে। যদিও মূলে সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু তথাপি দেবতাকে আনিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে হইলে মানবের তপস্যার প্রয়োজন। তপস্যার ভেক হইলে হইবে না, বিজ্ঞাপনের জয়ঢক্কা বাজাইয়া মূর্খ ও সরল-হৃদয় মানুষকে ঠকাইলে হইবে না। দেবতাকে কেহ ঠকাইতে পারে না। সুতরাং মানুষের নিন্দা বা প্রশংসা, অবজ্ঞা বা সমাদর, ইহলোকের সুবিধা বা অসুবিধা এসকলের প্রতি না চাহিয়া কেবলমাত্র আত্মার অন্তর্যামী পরম দেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। একজনও যদি এই তপস্যা করে, তাহা হইলে দেবজন্ম অবশ্যম্ভাবী। তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যজ্ঞান প্রয়োজন। অবশ্য তপস্যার দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জ্ঞান চাই। অজ্ঞান মানুষ নিজের হৃদয় জানে না। সে নিজের কাছে নিজেই বঞ্চিত। সে অনধিকার চর্চ্চা হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম। সুতরাং জ্ঞান চাই, হৃদয়ের নির্ম্মলতা চাই। এই জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি বুঝিতে হইবে।

অতীতের ঋষিগণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই গ্লানির প্রতিকার কি তাহা বুঝিতে হইবে এবং অকপটভাবে তপস্যা করিতে হইবে। একজনও যদি এই কার্য্য করে, তাহা হইলে দেবজন্ম অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীতে দেবজন্ম হইবার পূর্ব্বে দেবলোকে ও নরলোকে জ্ঞাতসারে একটী আয়োজন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে অবশ্য এই আয়োজন বুঝিতে পারে না। মর্ত্ত্যলোকে যাঁহারা সাধু ও তপস্বী, যাঁহারা বিশ্বকল্যাণ-ব্রতে ব্রতী, তাঁহারাই তপস্যার দ্বারা মহাশক্তি অবতারিত করেন। ইহারই নাম দেবজন্ম। মানবের তপস্যা ও মানবীয় শক্তির সহিত দেবশক্তির মিলনের দ্বারা ইহা হইয়া থাকে। ইহা একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আমরা এই আয়োজনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। বাল্মিকি-রামায়ণের আদিকাণ্ড পঞ্চদশ সর্গে রাবণ বধের জন্য সুরগণের পরামর্শ বর্ণিত হইয়াছে। দেবতারা একত্র হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে বলিলেন, হে প্রভো! লঙ্কার রাজা রাবণকে বর দিয়াছেন। আপনার বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে। তাহার অত্যাচারে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তাহার এত অহঙ্কার যে সে ইন্দ্রকেও পরাস্ত করিতে চায়। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি, ব্রাহ্মণ, অসুর প্রভৃতি সকলেই তাহার দ্বারা পীড়িত। দেবতাদিগের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা চিন্তা করিও না; আমি সেই দুর্বৃত্তের বিনাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। রাবণ যখন আমার নিকট বর প্রার্থনা করে তখন সে বলিয়াছিল, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে যেন আমার পরাজয় বা মৃত্যু না হয়। তাহার তপস্যার দ্বারা বাধ্য হইয়া আমি সেইরূপ বর দিয়াছিলাম। রাক্ষস রাবণ অতিশয় অহঙ্কারী। সে মানবকে নিতান্ত দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করে। এই কারণে বর লইবার সময় মানুষের নাম করে নাই। এই মানুষের হস্তেই যাহাতে তাহার মৃত্যুও হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। দেবতা ও মহর্ষিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ঠিক এই সময়ে ভগবান কমলাপতি খগেন্দ্রবাহনে আরোহণ করিয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গদ্যুতি অপরূপ। হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা, পরিধান পীতবসন। দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। অংশ ক্রমে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া অযোধ্যার অধিপতি দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিতে হইবে। নিশাচর রাবণ ব্রহ্মার বরে অতিশয় উদ্ধত হইয়াছে। আপনি

দেবচক্রে সেই রাবণকে ধ্বংশ করিবার জন্য সংসারে মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হউন। ভগবান্ দেবগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে অভয় দান করিলেন।

ভগবানের সম্মতি-লাভ করিয়াই দেবগণ নিরস্ত হইলেন না। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে বলিলেন,—ভগবান বিষ্ণু যখন মানুষ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন তখন তোমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তোমরা মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী সহায় সকল সৃজন কর। তোমরা গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, পন্নগী ও বানরিগণের গর্ভে বানর সকল সৃষ্টি করিতে থাক। আমি পূর্ব্বকালে জাম্বুবানকে সৃষ্টি করিয়াছি। ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে দেবগণ বানররূপধারী পুত্র সকল সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র হইতে বালি, সূর্য্য হইতে সুগ্রীব, বৃহস্পতি হইতে বুদ্ধিমান তার, কুবের হইতে গন্ধমাদন, বিশ্বকর্ম্মা হইতে নল এবং অগ্নি হইতে নীলের জন্ম হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মহীন্দ ও দ্বিবিদ, বরুণ হইতে সুষেণ, পর্জন্য হইতে শরভ এবং বায়ু হইতে হনুমানের উৎপত্তি হয়। মানবরূপে ভগবানকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিবার জন্য, ব্রহ্মার নেতৃত্বাধীনে এই প্রকারে আয়োজন আরম্ভ হইল।

কিন্তু বাল্মিকির রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, দেবলোকে আয়োজন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মর্ত্ত্যলোকে মহামনা মহর্ষিগণের মধ্যে এই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। দেবগণের সভাতে মহর্ষিগণও ছিলেন। ইহা রামায়ণে কথিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলে পর আমরা রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে মহর্ষিগণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। অতি প্রাচীন মহর্ষিগণ পূর্ব্ব হইতেই পুলস্তবংশীয় রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই তপস্যার দ্বারা দেবগণ উদ্বোধিত হইয়াছিলেন। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলে পর তত্রস্থ মহর্ষিগণ পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহর্ষিরা যেন বহুদিন হইতে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং ভরসা করিতেছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া দুর্বৃত্ত ও ধর্ম্মদ্বেষী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবেন। এই কারণে তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, আপনি রাজা, দেবরাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশ হইয়া রাজা ইহলোকে প্রজাগণকে রক্ষা করেন। এই কারণেই তিনি সকলের পূজনীয়। আমরা তপস্যা করি। আমাদের দণ্ড নাই। ক্রুদ্ধ হওয়া আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। অতএব

আমরা আপনার রক্ষণীয়। বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি প্রাচীন শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আসিয়া শরভঙ্গ ঋষির সহিত গোপনে কথোপকথন করিতেছিলেন। ইন্দ্রের সহিত শরভঙ্গঋষির কি কথা হইতেছিল, তাহা তখন জানিতে পারা গেল না। কিন্তু সূর্পনখার নাশাচ্ছেদ উপলক্ষে খর, দূষন, ত্রিশিরা ও তাহাদের চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য নিহত হইলে পর মহর্ষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, ইন্দ্র শরভঙ্গ ঋষিকে জানাইতে আসিয়াছিলেন যে আর ভয় নাই, শ্রীরামচন্দ্র আসিতেছেন, রাক্ষসগণ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। শরভঙ্গ ঋষি অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে মর্ত্তালোকে আনয়ন করিয়া রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করাই যেন তাঁহার এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য শরভঙ্গঋষি তাঁহার তপস্যার ফল শ্রীরামচন্দ্রকে দিতে চাহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য এই দান গ্রহণ করিলেন না। তিনি বিনীতভাবে ঋষিকে বলিলেন, আমি নিজের তপস্যার দ্বারা ঐ সমুদয় লোক অর্জ্জন করিব। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া শরভঙ্গ বুঝিলেন, তিনি ও অন্যান্য প্রাচীন ঋষিগণ যে উদ্দেশ্যে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রাক্ষস-উপদ্রুত ভীষণ বনপ্রদেশে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, সে উদ্দেশ্য এইবার সফল হইবে। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আগমন। শ্রীরামচন্দ্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বৃদ্ধ তপস্বী শরভঙ্গ আনন্দিতচিত্তে অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হইল। তিনি প্রসন্ন-হৃদয়ে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিলেন।

শরভঙ্গ ঋষি এই প্রকারে স্বেচ্ছায় ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দণ্ডকবনবাসী মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে আসিয়া মিলিত হইলেন। অসংখ্য মুনি, সকলেই কঠোর তপস্বী, ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পথ অবলম্বন করিয়া একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা দীর্ঘকাল তপস্যা করিতেছেন। রামায়ণে এই সমুদয় তাপসগণের নাম ও সাধন প্রণালী পাওয়া যায়। বৈখানস, বালখিল্য, সংপ্রপ, মরীচি, অশ্মকুট্ট, বহুপত্রাহারী তাপস, দন্তোলূখলী, উম্মাজক, গাত্রশয্য, অশয্য, অনবকাশিক, জলাহারী, বায়ুভোগী, আকাশনিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাহু, দান্ত, নিয়ত আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, সজপা, পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী,—এই সমুদয় ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—আপনি আমাদের রক্ষক, জল্লা ও গঙ্গা নদীর তীরবাসী এবং

চিত্রকূট নিবাসী বহুসংখ্যক মুনিগণ রাক্ষসদিগের দ্বারা পীড়িত হইতেছেন। তপস্বীদিগের এই দুঃখ আমরা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

তাহার পর শ্রীরামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ নামক আর একজন প্রাচীন মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। ইনিও শরভঙ্গের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের অপেক্ষায় কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, হে বীর! আমি তোমার অপেক্ষায় এতদিন দেহত্যাগ করি নাই। সুতীক্ষ্ণমুনির নিকট বিদায় হইয়া শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যঋষির আশ্রমে গমন করিলেন। যে সমুদয় প্রাচীন ঋষি রাক্ষসপীড়িত পৃথিবীর ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অগস্ত্যই প্রধান বলিয়া মনে হয়। ইল্বল ও বাতাপী নামক দুইজন পরম মায়াবী রাক্ষসকে অগস্ত্য বধ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত অগস্ত্যের আদেশে মস্তক নত করিয়া রহিয়াছেন। ঋষিসমাজে অগস্ত্যের প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলে অগস্ত্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এই দিব্য ও মহৎ বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিয়াছেন। এই ধনু বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা স্বর্ণ ও বজ্রমণি দ্বারা বিভূষিত। তুমি এই ধনু গ্রহণ কর। এই তূণীর ব্রহ্মা আমাকে দিয়াছেন। ইহা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহা অগ্নিসদৃশ নিশিত শর সমূহে পরিপূর্ণ। আর এই স্বর্ণময় কোষবদ্ধ সুবর্ণালঙ্কৃত অসি, ইহাও আমাকে ব্রহ্মা দান করিয়াছেন। তুমি এই ধনু, শর, খড়্গ ও তূণীর গ্রহণ কর।

রামায়ণের এই সমুদয় বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন মহর্ষিগণ বহুদিন হইতে রাক্ষস বিনাশ করিয়া, ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিবার জন্য, তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার দ্বারা বহু বহু ঋষি এবং দেবগণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষার জন্য যখন শ্রীরামলক্ষ্মণকে লইয়া যান, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা নামক মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র দিবার সময় বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—এই মন্ত্রের প্রভাবে তোমার শ্রান্তিবোধ, জ্বর বা বৈরূপ্য হইবে না। তুমি ঘুমাইয়াই থাক আর অন্যমনস্ক হইয়াই থাক, রাক্ষসেরা তোমার পরাভূত করিতে পারিবে না। এই বিদ্যা

পাঠ করিলে তোমার ক্ষুৎপিপাসা দূর হইবে। এই দুইটী মন্ত্র ব্যতীত বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে নানারূপ অস্ত্র দণ্ড চক্রাদি প্রদান করেন। বিশ্বামিত্র রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য তপস্যার দ্বারা এই সমুদয় দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে এই অস্ত্রসমূহ দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রামায়ণে এই অস্ত্র সমূহের নাম আছে। ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, ইন্দ্রচক্র, বজ্র, শিবের শূল, ঐষীকাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নাম্নী গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক দুইটী অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির, ক্রৌঞ্চ, শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মূষল, কাপাল, কিঙ্কিণী—এই সমুদয় অস্ত্র শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, কামরূপী আরও অনেক অস্ত্র বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন।

এই সমুদয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি—যাহারা অলস ও অকর্ম্মণ্য, উৎসাহহীন ও মিথ্যাচারী, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বা তাহাদিগের কাল্পনিক কোনরূপ দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব হয় না। তপস্বী মানব, যখন সত্য ও ধর্ম্মের জন্যে সর্ব্বত্যাগী হইয়া সত্য সত্য তপস্যা করেন, তখনই তাঁহাদের তপস্যার প্রভাবে দেবলোক আলোড়িত হয় এবং মর্ত্ত্যলোকে ঐশীশক্তির প্রাকট্য হইয়া থাকে। তপস্যাই সকলের মূল। যাহারা তপস্যাহীন, তাহাদিগের জগতে বাঁচিয়া থাকিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য সকল লোকে তপস্যা করিতে পারে না; কিন্তু কোনও সমাজে যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা সকলের কল্যাণের জন্য যদি তপস্যা না করেন, তাহা হইলে সেই সমাজের বাঁচিয়া থাকিবারই আশা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে বামনদেবের আবির্ভাবের কথা আছে। বলি, দৈত্য বা অসুর। শুক্রাচার্য্য তাঁহার গুরু। এই বলি, গুরু কর্ত্তৃক বহ্বৃচ ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ মহাভিষেক দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বজিত যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের ফলে, তিনি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবগণের দুঃখের সীমা নাই। তাঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে মলিনবেশে মর্ত্ত্যলোকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দেবমাতা অদিতিপুত্রগণের দুঃখে ব্যথিতা হইয়া, তাঁহার পতি কশ্যপের উপদেশানুসারে পয়োব্রত নামক একটি ব্রত পালন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ অদিতির পুত্ররূপে আগমন করিলেন, এবং বলির যজ্ঞে গমন করিয়া তাহার

নিকট ত্রিলোকের রাজ্য ভিক্ষা করিয়া লইলেন। বৃত্রাসুরের বধ উপলক্ষে ইন্দ্রের কঠোর তপস্যা শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মানবকে, বা সমাজে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। তপস্যার ফলে দেবজন্ম হইয়া থাকে।

উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক। ধর্ম্মের গ্লানি বলিতে ভারতবর্ষ চিরদিন কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের খাওয়া পরার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, ব্যাধিরও সীমা নাই। উদরান্নের জন্য মানুষ বাধ্য হইয়া সর্ব্বদাই অতি উৎকট রকমের পাপাচরণ করিতেছে। এখন যদি আমাদের এই অন্নসমস্যার মীমাংসা হয়, তাহা হইলেই কি আমরা সন্তুষ্ট হইব? তাহা হইলেই কি আমাদের ধর্ম্মগ্লানি দূরীভূত হইবে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় দেশে কোনও রূপ অন্নকষ্ট ছিল না। ইহলোকের ভোগ সুখ প্রচুর পরিমাণে সকলের করায়ত্ত ছিল। কিন্তু অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তখন ধর্ম্মগ্লানি হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্যকশিপুর শাসনকালে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অন্নবস্ত্রের ও ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য ছিল। রাবণের রাজ্য স্বর্ণলঙ্কার ঐহিক গৌরব ও সমৃদ্ধি রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মের গ্লানি কি, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। যাহারা ভোগাসক্ত, বিলাসী ও ঐহিক সুখকামী, আত্মার আলোকে যাহারা জীবনের উন্নততর মহিমা বুঝিতে পারে নাই, যাহারা সংযম ও নিবৃত্তিমার্গের পথিক নহে, তাহারা ধর্ম্মের গ্লানি বুঝিতে পারে না। পেটের দায়ে অনেকে সাধু সাজে, অর্থাৎ সাধুর সাজ পরিয়া অনায়াসে বা অল্পায়াসে উদরান্ন সংগ্রহ করে। কিন্তু তাহারা সাধু নহে। পৃথিবীতে মান সম্ভ্রম পাইবার জন্য অনেকে ধার্ম্মিকতার ছদ্মবেশে গ্রহণ করে এবং সরলচিত্ত নরনারীকে বড় বড় কথার চোটে ভুলাইয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করে। ইহারাও সাধু নহে। এই প্রকারের ছল বড়ই বিপদজনক। সুতরাং সত্য সত্য ধার্ম্মিক হইয়া আত্মশক্তির ভূমিতে বসিয়া তপস্যা করিতে হইবে। ধর্ম্মগ্লানি কোথায়, ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার প্রতিকার কি, অতীতের অভিজ্ঞতা দ্বারা সাধনবলে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি কিছু হইবার নহে। ধৈর্য্য ও তপস্যা উভয়েরই প্রয়োজন।

সাহিত্য-সাধনার আদর্শ

বীরভূম জেলার সাহিত্য-সেবকগণকে একত্র সম্মিলিত হইবার এই সুযোগের যাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি ও প্রার্থনা করি, আমাদের এই মিলন যেন একটি বাহ্য ও সাময়িক ব্যাপারে নিঃশেষিত না হয় এবং এই বার্ষিক সম্মেলনী যেন একটি হুজগ্ মাত্রে পর্য্যবসিত না হয়। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে সত্যরূপে চিনিতে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে একটি ভাব-গত যোগসূত্র গড়িয়া তুলিতে চেষ্টান্বিত হই।

মানুষ মানুষের সহিত মিলিবে ও মিত্রতা করিবে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের উপলক্ষ্য নানারূপ। একবর্ণের লোক, একব্যবসায়ের লোক, এক প্রকারের সামাজিক বা রাজনীতিক স্বার্থ-সম্পন্ন লোক—নিজেদের মধ্যে, প্রীতির অনুশীলন জন্য, বা সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার জন্য একত্র হইয়া থাকে। এই সব সম্মেলনে, প্রীতির অনুশীলন অপেক্ষা, সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার চেষ্টা অধিকতর প্রবল। কিন্তু আমাদের এই যে মিলন, ইহার উপলক্ষ্য, সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা এখানে, যাঁহারা একত্র হইয়াছি, সকলেই বাঙ্গলা-সাহিত্যের অনুশীলন করিতে ভালবাসি। অনেকেই কিছু কিছু লেখেন, বা লিখিয়াছেন, বা লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন—আর সকলেই ইচ্ছা করি, বাঙ্গলাভাষার যে উন্নতিমুখী গতি, সেই গতির সহিত সংসৃষ্ট রহিয়া, নিজের ও স্বদেশের কল্যাণ সাধন করি।

ইহাই আমাদের সকলের সাধারণ ভাব। এই সাধারণ ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া, আমরা সকলেই মিলিত হইয়াছি। মিলনের যত প্রকার উপলক্ষ্য হইতে পারে, এই উপলক্ষ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও সাত্ত্বিক। আমরা যদি ধর্ম্মের নামে একত্র হইতাম, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নানারূপ সঙ্কোচ থাকিত—অর্থাৎ, আমাদের সভা, হিন্দুসভা হইলে, মুসলমানকে ভ্রাতার ন্যায় বুকে টানিয়া লইতে পারিতাম না- বৈষ্ণব-সভা হইলে, শাক্তকে তেমন করিয়া আপনার করিবার সুযোগ পাইতাম না—আবার ব্রাহ্মণ-সভা হইলে কায়স্থকে এবং কায়স্থ-সভা হইলে ব্রাহ্মণকে, হয়ত আপনার করিতে পারিতাম না। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে, এ সব বালাই নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে দলাদলি আছে, কারণ উহা পার্থিব স্থূল স্বার্থের সহিত জড়িত। কিন্তু সাহিত্যের ভূমি মহামিলনের ভূমি। আবার, এই সাহিত্যের মিলন-মন্দিরে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ, রাজনীতিবিৎ, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা,—সকলেরই অধিকার আছে। সুতরাং আমাদের এই মিলন স্থায়িত্ব লাভ করুক—ভগবানের কৃপায় ইহা সফল হউক,

আমরা প্রত্যেকেই, সাহিত্যের মিলনভূমির এই অতুলনীয় গৌরব উপলব্ধি করিয়া, দেশের আপামর সাধারণকে ইহা বুঝাইতে সমর্থ হই—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

একটি খরস্রোতা, বিপুলকায়া, আবর্ত্ত ও কল্লোলময়ী নদী, প্রচণ্ডবেগে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যায়, মানবজাতির মানস-নদীও সেইরূপ, কালের বুকে বহিয়া যাইতেছে—ইহাই বিশ্ব-মানবের সাহিত্য-সাধনা। কবে কোথায় এই নদীর জন্ম, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন—তবে, নির্দ্দেশ করার চেষ্টায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। কোথায় বা এই নদীর পরিণতি, কোন্ মহাসিন্ধুর বুকে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য এই নদী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু সেই মহা-সিন্ধুর কল্পনায় আনন্দ আছে, লাভও আছে। ইহাই মানব জাতির সাহিত্য-সাধনা।

নদীর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। মানবের মানস-ক্ষেত্র উর্ব্বর হয়—সন্তপ্ত-হৃদয় শীতল হয়, মানবাত্মার পিপাসা নিবারিত হয়। সাহিত্যের গতি, নদীরই গতির মত। নানাদেশ—নানাভাষা—নানাসাহিত্য। কিন্তু বাহিরের ভেদ থাকিলেও, ভিতরে মহামিলন। এখনকার দিনে, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত না হইলে, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না, গভীররূপে সাহিত্যের আস্বাদনও করা যায় না। বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের ভারতীয় সাহিত্য—তাহার ভিতর বঙ্গসাহিত্য।

বিগত দেড়শত বৎসর মধ্যে, এই বঙ্গ-সাহিত্য এক অভিনব পুষ্টি, গভীরতা ও গতিশীলতা লাভ করিয়াছে। ইহার বৈচিত্র্যও প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী জাতির উন্নতিমুখী সাধনা, বাঙ্গালী জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা—এই সাহিত্যে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বাঙ্গালী—শরীরের দ্বারা, বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়া বাঙ্গালী হইয়াছি। কিন্তু মনের দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা বাঙ্গালী হইতে হইলে, সাহিত্যের অনুশীলন করা আবশ্যক। কারণ, আমাদের দেশের মানস-জীবন, এই সাহিত্যের মধ্যেই বিম্বিত ও স্পন্দিত। দেশীয় সাহিত্যের আলোচনার ইহাই হেতু।

আমরা প্রত্যেকে যেমন, এই সাহিত্য-সাধনায় যোগদান করিয়া, ইহার সহিত মিলিয়া, দিনের পর দিন অগ্রসর হইব, তেমনি নিজের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য-প্রচারক হইয়া, আমাদের চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, এই প্রবাহের সহিত অগ্রসর হইতে সাহায্য করিব। সাহিত্যের জন্য এইটুকু করিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বাধ্য।

সাহিত্য-সৃষ্টি অবশ্য সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া তাড়াতাড়ি তাহা জন-সমাজে প্রচার করা ভাল কাযও নহে। অনধিকারচর্চ্চা, সকল ক্ষেত্রেই পাপ। আত্মজ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তি। আমি কতটুকু জানি, যাহা জানি বা জানি বলিয়া মনে করি, তাহার কতটুকুই বা আমার নিজের, আর কতটুকুই বা ধারকরা পোষাকী জিনিষ, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ইহাই অন্তর্দৃষ্টি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শিখিবার বিষয় যতখানি, লিখিবার বা

বলিবার বিষয় ততখানি নাই। এই সুলভ ছাপাখানার দিনে, এই লিখিবার বা বই ছাপাইবার প্রলোভনের একটা বিকট উন্মাদনা, চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে।

আমরা, বীরভূমের এই মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক একত্র হইয়া, স্থানে স্থানে পাঠাগার ও বিতর্ক-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যদি জেলার মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিতে পারি, তাহা হইলেই, আমাদের এই মিলন সফল হইবে। আর যদি, সাহিত্যের যাহা সুমহৎ আদর্শ, তাহার সহিত সকলের যাহাতে পরিচয় হয়, তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে যে ব্যাধি দেখা দিয়াছে, সেই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-দেশে, কোন জেলাই এই আবশ্যকীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। আসুন, আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, ইহা সম্ভব কি না।

বার বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে যখন সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের নিকট একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই—এই প্রস্তাব। এ কথা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারা যায় যে, বীরভূম হইতে এই প্রস্তাব, দেশকে একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে। গত বার বৎসরে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ সহরে, আমাদের জীবন ও সাধনা কেন্দ্রীভূত হওয়া হিতকর নহে—বরং বিশেষ-রূপে অহিতকর। ইহা সম্ভবতঃ আপনারা চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছেন। পেটেণ্ট ঔষধ যেমন বিজ্ঞাপনের দ্বারা দেশের মধ্যে কাটতি হয়, কলিকাতা হইতে সেইরূপ অনেক জিনিষ, বিজ্ঞাপনের দ্বারা চলিয়া যায়। খবরের কাগজ এই বিজ্ঞাপনের বাহন। খবরের কাগজে কোন্‌টি বিজ্ঞাপন আর কোন্‌টি সম্পাদকীয় মন্তব্য, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মানুষ মানুষকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এই উপায়গুলি প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী করা হইয়াছে। বিদেশী মাল, কলিকাতার ন্যায় সহর হইতেই গ্রামে আসিয়া থাকে। কলিকাতা হইতে সাহিত্য, যদি গ্রামের দিকে আসে, তাহা হইলে ঐ মালের সহিত, আমাদের বিবিধরূপ বিড়ম্বনাও আসিবে—একথা দেশের সকলেই বোঝেন। কিন্তু, এই কথা অনুসারে কায হয় না। তাহার কারণ, আমাদের দেশে মফঃস্বলে সকল বিভাগেই, কতক-গুলি দালালশ্রেণীর লোক আছে। কলিকাতার ব্যবসায়িগণকে সাহায্য করিয়া, অনায়াসে নিজের নিজের উন্নতি করাই, এই দালালদিগের ব্যবসায়। সাহিত্যক্ষেত্রেও এইরূপ দালাল আছে। তাহারা নিজেরা সাহিত্য-রসিক নহে—তাহাদের প্রভাবে নিকটবর্ত্তী লোকেরা প্রভাবান্বিত হয় না—তাহারা যে বিশেষ লেখাপড়া জানে, বা অতি সাধারণ লোক অপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চ, এরূপ মনে করিবার

কোন কারণ নাই। অথচ, খবরের কাগজে দেখিতে পাই, তাহারা কৃতবিদ্য ও যশস্বী। এই শ্রেণীর লোক, মফঃস্বলে বসিয়া, বড় বড় ব্যাপার লইয়া ব্যবসায় করে। তাহারা যদি সাহিত্যসেবা করে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে সাহিত্য প্রচার হউক, সে জন্য চেষ্টা করে না, কোন প্রকারে কিছু টাকা কড়ি তুলিয়া, একটা হুজুক করিয়া, কলিকাতা হইতে কতকগুলি লোক আনিয়া একটি আড়ম্বরের দ্বারা দেশের লোকের চক্ষে ধূলি দিতে চায়। ইহাতে ঐ দালালদিগের লাভ হয়—তাহারা ঐ উপলক্ষে কতকগুলি নামজাদা লোকের সহিত পরিচিত হয়, খবরের কাগজে তাহাদের নাম জাহির হয়—এই প্রকারের একটা ফাঁকি, আমাদের দেশে চলিতেছে!

বড় বড় সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গেল—বহরমপুরে হইয়াছে, বর্দ্ধমানে হইয়াছে—সম্প্রতি মেদিনীপুরে হইয়া গেল। আপনারা কেহ ঐ সব স্থানে যাইয়া, নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন, বারইয়ারী আমোদ ছাড়া, ঐ সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা, কিছুই লাভ হয় নাই। অতিশয় ক্ষুদ্রচিত্ত লোক, নামের কাঙ্গাল, প্রশংসার জন্য লালায়িত, এতই তরল যে, নিজেকে চাপিয়া চলিতে জানে না—তাহারা আসিয়া বড় বড় সাহিত্যসম্মেলনে অযথা বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছে—ইহাই ত দেশের অবস্থা!

এই কারণে মফঃস্বলের লোকের উচিত, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা। কলিকাতার সহিত বিরোধ করিতে বলি না। কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপারে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বহু বহু বড় লোকের নামের জয়পতাকা উড়াইয়া যে সমুদয় আন্দোলন হয়, তাহা দ্বারা প্রকৃত কায খুব কমই হইয়া থাকে। খবরের কাগজে মিথ্যাকথা প্রচার করা হয়—কতকগুলি চতুর ও অযোগ্য লোক, ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সহায়তায়, নিজেরা প্রতিষ্ঠালাভ করে। স্বরূপে নগণ্য হইয়াও বিজ্ঞাপনের ডঙ্কানিনাদে গণ্যমান্য হইয়া উঠে।

এই সমুদয় কারণে, বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার স্বাধীনকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে মফঃস্বলে কায করিবে কে? সেরূপ স্বাধীনচিন্তা দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কোনরূপে যে চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারে, সে কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে। যাহার সে শক্তি নাই, সে লোক ভাড়া করিয়া, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশোলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতা দোকানদারের সহর—নালন্দা বা নবদ্বীপ নহে। সেখানকার জলবায়ুর গুণেই মানুষ ব্যবসাদার হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সব লোকের আনুকূল্যে মেকী চালাইয়া লওয়া বেশী কঠিন কায নহে। এই প্রকারের ফাঁকীও সাহিত্য রাজ্যে চলিতেছে! সাহিত্যের আন্দোলন করিয়া মফঃস্বল হইতে যদি এই ফাঁকি ও ব্যবসাদারী নিবারণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই।

আপনারা জানেন, বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা হইতে চাহে নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা সভার নিয়মাবলীতে লিখিত আছে যে, মফঃস্বলে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপিত হইতে পারিবে। আমরা নিয়মাবলীর এই ভাষা সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে—'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সফল করিতে হইলে, মফঃস্বলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত ভাবে আবশ্যক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন।' আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, দেশের মনোযোগ ও সামর্থ্য কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত হইয়াছে—সুতরাং কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ তাহা বলেন না। তাঁহারা বলেন—'আমরা কলিকাতায় যখন সভা করিয়াছি, তখন বাঙ্গলা সাহিত্যের আমরাই নিয়ামক; তোমরা মফঃস্বলের লোক,—আমরা দয়া করিয়া তোমাদিগকে অধিকার দিতেছি—তোমরাও সাহিত্য-পরিষৎ কর। অবশ্য আমাদের অধীন হইয়া থাকিবে—আমাদের কথা শুনিয়া চলিবে—এবং আমাদিগকে খাজনা দিবে।' ইহা যে একটা অত্যাচার! জানিনা, দেশের লোক, ইহার বিপক্ষে কেন কিছু বলেন না!

সাহিত্য পরিষদের উচিত ছিল, নিয়মিত-ভাবে সাহিত্য প্রচারক পাঠাইয়া মফঃস্বলে সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র স্থাপন করা। গাছ যেমন নিজের রস ও প্রাণশক্তি দিয়া, প্রথমাবস্থায় শাখা বিস্তার করে, চিরদিন সেই শাখাকে রস যোগায় এবং নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ধারণ করে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে সেইরূপ শাখা বিস্তার করিতে হইত। শাখা অবশ্য, বাহিরের আলো ও অঙ্গারক বাষ্প দিয়া বৃক্ষের পুষ্টিসাধনে অবহেলা করিত না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাহা করেন নাই। মফঃস্বলে স্বাধীনচিন্তা জাগরিত হইলেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনকেই হয়ত, সংশোধিত বা নিঃশেষিত হইতে হইবে। আজিকার সম্মেলনে, আপনারা এই বিষয়টি চিন্তা করুন।

আত্মনির্দ্ধারণ

আজকাল আত্মনির্দ্ধারণ বলিয়া একটা খুব বড় কথা বিদ্বৎ-সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মহাজাতি বা Raceকে, আত্মনির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, তাহার নিজস্ব সভ্যতার ও সাধনার বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিয়া অন্যান্য মহাজাতির সহিত আদান প্রদানের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহাজাতির পক্ষে যাহা সত্য, প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও তাহা সত্য। আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকেও নিজের বিশিষ্টতা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এতদিন সে বিষয়ে আমরা মনোযোগী হই নাই। আমাদের রচনা-রীতি ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রচনা-রীতি চলিতেছে, তাহা আমাদের বিশিষ্টতার কতখানি পরিচায়ক তাহা বলা যায় না।

বর্ত্তমান বাঙ্গলায়, অনেক সুপ্রসিদ্ধ লেখকের লেখা, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকে একেবারেই বুঝিতে পারে না। অথচ লেখক ও তাঁহার ভক্তেরা মনে করেন এবং প্রচারও করেন যে, ইহা সুবোধ্য "কথ্য"-ভাষায় লিখিত হইয়াছে! কিন্তু ভাল ইংরাজী-জানা লোক ছাড়া, সে ভাষা কেহই বুঝিতে পারে না। ইহা কি একটি বিসদৃশ ব্যাপার নহে? দেশের জনসাধারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পায় নাই। তাহারা ঠিক্ কিরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, গ্রামে বসিয়া, গ্রাম্যলোকের সহিত মিশিয়া ইহা যদি নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাধারণ জনশ্রেণীর যে বিষম ব্যবধান ঘটিয়াছে, তাহা দূর করিতে পারা যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই কঠিন সাধন-পথ পড়িয়া রহিয়াছে। মফঃস্বল হইতে, এই সাধনা আরব্ধ হওয়া আবশ্যক।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির (Race) সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রত্যেক জাতির অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার এবং সেই অনুভূতি ও চিন্তা, বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি ঠিক একরূপ নহে। একটি বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া, কে কোথায় বসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বক্তার মনে কোন্‌টির চিন্তা বেশী জোরে সর্ব্বপ্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারা যায়। যেমন, 'আমি ভাল করিয়া দেখিয়াছি'—এই একটি বাক্য। আবার নাট্যসাহিত্যে (in dramatic mood) বলা হইল—'দেখেছি গো দেখেছি, বেশ ভাল করে দেখেছি—আমি নিজে দেখেছি'। এই দুই প্রকারের বাক্য-প্রয়োগের পশ্চাতে বক্তার হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়ার বিশেষরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে কোন জাতির চিত্ত, ক্রিয়াকেই প্রধান রূপে দেখে, আবার কোন জাতির চিত্ত, স্বভাবতঃ কর্ত্তাকে প্রধানরূপে দেখে। কোনও জাতির ভাব-নিষ্ঠতা (subjectivism) অধিক, কোনও জাতির বস্তুনিষ্ঠতা (objectivism) বেশী। জাতীয় প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য, নানাবিধ কারণ-সমবায়ে গড়িয়া উঠে। সেই সমুদয় কারণের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য যে আছে, তাহা সাহিত্যের আলোচনায় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকার। বিশেষ করিয়া, আমাদের এই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐ বৈশিষ্ট্যের পরিচয়লাভ একান্ত আবশ্যক।

অনুভব-পদ্ধতি—জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষে উহা একান্তভাবে আবশ্যক কেন, তাহা আলোচনার বিষয়। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের ভারতবর্ষের যে কোনও সাহিত্যের তুলনা করুন। অবশ্য সাহিত্যের আলোচনা, সমগ্র জাতির জীবনেরই আলোচনা। ইংরাজ জাতির বা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস আমরা যতদূর জানি, তাহাতে দেখিতে পাই ইংরাজ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। নানাদেশের নানা জাতি, তাহাদের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও আচার লইয়া ইংলণ্ডে

ইংরাজী সাহিত্য বনাম ভারতীয় সাহিত্য

আসিয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে এবং ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও শোণিত-সংমিশ্রণের দ্বারা একটি জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রোমান্, কেল্ট, ডেন, এংগেল, নরম্যান, ফরাসী প্রভৃতি এই প্রকারে সংমিশ্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্যও ঠিক্ তাহাই। এই গঠন-কার্য্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার পর, ইংরাজের সম্প্রসারণ আরম্ভ হইল। এই সম্প্রসারণে ইংরাজের জাতীয় জীবন ও সাহিত্য, পৃথিবীর অতীতের ও বর্ত্তমানের, নিকটবর্ত্তী ও সুদূরবর্ত্তী যাবতীয় জাতির সাধনা ও চিন্তাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। গ্রীস, রোম, মিসর, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি অতীতের সুসভ্য জাতিসমূহ ব্যতীত, ফিজি প্রভৃতি অসভ্য দেশও এই সম্প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে। ইংরাজ জাতির এই যে ইতিহাসের ধারা, এই ধারার মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আসিয়া ইংরাজকে দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইয়াছিল—কিছু হারাইয়া ফেলিয়াছি, অতএব আর অগ্রবর্ত্তী না হইয়া, সেই হারানিধির অন্বেষণ করা প্রথম প্রয়োজন। এ প্রকার আন্দোলন যে ইংরাজী সাহিত্যে নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এই প্রকারের আন্দোলন কখন প্রয়োজনও হয় নাই, স্থায়িত্ব লাভও করে নাই।

এইবার আমাদের সমস্যা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা, অর্থাৎ পূর্ব্ব দেশের যাবতীয় প্রাচীন জাতিরা, যাহারা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি এবং আত্মপ্রকৃতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আবার গৌরব-শিখরে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, সেই সমুদয় জাতির বর্ত্তমান সময়ের প্রধান চিন্তাই এই যে, আমরা একটা বড় জিনিষ হারাইয়াছি—সেই হারানিধি সর্ব্বাগ্রে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ইহাই প্রথম কথা। পূর্ব্বদেশগুলি কিছু কাল, পশ্চিমের তাড়নায় বাহিত হইয়াছে, ইহা সত্য কথা। স্ব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও কিয়ৎ পরিমাণে হারাইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই সমুদয় দেশ, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আত্মনির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্যে এই চেষ্টা আবশ্যক। আমরা ইংরাজী লেখাপড়া বেশ ভাল রূপে শিখিয়া মাতৃভাষার অনুশীলন করিতেছি। ইংরাজী শব্দ ও বর্ণনা-প্রণালী প্রভৃতি আমাদের ভিতর অতিরিক্ত পরিমাণে রহিয়াছে। বিনা চেষ্টায় সেই সমুদয় জিনিষ বাঙ্গলা হরফে ও বাঙ্গলা কথায় বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হরফ ও কথা বাঙ্গলা হইলেই, তাহার প্রাণটা যে বাঙ্গলা, তাহা নহে। এখন সাহিত্যে বাঙ্গলার যাহা প্রাণ, তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই আত্মনির্ণয় উন্নতিমুখী গতির বিরোধী নহে—ঐকান্তিক স্থিতিশীলতাও নহে। গতি চাই, অগ্রবর্ত্তিতা চাই, পুষ্টি চাই, সমগ্র বহির্জ্জগৎকে আয়ত্ত করিয়া আত্মসাৎ করা চাই। কিন্তু প্রাণ-শক্তির জোর না থাকিলে, এই সমুদয় ব্যাপারগুলি একটি অসম্ভব বিড়ম্বনায় পরিণত হইবে। সুতরাং আমাদের বৈশিষ্ট্য-নির্দ্ধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে একান্ত ভাবে আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে এই বৈশিষ্ট্য

হারানিধির অন্বেষণ

অবধারণ করিয়া হারানিধির অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সাধন করিতে হইলে মফঃস্বলেই করিতে হইবে।

রচনারীতি বা style যে কত বড় জিনিষ, তাহা আমরা এখনও বেশ ভাল করিয়া আলোচনা করি নাই। সম্প্রতি গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী',-পত্রে "রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য" প্রবন্ধে এবং আমার 'সাগর-সুধা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়, এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধগুলিতে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নাই। আপনারা দয়া করিয়া যদি এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমরা বিশেষরূপ উপকৃত ও বাধিত হইব।

রচনা-রীতি

এই প্রকারে রচনা রীতি নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্যটী বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আবশ্যক। আত্ম-নির্দ্ধারণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের বা বাঙ্গলা ভাষার আত্মনির্দ্ধারণ যেরূপ আবশ্যক, তেমনি বাঙ্গলাদেশের এক একটি বিভাগেরও আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বীরভূমে যখন সাহিত্য-পরিষৎ হয়, তখন আর একটি কথা খুব জোরে বলা হইয়াছিল, বোধ হয় আপনাদের কাহারও কাহারও স্মরণ থাকিতে পারে। এই বীরভূম জেলার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ছোটনাগপুরের লৌহ ও প্রস্তরময় ভূখণ্ড এবং গঙ্গার অধিত্যকা—এই দুই প্রকারের ভূমি এই বীরভূমে সম্মিলিত হইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতার সম্প্রসারণের দিক হইতে দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গলা দেশে আর্য্য-সভ্যতার সম্প্রসারণে বীরভূমই আদি কেন্দ্র। হন্টার সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিভাগীয় আত্ম-নির্দ্ধারণ

বাঙ্গলা ভাষার আদি কবিগণ বীরভূমের লোক। বীরভূমই তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-সাধনার আদি লীলা-স্থল। রাঢ়ের সভ্যতা এই বীরভূম হইতেই তাহার বিশিষ্ট মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই বীর-ভূমের আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক বিভা-গের আত্মনির্দ্ধারণ প্রয়োজন। ইহা অবশ্য সাধনসাপেক্ষ এবং অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য এবং হয়ত এই কার্য্যের একটা চরম মীমাংসা নাই। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ হইতে এই কার্য্যের কথা বহুবার বহুভাবে বলিয়াছি, আপ-নাদের তাহাও স্মরণ থাকিতে পারে।

বীরভূমের আত্মনির্দ্ধারণ

বাঙ্গলা দেশের সমুদয় স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তা প্রভৃতি যদি কে পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে এক এক অংশের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা, তাঁহার মানসপটে জাগি উঠিবে। আত্মনির্দ্ধারণের জন্য এই প্রকারের পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপ্র স্থানের গ্রামসমূহ, আর বীরভূম জেলার গ্রামসমূহ এক রকমের নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সম্ব

একরূপ নহে। এমন কি, পল্লীবাসীর গ্রাম্য-সঙ্গীতের সুরও পৃথক; পোষাক পরিচ্ছদের ত কথাই নাই। এই সবগুলি বেশ প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। পর্য্যবেক্ষণ, সাহিত্য-সাধনায় অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা অধিক অগ্রসর হই নাই।

আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনী সংবাদ দেখিয়া বঞ্চিত হইবেন না। বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য জেলায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি কার্য্য হয় বা হইতেছে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের উপায়ও আমাদের আছে। আপনারা ভাবিবেন না যে, বীরভূম হইতে বর্ত্তমান যুগে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কোনও কাব হয় না। প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথি বীরভূম হইতে যত সংগৃহীত হইয়াছে, বাঁকুড়া ছাড়া অন্য কোনও জেলা হইতে তত হয় নাই। আমাদের 'রতন' লাইব্রেরীতে, ন্যূনাধিক চারি সহস্র হস্তলিখিত প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এই পুঁথির বিবরণমূলক বিস্তৃত সূচীপত্র একখণ্ড ছাপাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অনেকে বলেন—পুঁথিগুলি তাড়াতাড়ি ছাপাইয়া ফেলা আবশ্যক। আমরা ছাপাইবার পক্ষপাতী, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিবার পক্ষপাতী নহি। এত প্রাচীন পুঁথি রহিয়াছে—কিন্তু তাহা পড়েই বা কে, এবং পড়িতে চায়ই বা কে? আমরা মনে করি, সাহিত্যক্ষেত্রে মানুষ প্রস্তুত করা প্রধান কার্য্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বহু অর্থব্যয় করিয়া, বহু প্রাচীন গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন—সেগুলির দ্বারা উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমুদয় গ্রন্থ-প্রচারে, আর্থিক হিসাবে সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। প্রাচীন গ্রন্থ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের লোকের এই সমুদয় গ্রন্থ আস্বাদন করিবার শক্তিও যদি বাড়িয়া উঠিত, এই সমুদয় গ্রন্থের অনুশীলনের আবশ্যকতা যদি দেশের লোক বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে এই সমুদয় গ্রন্থ-প্রচারে, আর্থিক হিসাবে ক্ষতি হইবে কেন? অবশ্য এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা অল্প লোকেই পড়িবার অধিকারী। সে সমুদয় গ্রন্থ প্রচারে আর্থিক ক্ষতি স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদয় গ্রন্থ সম্বন্ধে ইহা সত্য নহে। আমাদের এই গ্রন্থগুলি, আশা করি অচিরেই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, এই সমুদয় গ্রন্থের প্রতি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা আশা করি, এই সম্মেলনের দ্বারা ক্রমশঃ অনুরাগ বাড়িয়া যাইবে। তখন এই সমস্ত গ্রন্থ-প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। সমুদয় কার্য্যই ভিতর হইতে, বা ভাবের দিক্ হইতে হওয়া আবশ্যক। আমরা সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি যে জীবনের উন্নতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, সে-কথা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের উন্নতি হউক—আমাদের মানস-জীবন সম্প্রসারিত হউক—উন্নততর চিন্তারাজ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, আমরা প্রকৃত আত্মোন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করি—ইহাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত। নতুবা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে

আমাদের কার্য্য প্রাচীন পুথি

ব্যবসায় বুদ্ধি ও নানা রূপ কৃত্রিম চাতুরী প্রবেশ করিয়া দেশের উপকার না করিয়া, অপকার করিবে।

বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে যাহা বলিবার, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। এখন, আধুনিক নাগরিক-সাহিত্য বা ঔপন্যাসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিতে চাই।

যাঁহারা বর্ত্তমান সাময়িক-সাহিত্যের বাদানুবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন যে, কিছুদিন হইতে আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে।

উপন্যাস

নারীচরিত্রই এই বাদানুবাদের বিষয়। বিলাতী স্বাধীন-প্রেম যেদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে বাদানুবাদের সৃষ্টি। যাঁহারা কলিকাতা সহরে থাকেন, প্রাচীন সমাজের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া নূতন রকম করিয়া নিজেদের সমাজ গড়িয়াছেন, অথবা যাঁহারা ঐ প্রকারের নব্য-সমাজের সংসর্গে আসিয়া, ঐ প্রকারের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন,—আমরা গ্রামের লোক, গ্রাম্য-সমাজ ও গ্রাম্য-জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল যুগে গ্রামের লোকেরাই উচ্চতর চিন্তা করিয়া থাকে। নাগরিক জীবন, উন্নততর ও গভীরতর চিন্তার অনুকূল নহে—বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে, তপোবনেই জ্ঞানের জন্ম হইয়াছে, আর সভ্যতা গ্রামকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আধুনিক উপন্যাসের প্রেমচিত্র সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম্য-বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, তাহা নিবেদন করিতেছি। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ, মানব-জীবনে একটি অতি প্রধান ব্যাপার। এই সম্বন্ধের সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়া, মানুষ দেবত্বে আরোহণ করে; আর অপব্যবহার হইলে, মানুষ ক্রমে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ ও পশু হইয়া যায়। ভারতবর্ষ এই অভিজ্ঞতা বহুযুগ পূর্ব্বে লাভ করিয়াছে। ইউরোপের জাতিসমূহ নিতান্তই আধুনিক। তাহারা অতি অল্পদিন পূর্ব্বে দল বাঁধিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত। গৃহহীন ও অন্নহীন—সুতরাং সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্য জীবন তাহাদের ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমুদয় চঞ্চলমতি ও জীবিকান্বেষণে পশুর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান নরনারীকে সুসম্বদ্ধ গার্হস্থ্যজীবনে ও সুশৃঙ্খলিত সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক ছিল।

পুরুষের নারীর প্রতি আকর্ষণ হয়—নারীরও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ হয়। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এই আকর্ষণ, নিম্নতম স্তরে সাময়িক সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; ইহা কোনও স্থায়ী ফল উৎপাদন করে না। তাহার পর এই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থায়ীত্ব লাভ করে। তখন পুরুষ বা নারীর, সাময়িক দেহগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখ সম্ভোগই এই মিলনের ফল বলিয়া মনে হয় না—পুত্রকন্যা প্রতিপালন প্রভৃতি স্থায়ী কার্য্য অবলম্বন করিয়া এই মিলন বা সম্বন্ধ মার্জ্জিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে

Gradual Idealisation বলে। ক্রমশঃ এমন দিন আসিতে পারে যখন, দৈহিক লালসা একেবারেই থাকে না, অথচ, উভয়ের মিলন অতিশয় মধুর ও গভীর হইয়া থাকে। সহধর্ম্মিনীত্ব এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ইংরাজীর Transmutation। আমরা পুরাণাদির সাহায্যে আমাদের ভারতীয় সামাজিক অভিব্যক্তির বিবরণ যদি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, একদিন আমাদের দেশে পৈশাচিক, রাক্ষস, ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল। তখনও আমাদের সমাজ হয়ত সুব্যবস্থিত হয় নাই, অথবা অন্যান্য সমাজকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, এই প্রকারের কতকগুলি অব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু, সে বহু বহু অতীতের কথা। এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন প্রজাপতির আদেশেই হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী, সংযম অভ্যাস করিবে। যে সংযত নহে, সে ভদ্রলোকই নহে, অধিকন্তু সে মানুষই নহে। সংযত পুরুষ ও নারী, পরস্পর মিলিত হইবে; কিন্তু নিজেদের দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সুখসাধনের জন্য নহে—বংশ রক্ষার জন্য, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ধারা রক্ষা করিবার জন্য।

ভারতবর্ষ, বহুযুগের বহু প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, মানব-জীবনের এই চরম ও পরম শিক্ষা পাইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার হস্তেই বিবাহের ভার থাকিবে, মনোভবের উপর এ ভার থাকিবে না, ইহাই ভারতবর্ষের সাধনার শেষ কথা। ভারতের ও প্রতীচ্য জগতের ইতিহাস ও সমাজ তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব।

এইবার চিন্তা করুন—আমরা, আমাদের সাহিত্য সাধনায় কোন্ দিকে অগ্রসর হইব? তরলমতি যুবক যুবতী, যাহারা শৈশব হইতে কোনরূপ সুশিক্ষা পায় নাই তাহারা ইন্দ্রিয়ভোগের যথেচ্ছাচার স্বভাবতঃ ভালবাসে। কিন্তু ইহা, কে ভালবাসে? ভারতবর্ষের শাস্ত্র বলিবেন—যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি ইহা ভালবাসিতে পারেন না। মানুষের মধ্যে যে পশু রহিয়াছে, সেই পশু ইহা ভালবাসে। আমরা, আমাদের সাহিত্যদ্বারা, মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভূত এই পশুগুলিকেই কি বলবান করিয়া যথেচ্ছাচারের পথে ছাড়িয়া দিব? না, এইগুলিকে শাসন করিয়া, সংযত করিয়া, আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিয়া, ত্যাগ ও অহিংসার পথে অগ্রসর হইব? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই প্রকৃত মীমাংসা রহিয়াছে।

আমাদের দেশে এখন ভোগবাদীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাঁহারা বলিবেন—তোমরা ভোগের পথ বন্ধ করিয়া মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছ। সেই কারণেই তোমাদের এই দুর্গতি। এতদিন ভোগবাদীরা নির্ভয়ে একথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে,—এই বুদ্ধ চৈতন্যের দেশে, আবার নূতন আদর্শের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকের বিমল-জ্যোতিঃ, পৃথিবীর অন্যান্য ভোগসর্ব্বস্ব দেশেও আজ উপস্থিত। সুতরাং ভারতের এই তপস্যা, বৈরাগ্য ও আত্ম-শক্তির বার্ত্তা নষ্ট হইবার নহে।

ঔপন্যাসিকগণ এই কথা মনে রাখিলেই, সাহিত্যের আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবে। কিন্তু দূরীভূত হওয়া কঠিন। কারণ, যাঁহারা গ্রন্থরচনা করেন, তাঁহারা সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেন কয়জন? তাঁহারা নাম চাহেন, অর্থ চাহেন। কাযেই মানবের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া, তাঁহারা খ্যাতি ও অর্থ অন্বেষণ করেন। ইহাই এখন সাহিত্যের অবস্থা। সুতরাং এই আবর্জ্জনা দূর করা বড়ই কঠিন।

আর এক কথা। এখন সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব (Capitalism in Literature) দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। যাহাদের টাকা আছে, তাহারা নিছক্ ব্যবসায় করিবার জন্য, ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য, সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। মূলধনীর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া লেখকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। বাজে ছবি, বাজে গল্প লিখিয়া সাধারণ তরলমতি পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। ইহারা দেশও জানেনা, সমাজও জানে না, ধর্ম্ম, মানবতা, বা ঈশ্বর জানেও না—বা মানে না!

সাহিত্যে মূলধনের প্রভাব

কলিকাতা সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র হওয়ায়, ও ক্রমে ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে মূলধনের বিনিয়োগ হওয়ায়, আমাদের এই সর্ব্বনাশ হইল! পূর্ব্বে যাঁহারা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র চালাইয়াছেন, তাঁহারা একটা বিশেষ রকমের আদর্শ বা প্রেরণা লইয়াই এইকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু এখন যে-কেহ, পয়সার জোরে কাগজ করিতেছেন। উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা বাড়িতেছে না, নবীন লেখকগণকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা নাই। একেবারে দায়িত্ববুদ্ধিহীন লোক, অর্থের জন্য বা নামের জন্য, সাহিত্যের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে!

সাহিত্য ও ধর্ম্ম—ইহার মধ্যে প্রভেদ খুব কম;—প্রভেদ নাই বলিলেই ভাল হয়। যেমন, ধর্ম্মের নামে মঠ-মন্দির করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করা একটা পাপ, সেইরূপ সাহিত্যের নামে, মানুষের কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন বা উত্তেজনা বিধান করিয়া, অর্থ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করাও একটি পাপ; এবং এই দ্বিতীয় প্রকারের পাপকেই আমি গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি। মফঃস্বলে সে সকল সাহিত্য সম্মেলন হইবে, সেখানে সাহিত্যিকগণ শান্তভাবে এই সমস্যার আলোচনা করিবেন—ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

এখন আমি যাহা বলিলাম তাহার সারমর্ম্ম এই—

সাহিত্য সাধনা মানবজীবনের পবিত্রতম সাধনা। ধর্ম্মসাধনার সহিত ইহার প্রভেদ নাই। সুতরাং, এই সাহিত্য-সাধনাকে উদ্দেশ্য বলিয়াই গ্রহণ করিব—অন্য কোন কিছুর উপায় বলিয়া নহে। সাহিত্যসেবীর চরিত্রই প্রথম ও প্রধান জিনিষ। ঋষি-জীবনের আদর্শ, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই পুরোদেশে অবিচলিত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক।

ধর্ম্মরাজ্যে যেমন আত্মশক্তির ভূমিতে দাঁড়াইয়া সাধন-পথে চলিতে হইবে, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি প্রত্যেক পদক্ষেপে ও প্রত্যেক উদ্যমে আত্মশক্তির ভূমি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। সুতরাং একালে যাহাকে ফ্যাশন বলে, অন্ধভাবে তাহার দ্বারা বাহিত হইলে চলিবে না। কলিকাতার লোকে কি বলে, কোন্ খবরের কাগজ কি বলে, বা নামজাদা লোকে কি বলে, সেদিকে চাহিলে চলিবে না। Idolaকে সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর গুরুরূপী ভগবান্ অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান্। তাঁহার প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া, সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। এই আদর্শ নূতন নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সাহিত্য-সাধনার এই আদর্শ বহু বহু যুগ পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে।

সুতরাং সাহিত্যে ব্যবসাদারী, চাতুরী, কাপট্য ও হুজুগ পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যারূপিণী ব্রহ্মময়ী সরস্বতী দেবীর যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা বাণীর উপাসক, তাঁহাদের গোষ্ঠী যাহাতে বৃদ্ধি লাভ করে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মফঃস্বলে সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া এই শুভকার্য্য সাধন করিতে হইবে।

সাহিত্য সাধনার পথে যাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হউন। Lord Macaulay বলিতেন—আমি যে লিখি, তাহার কারণ আমার মাথা বোঝাই হইয়া রহিয়াছে, পকেট খালি বলিয়া লিখিনা। ("I write not because my pocket is empty but because my brain is full.") অতএব যশের জন্য, অর্থের জন্য লিখিব না। যিনি সত্য, শিব ও সুন্দর তাঁহাকে উপলব্ধি করিব এবং বাহিরের অন্যান্য সকলের হৃদয়ে, মনে ও বাক্যে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করিব। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রও বহুকাল পূর্ব্বে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষকে জানিতে হইবে—বেশ ভাল করিয়া, ধ্যানযুক্ত হইয়া তাহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য জানিতে হইবে। এই বহুজাতির মিলনের দিন, বহুপ্রকারের আদর্শ ও সাধনার ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের দিন, ভারতবর্ষের সেই সনাতনী বাণী, ধ্যানযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুনিতে হইবে। নিজেদের বৈশিষ্ট্য যথাযথ রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধ হইব না। অন্যান্য দেশ ও অন্যান্য জাতির অতীতে ও বর্ত্তমানে যাহাকিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, বিচার পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব ও আয়ত্ত করিব। ইহাই সাহিত্য-সেবকের সাধনাদর্শ হইবে।

এই আদর্শ জয়যুক্ত হউক—বিশ্বমানবের উপাস্য পরমদেবতা যিনি শব্দ-মূর্ত্তিতে শাস্ত্ররূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মানবজাতিকে পরিচালনা করিতেছেন, সেই বেদপুরুষ ব্রহ্মণ্যদেব আমাদের সহায় হউন। আমরা সকলে সমবেত ভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছি।

[২]

এখন আমরা, সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য কয়েকটী আবশ্যকীয় কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৎসরে বৎসরে সাহিত্যিকগণ একত্র মিলিত হইয়া যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তাঁহ দের সেই আলোচনা পরিচালনা করিবার জন্য, একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচন করেন, তখন প্রথম

সাহিত্য-সম্মেলন

চিন্তা করিতে হইবে—এই সভাপতির কার্য্য কি?—সভাপতিরূপে তিনি কি করিবেন?

আমাদে এই সম্মেলন, এখন একটি সামান্য ব্যাপার; কিন্তু সামান্য হইলেও আমরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহা পরিচালনা করিব। আমরা যতই অযোগ্য অক্ষম হইনা কেন, আমাদের লক্ষ্য উচ্চ হওয়া আবশ্যক, সুতরাং সভাপতির নিকট কি আশা করা উচিত, প্রারম্ভে তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন কিছু দিন হইতে চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস। এই চারিটি বিভাগে চারিজন শাখা-সভাপতি কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদের অবশ্য জেলা-সম্মেলনে এখনও এই প্রকারের শাখা-বিভাগ প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু কালে প্রয়োজন হইতে পারে।

সমগ্র বঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি যে বিভাগের সভাপতি, সেই বিভাগে বাঙ্গালী জাতি এক বৎসরের মধ্যে কি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিবেন।

সভাপতির কর্ত্তব্য

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন কোনও দেশের সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সম্বন্ধহীন একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে—ইতিহাসে, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও বিশুদ্ধ সাহিত্যে—এক বৎসরে কি করিয়াছে, তাহা আলোচনা করার পর, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকে, এই এক বৎসরে বিশেষরূপে স্মরণীয় কি কি করিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ, আমাদিগকে যে বিশ্বমানবের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই।

এই দুইটি কার্য্য ছাড়া আরও একটি বৃহৎ কার্য্য রহিয়াছে। আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাতি—আমাদের অতীত, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ত্তমানের উন্নতিমুখী চেষ্টা ও সাধনা, আমরা যেমন জানিবার জন্য চেষ্টা করিব, সেইরূপ আমরা আমাদের অতীতকেও জানিবার চেষ্টা করিব। কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির শাস্ত্র, সমাজ এবং সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও উদ্যম উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া, পৃথিবীতে মনীষিগণের মধ্যে

একটি সুবিপুল চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ইহার পথ-প্রদর্শক। ইংলণ্ডের মনীষিগণও এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন—এখনও সেই চেষ্টার বিরাম নাই। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতবর্ষের অতীতকে জানিবার জন্য, এখন নবীন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন, ডাঃ ভাণ্ডারকার ও লোকমান্য তিলক হইতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক অনেক ভারতীয় মনীষী, এই বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছেন।

আমাদের অতীতকে গত এক বৎসরের মধ্যে, আমরা নূতন করিয়া কতটুকু বুঝিলাম এবং আমাদের অতীতকে বুঝিতে গিয়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির অতীত বা কতখানি স্পষ্টীকৃত হইল, বৎসর বৎসর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি কর্ত্তৃক তাহারও একটা হিসাব প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

সাধনার ত্রিধারা

তাহা হইলে আমরা এখন আমাদের সাধনার তিনটি ধারা পাইলাম। বর্ত্তমান এক বৎসরে আমরা কি করিলাম, বর্ত্তমান এক বৎসরে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কি করিল, আর আমাদের বিস্মৃত ও উপেক্ষিত অতীতকেই বা আমরা কতখানি আপনার করিয়া বুঝিলাম—এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গমই ভারতবর্ষের সাহিত্য-সাধনার পুণ্যতীর্থ হইবে।

কিন্তু যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি এই কার্য্য কি প্রকারে সাধন করিতে পারেন? তাঁহার অনুরাগ আছে, পরিশ্রম করিতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্তু উপকরণ কোথায়? সমবেত চেষ্টার এইখানে

সভাপতির কার্য্য-প্রণালী

প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেক জেলার সদরে কি এমন একটি পুস্তকাগার ও পাঠাগার স্থাপনা করা যায় না, যেখানে এই প্রকারে সাহিত্য-সাধনা করিবার উপকরণগুলি বৎসরের পর বৎসর সংগ্রহ করা যায়? আমরা অনেক সময় অনুভব করি যে ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক ও এখনকার দিনে জাপানী ভাষায় অভিজ্ঞ লোক, প্রত্যেক সাহিত্য অনুশীলনের কেন্দ্রে দুই একজন করিয়া থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহে অভিজ্ঞ লোক থাকা যে দরকার, তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, আমাদের একটি বিশেষ উপকার হইয়াছে যে, প্রত্যেক বৎসরে কয়েকটি করিয়া যুবক তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কেনেরিস, গুজরাটী, পালি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষা শিখিতেছেন। এই সমুদয় যুবকেরা যদি ঐ ঐ ভাষার চর্চ্চা রাখেন এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় কর্ম্মের অনুরোধে ছড়াইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে।

প্রত্যেক জেলারই সদরে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রহিয়াছেন। ইঁহাদের ভিতর হইতে এক একজন যদি ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক প্রভৃতি এক একটী ভাষা কিছু কিছু চর্চ্চা করেন, আর প্রত্যেক সদরে, পূর্ব্বে যে আদর্শ বলিলাম, সেই আদর্শ অনুযায়ী এক একটি করিয়া পুস্তকাগার ও পাঠাগার হয়,

আর জেলার মধ্যে গ্রামে বা মফঃস্বলে যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী এবং উন্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্য রচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যদি ঐ সহর হইতে গ্রন্থের ও শিক্ষকের সাহায্য পান, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যালোচনা সফলতা লাভ করিবে।

এই কার্য্যটী খুব কঠিন নহে। আমরা যখন বীরভূম সাহিত্যপরিষৎ করি, তখন অতি অনায়াসে বীরভূম টাউন হল লাইব্রেরীর নানারূপ সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে তথায় বাঙ্গলা পুস্তক একেবারেই ছিল না। সে সময়ে অতি সামান্য চেষ্টাতেই বহু বাঙ্গালা পুস্তক, টাউন হলে আমদানী করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া Theosophy ও New Thoughtএর অনেক পুস্তক আমদানী হইয়াছিল। অবশ্য এই চেষ্টা এখন আর কেন নাই, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনারা বৎসর বৎসর এই প্রকারের সাহিত্যসম্মেলন করিয়া, যদি চেষ্টান্বিত হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য আবার উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে।

আসল কথা, এই সমুদয় কার্য্যে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। আর সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইলে কেবল সমবেত হইলেই চলিবে না। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া কর্ম্মের আদর্শ ও চেষ্টা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা কি করিতে চাই, কি করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে একটা সুমীমাংসায় যাঁহারা উপস্থিত হন নাই, তাঁহারা কেবল মাত্র সমবেত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। এই প্রকারের সমবায়ের দ্বারা যাহা হয়, গীতা তাহাকে 'বিকর্ম্ম' বলিয়াছেন।

সমবেত চেষ্টা

আমি সিউড়ী সহরে বসিয়া আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল, আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে ঝাড়ুদারি করিতেছি। আমাকে যে সমুদয় অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহা যদি বিস্তৃত রূপে কখনও বলিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বুঝিতে পারিবেন, মফঃস্বলে সত্য সত্য সাহিত্যপরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কি কি কার্য্য করা উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে উন্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে, প্রতিদিন যে সমুদয় গ্রন্থের আবশ্যক হয়, তাহার মূল্য এতই বেশী যে, একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থ (Comparative Philology) তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব (Comparative Mythology) প্রভৃতির মূল্য কত! অথচ, এই সমুদয় গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া, ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, তাহা একেবারে গ্রহণীয় হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে দেশ-বিদেশে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, সে গুলিরই বা মূল্য কত! কলিকাতায় নানারূপ সুবিধা আছে। কিন্তু মফঃস্বলে বসিয়া যাঁহারা

সাহিত্যালোচনা করিবেন, তাঁহাদের উপায় কি? অথচ, আমরা ক্রমশঃই বুঝিতে পারিতেছি এবং সাহিত্য-সাধনার আদর্শ-আলোচনায় আমি সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, মফঃস্বলে সাহিত্য-সাধনার স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে এবং সাহিত্য-সেবকগণ বর্ত্তমান সময়ের নিম্ন ব্যবসায়-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, ত্যাগ ও সেবার পথে আসিয়া না দাঁড়াইলে, আমাদের প্রকৃত কল্যাণের আশা নাই।

অতএব মফঃস্বলে যাহাতে এই প্রকারের সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র অচিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই কেন্দ্র হইতে, আলোক ও স্বাস্থ্য, সমগ্র জেলার গ্রামে গ্রামে, পল্লীবাসী দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে সংক্রামিত হয়, আপনারা সমবেত ভাবে, তাহার ব্যবস্থা করুন। আমি অতি সামান্য লোক হইলেও, এই উপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে। আমি আমার একক চেষ্টায়, একমাত্র ভগবানের প্রতি চাহিয়া, নিজে দারিদ্র্য ক্লেশ যথেষ্ট পরিমাণে সহ্য করিয়াও, সিউড়ী সহরে একটী সামান্য পুস্তকাগার গড়িয়া তুলিয়াছি। যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে নানা জেলায় পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা বলেন—এই প্রকারের পুস্তকালয় বাঙ্গলায় অধিক নাই।

মফঃস্বলে সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্র

লাইব্রেরী করা, অনেক জায়গায় ফ্যাশন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফ্যাশন হইলে, প্রকৃত কার্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রথমে চাই মানুষ, তাহার পর কর্ম্ম। যেখানে মানুষ নাই, সেখানে কর্ম্ম করিয়া কি হইবে? উষর ক্ষেত্রে বীজ বপন ও ভস্মে ঘৃতাহুতি পণ্ডশ্রম মাত্র।

আমাদের যেমন তেমন গ্রন্থাগার হইয়াছে। কিন্তু এখন পড়িবার লোক কৈ? বাজে গল্পের বহি বা নূতন ছবিওয়ালা মাসিক কাগজ লইয়া যাইবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু গভীর ভাবে কোন বিষয়-বিশেষের অনুশীলন করিবার মত লোক, একেবারেই দুর্লভ। এই প্রকারের সাধু প্রকৃতি-সম্পন্ন পাঠক পাইলে আমরা কষ্ট করিয়াও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতাম। কিন্তু সে প্রকারের পাঠকের বড়ই অভাব। গ্রামে গ্রামে সাহিত্য সম্মেলন করিয়া, গভীরভাবে সাহিত্যালোচনা করিতে ইচ্ছুক এবং কতকটা নিষ্কামভাবে এই পথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত—এই প্রকারের লোক যদি আপনারা দু'একজন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের অতি মহৎ উপকার হয়।

আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এই প্রকারের লোকের অভাব হইবে না। আমাদের বীরভূম জেলা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও অনেক বিষয়ে ভাগ্যবান। আমরা অনেকেই এখনও গ্রামে বসিয়া মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট আছি। আধুনিক নাগরিক জীবনের বিলাস ব্যসন যদিও প্রচণ্ড বেগে নানা প্রকারে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, তথাপি আমরা কলিকাতার অতি-নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মত একেবারে 'পরাজিত' হই নাই। আমাদের গ্রাম্য জীবন এখনও রহিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই জীবন আমাদের চিরস্থায়ী হউক।

উচ্চ চিন্তা করিতে হইলে মোটামুটিভাবে দিন যাপন করা প্রয়োজন, ইহা আপনারা জানেন।

Plain living and high thinking আমাদের বালককালের মুখস্থ করা কথা। ভারতবর্ষ এই পথেই অমরতা লাভ করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় আমাদের এই পথ অক্ষুণ্ণ থাকুক। কিন্তু আমরা স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, সাহিত্যালোচনার সামান্য বাতাস পল্লীগ্রামের কোনও লোকের গায়ে লাগিলে, প্রথমেই তাহার চাল বিগড়াইয়া যায়। সে কলিকাতায় হাঁটাহাটি করে। কি করিয়া নাম বাহির হইবে, সেই জন্য মাথা খোঁড়াখুড়ি করে—তাহার পর দুই একজন কৃতীলোকের দুয়ার ধরিয়া, যদি একটু নাম হয়, তাহা হইলে চাঁদা তুলিয়া মোটর গাড়ী চড়িতে বা সিগারেট খাইতে শেখে।

সমবেত সাহিত্যান্দোলন করিয়া যদি মফঃস্বল হইতে এই প্রকারের লোক প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ মানুষের চরিত্রের উন্নতি হইল না—সামান্য কলমবাজী, আর তাহার সহিত লোক ঠকাইবার উপায় জ্ঞান—ইহাই যদি দেশের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মেলনকে একটি সংক্রামক ব্যাধি বলিতে হইবে এবং এই সংক্রামক ব্যাধি আমাদের এই গরীব জেলায় না আসাই ভাল। অবশ্য এইরূপ যে হইবেই বা হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি না। তবে, একটা বড় কাজ করিতে গেলে অনেকদূর চিন্তা করিতে হয়। দেবতা পূজার মন্দির গড়িবার সময়, অপদেবতা বা উপদেবতার আক্রমণ হইতে মন্দির রক্ষা করিবার জন্যও ব্যবস্থা করিতে হয়।

মফঃস্বলে সাহিত্যের কেন্দ্র কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। বীরভূমে অনেক সাহিত্যানুরাগী লোক আছেন এবং বড় লোক না হইলেও, সাহিত্যের জন্য কিছু কিছু ব্যয় করিতে পারেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। আমি আশা করি, আধুনিক ও আবশ্যক গ্রন্থ সমূহ যাহাতে সংগৃহীত হয়, এই সম্মেলন হইতে তাহার ব্যবস্থা হইবে।

সভাপতির কার্য্য কি, তাহা বলিয়াছি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় মফঃস্বলে বসিয়া একটী বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য তাহাও বলিয়াছি। আমি কিছুদিন সময় পাইলে হয়ত, অতি সামান্যভাবে একটা নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম। কিন্তু সময়াভাবে তাহাও পারি নাই।

বর্ত্তমান যুগে উচ্চশ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন যে, উপন্যাসই সর্ব্বোত্তম সাহিত্য; এখন উপন্যাসের যুগ চলিতেছে। ইহার পূর্ব্বে নাটকের যুগ, তাহার পূর্ব্বে মহাকাব্যের যুগ ছিল। সাহিত্যের এই যে যুগ-বিভাগ, ইহা অবশ্য বিদেশীয় সমালোচকগণের নিকট আমরা পাইয়াছি। সাহিত্যের যুগের সহিত সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তনেরও সম্বন্ধ আছে—একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

উপন্যাস বাহুল্যের অবাঞ্ছনীয়তা

ইংরাজী সমালোচক যখন বলিলেন—বর্ত্তমান যুগ উপন্যাসের যুগ, তখন আমাদিগকে যে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে—ইউরোপের সমাজের বা জন-

সাধারণের যে অবস্থা, আমাদের অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকারের হইয়াছে কি না? হয়ত কেহ কেহ বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে সেই অবস্থা লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জনসাধারণ ঠিক্ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যের তুলনা করিলে প্রথমেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সমালোচনা করিয়া একটা জিনিষ বুঝিবার যে সামর্থ্য ইংরাজের হইয়াছে—সমালোচনা করিয়া নিজের স্বাধীন মত গঠন করিবার যে অভ্যাস সাধারণ ইংরাজের জন্মিয়াছে, আমাদের এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের অসদ্ভাব বশতঃই, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও এই সমালোচনা-শক্তি ও স্বাধীন ভাবে মত গঠনের সামর্থ্য, আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠিল না! লর্ড মর্লের গ্রন্থাবলী যদি উত্তমরূপে আমাদের সাহিত্য-সংঘ সমূহে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আমার কথা প্রমাণিত হইবে।

সমালোচনা বৃত্তির অভাব

আজকাল অনেকে বাহিরের জিনিস লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন—আমাদের কি কিছুই নাই যে বিদেশের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিয়া আমরা শিক্ষালাভ করিব? আমাদের যে কিছুই নাই তাহা নহে—যথেষ্টই ছিল, এবং যথেষ্টই আছে। কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষেই হউক, আর ভগবদিচ্ছাতেই হউক, যাহা কিছু উচ্চ ও মঙ্গলকর, একদিন তাহা হারাইতে বসিয়াছিলাম। সেই জড়তার অবস্থায়, বাহির হইতে ধাক্কা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। একটা সামান্য উদাহরণ দেখুন—রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যখন সহমরণ লইয়া আন্দোলন হয়, তখন পণ্ডিতেরা সহমরণের সমর্থনে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই মন্ত্রটিকে মানিয়া লইয়া তর্ক করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে, আচার্য্য মোক্ষমুলারের চেষ্টায় যখন ঋগ্বেদীয় প্রাচীন পুঁথিসমূহ সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইল, তখন দেখা গেল যে ঐ মন্ত্রটির পাঠে ('অগ্রে' স্থলে 'অগ্নে') এমন ভাবে পবিবর্ত্তন করা হইয়াছিল যে, তাহার যাহা প্রকৃত অর্থ, ঠিক্ তাহার বিপরীত অর্থ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মনীষী কোলব্রুকও ইহা ধরিতে পারেন নাই! কিন্তু ইহা এখন ধরা পড়িয়াছে।

প্রতীচ্যের সহায়তার আবশ্যকতা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চেষ্টায় বেদ প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের যে আলোচনা হইয়াছে, তাহার সমুদয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহাদের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা না করিলে আমরা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। মোক্ষমুলরের অনুবাদের ভুল অনেকেই দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য ও তাহার ব্যাকরণ পাঠ করিয়া, তিনি যে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তুলনামূলক পুরাণতত্ত্বের আলোচনা করিয়া তিনি হিন্দু-আর্য্য (Indo-Aryan) জাতি সমূহের প্রচলিত ভাষার মৌলিক ধাতুগুলির যে রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কত জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা বলিয়া

শেষ করা যায় না। সুতরাং প্রতীচ্যের সাহায্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাদিগকে সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমাদের অপকার হইবে না—প্রত্যুত, বিশেষ উপকার হইবে।

যাঁহাদিগকে Orientalist বলে—অর্থাৎ যে সমুদয় পাশ্চাত্য মনীষী, পূর্ব্বদেশের শাস্ত্র সমূহ উত্তমরূপে আধুনিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের গবেষণার সহিত আমাদের উত্তমরূপ পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমাদের মহাভারত বা বেদান্ত লইয়া নব্য জার্ম্মাণী যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছে, আমাদের তন্ত্র লইয়া মার্কিণদেশে যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার শতভাগের একভাগও আমরা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি নাই!

অনেকে বলেন—অর্থের অভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, আমাদের এই পরাজয়ের কারণ। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। সুতীব্র ইচ্ছা থাকিলে, সমবেত চেষ্টা থাকিলে, মানুষ কি না করিতে পারে? আজ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কাল তাহা সম্ভব হইবে। স্বর্গীয় হরিনাথ দে'র মত বহুভাষাবিৎ বর্ত্তমান পৃথিবীতে কয়জন জন্মিয়াছেন? তিনি অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আমাদের মহা দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁহার জীবনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী জাতির যে প্রতিভা আছে, তাহার আলোকে কেবল বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবী উপকৃত ও আলোকিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী আমাদের জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা আমাদের অতীব সৌভাগ্যের কথা। বিশ্ব-ভারতীর ন্যায় প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আমরা প্রথম যৌবন হইতেই দেখিয়াছি। আজ রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই সুখস্বপ্ন সফল করিয়াছেন। তিনি ব্যতীত এ কার্য্য করিবার যোগ্যতা বা আর কাহার আছে? আমাদের বীরভূমে—জয়দেব চণ্ডীদাস ও নিত্যানন্দের দেশে—বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যেন এই বিশ্বভারতীর সহিত সংসৃষ্ট হইয়া সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সমালোচনীবৃত্তি সুবিকশিত না হইলে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য না জাগিলে, ঔপন্যাসিক সাহিত্যের বাহুল্য জাতির পক্ষে হিতকর নহে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এখন উপন্যাসেরই ছড়াছড়ি! তরলমতি যুবক আর অল্পশিক্ষিতা অলসস্বভাবা যুবতীরা এই সমুদয় গ্রন্থের গ্রাহক ও পাঠক। আমি ইহা বড়ই অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করি। বিলাতে বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, উপন্যাস-সাহিত্যের বাহুল্য দেখাইয়া যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদ করিবেন,

উপন্যাস-বাহুল্য

তাঁহাদের প্রতি আমার যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আপনাদিগকে আমার মত মানিয়া লইতে হইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে দেশের ও সমাজের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপনারা নিজ নিজ মত গঠন করিবেন—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্য-সম্মেলন চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে। দার্শনিক শাখা

দার্শনিক শাখা

ইহার মধ্যে অন্যতম। দার্শনিক শাখার যিনি সভাপতি হইবেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সদ্বৎসরের দার্শনিকী চিন্তা কি পরিমাণে উদ্বুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। বর্ত্তমান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিকী সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁহার নিকট আশা করি। ইংরাজী ভাষায় যে সমুদয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হয়, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া পড়িলেই গুণবান্ ব্যক্তি, এই কার্য্য অনায়াসেই করিতে পারেন। নীতিবিজ্ঞান বা Ethics সম্বন্ধে ত্রৈমাসিক কাগজ আছে—মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মাসিক কাগজ আছে। তাহা ছাড়া, হিবার্ট জর্ণ্যাল প্রভৃতি দার্শনিক পত্রিকা সকলেরই পরিচিত। মফঃস্বলে বসিয়া ঐ সমুদয় কাগজ নিয়মিতভাবে সংগৃহীত করা এক ব্যক্তির পক্ষে কঠিন। কিন্তু সমবেত চেষ্টা থাকিলে, একটা ব্যবস্থা বা organisation থাকিলে, ইহা সহজ হইয়া পড়ে। কেবল যে কাগজগুলিই আনা যায় তাহা নহে—দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া যাঁহারা ওকালতী বা শিক্ষকতা করিতেছেন, এবং দিনের পর দিন যাঁহাদের বিদ্যার মরিচা পড়িয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগকে খাটাইয়া এই সব জিনিষ পড়াইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে এই সকলের সারমর্ম্ম আমরাও মোটামুটি জানিয়া লইতে পারি।

সম্প্রতি দেখিলাম, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় মূল গ্রীক হইতে গ্রীসীয় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি বা cultureএর সহিত, গ্রীসীয় সংস্কৃতির সুনিপুণ তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা বড়ই প্রশংসার কার্য্য হইয়াছে। "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ উপযোগী। তিনি আধুনিক দর্শনশাস্ত্র সমূহ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং একালের লোক যাহাতে বুঝিতে পারে, ঠিক সেই ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় প্রচার করিতেছেন। পূর্ব্বে (অধুনা পরলোকগত) ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নব্য বাঙ্গালীর দার্শনিকী প্রতিভার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু তিনি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিও নব্য বঙ্গের দার্শনিকী চিন্তায় উচ্চশ্রেণীর দান। যাহা হউক, পূর্ব্বতন মনীষিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আমার সময়ও নাই, সামর্থ্যও নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদ ও বিজ্ঞান' বিষয়ক প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপনিষদ্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ে দর্শন বলিতে অনেক জিনিষ বুঝায়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বা জন ষ্টুয়ার্ট মিলও দার্শনিক, আবার কেয়ার্ড, গ্রীণ প্রভৃতিও দার্শনিক। কিন্তু দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে ইঁহাদের সংজ্ঞাই বিভিন্ন

প্রকারের। আমরা কিন্তু কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। যিনি প্রত্যক্ষবাদ বা Positivism প্রচার করিতেছেন তিনিও দার্শনিক, আবার যিনি বাস্তব প্রয়োজনবাদ বা Pragmatism প্রচার করিতেছেন তিনিও দার্শনিক। যিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের (Experimental Psychology) প্রচারক তিনিও দার্শনিক। কিন্তু আমরা আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্র বলিলেই, পরমার্থ তত্ত্বের আলোচনা বুঝিয়া থাকি। বর্ত্তমান কালে দর্শন বলিতে কি বুঝায়, তাহাও জানা দরকার। কেবল প্রাচীন দর্শনের স্বপক্ষে দুই চারিটি কথা বলিলেই, দার্শনিক বিভাগের সভাপতির কার্য্য করা হইবে না।

আমাদিগের সমবেত সাহিত্যান্দোলন, দার্শনিক বিভাগে যদি কিছু সত্য সত্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস, যাহা প্রতীচ্য জগতে নূতন নূতন মনীষী কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছে, সেই সমুদয় ইতিহাসের সহিত আমাদের দেশবাসিগণের যাহাতে পরিচয় হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইংরাজী ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। অনেকে পরীক্ষা দিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভও করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যার দ্বারা, দেশের বিশেষ কোন কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদিই বা হইতেছে, তাহা এতই অল্প পরিমাণে হইতেছে যে ধর্ত্তব্য নহে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত বিদ্যাকে পরিপূরণ করিবার চেষ্টা, আমাদের সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইংরাজী ভাষায় মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সধারণ দর্শন, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করেন। তাহা ছাড়া সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিরও আলোচনা হয়। হয়ত এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, এই সমুদয় বিষয়ের বাঙ্গালা ভাষায় পঠন পাঠন চলিবে। কিন্তু এতদিন তাহার সূচনা হওয়া উচিত ছিল। সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এই সমুদয় বিষয়ের কি বক্তৃতা করাইতে পারেন না? অবশ্য কলিকাতার সে প্রকার বক্তৃতা নহে—যাহার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, যাহা শুনিতে বড় কেহ যায় না এবং যদিই বা কেহ যায়, তাহা হইলে অধিকক্ষণ থাকে না—এবং থাকিলেও হয়ত কিছু পায় না। কিন্তু খবরের কাগজে যখন খবর বাহির হইয়াছে, তখন সেই বক্তৃতার যাঁহারা ব্যবস্থাপক, তাঁহারা অম্লানবদনে চাঁদার খাতা লইয়া বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তির দুয়ারে যাইতে পারেন। আমি এ-প্রকারের বক্তৃতার কথা বলিতেছি না! সত্যকার বক্তৃতা—যাহা হৃদ্য, শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষক—এই প্রকারের বক্তৃতার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে ছাত্রগণেরও উপকার হয়, আর দার্শনিকী চিন্তা দেশের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।

আমাদের সাহিত্যান্দোলনের আর একটি লক্ষ্য থাকা উচিত। যাঁহারা আধুনিক উচ্চশিক্ষা

পাইতেছেন, তাঁহাদের সহিত সেকালের প্রাচীন বিদ্যায় যাঁহারা কৃতবিদ্য, সেই সমুদয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মানসিক ব্যবধান, দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন বিদ্যার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, উপাধিধারী পণ্ডিতের সংখ্যা বাড়িতেছে। অনেকে পাঁচটা বা সাতটী উপাধি লাভ করিতেছেন। সংস্কৃত বিদ্যার এই প্রসার অবশ্য সুখের বিষয় বটে। কিন্তু বিদ্যার গভীরতা ক্রমেই যেন লুপ্ত হইতেছে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! আমাদের বীরভূমে এখনও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম ন্যায়তীর্থের ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিত রহিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিতগণের শাস্ত্রজ্ঞান বিস্ময়াবহ। কিন্তু এই শ্রেণীর পণ্ডিত অধিক দিন আমাদের দেশে থাকিবেন না। এই প্রকারের পণ্ডিত রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুসমাজের কার্য্য, সাহিত্য-সম্মেলন বা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য নহে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদ বা সাহিত্য-সম্মেলন যদি সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণের নিকট, একালের বিদ্যার আলোক কিয়ৎ পরিমাণে লইয়া যাইতে পারেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের সমক্ষে সেকালের বিদ্যার কিরণ, যদি কিয়ৎপরিমাণে ছড়াইয়া দিতে পারেন—এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণকে যদি মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইবার ও সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবের আদান প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা অচিরেই তিরোহিত হয়। জাপানে এক সময়ে প্রাচীন-পন্থী ও নব্য-পন্থীর ভিতর এই প্রকারের ব্যবধান জন্মিয়াছিল এবং সেই ব্যবধান দূর করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। জাপানে নিদাঘ-বিদ্যালয়ের (Summer School) প্রবর্ত্তনের দ্বারা এই ব্যবধান দূরীকৃত হয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালের বিদ্যা যে সমুদয় স্থানে আলোচিত হইয়া থাকে, সেই সমুদয় স্থানে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কিছুদিন করিয়া থাকিয়া যদি কিছু পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে উভয়দিকেই সুবিধা হয় এবং আমাদের জ্ঞানরাজ্যেও যথার্থ উন্নতি হয়।

প্রাচীন ও নব্যপন্থী শিক্ষার্থীর মিলন

এইবার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সমবেতভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহারা অনেক সময়ে অসতর্ক ভাবে, নানারূপ হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে প্রচার করিয়াছেন। অনেকে আমাদের সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিবার জন্যই যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এ সমুদয় কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেক সাধুপুরুষ রহিয়াছেন, তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অতীব প্রশংসনীয়।

ইতিহাস-শাখা

এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই, আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনা একরূপ চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও এই বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যালোচনার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের ইতিহাস

আলোচনা করিয়া একটী মীমাংসায় উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া আমাদের এই হতভাগ্য দেশে, ইহারই মধ্যে দলাদলি ও গালাগালির সূত্রপাত হইয়াছে। সত্য নির্দ্ধারণ যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মতভেদের জন্য মৈত্রীর অসদ্ভাব হইবে কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা বা ধনবান ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতা হইতেই স্থায়ী দলাদলির জন্ম হয়। যেখানে পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশা নাই, সেখানে বোধ হয় দলাদলি হয় না।

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকল সময়েই যে একটা মীমাংসা পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। মীমাংসার জন্য আলোচনা নহে—আলোচনার জন্যই আলোচনা। মানুষের মধ্যে অনেকগুলি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্যই মানুষ শাস্ত্রচর্চ্চা করে। মানুষের একটি বৃত্তির নাম—ঐতিহাসিকী বৃত্তি (Historical Sense)। এই বৃত্তির অনুশীলন আবশ্যক। বর্ত্তমানের যে কোন সমস্যা যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে, এই বৃত্তির যথাযথ প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু অনুশীলন না করিলে এই বৃত্তির বিকাশও হইবে না এবং আমরা ইহার যথাযথ প্রয়োগও করিতে পারিব না। অতীতের ইতিহাসে, মীমাংসার যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে; তবে এ জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে উন্মুক্ত সমস্যা (বা Open question) বলে, তাহা সকল সময়েই থাকিবে। কাজেই ঐতিহাসিক আলোচনায় ধৈর্য্য ও মত-সহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি সত্যনিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা বড়ই অহিতকর—সুতরাং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

বর্ত্তমানকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে বুঝিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা আমাদের জাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপে অগষ্ট কোঁৎ ও হেগেল যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—প্রথমেই সূত্রস্থাপন করিয়া সেই সূত্রানুসারে সত্য সমূহের আলোচনা, যাহাকে অবরোহ-পদ্ধতি বলে, আমরা অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকেরা স্বভাবতঃই সেই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। বর্ত্তমান যুগে কিন্তু আরোহ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। মনীষী মোক্ষমূলর যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি সুষ্ঠুরূপে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা এই আরোহ-পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ। আমাদের দেশের মনীষী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ক্রম-বিকাশের সূত্র-সম্বলিত তুলনামূলক ঐতিহাসিক পদ্ধতির কথা, ইউরোপের বিদ্বৎসমাজে ব্যাখ্যা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন—ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার পদ্ধতির ইংরাজী নাম—Historico Comparative method, supplemented by the Theory of Evolution। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহারা মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" পাঠ করিলে দেখিবেন যে, তিনি পূর্ব্বেই এই পদ্ধতির সূত্র স্থাপনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মূল্যবান। আমার বলিবার কথা এই যে, দেশের লোকের ভিতর যাহাতে ঐতিহাসিকী বৃত্তির যথাযথ অনুশীলন হয়, সে জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বহু কর্ম্মী বহু কার্য্য করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নেতৃত্বে যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গৌরবের কথা। আমাদের বীরভূমের 'বীরভূম বিবরণ' যে দুই খণ্ডে বাহির হইয়াছে, তাহাও অতি প্রশংসার বিষয়। আমরা আশা করি, 'বীরভূম বিবরণে'র অবশিষ্ট অংশগুলি সত্বর বাহির হইবে।

কিছুদিন হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতেছি। এসম্বন্ধে আধুনিক গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে, F. E. Pargiter M. A মহাশয়ের Ancient Historical Tradition নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্র ইহার প্রকাশক। পার্জ্জিটার সাহেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন আমাদের বেদ ও পুরাণ আলোচনা করিয়াছেন। অতীত ভারতের ইতিহাস রচনায় বৈদিক ও পৌরাণিক—এই উভয় শ্রেণীর উপকরণের মধ্যে প্রভেদ কি, সে সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে J. F. Blackier প্রণীত The A B C of Indian Art নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় শিল্পকলা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। Lionel D. Barnett সাহেবের Antiquities of India আধুনিক গ্রন্থ, মাত্র অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে ভারতীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ সাহায্য করিবে। এই সমুদয় গ্রন্থ আমাদের লাইব্রেরীর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে আমরা দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিয়াও অর্থব্যয় করি। কিন্তু এসব বিষয়ের আলোচনা করে কে? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বা কলিকাতার ধনবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বহু বহু লাইব্রেরীতেও যে সকল প্রাচীন অথচ মূল্যবান মাসিক পত্র নাই, আমরা তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দুই একজন সাহিত্যিক দূরদেশ হইতে আসিয়া পদধূলি দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। কিন্তু বীরভূম জেলার, এবং এমন কি সদর সিউড়ীর কেহ তাহা জানেন কি না সন্দেহ! আমি বীরভূমের নিন্দা করিতেছি না—দেশের সাধারণ অবস্থাই এইরূপ!

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনেক সভ্য আছেন। কিন্তু সভ্য সংখ্যা দেখিয়া কেহ বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যানুরাগী লোকের সংখ্যার হিসাব করিবেন না। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যখন যেখানে কর্ম্মসূত্রে বদলী হইয়া যান, সেখান হইতে পরিষদের সভ্য যোগাড় করিয়া দেন। এই প্রকারে অনেকেই সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এই প্রকারে সংগৃহীত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য-পরিষদকে সাহিত্য 'পারিষদ' বলেন। সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধেও আমরা অনেক কথা শুনিতে পাই। এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, কোন স্থানে সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে জমীদারেরা প্রজাদের উপর কিছু

কিছু 'বাব' আদায় করিয়াছেন! আশা করি ইহা সত্য নহে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের বিস্তার ও সাহিত্যিকগণের জীবনের উন্নতিই, সাহিত্যান্দোলনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই আন্দোলন যেন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন মাত্রে পরিণত না হয়।

কতকগুলি সুদক্ষ সাহিত্যপ্রচারক যদি দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া, নিয়মিতভাবে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে অনেক কার্য্য হইত। সাহিত্য-সম্মেলন প্রভৃতি করিয়া নবদ্বীপপরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থ ছাপাইয়া যে অর্থ হয়, সেই অর্থের দ্বারা এই প্রকারের প্রচার কার্য্য রক্ষা করা অসম্ভব নহে। কয়েক মাস পূর্ব্বে, "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রে সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে আলোচনায় আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমরা মফঃস্বলের লোক, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সাহিত্য-রাজ্যে আমাদের প্রকৃত অভাব কি? এবং সেই অভাব কি প্রকারেই বা পূরণ করিতে পারি?

অনেক দিন সাহিত্যের আন্দোলন চলিতেছে। এখন আমাদের বুঝিতে পারা উচিত, কলিকাতার প্রতি চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। যাঁহারা সহৃদয় তাঁহারা সাহায্য করুন—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব। কিন্তু আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, আমাদের গ্রামের কাজ গ্রাম হইতেই করিতে হইবে। আমরা দরিদ্র; দিন দিন আমাদের দারিদ্র্য বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন নূতন ব্যাধি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিতেছে। গ্রাম্য দলাদলিতে আমরা জীর্ণ; দেশের ধন বন্যার স্রোতের ন্যায় রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে—আমরা অসহায় হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সাহিত্য ও সচ্চিন্তার সাহায্যে আমাদের এই দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বীণাপাণির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, নরনারী সকলেই জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বাণীর মন্দিরে সম্মিলিত হউক।

দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিতে চাই। বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাপার বুঝিবার অভ্যাস যদি দেশের লোকের না হয়, তাহা বিজ্ঞান-শাখা হইলে, কেবল বিজ্ঞানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিলেই কাজ হইবে না। এই কথাগুলি আমি পুনঃ পুনঃ কেন বলিতেছি, তাহার হেতু নির্দ্দেশ আবশ্যক। আমরা সমস্ত ব্যাপার বাহির হইতে দেখিতে শিখিয়াছি। সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইবে, আসুন চাঁদা তুলিয়া কতকগুলি বড় বড় বই ছাপাইয়া ফেলা যাউক। ইহা বহির্মুখী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। যেমন বলা হইল—বিদ্যালয় করা যাউক, অমনি বড় বড় বাড়ি, চেয়ার, টেবল প্রভৃতি সরঞ্জাম আমাদের মানস নেত্রের পুরোভাগে জাগিয়া উঠিল। বিদ্যালয়ের নূতন ব্যবস্থা যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই হওয়া উচিত—পড়াইবে কে এবং কি পড়াইবে? অর্থাৎ প্রত্যেক প্রচেষ্টা, মানুষকে মূল করিয়া আরম্ভ করিলে, প্রাণ শক্তির সাহায্যে বা আত্মার ভূমিতে কার্য্য করা হয়। ভারতবর্ষের ইহাই নিজস্ব পদ্ধতি।

বিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে একটি কথা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি। আমাদের দেশে কিছুদিন হইতে নূতন নূতন অবতার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং নূতন নূতন ধর্ম্মমণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছে। এই সব ধর্ম্মমণ্ডলী কর্ত্তৃক অসংখ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। সেই সমুদয় গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা যোগশক্তির দ্বারা এমন সব কার্য্য করিতে পারেন, যাহা সাধারণ লোকে করিতে পারে না—ইহা আমি অস্বীকার করি না। সিনেট (A. P. Sinnet) সাহেব তাঁহার Occult World গ্রন্থে যে সমুদয় সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটি প্রভৃতির যে চেষ্টা ও উদ্যম, তাহারও আমি খুব প্রশংসা করি। কারণ এই সকল ব্যাপার অলৌকিক হইলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার আলোচনা হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে অতি অল্প শিক্ষিত লোক কর্ত্তৃক যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘোষিত হইতেছে, এবং ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক কার্য্যকলাপ প্রচার করিয়া সরল-চিত্ত নরনারীকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া কতকগুলি চতুর লোকের যে স্বচ্ছন্দে জীবিকার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে কি প্রমাণিত হয়? তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আমাদের দেশে এখনও বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অগষ্ট কোঁৎ মানব সমাজের ক্রমবিকাশে যাহাকে প্রথম স্তর বলিয়াছেন, এবং যাহার নাম দিয়াছেন "অলৌকিকের দোহাই দিবার যুগ," আমাদের দেশে এখনও সেই যুগ চলিতেছে। আমি প্রাণের গভীর বেদনায় এই কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আমি সংস্কারক নহি—আমি প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু, কিন্তু আমি মনে করি যে অলৌকিক সত্য হইলেও, অলৌকিকের উপর ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবও নহে—সঙ্গতও নহে।

ভগবান মানুষকে বিচারণা-শক্তি দিয়াছেন—তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বিজ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী নহে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে দৃঢ়ীকৃত করিবে—শিথিল করিবে না। দেশের কি দুরবস্থা, একটি সামান্য ঘটনার দ্বারা বুঝাইতেছি। একজন লোক, একজন কলেরাগ্রস্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। বই ছাপাইয়া প্রচার করা হইতেছে—অতএব তিনি সাধু, তোমরা পূজা লইয়া তাঁহার মন্দিরে প্রণামী দিয়া যাও—তাঁহার অলস, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য ও চরিত্রহীন শিষ্যগণকে, রাজার আদরে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, তোমাদের পরলোকের সুবিধা করিয়া লও! এই শ্রেণীর বই ছাপাইতে পয়সার অভাব হয় না—পয়সাওয়ালা অনেক লোক, এই শ্রেণীর বহি ছাপাইতে টাকা দিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুলভে খ্যাতিলাভ করেন। আবার হয় ত দেখিব, তাঁহাদের মধ্যেই কেহ একদিন, সাহিত্য-সম্মেলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন!

আমার বক্তব্য এই যে, রজার্সের মত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার, যিনি বহু গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া, কলেরা রোগের নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, কলেরা আরোগ্য করিবার জন্য,

দেওয়ান রামদুলালের পুত্র। বাঙ্গালা ১২৩৯ সালে তাঁহার জন্ম হয়। সর্ব্বধর্ম্ম কি, তাহা তিনি যোগ-প্রণালী, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শিষ্যের নাম—মনমোহন দত্ত। "মলয়া" নামক সঙ্গীত-গ্রন্থের রচয়িতারূপে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই পরিচিত। সর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার পর শ্রীযুক্ত লবচন্দ্র পাল বি, এ, এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া, এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশন, সরকারী বিধানে রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য তিনটি—১। সর্ব্ব ধর্ম্মের ভিত্তির উপর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত করা; ২। প্রচারের দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম স্থাপনা করা; ৩। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে মৈত্রী স্থাপিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করা'।

আলোচ্য সংখ্যায়, শ্রীমদাচার্য্য আনন্দস্বামী মহোদয়ের 'প্রকৃত তত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। ঈশ্বরবাণী শ্রবণ কি প্রকারে হয়, ঈশ্বরে মনের যোগ হইলে সাধক কি প্রকারে নানারূপ বর্ণ দেখিয়া থাকেন, এই সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়, বৃন্দাবন ভ্রমণের বিবরণ লিখিয়াছেন—তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রত্যেক হিন্দুরই আলোচনা করা আবশ্যক—"গোবিন্দজীর প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে বৃদ্ধ লম্বোদর সেবায়তগণ বড় বড় বাক্স লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা যাত্রিগণের নিকট ভেট আদায় করিতেছেন—যাত্রিগণের অবস্থাভেদে আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। যেখানে দু'পয়সার প্রত্যাশা আছে, সেই খানেই অধিক ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। বাস্তবিক সত্য কথা বলিতে কি, প্রায় সকল তীর্থস্থানেই পাণ্ডাগণ অর্থের লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া নিরীহ যাত্রি-গণের গলায় পা দিয়া অর্থ শোষণ করিয়া থাকেন।" উদার ও সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে ভারত-বর্ষের তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। "মৃত্যু, পরলোক ও স্থূলদেহ মুক্ত আত্মার জ্ঞান চৈতন্য"-সম্বন্ধে শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বি, এল্ মহাশয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিতেছেন—"অনেকে Theosophical Society নামক ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু সমিতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহার প্রচারিত সত্য সকলের প্রতি অবজ্ঞা ও হাস্য পরিহাস করেন; কিন্তু ঐ সমিতিতে প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সংযতচারী বহু সাধু মহাত্মা আছেন। মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তাঁহারা অনেক আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশিত করিয়াছেন।" লেখক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পদাশ্রিত স্বামী চিদানন্দের শিষ্য, ইহা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। তিনি সর্ব্বধর্ম্ম মিশনের কাগজে লিখিতে-ছেন, এবং থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটির সাহিত্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া, তাহার ভিতর যে সত্য রহিয়াছে, তাহাই প্রচার করিতেছেন। ধর্ম্ম সমন্বয়ের জন্য এইরূপ উদারতাই প্রয়োজন। শ্রীনরেন্দ্র কুমার দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ লিখিত "মহম্মদ" শীর্ষক একটি অতি সুপাঠ্য প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মিশনের ও এই মাসিক পত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

বিজ্ঞাপন

"বীরভূমি" মাসিক পত্রিকা, পূর্ব্বে চারি বৎসর ছয় মাস কাল পরিচালনা করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহির হওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়া লওয়া হইত। শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, অন্যান্য কার্য্যের ভার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট মূল্য লওয়া হয় নাই। আমি এখন অন্যান্য কর্ম্ম হইতে বহুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে পুনর্ব্বার 'বীরভূমি' প্রচার আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে যাঁহারা 'বীরভূমি'তে লিখিতেন, তাঁহারা অনেকেই এখন জ্ঞানরাজ্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহারাও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিত ভাবে লিখিবেন। সিউড়ীর 'রতন-লাইব্রেরী'তে অসংখ্য প্রাচীন ও অপ্রকাশিত মূল্যবান বাঙ্গালা পুঁথি আছে। সেই পুঁথিগুলি ক্রমে ক্রমে এই কাগজে প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ের যাবতীয় সমস্যা এই কাগজে আলোচিত হইবে। কাগজখানি যাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হয়, তাহা করিতে চেষ্টার ত্রুটী হইবে না। বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যা, ষষ্ঠ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে। বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র। পূর্ব্বে 'বীরভূমি'র যাহা লক্ষ্য ছিল, এখনও তাহাই লক্ষ্য। সহৃদয় বন্ধুগণ সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

প্রত্যেক সংখ্যা স্বয়ং সম্পূর্ণ, (Complete in itself) এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। কলিকাতা—কলেজ স্কোয়ারে ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যালয়ে এবং ঢাকা—পাটুয়াটুলি রিপন-লাইব্রেরীতে নগদ বিক্রয় হয়।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সঙ্কর্ষণ-প্রসঙ্গ

২ রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র
৩ আলোচনা ও অনুশীলন
৪ সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

সঙ্কর্ষণ-প্রসঙ্গ

১। পৌরাণিকের কাল

আমাদের দেশে পুরাণ বলিয়া যে গ্রন্থগুলি পরিচিত, তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলে প্রথমেই আমাদের মনে বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার উদয় হয়। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে আমরা সত্য বলিয়া যে সব কথা মানিয়া লইয়াছি, তাহার সহিত পুরাণের কথা একেবারেই মেলে না। প্রথমেই যদি বিরক্তি, বা সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আর পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। কাজেই পুরাণের আলোচনা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে পুরাণের আলোচনা হয়, তাহা পুরাণের মূলের কথাগুলিকে বাদ দিয়াই হইয়া থাকে। পুরাণের যে সব কথা কাব্য-হিসাবে, বা তত্ত্বকথা-হিসাবে, আমাদের একালের ধারণা ও রুচির অনুকূল আমরা আজকাল পুরাণের সেই অংশগুলিরই আলোচনা করি, ইহা মন্দের ভাল, কিন্তু ইহাকে প্রকৃত পুরাণ-আলোচনা বলিতে পারি না।

পুরাণের মতে এখন ব্রহ্মার পরমায়ুর একান্ন বৎসরের প্রথম মাসের প্রথমদিন চলিতেছে। ব্রহ্মার একমাসের যে তিরশটি দিন, তাহাদের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। শুক্লপক্ষের প্রথম দিনের নাম শ্বেতবরাহ, আর দিনের নাম কল্প। অতএব এখন ব্রহ্মার পরমায়ুর একান্ন বৎসরের, প্রথম মাসের প্রথম দিন বা শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে। ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর। বর্ত্তমান দিনের ছয়মনু চলিয়া গিয়াছেন। এখন সপ্তম মনুর অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর শাসনকাল। প্রত্যেক মনুর শাসনকালে অর্থাৎ মন্বন্তরে একাত্তর চতুর্যুগ অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ পর পর কিঞ্চিদধিক একাত্তর বার আসিয়া থাকে। এখন ব্রহ্মার পরমায়ুর দ্বিতীয় পরার্দ্ধের (৫০ বৎসর পর্য্যন্ত প্রথম পরার্দ্ধ, তাহার পর ৫০ বৎসর দ্বিতীয় পরার্দ্ধ) প্রথম কল্পের অর্থাৎ শ্বেতবরাহ কল্পের সপ্তম মনু বৈবস্বতের শাসনকাল। এই মনুর শাসনকালে একাত্তর চতুর্যুগের সাতাইশটি

চতুর্যুগ চলিয়া গিয়াছে এখন অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিযুগ চলিতেছে। এই কলির ৫০২৪ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কল্পের ১৯৭২৯৪৯০২৪ বৎসর হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী সৃষ্টির পর ১৯৫৫৮৮৫০২৪ বৎসর গত হইয়াছে। পৌরাণিকের এই কাল পরিমাণ পঞ্জিকাতেও বৎসর বৎসর লিখিত হইতেছে। এই কালের কথা শুনিলেই আমাদের হাসি পায় এবং মনে হয় ইহা একেবারে কল্পনা, ইহার মধ্যে কোনই সত্য নাই।

কিন্তু আমরা ভারতবর্ষের অধিবাসী, বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছি যে আমরা অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। আমরা এইরূপ শিখিয়াছি যে বর্ত্তমান ইউরোপ আধুনিক বিজ্ঞানের নামে আমাদিগকে যাহা শিখাইতেছে, তাহাই একমাত্র সত্য; তাহার উপর আর কাহারও কিছু বলিবার নাই। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যে দোষ তাহা নহে, আমাদের শিক্ষারই দোষ। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রতিদিন বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। সে পরিবর্ত্তন অত্যন্ত বিস্ময়াবহ। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস আমরা জানিতে চেষ্টা করি না। একটা মত বা সিদ্ধান্ত, যাহা পরের মুখে শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছি—তাহাই ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া এক নূতন প্রকারের চিন্তা-তরঙ্গ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আধুনিক চিন্তাপদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এই চিন্তার কয়েকটি সূত্র আমরা নির্দ্ধারণ করিতেছি। খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল খৃষ্টানেরা সাধারণতঃ যেভাবে বুঝে তাহা ঠিক্ নহে। কিন্তু আমরা সে কথা বলিলে উহারা শুনিবে কেন? প্রচলিত খৃষ্টান মত এই যে ছয় হাজার বৎসর হইল মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে পাগলের প্রলাপ মাত্র, তাহা সামান্য বিজ্ঞান-পড়া লোকেও জোর করিয়া বলিতে পারে। ইউরোপের সাধারণ অতিদাম্ভিক পণ্ডিতেরা বলিতে চাহেন যে মানবজাতির যত কিছু জ্ঞানচর্চ্চা প্রভৃতি এই ছয়হাজার বৎসরের মধ্যেই হইয়াছে। কিন্তু ইহাও একেবারে অসম্ভব। পূর্ব্বকালে কত বড় বড় জাতি আসিয়াছে, কত বড় বড় মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমশঃ পাইতেছেন। ক্রমশঃ জানিতে পারা গিয়াছে, এমন অনেক তত্ত্বকথা ও জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকালের মানুষেরা জানিতেন, যাহা এখনকার দিনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় পণ্ডিতেরও ধারণার অতীত। প্রাচীনকালের অনেক শাস্ত্র, বিদ্যা ও সাধনপথ, সরাইয়া রাখা হইয়াছে।

সে সব বিদ্যা লুপ্ত হয় নাই, গোপনে রহিয়াছে, মানবজাতি উপযুক্ত হইলে তাহা আবার দেওয়া হইবে। এই সব কথার প্রমাণ আমরা ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত করিব। এখন আমাদের বলিবার কথা এই যে, পৌরাণিকদের এই কালবিভাগ শুনিয়া বিচলিত হইবেন না। ইহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য—এবং ইহা বুঝিতে পারিলে জ্ঞানরাজ্যের নূতন দ্বার খুলিয়া যাইবে। তবে হঠাৎ একদিনে এক কথায় যদি ইহা বুঝিয়া লইতে চাই, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কোন আশা নাই।

বর্ত্তমান যুগে বহু আলোচনা ও অনুসন্ধানের পর একদল সাধুপুরুষ বলিতেছেন, প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে অধ্যাত্মবিদ্যা, বেদবিদ্যা বা যোগবিদ্যা প্রচলিত ছিল, এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় অধিকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা যাহা অনুশীলিত হইত, সেই বিদ্যায়, বহু বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, মানুষ কি ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থাই বা কি এবং এই মানুষের বা আমাদের, ভবিষ্যতই বা কি, এই সমুদয় প্রশ্নের চরম মীমাংসা ছিল। মানুষের উৎপত্তি, তাহার জীবনের আবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ, জন্মান্তর, এবং পূর্ণ পরিণতি বা মুক্তি, এই সকলেরও সঠিক মীমাংসা ছিল।

Esoteric philosophy solved ages ago, the problem of what man was, is, and will be, his origin, life-cycle—interminable in its duration of successive incarnations or rebirths—and his final absorption into the source from which he started.

এই যে বিদ্যা, ইহা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ভাষায় যদি আমাদিগকে দেওয়া হয় তাহা হইলে আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। পক্ষান্তরে সামান্য একটু লইয়া জগতে অনর্থ উৎপাদন করিব। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রকারের অনর্থের অভিনয় অনেকবার হইয়া গিয়াছে—আমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের পুরাণ আলোচনা করিলে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। কাজেই একদিকে প্রাচীন বিদ্যা যেমন অনেক সরাইয়া গোপনে রাখা হইয়াছে, তেমনি অনেক কথা ইঙ্গিতে, আভাসে, আংশিকরূপে ও কৌশলে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা সাধনশীল, যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া সত্য পাইতে ইচ্ছুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা এই সব বর্ণনার ভিতরের অর্থ বুঝিতে পারেন। যাহারা বহিরঙ্গ, তাহারা পারে না। পুরাণ-সমূহের মধ্যে এই সব শিক্ষা বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে।

এইবার কল্প, মন্বন্তর ও যুগবিভাগ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিতেছি। বিলাতের একজন খুব বড় চিন্তাশীল লোক বহুদিন পূর্ব্বে প্রাচীনজগতের পুরাণশাস্ত্রের এই কাল-বিভাগ আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জগতের মানবগণের নিকট "Time, cyclical time, was their abstraction of the Deity, Coleridge. কালের এই আবর্ত্তন ও বিভাগের দ্বারাই অনন্ত পরমেশ্বরের লীলা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রকারের কাল-বিভাগ, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং কতকাল ধরিয়া যে প্রচলিত ছিল, তাহা একালের কোন প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ বলিতে পারে না। পুরাণের সহিত জ্যোতিষের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) নহে, গণিত জ্যোতিষের সহিত ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) এক সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে পুরাণের অনেক কথা বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু সে বড় কঠিন কথা।

যাহা হউক আমরা যদি অধীর ও শ্রদ্ধাহীন না হই, এই কঠিন কথাও ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিব।

২। পৌরাণিকের দেশ

পৌরাণিকের দ্বিতীয় কথা যাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাহা দ্বীপ ও বর্ষের কথা। প্রত্যেক পুরাণেই এই কথা বলা হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তিনিই প্রথম রাজা, তিনি দেখিলেন সূর্য্যদেবের কিরণে ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ আলোকিত হয়, অপর অর্দ্ধাংশ অন্ধকারময় হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি আমার নিজের তেজের দ্বারা রাত্রিকেও দিন করিব। এই বলিয়া তিনি এক উজ্জ্বল রথে চড়িলেন, আর সূর্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাতবার ভ্রমণ করিলেন। প্রিয়ব্রতের এই কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আসিলেন ও তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন 'বৎস তুমি তোমার অধিকারের বহির্ভূত কার্য্য করিতেছ।' ব্রহ্মার কথায় প্রিয়ব্রত নিরস্ত হইলেন। মহারাজা প্রিয়ব্রতের রথচক্রের অগ্রভাগের দ্বারা সাতটি গর্ত্ত হইয়াছিল, এই সপ্তখাতই সাত সমুদ্র। আর এই সাত সমুদ্রের ভিতরে সপ্তদ্বীপ। সকলের মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের চারিদিকে লবণ-সমুদ্র। তাহার পর প্লক্ষদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপের

চারিদিকে ইক্ষুরস-সমুদ্র। তাহার পর শাল্মলীদ্বীপ, সুরাসমুদ্র, কুশদ্বীপ, ঘৃতসমুদ্র, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, দধিসমুদ্র, শাকদ্বীপ, দুগ্ধসমুদ্র, পুষ্করদ্বীপ, শুদ্ধজলসমুদ্র। এই গেল সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র। পুরাণে এই সমুদয় দ্বীপের বিভাগ-সমূহের বর্ণনা আছে। তাহা ছাড়া ভগবান্ কোন্ দ্বীপে কোন্ মূর্ত্তিতে পূজিত হইয়া থাকেন তাহারও বিবরণ আছে। পুষ্করদ্বীপে কমলাসন মূর্ত্তি, শাকদ্বীপে বায়ু, ক্রৌঞ্চদ্বীপে জল, কুশদ্বীপে অগ্নি, শাল্মলীদ্বীপে সোম, প্লক্ষদ্বীপে সূর্য্যরূপে ভগবান্ আরাধিত হইয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষ। ইহাদের এক এক বর্ষে উপাস্যদেব এক এক রূপ। ইলাবৃত বর্ষে সঙ্কর্ষণ, ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়গ্রীব, হরিবর্ষে নৃসিংহ, কেতুমালবর্ষে কামদেব, রম্যক্‌বর্ষে মৎস্য, হিরণ্ময়বর্ষে কূর্ম্ম, উত্তর-কুরুবর্ষে যজ্ঞপুরুষ বরাহ, কিম্পুরুষবর্ষে রামচন্দ্র, আর ভারতবর্ষে নর-নারায়ণ। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত। বিষ্ণুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের সহিত এই বর্ণনার নামের কিছু কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু এই সামান্য মতভেদ তেমন গুরুতর কিছু নহে। পৌরাণিকের এই দেশ-সম্বন্ধীয় মূল কথাটি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মনে রাখিয়া ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। 'মন্বন্তর-কথা' নামক গ্রন্থে আমরা বলিয়াছি—"এই সপ্তদ্বীপকে কেবল দেশের মধ্যে দেখিবেন না। দেশ ও কাল এক করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন।"

সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র প্রভৃতি বিভাগের কথা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ত্রেতাযুগে প্রিয়ব্রত রাজা হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে কথিত হইয়াছে। সে প্রায় দুই শত কোটি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন এই ভূপৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ হিসাব করিবেন। সে সময়ে ভূপৃষ্ঠের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে কি প্রকারের প্রাণীর বাস সম্ভব ছিল তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ হিসাব করিবেন। এখন যে প্রকারের মানুষ দেখিতেছি, এই প্রকারের মানুষ কতদিন ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছে। এই সমুদয় ব্যাপার আমাদের আলোচনা করা দরকার। এই সব সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলে আমরা বিশ্বের অনেক রহস্য জানিতে পারিব। কিন্তু এই সব বিজ্ঞান জড়বস্তুকে মূল ধরিয়া জড়ের সাহায্যে তত্ত্বের আলোচনা করে। এখন দেখিতে হইবে চৈতন্যের দিক্ হইতে চৈতন্যের সাহায্যে তত্ত্বের আলোচনা করিতে পারা যায় কি না। এই সব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া উচিত।

ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও বর্ষে ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পূজা করা হয় বা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সর্ব্বশেষে জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে নর-নারায়ণের উপাসনা। বর্ত্তমান সময়ে কোনও পরিণত ধর্ম্মমতের আলোচনা করিতে হইলে আমরা তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা করি। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন মতের মিলনের দ্বারা, এবং মানবের হৃদয়-বৃত্তি ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মমত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের, প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক সংস্কার ও বিশ্বাসের ইতিহাস আছে। ভাগবতধর্ম্ম ভারতবর্ষের নরনারায়ণ উপাসনা, ইহার প্রকৃত ইতিহাস বা উৎপত্তি জানিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের ও বর্ষের বিবরণ আবশ্যক। সুতরাং সে দিক্ হইতেও এই সব তত্ত্বের আলোচনা করা উচিত।

৩। পুরাণ ও বিজ্ঞান

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদাই বদ্‌লাইতেছে। এখন যেখানে অতি উচ্চ পর্ব্বতমালা, একদিন সেখানে বিশাল সমুদ্র ছিল। আজ যেখানে মরুভূমি পূর্ব্বে সেখানে রমণীয় নগর ছিল। অতিরিক্ত শীতল বলিয়া এখন যে সব স্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলিলেও হয় পূর্ব্বে সেই সব স্থান, এত শীতল ছিল না, নাতিশীতোষ্ণ ছিল এবং সুসভ্য নরনারী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সেখানে পরমানন্দে বসবাস করিত, এই সব কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। এখন যেখানে মিশর দেশ ও মরুভূমি, পূর্ব্বে সেখানে সমুদ্র ছিল, একথা হেরোদোতাস্, স্ট্র্যাবো, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা প্রাচীনতর কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এই সব কথা লোকে উপন্যাস বলিয়া মনে করিত। এখন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন। এখন যে দেশের নাম আবিসিনিয়া, পূর্ব্বে উহা একটি দ্বীপ ছিল—একদল মানুষ উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চল হইতে তাহাদের দেবতা-সহ এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিল। মাদাগাস্কার দ্বীপ হইতে লঙ্কা ও সুমাত্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল মহাদেশ ছিল। বর্ত্তমান আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থান এই লুপ্ত ও বিস্তৃত মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। অপর দিকে এই মহাদেশ ভারত মহাসাগর হইতে অষ্ট্রেলিয়া-পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের জলে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে! কয়েকটি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া এখন সমুদ্র-মধ্যে দ্বীপ হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রকারের বহু বহু পরিবর্ত্তনের কথা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন যুগের যে সব সময় নির্দ্ধারণ করেন, তাহা এতই পরিবর্ত্তনশীল যে সমুদয়গুলি পড়িলে হাসি পায় এবং আমরা যখন তাহাদের মত অবনত-মস্তকে মানিয়া লই তখন দুঃখও পায়। সার্ উইলিয়ম্ টমসন্ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একজন নামজাদা বড়লোক, ভূতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কালনির্ণয় ব্যাপারে তিনি দ্বাদশবার মত বদ্‌লাইয়াছেন। এই সব পণ্ডিতদিগের আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাকে মায়োসিন্ যুগ (Miocene age) বলেন, সেই যুগে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড ও স্পিটস্‌বার্গেন দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ছিল। Had an almost tropical climate. হোমারের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের গ্রীক্‌দিগের মধ্যে কিম্বদন্তী ছিল—হে চিরসূর্য্যালোকে আলোকিত এক দেশ (Land of the Eternal sun) ছিল। তাঁহাদের দেবতা এপোলো (Apollo) প্রত্যেক বৎসর সেখানে একবার করিয়া যাইতেন।

এই সমুদয় বিষয়ের সুবিস্তৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সংশয়ী, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের সামান্যমাত্র আলোক পাইয়া যাঁহারা প্রাচীন জগতের পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা করুণার পাত্র। তাঁহাদের হিতসাধনের জন্য এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

পৌরাণিকগণ যে দ্বীপ ও বর্ষের কথা বলিয়াছেন, তাহা অতি পূর্ব্ব কালের ভূপৃষ্ঠের আলোচনা করিয়াই করিয়াছিলেন, এইরূপ অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দেবতার ঔরসে বানরের জন্ম সত্য সত্যই হইয়াছিল, কিন্তু সে বহুকালের কথা, পুরাণে সে কথা পাওয়া যায়। একালের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা এখনও স্বীকার করেন না, কিন্তু ক্রমশঃ যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন যে দৃষ্টিতে আমরা জগৎ ও জীবন পর্য্যালোচনা করি, সে দৃষ্টিই ক্রমশঃ বদ্‌লাইয়া যাইবে। মানুষের ভাষাও বদ্‌লাইয়া যাইবে। সুতরাং ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। পুরাণের কথা বুঝিবার প্রণালী বা কৌশল আছে। নিরুক্তকার যাস্ক তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সাধনা-ব্যতীত সে কৌশল জানিবার উপায় নাই। অতএব অতীতের প্রতি যে অশ্রদ্ধার ভাব আমাদের জাগিয়া উঠিয়াছে, ব্যস্তভাবে পুরাণাদি শাস্ত্র-সম্বন্ধে যাহা হউক একটা মন্তব্য প্রকাশ করিবার যে অভ্যাস আমাদের জন্মিয়া গিয়াছে,

তাহা দূরীভূত হউক। শ্রদ্ধার সহিত পরিশ্রম করিয়া এই সব পবিত্র ও পূজনীয় বিষয় আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠুক।

৪। আলোচনার ভ্রান্তপথ

যাহা ভাল করিয়া জানা নাই, এবং যাহা ঠিক্ মত জানিবার কোন উপায়ও নাই, যাহা অস্পষ্ট ও সুদূরবর্ত্তী, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার সাহায্যে সুস্পষ্ট ও সুজ্ঞাত যে বর্ত্তমান, তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার যে চেষ্টা তাহার মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে অস্বাভাবিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে সর্ব্বত্রই এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণ—হিন্দুদের ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বেদ যখন এই ধর্ম্মের মূল, তখন আমরা বেদ লইয়া বসিয়া গেলাম। বেদ বহুকালের জিনিস, সমগ্র বেদ পাওয়া যায় না, বা পাওয়া যায় নাই, যাহা পাওয়া যায়, তাহারও অর্থ লইয়া বিষম মতভেদ, কিন্তু তথাপি আমরা সেই বেদ হইতে আরম্ভ করিলাম, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে, আমরা প্রথমে বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহার তর্জ্জমা লইয়া আরম্ভ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সেই সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান লইলাম। তাহার পর পুরাণে আসিলাম, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের রচনার কাল নির্ণয় করিলাম এবং যে খানিকে প্রাচীনতম মনে করিলাম, তাহাকে মূল ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম। এই পদ্ধতিই এখনকার পণ্ডিত-মহলের প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতি অস্বাভাবিক ও ভ্রান্ত, সুতরাং সর্ব্বনাশ-কর।

যাঁহারা মনে করেন বর্ত্তমানে যাহা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই, ক্রমে ক্রমে তাহা ধ্বংশ হইয়া যাইবে; তাহাকে কেবল জানা দরকার, জানিয়া আয়ত্ত করা দরকার, তাহারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। কিন্তু এই বর্ত্তমানকে যাহারা আদরের বস্তু, ও জীবনে গ্রহণ করিবার বস্তু বলিয়া মনে করে, তাহাদের আলোচনা করিবার পদ্ধতি অন্যরূপ। তাহারা সর্ব্বপ্রথম এই বর্ত্তমানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে, এবং এই বর্ত্তমানকে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমানকে বুঝিতে গেলে অতীতের আলোচনা প্রয়োজন, বর্ত্তমানের ভিতর অতীত রহিয়াছে। বর্ত্তমানকে বুঝিয়া ও উত্তমরূপে ধরিয়া অতীতের অভিমুখী হইতে হইবে। এই প্রকারে চেষ্টা করিলে হয়ত শীঘ্র প্রাথমিক

অবস্থায় যাওয়া যাইবে না, বা মূল কথা বুঝিতে পারা যাইবে না, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি?

উদাহরণ, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, এই ভারতবর্ষে একটি অপ্রচলিত পুরাতন জিনিস নহেন। ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি পুরাতন জিনিস, সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ তো কেবলমাত্র একজন ঐতিহাসিক পুরুষ নহেন। সহস্র সহস্র ভক্তের ও ভাবুকের হৃদয়াবেগ আশ্রয় করিয়া, তিনি আজও নানারূপে নানাসম্প্রদায়ে সম্পূজিত হইতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমরা, বর্ত্তমান সময়ে যে আকারে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে অতি উত্তমরূপে তাহার সংবাদ লইব। এই সংবাদ লইতে গেলে আমরা যে উপকরণ সমূহ পাইব, সেই উপকরণগুলিকে ঠিক্‌মত বুঝিতে চেষ্টা করিব। সেই উপকরণগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলে আপনা হইতেই আমাদিগকে প্রাচীনতর উপকরণের সন্ধান লইতে হইবে। এই প্রাচীনতর উপকরণগুলি আপনা হইতেই আসিবে। এই প্রকারে আলোচনা করাই সঙ্গত।

আমরা বর্ত্তমানপ্রসঙ্গে সেই পদ্ধতিই বিশেষরূপে অবলম্বন করিতে চাই। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আজও তাঁহার উপাসনা চলিতেছে। উপাসকেরা বলিতেছেন, আজ যিনি নিত্যানন্দ, তিনিই সঙ্কর্ষণ, তিনিই অনন্ত, তিনিই বলরাম। এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে প্রমাণ বচন সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানগুলির সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিব, এই আলোচনা করিতে করিতে যদি স্বভাবতঃ অন্য প্রাচীনতর কোন মতের বা প্রমাণের আলোচনা করিতে হয়, তাহাও করা যাইবে। আমরা কোনও তত্ত্বের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি জানিবার জন্য যেন ব্যস্ত না হই, তবে ধীরভাবে আলোচনা করিতে করিতে চরম তত্ত্ব যদি আসিয়া উপস্থিত হয়—আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানকে গ্রহণ করিয়া এই প্রণালীতে আলোচনা করাই আমাদের উচিত। যাঁহারা বৈদেশিক, তাঁহাদের জন্য এই প্রণালী নহে। কারণ, তাঁহারা আমাদের কোন একটা জিনিস জানিতে চাহেন কেন, এবং তাহা লইয়া আলোচনাই বা করেন কেন?

তাঁহাদের উদ্দেশ্য, জিনিসটার উদ্ভব ও বিকাশ বুঝিয়া লওয়া। একটি জিনিস বুঝিলে, সেই জিনিসটা যাহাদের তাহাদেরও বোঝা যায়। কতকগুলি মানুষকে বা কোন সমাজকে ঠিক্ মত বুঝিতে পারা শাসকগণের জন্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দ্বারা চালিত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতে চাহেন, জানিয়া শেষ করিতে চাহেন, জানিয়া শেষ করিয়া জিনিসটি যাহাদের তাহাদের বাহিরের ও ভিতরের জীবন আয়ত্ত করিতে চাহেন। কিন্তু আমরা আমাদের জিনিস জানিতে চাই কেন? কেবল জানা নহে, জানিয়া শেষ করাও নহে। আমরা জানিতে চাই, জীবনের সাধনার দ্বারা তাহাকে যথার্থরূপে গ্রহণ করিবার জন্য। যথার্থরূপে গ্রহণ করিয়া আমরাও সজ্ঞানভাবে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাই, এবং সেই তত্ত্বের যাহা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও আত্মপ্রকৃতিগত বিকাশ, সেই বিকাশের অভিমুখে সেই তত্ত্বটিকে লইয়া যাইতে চাই। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। যাঁহারা বৈদেশিক, অথচ আমাদের ধর্ম্ম, আচার, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি জানিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্য সকলেই এক প্রকারের লোক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকারের লোক আছেন। একেবারে কোনরূপ পূর্ব্ব-সংস্কার নাই—আমরা যাহাকে 'অঘ' বলি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন্ যাহাকে Idola বলেন, একেবারে তাহা নাই—এ প্রকারের লোক যখন কোনও বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তখন অবশ্য কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। এই প্রকারের সাধকের নিকট সত্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। কিন্তু ইহা যে অতি সুদুর্ল্লভ। অধিকাংশ লোকই কতকগুলি বদ্ধ-সংস্কার লইয়া বিদেশের প্রাচীন জিনিসের আলোচনা করেন। তাঁহারা আলোচনা করেন কেন, পূর্ব্বে বলিলাম—কথাটা ইংরাজীতে বলিলে কাহারও কাহারও বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে—They want to know it and master it by knowledge. কিন্তু আমরা জানিতে চাই কেন, We want to know it, so that we may properly live it and so to live it that it that it may grow. কতদূর তফাৎ ভাবিয়া দেখা উচিত।

৫। ইলাবৃত বর্ষ

এই ভূমণ্ডল একটি প্রকাণ্ড পদ্মের ন্যায়। সপ্তদ্বীপ তাহার কোষ। ঐ কোষের অভ্যন্তরে জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ, এই নয়টি বর্ষের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ একটি। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে এই বর্ষগুলির বিবরণ আছে। এই বিবরণ সমূহের মধ্যে ইলাবৃত-বর্ষের বিবরণ প্রয়োজন, কারণ এই ইলাবৃতবর্ষেই আমরা সঙ্কর্ষণ দেবের আরাধনার পরিচয় পাই। সমুদয় বর্ষের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ সকলের ভিতরে—শ্রীমদ্ভাগবত ইহাকে অভ্যন্তর-বর্ষ বলিয়াছেন। এই স্থানে সুমেরু পর্ব্বত বিরাজিত। আটটি কুলপর্ব্বত আছে, সুমেরু তাহাদের রাজা, আর এই সুমেরু পর্ব্বত সুবর্ণময়। এই সুমেরুপর্ব্বত ভূমণ্ডলরূপ সুবৃহৎ পদ্মের কর্ণিকার স্বরূপ। সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটি অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। চারিটি পর্ব্বতে চারিটি অতি বৃহৎ বৃক্ষ—আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট। বৃক্ষ চারিটির নিকটে চারিটি হ্রদ—দুগ্ধজল, মধুজল, ইক্ষুরসজল, ও শুদ্ধজল। উপদেবগণ এই জল সেবন করিয়া যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। চারিটি উপবন—নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক, সর্ব্বতোভদ্র। ঐ উদ্যানে দেবরমণীগণ পতিসহ বিহার করেন—আর গন্ধর্ব্বগণ তাহাদের গুণগান করেন। মন্দর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে অরুণোদা নাম্নী নদী বাহির হইয়া ইলাবৃত-বর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে দেবচূত নামে এক বৃক্ষ আছে—উহার ফল অতিশয় সুগন্ধি এবং উহার রস অরুণ বর্ণ—অরুণোদা নদীতে ঐ মধুর রস সর্ব্বদা বহিয়া যাইতেছে—ভবানীর সেবিকা যক্ষনারীগণ ঐ রস সেবন করে, তাহার ফলে তাহাদের অঙ্গের সৌরভ অতিশয় অপূর্ব্ব। পূর্ব্বে যে জম্বুবৃক্ষের কথা বলা হইল, তাহার ফলের রসে জম্বুনদের উৎপত্তি। ঐ নদের উভয় তীরের মৃত্তিকা ঐ রসে পরিপূর্ণ, ঐ রসের সহিত বায়ু ও সূর্য্যকিরণ সংযুক্ত হইয়া জম্বুনদ-স্বর্ণ নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণ উৎপাদন করে। দেবতাদের আভরণ এই স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে দুইটি দুইটি করিয়া আটটি পর্ব্বত। পূর্ব্বে জঠর ও দেবকূট, পশ্চিমে পবন ও পারিপাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর, উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর। সুমেরু পর্ব্বতের মাথার উপর ব্রহ্মার পুরী। ঐ পুরীর আটদিকে ইন্দ্রাদি অষ্ট-দিক্‌পালের পুরী।

lities which furnish the ever-flowing source of new invention and inspiration ; in the second it has lost touch with the realities themselves and bases itself on *descriptions* of reallties—on tradition, books, ancient authorities ; it copies. explains, comments and follows."—M. M. Van Menon in the Commonweal.

ভারতবর্ষে বোধির যুগ ঋষিদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলে তর্কযুগের আরম্ভ হইয়াছিল ; সে যুগের এখনও অবসান হয় নাই। ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, নিবন্ধ, অনুবন্ধ ইত্যাদি এই যুগের কীর্ত্তি। বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বের যতদূর নিরাকরণ হইতে পারে, তৎপক্ষে ইঁহারা কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। কাউএল সাহেব বলিতেন যে, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়—makes the European head dizzy। পাশ্চাত্য কেন, এরূপ প্রাচ্যও বিরল যিনি অবাধে এই সকল নিশিত বুদ্ধিভেদ্য তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত মস্তিষ্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন।

প্রাচীন দর্শনেও যে পরবাদ আছে, এ কথা অস্বীকার করি না। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ইহারই যথেষ্ট উদাহরণ। পঞ্চশিখাচার্য্যের ষষ্ঠিতন্ত্র (ঈশ্বর-কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা যাহার আর্য্যাশ্লোক-নিবদ্ধ সংগ্রহ) সেই ষষ্ঠিতন্ত্রও পরবাদ বিবর্জ্জিত ছিল না। ইহাও স্বীকার করি যে,

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তুধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

কিন্তু তথাপি মনে হয়—বাদ ও বিতণ্ডা এক বস্তু নহে। আর মনে পড়ে ঃ— নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

এবং মনে পড়ে বাদরায়ণের সূত্র

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ্।—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ঃ—

'লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ এক বুদ্ধিমানের অনুমোদিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান নিরাস করেন। পক্ষান্তরে, তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায় ?'

শঙ্করাচার্য্য তৃতীয় বুদ্ধিমানেই বিশ্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু যদি তৃতীয়ের পর চতুর্থ থাকে, চতুর্থের পর পঞ্চম, তাহার পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি বীজগণিতের "n" পর্য্যন্ত, তাহা হইলে তর্ক কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হয় ? আমাদের দেশে তর্কযুগে ইহাই ঘটিয়াছিল।

কেহ দ্বিতীয় ধাতার ন্যায় "বেদান্ত-মার্ত্তণ্ড" রচনা করিয়া—'রবির পরিধি যেন ধাঁধিল নয়ন।" অমনি প্রতিপক্ষ সেই সূর্য্যের উপর প্রকাণ্ড এক মেঘ নিক্ষেপ করিলেন অর্থাৎ 'হেন কালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে'! অমনি বিপক্ষ পক্ষ প্রচণ্ড তর্ক-'প্রভঞ্জনের' অবতারণা করিলেন। মেঘে ও পবনে তুমুল যুদ্ধ বাধিল ; বিমানচারী দেবগণ বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

কোথাও বা আমাদের মানস-রসনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রচুর 'খণ্ডন-খাদ্য' বিরচিত হইল, কিন্তু মণ্ডনের অভাবে তাহার শর্করা কর্করায় পরিণত হইল। কেহ আমাদের নাসারন্ধ্র পুলকিত করিবার আশয়ে 'বেদান্ত-পারিজাত' বিকশিত করিলেন ; কিন্তু তাহা—

'অকাল কুসুমানীব ভয়ং সঞ্জনয়ন্তি নঃ।"

কেহ 'শতদূষণী' রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ড খণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন। প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ 'শতদূষণী-খণ্ডন' প্রচার করিলেন। কিন্তু দূষণকর্ত্তা নির্ব্বাক হইবার লোক নহেন ; কারণ মৌন মুনির অলঙ্কার, তার্কিকের নহে। এইরূপে খণ্ডন মণ্ডনের সন্ধান প্রতিসন্ধানে তর্কস্থল কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তখন প্রতিপক্ষ 'বেদান্ত—ডিণ্ডিম' নিনাদিত করিয়া বিবাদীকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিলেন। অমনি বিবাদী রণমুখে অগ্রসর হইয়া বাদীর প্রশস্ত গণ্ডে বিপুল দার্শনিক 'চপেটাঘাত' করিয়া সংকুল যুদ্ধনীতি প্রদর্শন করিলেন। ফলে বিতণ্ডাক্ষেত্র 'ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধন-শিশুনং'এ পরিণত হইল এবং তার্কিকপুঙ্গবদিগের রক্তে রঞ্জিত হইয়া 'রন্তি-দেবস্য কীর্ত্তিং'কে পরাজিত করিল।

আমার ধারণা, যদি আমাদিগকে আর্য্য-সত্যের পুনরাবিষ্কার করিতে হয়, তবে আমাদের গৌতম বুদ্ধের ন্যায় আবার 'বোধি'দ্রুমতলে ধ্যানমগ্ন হইতে হইবে ; যদি আমরা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করি, তবে শ্বেতকেতুর ন্যায় আমাদিগকে আবার ন্যগ্রোধ ফল আহরণ করিয়া গুরুর চরণতলে উপসন্ন হইতে হইবে এবং মৌনী হইয়া বলিতে হইবে ঃ—

মহৎ যাঁহার আদ্য গুণ-বিগ্রহ,—বিজ্ঞান বা সত্ব তাঁহার আশ্রয়, তিনি চিত্তরূপ—সত্ব-প্রধান—অতএব বাসুদেব। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহা হইতে উদ্ভুত। তাঁহা হইতেই আমি রুদ্র, ত্রিগুণময় স্বতেজের দ্বারা বৈকারিক দেবতাবর্গ, তামস ভূতবর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করি।

এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ, স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃত তামসৈন্দ্রিয়াঃ সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদং॥
যন্নিস্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং মায়াং জনোঽয়ং গুণ সঙ্গ মোহিতঃ।
ন বেদ নিস্তারণ যোগমঞ্জসা তস্মৈ নমস্তদ্বিলয়োদয়াত্মনে॥৭।৮

যাঁহার অনুগ্রহে মহদাদি আমরা সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করি, তাঁহার মায়া আমাদের ন্যায় গুণ-সঙ্গ-মোহিত জন কেবল জানিতে পারে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় জানিতে পারে না। তাঁহার মায়া কর্ম্মরূপ গ্রন্থির প্রাপক, তাঁহার স্বরূপ হইতে বিশ্ব প্রকাশিত ও তাঁহাতেই বিলীন, সেই ভগবান্‌কে প্রণাম।

ইলাবৃত-বর্ষে ভগবান্ ভব, ভবানী ও তাঁহাদের সেবিকা অসংখ্য নারীগণ কর্ত্তৃক এই সঙ্কর্ষণদেবের পূজা বর্ণিত হইল। এই যে অসংখ্য সেবিকা, ইঁহারা নাগবধূও হইতে পারেন, কারণ সঙ্কর্ষণদেবের যে স্তব উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল, তাহার মধ্যে নাগবধূগণের অর্চ্চনার কথা রহিয়াছে। এই সঙ্কর্ষণদেব চতুর্মূর্ত্তি ভগবান্ মহাপুরুষের তুরীয় তামসী মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের আরাধনা-কথা বর্ণনা করিবার জন্য ভাগবত বলিয়াছেন নয়টি বর্ষেই ভগবান্ নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়া—"আত্মতত্ত্বব্যূহেন" অর্থাৎ স্বমূর্ত্তি-সমূহের দ্বারা নিয়ত সন্নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তি-সমূহের মধ্যে সঙ্কর্ষণ অন্যতম।

৭। সঙ্কর্ষণ, বলরাম ও নিত্যানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দের বর্ণনায় তাঁহাকে সহস্রবদন, বলরাম, সঙ্কর্ষণ, অনন্ত ও সহস্রেক-ফণাধর বলা হইয়াছে। তিনি হলধর—তাঁহার শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড—তিনি চৈতন্যচন্দ্রের রসে মত্ত। তাঁহা অপেক্ষা কেহই চৈতন্যের প্রিয় নহে, চৈতন্যদেব তাঁহার দেহে সর্ব্বদাই বিহার করেন। এই শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র-কথা যিনি শ্রবণ করেন ও গান করেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাঁহার পরম সহায় হইয়া থাকেন, মহেশ ও পার্ব্বতী তাঁহার উপর প্রীতি-যুক্ত হয়েন, আর তাঁহার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

সঙ্কর্ষণ-দেবের কথা বলা হইল, ইনিই হলায়ুধ ও বলরাম। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই রাস-ক্রীড়াই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলা। কিন্তু এই রাস-ক্রীড়া কি কেবল শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছিলেন? শ্রীমদ্ভাগবতে রহিয়াছে, শ্রীবলরামও রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন!

৮। বলরামের রাসক্রীড়া ও কৃষ্ণসেবা

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৫ অধ্যায়ে শ্রীবলরামের রাসক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কতকাল শ্রীবৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিয়াছেন! প্রথমাবস্থায় আমরা বৃন্দাবনের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম—কিন্তু আর যেন সে কথা স্মরণ নাই। কংস-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন, উদ্ধবের সহিত ব্রজবাসিগণের যে কথোপকথন হয়, তাহাতে আমরা বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহার পরিচয় পাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণও গোপগোপী ও বৃন্দাবন কিভাবে দেখিতেন তাহাও দেখা গিয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের বস্তু, নীরবেই হৃদয়-মধ্যে থাকিয়া যায়, সংসারে বা প্রকট লীলায় তাহা পরিব্যক্ত করিবার উপায় নাই। প্রকট-লীলায় কেবলই সংগ্রাম, কেবলই সংশয়। ব্রজগোপীর আত্ম-সমর্পণ আর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরমানন্দ-সম্ভোগ ইহা গোপনের বস্তু—ইহা একটি আদর্শ-মাত্র—ইহা ধ্যানের বস্তু।

বৃন্দাবন হইতে আসিবার পর কংসবধ, কৃষ্ণ বলরামের গুরুগৃহে বাস, গুরু সান্দীপনি মুনিকে দক্ষিণা দিবার জন্য পাঞ্চজন্য অসুরকে বধ করিয়া যমালয় গমন ও তথা হইতে মৃত গুরুপুত্রের আনয়ন, তাহার পর জরাসন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, দুর্গ-নির্ম্মাণ, কালযবন বধ, মুচুকুন্দ রাজার প্রতি অনুগ্রহ, তাহার পর দ্বারকাগমন, রুক্মিণী-পরিণয়, প্রদ্যুম্নের জন্ম, শম্বরাসুর বধ, জাম্ববতী, সত্যভামা প্রভৃতির সহিত পরিণয়, নরকাসুর বধ, বাণ রাজার সহিত যুদ্ধ,—ঘটনার পর ঘটনা চলিতেছে। ইহাছাড়া পাণ্ডবদিগের অদৃষ্ট-চক্রও ঘুরিতেছে—এই সংগ্রামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরও সংবাদ লইতেছেন। এইবার সময় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যাইবেন, তাহার পর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিয়া রাজসূয় যজ্ঞ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, সাল্ব, দন্তবক্র, বিদূরথ, পৌণ্ড্রক,

কাশীরাজ প্রভৃতিকে বধ করিবেন। এইগুলি শ্রীকৃষ্ণের লীলার আর এক অধ্যায়। এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের কথা—শুধু কথা নহে শ্রীবৃন্দাবনের চরম ও পরম কথা শ্রীমদ্ভাগবত একটি বিশেষ ঘটনার দ্বারা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন। ঘটনাটি আমাদের পরিচিত—উহা রাসক্রীড়া। কিন্তু এই যে রাসক্রীড়া, ইহার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নহেন, ইহার নায়ক বলরাম।

ভগবান্ বলভদ্র বন্ধুগণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে রথে আরোহণ করিয়া নন্দ গোকুলে গমন করিলেন। অনেক দিনের কথা, কৃষ্ণ বলরাম চলিয়া যাওয়ার পর একবার রথে চড়িয়া উদ্ধব এই নন্দগোকুলে আসিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তথায় বাস করিয়া কৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে ব্রজবাসিগণের শোক কিয়ৎপরিমাণে অপনোদন করিয়াছিলেন। গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়-কথা উদ্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভাগ্যবান্ পরমজ্ঞানী ও একান্ত কৃষ্ণ-ভক্ত উদ্ধব ব্রজগোপীর হৃদয়ের সেই প্রেমরসামৃত প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উদ্ধব অনেক তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে আসিবেন এমন কথাও বলিয়াছিলেন। তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে। ব্রজবাসী,—বিশেষ করিয়া ব্রজগোপী, আশাপথ চাহিয়া দারুণ উৎকণ্ঠায় বসিয়া রহিয়াছে—মৌনহৃদয় উষ্ণদীর্ঘশ্বাসের দ্বারা কেবল বলিতেছে, "কৈ, এখনত কৃষ্ণ আসিল না?" আবার রথ আসিল, বলরাম আসিলেন। কৃষ্ণ আসিলেন না, কিন্তু শুষ্কপ্রায় আশা-নদীতে আবার বন্যা বহিল, কত কথাই বলরামকে জিজ্ঞাসা করা হইল। বলরাম সকলের সহিত সেই পূর্ব্বের ন্যায় প্রেমে মিশিলেন, সেই ভালবাসার খেলা খেলিলেন,—শেষে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমরা আশ্বস্ত হও, আমি দ্বারকায় গিয়া বলপূর্ব্বক কৃষ্ণকে লইয়া আসিব—শূন্য বৃন্দাবন আবার পূর্ণ হইবে। উদ্ধব কৃষ্ণের অধীন, উদ্ধব কি আনিতে পারে? আমি অধীন নহি, আমি জোর করিয়া লইয়া আসিব।" বলভদ্রের কথায় সকলের বিশ্বাস হইল। অবিশ্বাসের যে কোন কারণ নাই—ইনি বলভদ্র—ইঁহার বলের সীমা নাই, ইনি সঙ্কর্ষণ ও সুতরাং যাহা হইবার নহে, যাহা অসম্ভব, জোর করিয়া অবশ্যই তাহা করিতে পারেন। তার পর চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইমাস, তিনি ব্রজগোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় অবশ্য এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার সঙ্গিনী নহেন—ইঁহারা

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥

পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণে সমুজ্জ্বল রজনী, প্রস্ফুটিত কুমুদ পুষ্পের গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহ, যমুনার উপবনে (রামঘট্ট নামক প্রসিদ্ধ স্থানে) স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া বলরাম বিহার করিতে লাগিলেন।

সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের ইহাই দ্বিতীয় কথা। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার সময়েও বলরামের রাসক্রীড়ার প্রসঙ্গ আছে। দশম স্কন্ধের ৩৪ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই রাস করিয়াছেন।

যিনি রাসক্রীড়ার নায়ক, তিনি পরম প্রভু বা পরমপতি। সেই পরমপতি ব্যতীত রাসক্রীড়ার অধিকার কাহারও নাই, ইহাই তত্ত্ব। সুতরাং বলরামের যখন রাসক্রীড়া রহিয়াছে, তখন তিনিও পরম প্রভুত্বের অধিকারী—অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েই একতত্ত্ব, একই বস্তু—শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দেও তাহাই। কিন্তু, এই সঙ্কর্ষণদেবের বা বলরামের বা নিত্যানন্দের, এই প্রভু ভাব ব্যতীত আর একটি ভাব আছে, তাহার নাম দাস-ভাব। "মূর্ত্তিভেদে আপনি হয়েন প্রভু দাস।" যদিও তিনি প্রভু, কিন্তু মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়া দাসের কার্য্য বা সেবার কার্য্য করিয়া থাকেন। যাহা কিছু শ্রীভগবানের বা শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য প্রয়োজন, সমস্তই সেই অনন্ত, অর্থাৎ একই অনন্তদেব নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া, স্বয়ং নানা উপকরণ হইয়া ভগবানের সেবা করিতেছেন—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেইজনে॥

বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সেবাকার্য্যে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার নাম "শেষ"। যামুন মুনির বিরচিত একটি শ্লোক শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই কথাই আছে।

৯। সঙ্কর্ষণ ও লীলা

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের দ্বারাই শ্রীভগবানের লীলা প্রকট হইয়াছে। লীলা প্রকট করিতে হইলে, সেবার উপকরণ আবশ্যক। ভগবান স্বরূপে অনন্ত, বাক্যমনের অগোচর। তাঁহার লীলা এখানে, এই প্রপঞ্চে যে প্রকট হইবে, ইহার কোনই আশা ছিল না—এই সঙ্কর্ষণ দেবই লীলা-প্রাকট্যের জন্য যে যে উপকরণ আবশ্যক তৎসমুদয় যোগাইলেন, তাই লীলা প্রকট হইল। যামুন মুনির শ্লোক এই—

নিবাস শয্যাসন পাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবরণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ॥

আপনাকে লোকে শেষ বলিয়া থাকে, কারণ, বাসস্থান, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ছত্র প্রভৃতি সেবার সামগ্রীগুলি সমস্তই আপনার মূর্ত্তিভেদ মাত্র। আপনি সেবার শেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই সংসারে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে তাহারা সীমাবদ্ধ, ক্ষয়শীল ও অপূর্ণ। মানুষ যখন নিত্য, পূর্ণ ও অসীম শ্রীভগবানের অন্বেষণ করে তখন এই প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু, তাহা ছাড়িয়া, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে চাহে। এই এক প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতি। কিন্তু আর এক প্রকারের দৃষ্টি বা অনুভব-প্রণালী আছে। এখানে যাহা কিছু আছে তাহা খণ্ডিত ও অনিত্য হইলেও তাহাদের একটি নিত্য, পূর্ণ ও অখণ্ড ভাবমূর্ত্তি আছে। সেই নিত্য ও আদর্শস্থানীয় মৃত্যুহীন ভাবমূর্ত্তি আছে বলিয়াই এই ছায়ার জগতে নিত্যের ও ভাবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। যাবতীয় সেবার উপকরণের বা যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থের যে নিত্যমূর্ত্তি (Ideal Infinitude of the Eternal Type) তাহাই সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি, সেই কারণেই তিনি একই সঙ্গে এক ও বহু, তিনি সহস্রবদন ও সহস্রমস্তক। এই সঙ্কর্ষণই যথার্থ অনন্ত। এই অনন্তের বোধের উপরই নিত্যের প্রাকট্য বা লীলার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সঙ্কর্ষণকে লইয়াই লীলা। ইহাই লীলাবাদের শেষ সিদ্ধান্ত, সকলেই ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিবেন। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের সাধনসম্পদের সামঞ্জস্য আছে—ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। মহাবল

গরুড়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাহন, যিনি অতি অনায়াসে ও আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন তিনি অনন্তের অংশ। ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, ব্যাস, শুক, নারদাদি যাবতীয় ভক্ত, তাঁহারা অনন্তের পূজা করেন। তিনি আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর ও বৈষ্ণব; তিনি সর্ব্বদাই প্রেমরস আস্বাদনে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন।

১০। সঙ্কর্ষণ ও শেষ

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ইলাবৃত বর্ষে সঙ্কর্ষণ দেবের ভব ও ভবানী কর্ত্তৃক যে পূজা, তাহার কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। আবার পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে পাতালের তলে ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব শেষ-নামক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে প্রকারে অবস্থান করেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পাতালের মূলদেশে ভগবানের তামসী (তমোগুণের কার্য্য যে সংহার, তাহার প্রবর্ত্তয়িত্রী যে মূর্ত্তি, তমোময়ী মূর্ত্তি নহে। বিশ্বনাথ) অংশ আছে, তাহার নাম অনন্ত। সাত্বততন্ত্রনিষ্ঠ ভক্তগণ চতুর্ব্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাঁহারা ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি আমার' এই বোধ, ইহাই তাঁহার অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠানের দ্বারা তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যকে আকর্ষণ করেন। এই জন্যই তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। সহস্রশীর্ষ ভগবান্ তাঁহার এই অনন্ত মূর্ত্তির একটিমাত্র মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেখানে এই ভূমণ্ডলকে একটি শ্বেত-সর্ষপের ন্যায় দেখায়। প্রলয়কালে তিনি এই জগৎকে সংহার করিতে বাসনা করিয়া সঙ্কর্ষণ নামক একাদশ ব্যূহে রুদ্ররূপ ধারণ করেন। তখন তাঁহার ভ্রূযুগল ক্রোধে বিঘূর্ণিত হয়, আর তিনি ত্রিশিখ-শূল হস্তে লইয়া সমুত্থিত হন। তাঁহার চরণ-পদ্মে নখগুলি মণিদর্পণের ন্যায় ঝল্ ঝল্ করিতেছে—নাগপতিগণ ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করেন। নাগকুমারীগণ পরম ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। অনন্ত গুণসাগর ভগবান্ আদিদেব অনন্ত, কেবল প্রলয়কালেই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করেন, অন্যসময়ে তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মঙ্গলকর। সুর, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, উরগ ও মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার ধ্যান করেন, তাঁহার নয়নদ্বয় মদ দ্বারা সর্ব্বদা মুদ্রিত ও বিকৃত এবং বিহ্বল, তিনি সুললিত বাক্যের দ্বারা আশ্রিত দেবগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন। তাঁহার বসন নীলবর্ণ, কর্ণে কুণ্ডল, হস্ত দুইটি অতি সুন্দর, পৃষ্ঠদেশে হল। তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা।

১১। নারদ ও সঙ্কর্ষণ

দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় তুম্বুরুর সহিত সেই ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমা নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণাঃ যদীক্ষয়াসন্
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্ নানাঽধাৎ কথমুহবেদ তস্য বর্ত্ম।

এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতুরূপ সত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণের দ্বারা নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, যিনি একমাত্র সত্য হইয়া এই বিচিত্র প্রপঞ্চ আপনাতেই ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ অনন্তদেবের তত্ত্ব (প্রাপ্তিমার্গ) কে বুঝিবে ?

মূর্ত্তিঃ নঃ পুরু কৃপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যামাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ॥

তাঁহার তত্ত্ব অবোধ্য, কিন্তু তথাপি মুমুক্ষুজন তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাহার কারণ তিনি আমাদের ন্যায় ভক্তগণের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া আশ্রিত জনগণের মন বশীভূত করিবার জন্য শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-পরাক্রম মহাবল সিংহেরা শিক্ষা করিয়াছে।

যন্নাম শ্রুত মনুকীর্ত্তয়েদকস্মাদার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ॥

মহাপাতকীও যদি, অন্যের নিকট শুনিয়াই হউক, আর না জানিয়া দৈবক্রমেই হউক, অথবা পরিহাস করিয়াই হউক, তাঁহার নাম একবার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে নিজের কলুষ রাশি হইতে স্বয়ং শুদ্ধ হইয়া অন্যেরও কলুষরাশি বিনষ্ট করে। অতএব সেই মুমুক্ষু জন সেই ভগবান্ ব্যতীত আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ?

মূর্দ্ধন্যর্পিতমনুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো ভূগোলং সগিরি সরিৎ সমুদ্রসত্ত্বং।
আনন্ত্যাদবিমিত বিক্রমস্য ভূম্নঃ কোবীর্য্যান্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ॥

তাঁহার সহস্র মস্তক, তন্মধ্যে একটি মস্তকে সরিৎসাগর গিরি ও প্রাণিসমূহ-সমন্বিত, এই নিখিল ভূমণ্ডল অর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার বিক্রম অনন্ত ও অপরিমিত, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কেহ তাঁহার গুণরাশি বর্ণনা করিতে পারে না।

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো দুরন্তবীর্য্যোরু গুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি॥

ভগবান্ অনন্তের এইরূপ প্রভাব। তাঁহার বল, গুণ ও প্রভাবের অন্ত নাই। অথচ তিনি রসাতলের মূলে অধিষ্ঠিত হইয়া লোকস্থিতির জন্য লীলায় নিজের মস্তকের দ্বারা ভূমিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিরাধার।

শ্রীমদ্ভাগবতে সঙ্কর্ষণের পূজা ইলাবৃতবর্ষে ও পাতালে কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা আমরা আলোচনা করিলাম। এই সঙ্কর্ষণই বলরাম, আবার সেই বলরামই নিত্যানন্দ। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দচরিত্র সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান কথা আলোচনা করিলে আমরা সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত সম্বন্ধীয় শেষকথা বা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী প্রচলিত কথা জানিতে পারিব।

১২। নিত্যানন্দ-মিলন।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত নামে পরিচিত। সন্ন্যাসীর কথা সকলেই জানেন—আচার্য্য শঙ্কর এই প্রাচীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সংশোধিত করিয়া পুনর্গঠিত করেন। সন্ন্যাস-পন্থা বৈদিক। বৈদিক সন্ন্যাস পন্থাই তন্ত্রে অবধূত-পন্থা নামে পরিচিত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও অবধূত-পন্থা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই কথিত হইয়াছে। মুণ্ডমালা-তন্ত্রেও অবধূত-পন্থা সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদয় কথা পরে আলোচ্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী তৎকালীন ভক্তগণ কি ভাবে দেখিতেন, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

১৩৯৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। তিনি বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপেক্ষা বার বৎসরের বড়। এগার বৎসর পর্য্যন্ত তিনি পিতামাতার নিকট একচক্রা বীরচন্দ্রপুরে ছিলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর তাঁহার পিতা হাড়াই ওঝা (নামান্তরে মুকুন্দ পণ্ডিত) পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া আসিয়া পুত্রটিকে তাহার পিতার নিকট ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনে যাইতেছিলেন, ছেলেটিকে তিনি সঙ্গে লইলেন। বালক নিত্যানন্দ এই সন্ন্যাসী গুরুর সহিত ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিলেন—তীর্থ-পর্য্যটনের শেষে তিনি আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত গয়াক্ষেত্রে পূজ্যপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা লইয়া নবভাবে বিহ্বল হইয়া নদীয়ায় ফিরিয়া আসিলেন—নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর আর আনন্দের সীমা থাকিল না। নবদ্বীপে প্রেমামৃত-বন্যা উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক্ সেই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি গোপনেই নবদ্বীপে আসিলেন ও নন্দন আচার্য্যের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণকে বলিলেন—কোন মহাপুরুষ সত্বর নবদ্বীপে আসিতেছেন। তাহার পর একদিন মহাপ্রভুর দেহে হলধরের আবেশ উপস্থিত হইল। আবিষ্ট অবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন "মদ-আন, মদ-আন।" বাহ্য-জ্ঞান হইলে পর তিনি হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন "কে কোথায় আসিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া আইস।" হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত নবদ্বীপ খুঁজিলেন, কিন্তু কাহাকেও বাহির করিতে পারিলেন না। এইবার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিজেই বাহির হইলেন, "জয় কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে নন্দন আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন নন্দন আচার্য্যের গৃহে এক পুরুষরত্ন বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার অঙ্গের জ্যোতি 'কোটি-সূর্য্য-সম,' তাঁহার অবস্থা সকল সময়েই আবেশময়, তিনি ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা হাস্য করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর সহচর-গণ-সহ নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও বিশ্বম্ভরকে চিনিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অনিমেষ নেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে দেখিতেছেন

"রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ।

সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে পরিপূর্ণ-রূপে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের এই মিলন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচ্য। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম শুনিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম শুনিলেই তাঁহারা উঠিয়া পলায়ন করেন। যেমন অনেক লোক গোবিন্দের পূজা করেন কিন্তু শঙ্করকে মানেন না,

এবং শিবদ্বেষী হওয়ার জন্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান নিস্ফল হয় এবং তাহারা নরকে যায়, ইহাও ঠিক্ সেইরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে লইয়া অনেক সময়ে অনেক গোলমাল হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবমতের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিববিদ্বেষ বা শৈব সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ রকমের কলহ ছিল, মধ্বাচার্য্য শৈব ও বৈষ্ণব মতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাহা এই মধ্বসম্প্রদায়েরই শাখা। সুতরাং তাঁহার সম্প্রদায়ে শিববিদ্বেষ না থাকিবারই কথা। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবকে স্বীকার করার জন্য আপত্তি হইয়াছে। লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল-গ্রন্থে ইহার এক প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক শঙ্কর-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আপত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মণ্ডলীর মধ্যে হয় নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে লইয়া বরাবরই আপত্তি ছিল, ইহার আরও অনেক প্রমাণ আমরা পাইব।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলিলেন বর্ত্তমান অবতারে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বড়ই গূঢ়। এই কারণেই শ্রীবাস ও হরিদাস সারাদিন খুঁজিয়াও তাঁহাকে বাহির করিতে পারিলেন না। এস্থলে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাতালে অনন্তদেব বা সঙ্কর্ষণদেব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহার শেষ অংশে আমরা জানিয়াছি যে এই অনন্তদেবের মহিমা দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সভায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় এই ব্রহ্মাই হরিদাস আর শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ। এবারে সেই দুইজনই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইলেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য কথা, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্য ভাগবত পড়িয়া এরূপ অনুমানও করা যায় যে ইঁহারা দুইজনে নন্দন আচার্য্যের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বেশভূষা বা ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনিই যে সেই মহাপুরুষ, যাঁহার কথা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কাজেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই বাহির হইলেন এবং তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বাহির করিলেন।

পুরাতনকে তাহার পুরাতনত্বের মধ্যে চিনিয়া লওয়া বেশী কঠিন নহে, কিন্তু তিনি

নূতনের মধ্যে কিভাবে কোথায় রহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা বড় কঠিন। আমরা বাহিরের লক্ষণ লইয়াই থাকি, এবং বাহ্য লক্ষণের দ্বারা সমুদয় বস্তুকে চিনিয়া লইতে চাই। কিন্তু যে বস্তু চৈতন্যরূপ বা যাহা তত্ত্ব বস্তু, তাহা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করিয়া যাহারা বাহিরের পুরাতন চিহ্ন ও লক্ষণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা আর সত্যের সন্ধান পাইবে না। লীলাবাদের ইহাই প্রথম কথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ যেদিন তিনি গোচারণের মাঠে রাখাল বালকগণের মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে বসিয়া তাহাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছিলেন, সেদিন বেদপতি ব্রহ্মাও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। তিনি শিশুবৎস লুকাইয়া রাখিয়া কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেদিনের সেই দম্ভের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই আজ তিনি হরিনাম মহামন্ত্রের প্রচারক হরিদাস-রূপে আবির্ভূত—শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ। শ্রীমদ্ভাগবতে পাইয়াছি একদিন ইঁহারাই সঙ্কর্ষণ তত্ত্বের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরই বোধ ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার অনুমোদন আর নারদের প্রচার, এই দুইকে আশ্রয় করিয়া ইলাবৃতবর্ষের ভবভবানী-সম্পূজিত, আর পাতালের নাগকন্যাগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে সংসেবিত, সেই সংকর্ষণ তত্ত্ব আমাদের ভারতবর্ষের সামগ্রী হইলেন। এই সঙ্কর্ষণ ব্যতীত লীলা হয় না। সঙ্কর্ষণই অনন্ত ; কিন্তু এই প্রকাশিত বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত অনন্ত নহেন, সমগ্র বিশ্বকে কারণরূপে বা নিত্যরূপে আপনার মধ্যে তিনি সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং এই সঙ্কর্ষণকে বাদ দিলে প্রপঞ্চে লীলার প্রাকট্য একেবারেই সম্ভব হয় না, কারণ তাহা হইলে এই প্রপঞ্চে নিত্যের স্থান হয় না। এই কারণে অনন্তই সঙ্কর্ষণ, তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বলের সীমা নাই, তিনি রমণীয়, সকলের আনন্দদায়ী, এই কারণে তিনি বলরাম। আজ তাঁহার শেষ লীলা, আজ তিনি শ্রীনিত্যানন্দ রূপে আসিয়াছেন, নন্দন আচার্য্যের গৃহে রহিয়াছেন, শ্রীবাস ও হরিদাস তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। তার পর কি হইল ? শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বলিলেন—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥
না বুঝি যে নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় বড় বাধ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আজ এই জন্যই আসিয়াছেন, কত যুগে কত মন্বন্তরে, কল্পে কল্পে শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণের, কত দ্বীপে, কত বর্ষে, কত প্রকারের লীলা হইয়া গিয়াছে। লীলা পুরাতন ঘটনা নহে, লীলা নিত্য বা নিত্য-নূতন। আজও অনেক লীলা হইতেছে, আরও অনেক লীলা হইতে পারে, প্রয়োজন হইলে হইবে। সেই সমুদয় প্রাচীন কালের লীলা-সমূহের নায়কগণ আজও খেলা করিতেছেন বা খেলা করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু আমরা যে সংসারে সংসার দেখিতেছি, আমি আমাকে দেখিতেছি, "তত্ত্বতঃ" অর্থাৎ নিত্যসত্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ সে চৈতন্য নাই, যে চৈতন্যকে আমরা পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া বুঝিব, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাহায্য বা কৃপা না পাইলে, লীলার রহস্য বুঝিবার উপায় নাই। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন—

"চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে"

এই কারণেই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ও কলিহত নরনারীকে কাতর প্রাণে বলিতেছে,

'ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নাম।' এই চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি এই নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানিতেন, কিন্তু তত্ত্ব জানিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার কারণ কি ? "কোন কৌতুকে কারণে।" তত্ত্ব হইতে লীলায় আসা, অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্যকে এই বিশেষের মধ্যে ক্রীড়ান্বিত অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। চৈতন্যের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-ব্যতীত কি প্রকারে হইবে ?

এইবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে চিনাইয়া দিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি বিশেষ শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন—শ্রীবাস পণ্ডিত এই শ্লোক পাঠ করিলেন—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ শ্রবণযুগলে কর্ণিকার কুসুম, কনক-কপিশ বস্ত্র পরিধান, গলে বৈজয়ন্তী

মালা, নটবরবেশ শ্রীকৃষ্ণ গোপবৃন্দসহ অধর সুধায় বেণুরন্ধ্র, পূর্ণ করিয়া আপনার চরণচিহ্ন-অঙ্কিত রতিজনক পরমস্থান শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন— আর গোপগণ তাঁহার গুণগাথা গান করিতে লাগিলেন।

এই শ্লোক শ্রবণমাত্রেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অচেতন হইয়া পড়িলেন—উন্মাদ বাড়িতে লাগিল, সে কি সিংহনাদ, সে কি আছাড়—হাড় যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আনন্দের সীমা নাই, শ্রীবিশ্বম্ভরের মুখের প্রতি চাহিয়া ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, আবার কখন বাহুতে তাল ঠুকিতেছেন। এই প্রকারের 'কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ' দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। কাহারও সাধ্য নাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিবারণ করেন। শেষে মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে কোলে লইলেন, তখন তিনি নিস্পন্দ হইলেন।

যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই ভাবাবেশ দেখিয়া সকলেরই অন্তরে নিত্যানন্দের সঞ্চার হইল। এইবার মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিলেন—"আপনি ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি, আপনার ভজনা না করিলে লোকে কৃষ্ণভক্তি পায় না। আপনার চরিত্র অগম্য ও অচিন্ত্য। তিলার্দ্ধের জন্যও আপনার সঙ্গ হইলে জীব কোটি পাপ হইতেও অনায়াসে পরিত্রাণ পায়। আমি বুঝিলাম কৃষ্ণ আমায় উদ্ধার করিবেন—তাই আপনার সঙ্গ লাভ করিলাম।" তাহার পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোথা হইতে আসিলেন, মহাপ্রভু তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায় অতিশয় চঞ্চল, মহাপ্রভু তাঁহার স্তুতি করায় যেন অতিশয় লজ্জিত হইলেন। লজ্জা-বিজড়িত-স্বরে বলিলেন—"অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিলাম, কৃষ্ণের প্রাচীন স্থান-সমূহে অন্বেষণ করিলাম—স্থানগুলি রহিয়াছে কিন্তু কৃষ্ণকে কোথায়ও দেখিতে পাইলাম না। শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসনসমূহ আচ্ছাদিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভাল লোককে জিজ্ঞসা করিয়া জানিলাম কৃষ্ণ গৌড়দেশে গিয়াছেন। তাই এখানে আসিলাম।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে রহিলেন—তাঁহার প্রথম কার্য্য ব্যাস-পূজা। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রায়ই কলহ হইত—এই কলহকে একটা বাহ্য ব্যাপার

বা একটি ক্রীড়ামাত্র বলা হইয়াছে। যাহা হউক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায়, নিজের হাতে ভাত তুলিয়া খাইতে পারেন না—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনী দেবী মায়ের মত তাঁহাকে যত্নে পালন করেন, এবং ভাত খাওয়াইয়া দেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—"তুমি এই অবধূতকে কি জন্য স্থায়ীভাবে ঘরে রাখিয়াছ? ইহার জাতিকুলের স্থিরতা নাই, তুমি অতিশয় উদার প্রকৃতির লোক। কিন্তু তুমি যদি নিজের জাতিকুল রাখিয়া সমাজে চলিতে চাও তাহা হইলে এই অবধূতকে বাড়ি হইতে সরাইয়া দাও।"

ইহা অবশ্য মহাপ্রভুর পরীক্ষা। কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের সহিত মিশিয়া গেলেও সামাজিকগণ তাঁহাকে মোটেই ভাল চক্ষে দেখিতেন না, তাঁহার আচার ব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি সমস্তই অন্য রকমের, আমাদের প্রচলিত রীতি-নীতির সহিত তাহার মিল নাই। সকলেই শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় উদার প্রকৃতির লোক নহেন—অনুদার ও সঙ্কীর্ণচিত্ত লোক সমাজের ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত, তাহাদের সাহস নাই, সত্য যদি কোন নূতন বা অপ্রচলিত মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাহারা সে সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় এই প্রকারের আর একটি ঘটনা ইহার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। হরিদাস ঠাকুর যবন বলিয়াই সমাজে পরিচিত ছিলেন—শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একজন প্রাচীন ও পদস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি হরিদাসকে যখন নিজের গৃহে রাখিলেন—তখন এই প্রকারের একটা সামাজিক আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সে আন্দোলনকে গ্রাহ্য করেন নাই, অধিক কি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়া বলিয়াছিলেন "ইনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, কারণ ইনি ভক্ত।"

যাহা হউক মহাপ্রভু যে পরীক্ষা করিতেছেন, ইহা শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝিলেন এবং মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভো! আমি সামান্য ব্যক্তি, আমাকে এ প্রকারে পরীক্ষা করা আপনার পক্ষে সঙ্গত নহে। একদিনের জন্যও যিনি আপনার ভজনা করেন, তিনি আমার প্রাণ স্বরূপ। নিত্যানন্দ আপনার দেহ। এই নিত্যানন্দ যদি মদিরা ও যবনী

ধরেন, আমার জাতি, প্রাণ, ধন সমস্তই যদি বিনাশ করেন, তথাপি আমার চিত্তে কোন বিরুদ্ধভাব জাগিবে না।

শ্রীবাসের কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিলেন—"পণ্ডিত, লক্ষ্মী যদি কখনও নগরে নগরে ভিক্ষা করেন, তাহা হইলেও তোমার ঘরে কখন দারিদ্র্য হইবে না। তোমার বাড়ীর কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত আমাতে অবিচলা ভক্তি লাভ করিবে। তোমার হস্তে আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় এই শ্রীনিত্যানন্দকে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।"

১৩। শ্রীনিত্যানন্দ রহস্য

শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে বিহার করিতে লাগিলেন, কখনও তিনি গঙ্গার অগাধ জলে মহাস্রোতে নির্ভয়ে সাঁতার খেলেন, কখনও বালকগণের সহিত নিতান্ত চপলভাবে খেলা করিয়া বেড়ান। বালক ও স্ত্রীলোকগণের সহিত তাঁহার ব্যবহার সকলের চক্ষে বেশ ভাল লাগিত না। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী তাঁহাকে ছোট ছেলের মত হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিতেন, শচীমাতা তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। নিত্যানন্দ বালকের ন্যায় সরল ও চপল, কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ত্রিশ বৎসরের উপর, সুতরাং তাঁহার স্ত্রীলোকগণের সহিত এই বালকের মত ব্যবহার সকলের চক্ষে ভাল লাগিত না। তাহার পর তাঁহার জাতি কুলের যে ঠিকানা নাই, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ বালকভাবে শচীমাতার চরণ ধরিতে যাইতেন আর শচীমাতা পলাইয়া যাইতেন।

স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার ব্যবহার যে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত না এবং সে সম্বন্ধে লোকে যে নানারূপ প্রতিকূল সমালোচনা করিত, তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি স্থান পড়িয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আলোচনা নহে, শ্রীবলরামের রাসের বর্ণনা হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলরামের এই রাস বর্ণনায় অবশ্য বারুণী মদ্যপানেরও প্রসঙ্গ আছে। যাউক, সে দ্বাপরযুগের কথা। বলরাম-সম্বন্ধেও দ্বাপরযুগে আপত্তি হইয়া থাকিবে—যাহা হউক বলরামের রাসক্রীড়ার প্রমাণ দেওয়া উপলক্ষে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তারাও রামের রাসে করেন স্তবন॥

যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে এক তত্ত্ব কৃষ্ণ-হলধরে॥
চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত॥
মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখি পুরাণ।
বলরাম রাস-ক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥

উদ্ধৃত অংশের আলোচনাতেই অনেক কথা পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ বলরামের চরিত্র "চারিবেদে গুপ্ত"—পুরাণে অবশ্য ইহা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু লোকেরা মূর্খ, তাহারা গভীররূপে পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনা করে না। বলরামের চরিত্র যে কিছু অসাধারণ রকমের, সাধারণ মানুষের যাহা প্রচলিত ধারণা সেই ধারণার মাপ কাঠিতে তাঁহাকে মাপিবার উপায় নাই. যাহারা গতানুগতিক ও অনুদার, বাহিরের ছোট খাটো বিচারের তুলাদণ্ড লইয়া যাহারা বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা বলরামকেও বুঝিতে পারে নাই, শ্রীনিত্যানন্দকেও তাহারা বুঝিতে পারে নাই। মুনিরা স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করেন, এই এক সামাজিক ধারণা, বলরাম রাস করিলেন, মুনিগণ তাহার বন্দনা করিলেন, আর দেবতারা সেই রাসে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। কি বলিবেন? শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় "তেজীয়সাং ন দোষায়" যাহারা তেজস্বী তাহাদের দোষ নাই, অথবা সব লোককে এক রকমের মাপ কাঠি দিয়া মাপিতে নাই—সত্য বুঝিতে হইলে কেবল বাহিরের লক্ষণের দ্বারা বিচার করিতে নাই। বলরাম সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহার কথার ভিতর আর একটি কথা রহিয়াছে, তাহাও বেশ ভাল করিয়া ভাবিবার ও বুঝিয়া দেখিবার। চারিবেদে যাহা গুপ্ত, পুরাণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্ব সন্দর্ভে বলিয়াছেন, যিনি বেদের অর্থ পূরণ করেন, তিনি পুরাণ, বেদার্থের পূরণ বলিতে কি বুঝায় তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক বিরোধের যুগে বৈষ্ণব মতকে অনেকে অবৈদিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধনও শ্রীনিত্যানন্দে আপত্তি হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের উপাসনা বা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের উপাসনা যে প্রাচীন

ভাগবত মত, তাহা মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানেই পাওয়া যায়। যাহা হউক এই সমুদয়ের প্রমাণের দ্বারা কোন মীমাংসা হইবে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সময়ে অনেকের নিকট কিভাবে প্রতীত হইয়াছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রাচীন সন্ন্যাস-পন্থায় সমাজে স্ত্রীলোকের যে বিশেষ কোন উচ্চস্থান ছিল, তাহা মনে হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেমভক্তির পথ সার্ব্বজনীন আকারে প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহাতে স্ত্রীলোকের স্থান অতিশয় উচ্চ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। "ব্রজগোপীদের আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" "রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা" ব্রজবধূগণের কল্পিত পরম রমণীয় যে উপাসনা-পদ্ধতি তাহাই যখন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া ঘোষিত হইল, তখন স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা যে কতদূর বাড়িয়া গেল তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এই মত প্রচারের যখন প্রধান সহায় ও অবলম্বন হইলেন, তখন মতদ্বৈধ হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহার সে সময়ে অনেকের নিকট একটি ভীষণ রকমের বিদ্রোহ বলিয়া মনে হইয়াছিল—অবশ্য গতানুগতিককে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্রই এক নব জীবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস জাগাইয়া তুলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কলিযুগকে ধন্য করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর সকলই মধুর, মাধুরীই তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বস্ব—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতেও মাধুরী এবং করুণা অসীম, কিন্তু এই মাধুরী ও করুণার সহিত একটা তেজস্বিতা ও উদ্দামভাব ছিল—এই কারণেই নিত্যানন্দ প্রভুকে যথার্থরূপে গ্রহণ করা গতানুগতিকের অনুবর্ত্তী দুর্ব্বল প্রকৃতির ও ভীরু স্বভাবের লোকের পক্ষে কঠিন ছিল। অবশ্য মহাপ্রভুকে যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা যে কেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অস্বীকার করিলেন, তাহা নহে, কিন্তু সাধারণ লোকে এত বড় একটা নূতন বস্তু একেবারে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন—অন্তরঙ্গ ভক্তগণ যে সময়ে প্রত্যেক রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহে নব নব ভাবের আবেশ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, ইনিই শ্রীভগবান্, আজ দাস্য ভাব জগতে প্রচার করিবার জন্য নিজে ভক্তের ভাব লইয়া আসিয়াছেন, সেই সময়ে নবদ্বীপে একটি অতি প্রবল বিরোধীদল গড়িয়া উঠিল। তাহারা নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল, ভক্তগণকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

লোকে বলিতে লাগিল, ইহারা জাতিভেদ মানে না, ইহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, ইহারা মদ খায়, ইহারা তান্ত্রিকী সাধনার দ্বারা পঞ্চকন্যা ও নানাবিধ ভোগের সামগ্রী আনিয়া রাত্রিতে আমোদ প্রমোদ করে; ইহাদের এই সব দৌরাত্ম্যের দ্বারা অনাবৃষ্টি ও শস্যহানি হইতেছে, অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি উপস্থিত হইবে, ইহাদের কিছুতেই প্রকৃতিস্থ করিতে পারা গেল না, এখন রাজদ্বারে অভিযোগ করা আবশ্যক। এই প্রকারের বিরুদ্ধ ভাব যখন জাগিয়া উঠিল, তখন বেশীর ভাগ আক্রোশ হইল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর।

কেহ বলে "ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত।"
* * * *
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বাড়ীতে অতিথি করিয়া রাখার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের উপরও লোকের আক্রোশ হইল—

শ্রীবাস বামন এই নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি লইয়া ফেলাইব সোঁতে॥
ও বামন ঘুচাইল গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই এ সমুদয় জানিতেন, সেই কারণেই তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে যেদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণুর খট্টাতে বসিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, যাহা সাতপ্রহরিয়া ভাব নামে পরিচিত, সেদিন সেই অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীতে স্ত্রীলোকও ছিলেন—

পতিব্রতাগণ করে জয় জয় কার।
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সভার।

শ্রীবাস পণ্ডিতের একজন দাসী, তাহার নাম ছিল দুঃখী, সে জল বহিতেছিল, মহাপ্রভু সেদিন তাহার নাম দিয়াছিলেন সুখী।

কেবল সাধারণ লোক নহে সে সময়ে যাঁহারা সমাজে পদস্থ ও পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাঁহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহাকে দলে লইয়া পরম আদরে তাঁহার সহিত মাতামাতি করার জন্য ভক্তগণের নিন্দা করিতেন, ইহা ভক্তেরা ও তাঁহাদের মণ্ডলীর যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা সকলেই জানিতেন। কিন্তু এই আলোচনায় তাঁহারা বিরক্ত হইতেন না এবং এই নিন্দা বেশ কৌতুকের সহিত শ্রবণ করিতেন। জগাই মাধাই উদ্ধারের পর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়া গঙ্গার জলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীগদাধর জল খেলা করিতেছিলেন। গদাধরের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের আর নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈত প্রভুর জলখেলা চলিতেছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চোখে এমন জল দিয়া দিলেন যে অদ্বৈত প্রভু খেলাতে বেশ ভাল রকম পরাস্ত হইলেন, তিনি অনেকক্ষণ, চোখ মেলিতে পারিলেন না। সেই অবস্থায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বলিতেছেন—

নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত সংহতি বিহরে॥

আর একবার জলখেলায় হারিয়া অদ্বৈত প্রভু বলিলেন—

পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কোথা না জানে কোথাত॥
মাতা পিতা গুরু নাহি না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল বোলায় অবধূত॥

জগাই মাধাই উদ্ধারের ঠিক্ পূর্ব্বে ভক্ত-মণ্ডলীতে যখন উহাদের কথা এবং প্রথম দিন হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাতের কথা হয়—তখন শ্রীঅদ্বৈত

প্রভু হরিদাসকে কৌতুক করিয়া বলেন—"জগাই মাধাই মাতাল, নিতাইও মাতাল, মাতালের সঙ্গে মাতালের মিলন হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি হরিদাস, তুমি নৈষ্ঠিক, তুমি কি জন্য মাতালের দলে যাও। এই নিত্যানন্দ সকলকেই মাতাল করিবে, আমি উহাকে খুব ভাল করিয়া জানি। দুই তিন দিন পরে দেখিবে নিতাই ঐ দুইজন মাতালকে আমাদের দলের ভিতর লইয়া আসিবে।"

নিত্যানন্দের এই মাতাল-সুখ্যাতি অনেকবার শুনিতে পাওয়া যাইবে, কেন এ সুখ্যাতি তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। মাতাল মদ খায়, মদের প্রভাবে কিছুক্ষণ একটা সামান্য আনন্দ পায়, কিছুক্ষণ বেশ বিহ্বল হইয়া থাকে। আমরা মাতালের যতই নিন্দা করি, সংসারের সাধারণ হিসাবী ও পরনিন্দক লোক অপেক্ষা তাহারা যে অনেক ভাল, তাহা জগাই মাধাই উদ্ধারেই বুঝিতে পারা যায়। মাতাল আনন্দের কাঙাল। তাহাকে ঘৃণা করিবেন করুন, কিন্তু সে ঘৃণার পাত্র নহে, সে করুণার পাত্র। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছিল। যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত তাহারা গম্ভীর হইয়া নিজেদের শুচিতার অহঙ্কার লইয়া পৃথক্‌ভাবে বসিয়া থাকিত, কাহারও সহিত মিশিতে ঘৃণা বোধ করিত। সংসারের সাধারণ মানুষ আনন্দ চায়, আনন্দে মত্ত ও বিহ্বল হইতে চায়—ইহা তাহাদের স্বভাব। আর ধার্ম্মিক লোকেরা তাহাদের সেজন্য তিরস্কার করে। সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা, অর্থাৎ ধার্ম্মিক পণ্ডিত সাধু ও প্রধান প্রধান লোকেরা যখন ধর্ম্মের নামে বিষণ্ণ ও মলিন বদনে নিরানন্দের অন্ধকারে নিস্তব্ধভাবে একা একা বসিয়া, আর সাধারণ জনশ্রেণী বিষয়ানন্দ ও তদপেক্ষা নিম্নতর মাদক সেবনাদি জনিত ঘোর তামসিক আনন্দে আত্মহত্যার পথে ধাবিত, সেই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। তাঁহাকে যে দেখিবে সে যদি সরল প্রকৃতির লোক হয় তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, ইঁহার সমগ্র জীবনটাই বিশুদ্ধ আনন্দ। কি যে ভাবের অমৃত পানে তিনি নিয়ত বিহ্বল তাহা কে বলিবে, তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান নাই, তাঁহার পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহার স্ত্রীর সহিত বাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিয়াছেন আর শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত দিগম্বর হইয়াই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে বালকের মত ভাব, কিন্তু বয়সে বালক নহেন। বালক বলুন, উন্মাদ বলুন, সকল সময়েই বিহ্বল, মাতিয়াই আছেন। মাতাল মদ খাইয়া হৈ হৈ করিতেছে, আর

বড়-মাতাল নিতাই "হরি হরি" বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে ও নাচিতে নাচিতে তাহাদের দলে গিয়া মিশিলেন—তাহারা নিতাইকে আপনার লোক বলিয়াই দলে লইল—তাহারা হৈ হৈ করিতেছিল, এখন 'হরি হরি ! করিতে লাগিল। শেষে তাহারা ভাবিল আমাদের মদের নেশা ছাড়িয়া যায়, তখন অবসাদ আসে আর এই নিতাই মাতালের নেশা ছাড়ে না। তাহারা ভাবিল এই বড়-মাতালটি কোন্ ভাটিতে মদ খায় তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ক্রমে ক্রমে তাহারা নিতাইএর ভাটির মদ খাইতে পাইল ও ধন্য হইল।

ধার্ম্মিক লোক, পণ্ডিত লোক ও সাধু লোক, কে এমন করিয়া নিম্নশ্রেণীর মাতালের দলে মিশিয়া তাহাদের টানিয়া আনিয়া আপনার করিবে ? সাধু লোকেরা যে তাহাদের ঘৃণা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে নিজেরা পবিত্র হইয়া থাকিতে চায় ! সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের এই ভাব তাহাদের নিকট নিতান্তই নূতন ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু নিত্যানন্দ যে সঙ্কর্ষণ।

সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের কথা বলিয়াছি—সঙ্কর্ষণ তিনি, যাঁহার ভিতরে বিশ্বের সকলেরই চির-বিশ্রামের স্থান আছে—সঙ্কর্ষণ তিনি, যিনি বিশ্বের কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি সঙ্কর্ষণ ছাড়া লীলা হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ যে নূতন ভাব বা ধর্ম্মজীবনের যে নূতন আদর্শ আনিলেন তাহাই যে সঙ্কর্ষণ ভাব ইহা বুঝিয়া লইবেন। বৈদিক ধর্ম্ম কোন সময়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তখন বৈদিক ধর্ম্মের সাধকগণ সঙ্কর্ষণের তত্ত্ব বুঝিতেন না। ইলাবৃত বর্ষের ভব-ভবানীর আরাধনা, পাতালে নাগবধূগণের আরাধনা হইতে নারদ এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বকে সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার সভায় আনিলেন। এই নারদই কলিতে শ্রীবাস পণ্ডিত তাহা মনে রাখিতে হইবে। আর বেশী কথায় প্রয়োজন নাই, ভক্তগণ আস্বাদন করিবেন।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় মাধাই উদ্ধার হইলেন, উদ্ধার হওয়ার পর তিনি অবশ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বুঝিলেন। এই অবস্থায় তিনি একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর

বন্দনা করিতেছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই স্তবের ভিতরে সঙ্কর্ষণ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং বৈষ্ণব-সাধনার সহিত তাহার সম্পর্ক কথিত হইয়াছে —এই স্তবে আলোচনার অনেক বিষয় আছে—সেই স্তবের মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

১৪। 'জগাই মাধাই' এর স্তব

১। তুমি বিষ্ণু, পালন কর। ২। তুমি অনন্ত, ভুবনকে ফণায় ধারণ কর। ৩। তোমার কলেবর ভক্তির স্বরূপ। ৪। পার্ব্বতী-শঙ্কর তোমাকে সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করেন। ৫। ভক্তিযোগ তোমার, তুমিই তাহা দান কর। ৬। তোমা অপেক্ষা চৈতন্যের প্রিয় আর কেহ নাই। ৭। গরুড় মহাবলী, তিনি কৃষ্ণকে বহন করেন, সে তোমারই কৃপায়। ৮। অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গান কর ও কৃষ্ণভক্তি বুঝাইয়া দাও। ৯। নারদ তোমার গুণ গান করেন। ১০। তোমার যাহা কিছু সমস্তই চৈতন্যের সম্পদ। ১১। তুমি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলে। ১২। জনক যে মহাজ্ঞান পাইয়াছিলেন সে তোমারই কৃপায়। ১৩। তুমি সর্ব্বধর্ম্মময় পুরাণ পুরুষ, বেদ তোমাকে আদিদেব বলেন। ১৪। তুমি জগৎ-পিতা ও মহা-যোগেশ্বর। ১৫। তুমি লক্ষ্মণ ও মহাধনুর্দ্ধর। ১৬। তুমি পাষণ্ড-ক্ষয়কারী রসিক আচার্য্য। ১৭। চৈতন্যের সমুদয় কার্য্য তুমিই জান। ১৮। মহামায়া তোমার সেবিকা। ১৯। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার পদছায়া কামনা করে। ২০। তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি এবং তুমি চৈতন্যের মহাশক্তি। ২১। চৈতন্যের শয্যা খট্টা প্রভৃতি সমস্তই তুমি। ২২। পতিতের ত্রাণকর্ত্তা, পাষণ্ড দলন।

২৩। তুমি সে করহ প্রভু বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা ॥

২৪। ক্রোধকালে তুমি রুদ্র। ২৫। সকল করিতেছ, অথচ কিছুই কর না। ২৬। তোমার বিগ্রহ পরম কোমল ও সুখময়, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে শয়ন করেন। ২৭। মহারাজা চিত্রকেতু তোমার সেবা করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়াছেন। ২৮। শৌণিকাদি ঋষি নৈমিষারণ্যে তোমারই সেবা করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝিলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের

প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে, এবং বৈষ্ণবজীবন কি আদর্শে ও কি প্রণালীতে গঠন করা আবশ্যক তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। সুতরাং পূর্ব্বের ঐ আটাশটি কথা ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। ইহার ভিতর ইতিহাস আছে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনার যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ও সমন্বয় চলিতেছে তাহার আভাস আছে—আর আমরা কোন্ পথে চলিব ও কি করিব তাহারও উপদেশ আছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস যে সত্যই ব্যাসাবতার এই সমুদয় অংশ বিশেষরূপে আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যে স্তব মাধাই কর্ত্তৃক কথিত হইল, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দের যে সমুদয় মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, সেগুলি যে ইচ্ছামত অর্থাৎ যখন যেটি মনে পড়িয়াছে, তখন সেটি বলা হইয়াছে তাহা নহে। মানব-জাতি একদিনে হঠাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপের এই অপূর্ব্ব পরিচয় যাহা শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের লীলায় প্রকটিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পায় নাই। এই পরিচয় লাভের একটি ইতিহাস আছে। যুগের পর যুগ যাইতেছে, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর যাইতেছে, অস্ফুট সচ্চিদানন্দ এই জীব ক্রমশঃ জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে প্রস্ফুট হইতেছে। জীবচৈতন্য যেমন বিকশিত হইতেছে, লীলাময় শ্রীভগবানের স্বরূপের গভীর হইতে গভীরতর পরিচয় সেই পরিমাণে তাহার চিত্ত-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জীবের সমষ্টি চৈতন্যে (In the total consciousness of the phenomenal universe) ক্রমে ক্রমে বিভুচৈতন্য শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রতিফলিত হইতেছে। এই ক্রমিক প্রতিফলন ক্রিয়া অগ্রসর হইতে হইতে সর্ব্বশেষে শ্রীরাসমণ্ডলের মহা সঙ্কীর্ত্তনের মহামিলন হইবে; ইহাই লক্ষ্য, ইহাই শেষ কথা। শ্রীবৃন্দাবনে ও নদীয়ালীলায় আমরা এই শেষ কথার বা ভক্ত ভগবানের পূর্ণমিলনের শেষ দৃশ্যের দ্বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব। কিন্তু এই যে চরমমিলন, ইহা একদিনে অকস্মাৎ হয় নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় তাঁহার শ্রীল লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে এই মিলনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। একদিকে ভক্ত আর একদিকে ভগবান্, উভয়ে ক্রমশঃ কাছাকাছি হইতে হইতে চরমে পরম লক্ষ্য সাধিত হইল, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। তত্ত্বের দিক্ হইতে ইহাই শেষ কথা, কিন্তু জগজ্জীবের প্রাপ্তি বা উপভোগের কথা ভাবিতে গেলে আর একটু বাকি থাকিল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এখনও জগতের সকলের হইলেন না।

এইটুকু না হইলে শ্রীবৃন্দাবনের লীলাই যে পূর্ণ হয় না, তাই নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের লীলা।

সাধারণ লোক অজ্ঞ, কাজেই তাহারা একজন গৌরাঙ্গ, একজন নিত্যানন্দ, একজন অদ্বৈত, এই প্রকারে লীলার পরিকরগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখে, কাজেই লীলা বুঝিতে পারে না। লীলা বুঝিতে গেলে এইটুকু জানিতে হইবে যে ইঁহারা অভিন্ন ও ভিন্ন। প্রকট হইয়া ইঁহারা যেন পৃথক্, এইভাবে কার্য্য করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে আনন্দ কন্দলও হইতেছে, কিন্তু স্বরূপে, এক মহাপ্রভু, দুইপ্রভু, আর গদাধর ও শ্রীবাস, এই পঞ্চতত্ত্ব, ইঁহারা এক। অর্থাৎ এই পঞ্চতত্ত্বকে এক সঙ্গে একই তত্ত্বরূপে যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবেন, তাঁহারাই ভগবৎ-স্বরূপের সেই পূর্ণ পরিচয় (That perfected conception of the Divine in sport) পাইবেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার দ্বারা জগজ্জীবের ধারণায় বা অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু এই পূর্ণ পরিচয় একদিনে হঠাৎ মানব-হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। এই উপলব্ধির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ আছে। নানা ভাবের ভাবুক, নানারূপ সাধন-পথের পথিক সেই এক পরমার্থ বস্তুকে পাইবার জন্য নানা পথে অগ্রসর হইয়াছেন, নিজ নিজ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই পথিকগণের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, কেবল বাহিরের দেখা সাক্ষাৎ নহে, হৃদয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাহাদের মধ্যে আদান প্রদানও হইয়াছে। এই প্রকারে নানা দিক্ হইতে একলক্ষ্যের অভিমুখী তীর্থযাত্রীগণের যে ক্রমিক মিলন, তাহাই অবলম্বন করিয়া সেই মহামিলনের বা মহারাসের রসিক নাটুয়া নিজের পরিচয় অল্পে অল্পে প্রকট করিয়াছেন। তাহার পর একদিন যেন তীর্থযাত্রীগণের মহামিলন তাহার পূর্ণাবস্থায় আসিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশে আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাইব, নদীয়ার মহাসঙ্কীর্ত্তনে ও জগন্নাথের রথে আমরা এই দৃশ্য দেখিতে পাইব।

সমষ্টি-চৈতন্যে এই লীলাময় তাঁহার স্বরূপের অন্তরতম মাধুর্য্যের পরিচয় যে প্রণালীতে অর্থাৎ যে সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়া প্রকট করিয়াছেন, ব্যষ্টি-চৈতন্য যে সাধক জীব, তাহারও হৃদয়ে তাঁহার পূর্ণতম পরিচয়, প্রায়শঃ সেই সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়াই উপস্থিত হইবে। এই বিশ্বের জীবনের ইতিহাস আছে—পুরাণে সেই ইতিহাস ঋষিরা বর্ণনা করিয়াছেন,

আমাকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে সেই ইতিহাসের যাহাতে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহাই করিতে হইবে—এই প্রকারে বিশ্বের জীবন আমার জীবন হইবে—এবং আমার জীবন ভরিয়া বিশ্বনাথের লীলাতরঙ্গ নাচিয়া উঠিবে।

এই সিদ্ধান্তটি পৌরাণিক সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা। এই তত্ত্বটি ভালরূপে বুঝিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যে স্তব মাধাই কর্ত্তৃক কথিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রথমেই মাধাই বলিলেন—তুমি বিষ্ণু, তুমি বিশ্ব পালন কর। ইহাই মূলসূত্র (Nucleus)। এইজন্যই 'বৈষ্ণব' এই নামটি এত সাধারণ। কেহ লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করেন, কেহ সীতারামের আরাধনা করেন, কেহ রুক্মিনীকান্তের, কেহ বাল-গোপালের কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ নাম "বৈষ্ণব।"

শক্তি-উপাসনার তৃতীয়স্তর বা শেষস্তর শ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে আলোচনা করিলে দেখিবেন, সেই এক কথা—বৈষ্ণবী-শক্তির আরাধনা। বিষ্ণু আর বৈষ্ণবী শক্তি,—শক্তি ও শক্তিমান্ যখন অভেদ, তখন ইহার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করি কেন? বৈষ্ণবী তাহার পর নারায়ণী। বৈদিক কোন ক্রিয়া করিতে গেলে প্রথমেই আচমন, আর সেই আচমনে 'বিষ্ণুর পরম পদ' চিন্তা। আবার রায় রমানন্দের সহিত যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন হইতেছে তখন প্রথমেই বর্ণাশ্রমাচার আর তাহার লক্ষ্য, বিষ্ণু-ভক্তি। এই বিষ্ণুকে মূল ধরিয়া আমাদিগকে এই প্রেমধর্ম্মের বা লীলাবাদের শেষ কথা কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে জগতে আসিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। নানা পুরাণে নানারূপ বর্ণনা দেখা যায়, কেহ নারায়ণের পর বিষ্ণুকে ধরিয়াছেন, কেহ বিষ্ণুর পর নারায়ণকে ধরিয়াছেন। এই সকল সামান্য মতভেদের মীমাংসা কিছু কঠিন নহে। সঙ্কর্ষণ, বিষ্ণুরই নামান্তর, ইহা মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে।

সঙ্কর্ষয়সি ভূতানি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ।
ততঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তত্ত্বজ্ঞান বিশারদৈঃ॥

যাবতীয় ভূতগ্রাম কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ কর, এই কারণে তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদগণ-কর্ত্তৃক তুমি সঙ্কর্ষণ-নামে অভিহিত। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, যাঁহাদের সহিত সঙ্কর্ষণকে লইয়া চতুর্ব্যূহ, তাঁহারাও এই বিষ্ণুর নামান্তর, ইহাই

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, পাতালে সঙ্কর্ষণদেব রহিয়াছেন, আর নারদ ব্রহ্মার সভায় তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তখন কেহ মনে করিতে পারেন বিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ বুঝি পৃথক্। লীলায় কখন কখন পৃথকরূপে প্রতীত হইতে পারেন, কিন্তু পৃথক নহেন—তত্ত্বে এক।

"বিষ্ণু" বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে তাহারই আলোচনা করা দরকার।

(ক) বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ—এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া যিনি রহিয়াছেন, তিনি বিষ্ণু।

(খ) বেষতি, সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বমিতি। যিনি বিশ্বকে সিঞ্চিত বা আপ্যায়িত করেন। মেঘ যেমন বৃষ্টি দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন, বিষ্ণুও সেইরূপ তাঁহার কৃপামৃত বা লীলামৃতের দ্বারা বিশ্বের পোষণ করেন।

(গ) বিষ্ণাতি বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাদিতি বা—যিনি ভক্তগণের মায়া অপসারণ করিয়া সংসার হইতে নির্ম্মুক্ত করেন তিনি বিষ্ণু।

(ঘ) বিশতি সর্ব্বভূতানি বিশন্তি সর্ব্বভূতানি অত্র—যিনি সকলভূতে প্রবেশ করেন আর সকল ভূত যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি বিষ্ণু।

বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশ ধাতোর্প্রবেশণাৎ॥

যেহেতু সেই মহাত্মার শক্তিতে এই বিশ্বের সম্ভব হইয়াছে, এই কারণে তাঁহার নাম বিষ্ণু। বিশ্, ধাতুর অর্থ প্রবেশন।

প্রথমে বিষ্ণুরূপে পালন, তাহার পর ধারণ। উভয়েই এক ভাবের কথা। তাহার পর বলা হইল, তোমার কলেবর ভক্তির স্বরূপ। অতএব ভক্তিবাদ সংসারকে উপেক্ষা করা নহে, রক্ষা করা ও উন্নত করা। যাঁহারা মনে করেন সাংসারিক কর্ত্তব্য বা জগতের ও মানবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোনও একটা অলৌকিক উপায়ে এক সুদূরবর্ত্তী আনন্দ-ধামে যাইয়া উপস্থিত হইব, তাহারা ভক্তিবাদ বুঝিতে পারে নাই বা ভুল বুঝিয়াছে। পার্ব্বতী ও শঙ্কর, দেবাদিদেব মহাদেবের এই যে যুগলমূর্ত্তি, ইহারও তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে। ইহা শিবের আনন্দমূর্ত্তি। 'স্বারাজ্য সিদ্ধি' গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই ইহার পরিচয় পাওয়া

যায়। যিনি প্রলয়ের দেবতা ও শ্মশানবাসী তিনি অমঙ্গলরূপ নহেন। তিনি শঙ্কর,—পরম শুভদায়ক। তিনি রসহীন বা স্নেহহীন নহেন—তিনি পার্ব্বতীপতি—তিনি জগতের পিতা। শিব-উপাসনার এই ধারণা সঙ্কর্ষণতত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। যাহা হউক এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিস্প্রয়োজন। সহৃদয় ও তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ আস্বাদন করিবেন।

সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব।

আমরা পূর্ব্বে পুরুষাবতার-প্রসঙ্গ আলোচনায় সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোন কথাই সুস্পষ্ট হয় নাই, তবে চিন্তা করিবার কতকগুলি প্রণালী উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার অধিক কিছু হইবার আশা নাই। আমরা প্রারম্ভেই বলিয়াছি, ব্যস্ত হইলে চলিবে না। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ স্মরণ করিবেন। কতকগুলি ভক্ত একমনে ও একপ্রাণে সরল হৃদয়ে সমস্বরে যেখানেই শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবেন, শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আবির্ভূত হইবেন। ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভগবতদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বর্ণনায় শ্রীভগবান্‌ও ঠিক্ এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এক জায়গায় জুটিয়া কেবল চীৎকার ও লাফালাফি করিলেই হইবে না। হৃদয় মন এক হওয়া চাই, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা চিন্তা ও চেষ্টা এক হওয়া চাই। কাজেই এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব বা অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসা পাইবার জন্য আমরা আশা করিব না। তাঁহাকে আমরা দলবদ্ধভাবে অন্বেষণ করিব; সত্য করিয়া,—আমাদের ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা, আমাদের শাস্ত্রানুশীলন, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, আমাদের দয়া বা ভূতানুকম্পার দ্বারা তাঁহার অন্বেষণ করিব। অন্বেষণের পথ কোথায়, শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিবেন, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ বা সাধু বা গুরু তিনি সেই শাস্ত্রীয় পথ বুঝাইয়া দিবেন। ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা সেই পথে চলিতে হইবে।

রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্গসাহিত্যের মহারথী পূজ্যপাদ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের বাঙ্গলা রচনাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুরোধে একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, সেই গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। সেই ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—'মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গলা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।'

এই ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতীভাষার অবোধ্যতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন যে—'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা, প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল।' তাঁহাদের ভাষা তত দুর্ব্বোধ্য না হইলেও, ঐ ভাষা সার্ব্বজানীন নহে—ইহাই প্রমাণিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—'যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই (প্যারীচাঁদ মিত্র) তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত সম্বন্ধে আমরা দুইটি প্রশ্ন, সসম্মানে সাহিত্য-সমাজে উপস্থাপিত করিতেছি।

রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার সহিত, কি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই পরিচিত ছিলেন না? প্রকৃত কথা এই যে, মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতা স্বর্গীয় রামনারায়ণ মিত্র মহোদয়, রাজা রামমোহন রায়ের একজন সুহৃদ্ ছিলেন। রামনারায়ণ বঙ্গভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, স্বদেশে নানা বিভাগে নানারূপ কার্য্যের দ্বারা একটি বিপুল আন্দোলন জাগরিত করিয়া বিদেশে গমনপূর্ব্বক যে সময়ে ব্রিষ্টল্ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন (১৮৩৩ খ্রীঃ), তখন প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয়ের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর (জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ)। প্যারীচাঁদ, পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির তিনি সহপাঠী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই প্যারীচাঁদ অতিশয় চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতি-সম্পন্ন ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার

বাল্যজীবনের এই ঘটনাগুলি হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বাল্যকাল হইতেই, তাঁহার পিতৃবন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা, চেষ্টা ও রচনাবলীর সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাঙ্গলা সাহিত্য-সাধনার আলোচনায়, রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকাল ইংরাজী ১৮২০ খ্রীঃ; অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় তাঁহাদের ছয় বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং অক্ষয়কুমার দত্ত বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য সংস্কৃতানুসারী রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর, তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্য-ভাষার রচনা-রীতি যে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে।

আমাদের বিশ্বাস, রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর সাহায্যে, তাঁহার রচনা-রীতি অনুভব করিলে ইহা দেখা যাইবে যে, একদিকে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃতানুসারী সুবোধ্য ভাষা, আর একদিকে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্য ভাষা—এই উভয়েরই বীজ, রাজা রামমোহন রায়ের রচনায় সংমিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রয়োজনের তাড়নায়, রাজা রামমোহন রায়ের পর, এই দুইটি ধারা স্বভাবতঃই বিভক্ত হইয়া গেল।

প্যারীচাঁদ মিত্র উপন্যাস লিখিয়াছেন, গল্প লিখিয়াছেন, লৌকিক চিত্রাবলী সাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছেন এবং বহুলপরিমাণে হাস্যরসের অবতারণা করিয়া সাহিত্যকে সরস ও হৃদ্য করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য ক্ষেত্রের বিপুলতা নিবন্ধন কথ্য-ভাষার শক্তি, তাঁহার রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব, সামাজিক আচার ব্যবস্থা প্রভৃতি গভীর বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচারেই তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য-সাধনার সামর্থ্য প্রধানরূপে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। কাজেই, কথ্য ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে, তাঁহার হস্ত রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তাঁহার যে সমুদয় রচনা 'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সাহিত্য-রচনায় কথ্য-ভাষা ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন করিবার চেষ্টা তাঁহার ভিতর পরিপূর্ণরূপেই ছিল। অন্যান্য গভীর বিষয়ের আলোচনাতেও ইহার নিদর্শন আছে। তাহার পর রাজা রামমোহন রায়, সমাজ-সংস্কারক রূপে দেশের জনসাধারণের উন্নয়ন কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। দেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন কার্য্যে, এই জন্যই তাঁহাকে মনোনিবেশ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের কথ্য-ভাষার প্রবর্ত্তন কার্য্যে রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে স্বীকার করা আবশ্যক।

রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের

পুষ্টিসাধনে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের জনসাধারণকে প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের তত্ত্ব শিখাইবার জন্য ও দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিবার জন্য, গদ্য-সাহিত্যের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জনসাধারণকে কোন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যখন উদ্দেশ্য, তখন ভাষাকে সুবোধ্য করিবার জন্য বহুলপরিমাণে কথ্য-ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণের বাঙ্গলা গদ্যে গ্রন্থাদি রচনার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইংরাজ যুবকেরা এদেশে রাজকার্য্য করিবার জন্য আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশীয় পণ্ডিতেরা এই কলেজের পাঠ্যপুস্তক লিখিতেন। কিন্তু ঐ সমুদয় গ্রন্থ, অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারী ও দুর্ব্বোধ্য। সেই গ্রন্থের দ্বারা কলেজের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা যথার্থরূপে সিদ্ধ হইত না। খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ কলেজের এই অভাব পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। মহাত্মা কেরী, কলিকাতার ইংরাজ শাসকগণ কর্ত্তৃক প্রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হইয়াও, শেষে যে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সসম্মানে গৃহীত হইলেন, তাহার ইহাই কারণ।

রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যের সাধনায় দেশের লোককে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই কার্য্যেই তাঁহাকে তাঁহার অধিকাংশ শক্তি ও সময় নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কাজেই, ইংরাজ রাজপুরুষগণের বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষালাভ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার মনে জাগ্রত হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের পর, বহুজনে বহুদিক্ হইতে রাজার আরব্ধ কার্য্য বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। রাজা রামমোহনের আরব্ধ কার্য্যের অনেকগুলি, প্যারীচাঁদ মিত্রের সাধনার বিষয় ছিল। ইহা তাঁহার জীবনী ও গ্রন্থাবলী আলোচনা দ্বারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়।

রাজা রামমোহন রায়, ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমনে, অত্যন্ত আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার সময়ের বা তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় ইংরাজ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা কামনা করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ—'আলালের ঘরের দুলাল'-এর একটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন যে—এই গ্রন্থপাঠে বৈদেশিকগণ, বাঙ্গালার কথ্য-ভাষা শিখিতে পারিবেন, হিন্দু সমাজের আচার নিয়ম, বঙ্গদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রা-পদ্ধতি প্রভৃতিও এই গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই ভূমিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদেশীয়গণকে আমাদের দেশের কথ্যভাষা ও দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত করান, এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য ছিল। সমাজ সংস্কারও যে এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও গ্রন্থকার ঐ ইংরাজী ভূমিকায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। সুতরাং প্যারিচাঁদ মিত্রের বাঙ্গলা সাহিত্যের

সাধনায় রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্ত্তিতাই প্রতিপাদিত হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা যায় না। কেবল প্যারীচাঁদ মিত্র কেন? নব্যবঙ্গের সাহিত্য ও সাধনা, আজ বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের পুরোদেশে উপস্থিত। ইহার যে কোন অংশের আলোচনায় রাজা রামমোহন রায়ের প্রেরণার আলোচনা করিতেই হইবে। কিন্তু মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, রাজা রামমোহন রায়কে বর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ইহার সঙ্গত কারণ কি?

বাঙ্গলা সন ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের 'বঙ্গদর্শন'-এ, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গলা ভাষা—লিখিবার ভাষা' সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচারিত করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের প্রাথমিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং সাধুভাষা ও কথ্যভাষার দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নবীন লেখকগণকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি বড়ই মূল্যবান। বাঙ্গলার সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁহারা লেখনী চালনা করেন, প্রথমাবস্থায় তাঁহাদের সকলেরই এই প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে পাঠ করা আবশ্যক। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও আমাদের দুই একটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম কথা—এই প্রবন্ধেও রাজা রামমোহন রায়ের নামও উল্লিখিত হয় নাই। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।' বাঙ্গালায় প্রচলিত ভাষায় প্যারীচাঁদ মিত্র উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। উপন্যাস রচনায় তিনি বহুল পরিমাণে কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, এবং কথ্য-ভাষার শক্তি ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, কথ্য-ভাষার রচনাকে—'টেকচাঁদী ভাষা' বলিয়াছেন। অবশ্য নামকরণে কোন আপত্তি নাই—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র যে নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সে নাম সাহিত্যে রক্ষা করাই সঙ্গত। কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয় যে, সকল সময়েই কথ্যভাষায় লিখিতেন তাহা নহে। কাজেই, এই কথ্যভাষাকে—'আলালী ভাষা' বলিলে অধিকতর সঙ্গত হইবে।

প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের রচনা-রীতি ও সাহিত্যিক-প্রকৃতি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্গসমাজে যে বিচিত্রমুখী জাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিরই প্রভাব প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য-সাধনায় সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম-উপাসনা, আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা, কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া প্রকারান্তরে ঐ মহাত্মাদ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের অনেক রচনার ভাষা,

অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষারই প্রায় তুল্য এবং রাজা রামমোহন রায় যে ভাষায় রচনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই মার্জ্জিত মূর্ত্তি। সুতরাং কি মানস-জীবনে, কি বাহিরের রচনা রীতিতে রাজা রামমোহন রায়ই পারীচাঁদ মিত্রের প্রেরণাদাতা।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য-রচনায় ভাবানুযায়ী যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রকৃত প্রস্তাবে সেই মধ্য পথেরই পথিক। গভীর বিষয়ের রচনায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অক্ষয়কুমার দত্ত বা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরই ভাষার মত। তবে উপন্যাস রচনায় পাত্র পাত্রীর অবস্থা ও শিক্ষানুসারে সংস্কৃত নাটকে যেমন নানা প্রকারে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন আছে, সেইরূপ কথ্য-ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণনায় তিনি বহুল পরিমাণে কথ্য-ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবহারেই তাঁহার কৃতিত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগকে কথ্য-ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজন বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে—মিঠাই মণ্ডা খাইতে খাইতে জিহ্বার একরূপ বিকৃতি হয়; তখন আদার কুচি, কুমড়ার অম্বল প্রভৃতি একটু মুখে দেওয়ার দরকার হইয়া পড়ে। সাহিত্যেরও সেইরূপ সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষা শুনিতে শুনিতে কর্ণের বা মনের একপ্রকার ক্লান্তি জন্মায়। সেই সময়ে কথ্য-ভাষার চাটনি পাইলে, হৃদয় ও কর্ণ উভয়েরই রসায়ন স্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাই কি কথ্য-ভাষা ব্যবহারের উপযোগিতা?

সাহিত্যে কথ্য-ভাষার যদি ইহাই মূল্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্যকে আমরা নিতান্ত বাহিরের জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি বলিয়াই মনে হয়। সাহিত্যে যে শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহার অর্থের উপরই শব্দটীর সার্থকতা নির্ভর করে না। সংস্কৃত শব্দের অতি উচ্চাঙ্গের ব্যঞ্জনা-শক্তি আছে। সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থের প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারগণের টীকায় কেবল শব্দের নহে,—যে ধাতু হইতে শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ধাতুর ব্যঞ্জনা-শক্তির দ্বারায় কাব্য যে কিরূপ হৃদ্য ও সরস হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু অপ্রচলিত ও ভদ্র সমাজে স্বল্পপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি বঙ্গীয় পাঠকের নিকট সহজ-লভ্য নহে। যাঁহারা পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যালোচনায় যাঁহাদের মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে, ব্যঞ্জনা-শক্তি সঞ্জাত এই রস তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন। সুতরাং মৃত বা অপ্রচলিত বা স্বল্প-প্রচলিত ভাষার শব্দ, বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইলে সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-শক্তির যে অশরীরী আনন্দ, তাহা বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। কথ্য-ভাষায়, আনন্দের সময়, উল্লাস ও উৎসাহের সময়, কৌতুক রসের জাগরণের সময়, মানুষ স্বভাবতঃ এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে, যাহার শক্তির তুলনা নাই। আবার এই শব্দগুলি অনেক স্থলে ধ্বন্যাত্মক—অর্থাৎ তাহাদের কোন ব্যাকরণশুদ্ধ আভিধানিক অর্থ নাই। এই

শব্দ বা ভাব প্রকাশের উপকরণগুলিকে যদি সাধুভাষার অনুরোধে সাহিত্য-রচনা হইতে বর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে সাহিত্য শ্রীহীন, নীরস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে—মানবের প্রকৃত হৃদয়ের সতেজ প্রতিধ্বনি সাহিত্যের মধ্যে ঝঙ্কৃত হয় না। কাজেই এই শব্দগুলি ব্যবহার করা আবশ্যক। কিন্তু বিপদও আছে। মানবের অমার্জ্জিত নিম্নবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যঞ্জনাও লৌকিক শব্দের ভিতর রহিয়াছে। সাহিত্য যখন মানবকে উন্নীত করিতে চাহে, যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর—তাহাকেই মূর্ত্তিমান করিতে চাহে, তখন একদিকে কথ্য-ভাষার সামর্থ্য রক্ষা করিতে হইবে—আর একদিকে কথ্য-ভাষার নিম্নস্তরের মলিন ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দসমূহ বর্জ্জন করিতে হইবে।

তাহার পর প্রাদেশিকতা একটি অন্তরায়। বীরভূমের লোকও বাঙ্গালী—শ্রীহট্টের লোকও বাঙ্গালী। বাঙ্গলা দেশই যে একটা মহাদেশ। সুতরাং প্রাদেশিকতার আপত্তিও কথ্য-ভাষার প্রয়োগে উপেক্ষণীয় বা অসঙ্গত নহে। ফলতঃ, সাহিত্যে কথ্য-ভাষার প্রয়োগ বড়ই কঠিন। সংস্কৃতানুসারিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, কথ্য-ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা করিয়া সেই গ্রন্থকে বিদ্বজ্জনের অনুমোদিত করা বড়ই কঠিন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 'হুতোম পেঁচার নক্সা'য় কথ্য-ভাষার ব্যবহার, প্যারীচাঁদ মিত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর।' বঙ্কিমচন্দ্র, 'হুতোমি'-ভাষার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—'সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্য, এই ভাষায় সিদ্ধ হইতে পারে না, এই ভাষা দরিদ্র, নিস্তেজ, এই ভাষার বন্ধন নাই—'হুতোমি' ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি 'হুতোম-পেঁচা' লিখিয়াছেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করিনা।'

বাঙ্গালা ভাষার রচনা-রীতি সম্বন্ধে খুব ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। রচনারীতির আলোচনা বড়ই গভীর বিষয়। হুতোমি-ভাষা সম্বন্ধেও মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য ধীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা সাহিত্য-রথিগণের মনোযোগ এই দিকে বিনীতভাবে আকর্ষণ করিতেছি।*

শ্রীশিবরতন মিত্র

* ১৩৩০ বৈশাখ সংখ্যা "বঙ্গবাণী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

আলোচনা ও অনুশীলন

সাহিত্য-সম্মিলন

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন লইয়া বেশ খোলাখুলি রকমের দলাদলি হইয়া গেল। কেনই বা দলাদলি হইল, কর্ম্মিগণ পৃথক্ হইয়া কি কি করিলেন, এবং তাহার স্থায়ী ফলাফলই বা কি, সে সম্বন্ধে খবরের কাগজে বেশী কিছু আলোচনা হয় নাই। এই দলাদলি যদি একটা ব্যাধিই হয়, তাহা হইলে তাহার নিদানও জানা গেল না, লক্ষণও ধরা গেল না—কাজেই চিকিৎসক থাকিলেও চিকিৎসার উপায় নাই।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মূল সভাপতি, কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা একজন শাখা-সভাপতি। তাহা ছাড়া পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, নাট্যকার অমৃতলাল বসু, শান্তিনিকেতনের বৈজ্ঞানিক জগদানন্দ রায় মহাশয় এক এক শাখায় অধিষ্ঠিত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি,—কেহ ধনে মানে, কেহ জ্ঞানে বিদ্যায়, কেহ নামে, যশে। সুতরাং বিরোধ কেন?

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তর উপর সভার স্থান না করিয়া একটু দূরে করা হইল, ইহাই কি বিরোধের হেতু? বঙ্কিমের অতিভক্তগণ কি বঙ্কিমের বাস্তুভিটার ধূলিরাশিকে উপেক্ষিত দেখিয়া মনের দুঃখে একটি প্রতিযোগী সম্মিলন করার সঙ্কল্প করিলেন? ব্যাপারটা যদি ব্যক্তিগত না হইয়া ভাবগত বা নীতিগত হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করিবে কে? মূল সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তুভিটার উপরেই সম্মিলনের স্থান করিতে চহিয়াছিলেন, এবং সেজন্য চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই, একটু দূরে জায়গা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের অপরাধই বা কি?

বঙ্কিমের ভিটার উপরের সম্মিলনের অধিবেশন আগেই হইয়া গেল। তাহাতে আসিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, আসিতেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—কিন্তু শরীরের জন্য পারিলেন না। আর আসিলেন নাটোরের মহারাজা, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রামপ্রসাদ চন্দ্র আর ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। বড় বড় এক একখানা মাসিক কাগজকে যদি সাহিত্যের এক একটা ছোট ছোট দল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে—পূর্ব্বোক্ত তালিকার প্রথম দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা, রাজনীতিক ও সংবাদ পত্র-লেখককে একত্রে "বঙ্গবাণী" মাসিকপত্র বলা যাইতে পারে। ইঁহারা ঐ কাগজখানির

সর্ব্বস্ব—প্রাণ ও আত্মা। সকলেই জানেন, এই কাগজখানি পরাক্রমশালী নরসিংহ বিচারপতি সার্, আশুতোষের।—পূর্ব্বোক্ত তালিকার আরও দু একজন সার্ আশুতোষের আশ্রিত ও অনুগত। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হউক, দূর হইতে, মুখ্যভাবে না হউক গৌণভাবে, এমন কি জ্ঞাতসারে না হইয়া অজ্ঞাতসারে সার্ আশুতোষের প্রভাব এই প্রতিযোগী দলের মূলে আছে কি না, জানা যায় নাই। অবশ্য অন্যান্য কারণ—স্থানীয় ও দেশীয়, ব্যক্তিগত, চাকুরীগত বা ব্যবসায়গত তাহার সহিত মিশিয়া থাকিতে পারে।

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী এই সম্মিলন সফল হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষগণ শেষে বলিয়াছেন বা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—ইহা প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন নহে—ইহা "বঙ্কিম-উৎসব" এবং বৎসর বৎসর ইহার অধিবেশন হইবে। শুভ প্রস্তাব, সন্দেহ নাই।

সম্মিলনের বিরুদ্ধে আর একটা দল যখন গড়িয়া উঠিল এবং তাঁহারা বিধিমতে যখন আপনাদিগকে জাহির করিতে লাগিলেন, তখন বর্দ্ধমান খবর দিলেন, দলাদলি হইলে তিনি সভাপতি হইবেন না, অর্থাৎ গোটা বাঙ্গলাদেশের যাবতীয় সাহিত্যিক একমত হইয়া যদি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি সাহিত্য-সম্মিলনকে অলঙ্কৃত করিতে অনিচ্ছুক। বিরোধী দল যখন সফলকাম হইলেন না, তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বর্দ্ধমানকে বুঝাইলেন, বিরোধ বা দলাদলি কিছুই নহে, একটি অতি সামান্য ব্যাপার—অতএব দয়া করিয়া অপত্তি করিবেন না।

মূল সম্মিলন হওয়ার পরেই আর এক প্রতিযোগী সম্মিলন হইল। হুগলীতে হইলে ভাল হইত—কারণ গঙ্গার ঠিক্ পরপার হইত, এবং ইংরাজী Rival কথাটার প্রয়োগ সুসিদ্ধ হইত। এই সম্মিলন বসিল হাবড়ায়—গঙ্গার পরপার—তবে কিছু দূর। শুনা যায় এই সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ নৈহাটিতেও পদধূলি দিয়াছিলেন—এখানেও দিয়াছিলেন। প্রবাসীর চারুবাবু প্রভৃতিও এখানে ছিলেন, সার্ আশুতোষের ভক্তেরাও ছিলেন। উপন্যাসের নব্যপন্থীগণ এই সম্মিলনে নিজেদের মর্ম্মকথা খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সম্মিলনের মূল্য আছে। কিন্তু প্রতিযোগীরূপে করা হইল কেন? হাবড়ায় আর একবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহা সার্ আশুতোষের বিজয়-নিশান। হাবড়ায় সম্মিলন হইয়া ভালই হইয়াছে, কিন্তু নৈহাটির শাস্ত্রী-বর্দ্ধমান সম্মিলনের প্রতিযোগীরূপে না হইলেই ভাল হইত।

শরৎ বাবুই যদি এই সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা হন, আর পল্লা দিয়া কাজ করা যদি ইহার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, ইহা শরৎ বাবুর জীবনের দ্বিতীয় মহাভুল। তাঁহার প্রথম ভুল রাজনীতির আসরে নামা, আর চিঠি লিখিয়া ছাড়িয়া যাওয়া, আর এইটি দ্বিতীয় ভুল।

দুই রকমের কাজ আছে এক ভাবের কাজ আর এক বাস্তব কাজ। যাঁহারা আনুগত্য করিয়া ধনবান্, পদস্থ ও প্রতিপত্তিশালী ভাগ্যবান্‌দিগের সহিত মিশিতে পারেন না, তাঁহারা শক্তি থাকিলে ভাবের কাজ করিতে পারেন। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাস্তব কাজ করিতে গেলে, যদি নিঃশব্দে করেন, শক্তি থাকিলে কিছু করিতে পারেন, কিন্তু সশব্দে করিতে গেলে কিছুতেই পারিবেন না।

সাহিত্য পরিষৎ হইয়াছে—সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে। দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই যখন পৃষ্ঠপোষকতা চাহেন, দেশের অধিকাংশ লেখাপড়া জানা লোকই যখন চাকুরীজীবি, তখন সাহিত্য-পরিষদে বা সাহিত্য-সম্মিলনে ধনবান ও পদস্থ লোককে যতই লইতে পারা যায়, ততই সুবিধা। কেবল সুবিধা বলি কেন,—তাঁহাদের লইয়া আসা, তাঁহাদের অভিনন্দন দেওয়া, তাঁহাদের স্তবস্তুতি করা স্বাভাবিক। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন না, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া শক্তি থাকে নীরবে কাজ করিবেন। একাই কাজ করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া কাজের পত্তন করিবেন। যদি কেহ আসেন সৌভাগ্যের কথা। আর শক্তি না থাকে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রার আয়োজন করুন। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বেশী হইবে না—প্রমাণ কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ একদিকে, আর একদিকে অন্যবিধ প্রমাণ জনসাধারণের কাগজ অমৃতবাজার-পত্রিকা।

কাশীমবাজারে হাঁটাহাঁটি করিয়া, লালগোলার বিদ্যোৎসাহী জমিদারকে তাঁহার কুটুম্বের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎটি হইয়াছে, সাহিত্যপরিষৎ হইতে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে। সুতরাং টাকা তুলিয়া পুরস্কার দিয়া বই লেখাইয়া লওয়া, সাহিত্যিকদিগকে রাজসভার সভাপণ্ডিত করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কি উপায়ে পরিষৎ বা সম্মিলন সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন?

শরৎ বাবু না কি খুব দুঃখিত—বাঙ্গালাদেশের ভদ্রসাহিত্যিকেরা তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়াছে। তিনি অপাংক্তেয় হইয়াছেন বলিয়া আমাদের দুঃখ নাই—তবে ইহার জন্য তিনি সুখী না হইয়া দুঃখিত বলিয়া আমরা তাঁহার জন্য আরও বেশী দুঃখিত।

ভদ্র সাহিত্যিকই বা কে, আর অপাংক্তেয়ই বা কে, ইহা বুঝিলাম না। চাকুরী-করা লোক যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে ভদ্রাভদ্রের বিচার কেন? শরৎ বাবুর পুস্তক বিক্রয় কি কিছু কমিয়াছে? যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থ পড়ে তাঁহারা কি আর পড়িতেছে না? যদি তাহা না হয় তবে আর দুঃখ কেন? ইহাই প্রকৃত মানদণ্ড। বিদেশের লোকে বড় বলিয়াছে বলিয়াই যাহারা বড়, অন্য কোন কারণে নহে—তাহারা ছোট বলিলে যে দুঃখিত হয়, সে ছোট বলার জন্য ছোট নয়, দুঃখিত হওয়ার জন্য ছোট। সুতরাং এজন্য আলোচনা করা শরৎ বাবুর ভাল হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, আশা করি তিনি শান্ত হইয়াছেন?

অতএব, "যাহার শেষ ভাল, তাহার সব ভাল" এই নীতি অনুসারে—এই দলাদলি কিছুই নহে—

বাঙ্গালার সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্য-সম্মিলন, সাহিত্য পরিষৎ, লেখক, পাঠক, বক্তা, সভাপতি, সকলেরই জয় হউক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। ৩১শে আষাঢ়ের "বীরভূম বার্ত্তা"য় আমরা তাঁহার পত্রখানি পড়িলাম। মোটামুটি অভিযোগ এই কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এমনভাবে নির্ব্বাচিত হয় প্রত্যেক বৎসরে 'গুটিকত মার্কামারা লোক সভ্য ও কার্য্যাধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। "বোধ হয় তাহারা সকলে এইভাবে কোনরূপ সাহিত্য-চর্চ্চা না করিলেও সাহিত্যরথী বলিয়া জাহির হইতে চাহেন।" লেখক ইহার সুবিচারপ্রার্থী। বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে সভাপতি শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি—তাহাতে সাধারণভাবে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এই পত্রখানি তাঁহার মন্তব্যের পুষ্টি করিতেছে। এ বিষয়ে দেশে একটা চিন্তা ও আলোচনা জাগিয়া উঠিয়াছে—সুতরাং সংস্কার অবশ্যম্ভাবী।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

১। সাময়িক সাহিত্য

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গ—[শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও ধর্ম্মপ্রচারিণী মাসিক পত্রিকা। কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস গোস্বামী, ৭ বিডন্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। বার্ষিক ভিক্ষা ২।৵০] আমরা প্রথমবর্ষের প্রথম ৪ মাসের কাগজ পাইয়াছি—১৩২৯ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধর্ম্মে বা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনেকগুলি দল আছে—এবং দলাদলিও আছে। বর্ত্তমান সময়ে সেই দলাদলি কমিতেছে না, বাড়িতেছে। তবে প্রত্যেক দল যদি প্রকাশ্যভাবে নিজেদের মত স্পষ্ট করিয়া বলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে একটা মীমাংসা হইতে পারে। দলাদলি তত্ত্বগত হইলেই অবশ্য মীমাংসা হইবে, কিন্তু দলাদলির মূলে পার্থিব স্বার্থ বা ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিলে মীমাংসা হইবে না, দেশের উন্নতি হইলে ধ্বংস হইবে। "বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" এই যুগল-উপাসনা বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশিষ্ট দল—সুতরাং তাঁহাদের যাহা মত, সম্প্রদায়িক লোক ছাড়া, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের

তুলনামূলক আলোচনা করেন, তাঁহাদেরও এই মতের ব্যাখ্যা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা আবশ্যক। এই কারণে আমরা এই পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহাশয় সুলেখক, বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা এই প্রকারের একখানি পত্রিকার প্রকাশ, আনন্দের কথা। যুগের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিলে দেশের উপকার হইবে। আমরা বারান্তরে বিস্তৃততর আলোচনা করিব।

গৌড়দূত—মালদহের সাপ্তাহিক পত্র—এখানি স্বাধীনপত্র অর্থাৎ সরকারী ইস্তাহার-পুষ্ট নহে। আমরা দুই সংখ্যা পাইয়াছি। আমরা এই পত্রে একটি কথা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। দেশ-বন্ধু দাসের দলের লোক মালদহে গিয়া চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা সেখানে বিক্রীত না হয়। আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, যে ইহা সত্য কথা। কিন্তু গৌড়দূত নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ, অতএব অবিশ্বাসই বা করি কিরূপে—ভগবান্ সর্ব্ববিধ নীচ ও ক্ষুদ্র চেষ্টা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। গ্রন্থ-সাহিত্য

মর্ম্মবাণী—[শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত, কবিতাপুস্তক মূল্য চারি আনা। শান্তিপুর, প্রেমনিকেতন হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত] এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, ভাবও তেমনি পবিত্র। প্রত্যেক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদারভাবের উদ্দীপক। বালক বালিকাগণকে এই প্রকারের কবিতাপুস্তক পড়িতে দেওয়া আবশ্যক। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হওয়ার উপযুক্ত, পারিতোষিক পুস্তকরূপে বালক বালিকাগণকে দিলে তাহারা আনন্দিত ও উপকৃত হইবে।

ব্রহ্মদর্শন—[শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্, এ, প্রণীত। শ্রীমতী শকুন্তলা রাও এম, এ, কর্ত্তৃক ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা আকারের ৫৪ পৃষ্ঠা গ্রন্থ, মূল্য ।৵০ মাত্র।]

এই গ্রন্থে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মদর্শনের সর্ত্ত, নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, সত্যেন লভ্যঃ, ব্রহ্মদর্শনের অধিকার, এই কয়েকটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট প্রচারক; সুপণ্ডিত, সুলেখক, ত্যাগী ও সাধুপুরুষ।

আমাদের দেশে এখনও এমন হতভাগ্য লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, "আমি হিন্দু আমি ব্রাহ্মদের বই পড়িব কেন?" অথবা "আমি ব্রাহ্ম আমি হিন্দুদের বই পড়িব কেন?" এই সকল লোক হতভাগ্য ও চিরবঞ্চিত। এই গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়িলে ধর্ম্মান্বেষী ও সত্যজিজ্ঞাসু মাত্রেই উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্র নাই, ইহা বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য-

ধর্ম্মের গ্রন্থ। উপনিষদের ব্রহ্মদর্শন বা ভারতীয় মহর্ষিগণের অপরোক্ষ অনুভূতি বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে মূল সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া শাক্যসিংহ, ইশা, রূপসনাতন, শ্রীচৈতন্যদেব, ফ্র্যান্সিস্, মহম্মদ, এবং বর্ত্তমান যুগের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সাহায্যে লেখক দেখাইয়াছেন —"ব্রহ্মদর্শন আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটি জীবন্ত অনুভূতি। বিভিন্ন দেশের সাধুগণ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। * * ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে তাঁহারা ঈশ্বর-দর্শন করিয়াছেন; কেবল তাঁহাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় মিল আছে তাহা নয়, তাঁহাদের ভাষাতেও আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়। এই অভিজ্ঞতাকে তাঁহারা দর্শন আখ্যা দিয়াছেন। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাঁহারা ব্রহ্মদর্শনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতেও সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।" ইহাই গ্রন্থের উপসংহার।

মানবের সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস শোনা কথা বা শেখা কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম অবস্থায় ইহা ভাল ও দরকার; কিন্তু এই বিশ্বাস জীবনের কঠোর পরীক্ষায় ও ঘাত-প্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়। মানুষের জ্ঞানশক্তির উপর সন্দেহ করিবেন না, সংশয় ভাল, মানুষ সরলপ্রাণে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করুক। প্রকৃত বিশ্বাসে ও জ্ঞানে বিরোধ নাই। জ্ঞান বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ও সমুজ্জ্বল করে। ইহাই দ্বিতীয় স্তর। ইহার উপরে আর একটি স্তর আছে, সেখানে আর যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই, তাহারই নাম ব্রহ্মদর্শন। মানব আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশ, একটি মৌলিক অভিজ্ঞতা —বর্ণনা পড়িয়া বা অন্যের মুখে শুনিয়া তাহা বোঝা যায় না, নিজের অভিজ্ঞতায় জানিতে হয়।

গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে যে সমুদয় সাধন প্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই নিরপেক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অনেকে তপস্যা বলিতে কেবলমাত্র শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধন বুঝিতেন, এখনও অনেকে সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন—শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধনেরও প্রয়োজন আছে। শরীরের সঙ্গে ধর্ম্মের নিগূঢ় যোগ আছে। শরীরের সঙ্গে মনের গূঢ় যোগ আছে; মনকে দমন করিতে হইলে শরীরের সংযম আবশ্যক। শরীরকে যথেচ্ছ ভোগ ও বিলাসের স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মসাধন অসম্ভব না হইলেও সুদুষ্কর। গ্রন্থকার ইহা বলিয়াছেন— আমরা বলি "অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।" মধ্যযুগের অতিকৃচ্ছ্রবাদ ও আধুনিক যুগের কৃচ্ছ্র-ত্যাগবাদ বা যথেচ্ছ-ভোগ-বাদ, লেখক এই দুই মতের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ধর্ম্মও এইরূপ। বুদ্ধদেব ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেন কিছু বলেন নাই, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর।

—০—

বিজ্ঞাপন

"বীরভূমি" মাসিক পত্রিকা, পূর্ব্বে চারি বৎসর ছয় মাস কাল পরিচালনা করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহির হওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়া লওয়া হইত। শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, অন্যান্য কার্য্যের ভার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট মূল্য লওয়া হয় নাই। আমি এখন অন্যান্য কর্ম্ম হইতে বহুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে পুনর্ব্বার 'বীরভূমি' প্রচার আরম্ভ করিলাম। বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যা, ষষ্ঠ ভাগ তৃতীয় সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে। বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র।

প্রত্যেক সংখ্যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, (Complete in itself) এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। কলিকাতা—কলেজ স্কোয়ারে ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যালয়ে এবং ঢাকা—পাটুয়াটুলি, রিপন-লাইব্রেরীতে নগদ বিক্রয় হয়।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

শান্তিনিকেতন প্রেস

এই প্রেসে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে পুস্তক, পত্রিকা, চেক, দাখিলা, চিঠি, রসিদ, জমিদারী ও মিউনিসিপালিটীর নানাবিধ ফরম, ব্যবসায়ীদিগের ক্যাশ-মেমো ও মূল্য-তালিকা, বিবাহের প্রীতি-উপহার ও নিমন্ত্রণ পত্র এবং ভিজিটিং কার্ড প্রভৃতি সকল রকম ছাপার কার্য্যাই সত্বর ও সুন্দররূপে হইয়া থাকে। লাল, নীল, সোনালী ও রূপালী প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র বর্ণের ছাপাও হয়।

পুস্তকাদি ছাপার জন্য ডবল্ ডিমাই মেশিন প্রেস এবং ছোট ছোট সুন্দর কাজের জন্য হাফ্ ডিমাই ট্রেডল্ মেশিন আছে। এতদ্ভিন্ন দপ্তরী-খানার কার্য্যাদি, যথা—পুস্তকাদি বাঁধাই, পারফোরেটিং, নম্বরিং প্রভৃতি হইয়া থাকে।

সর্ব্বসাধারণের কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রুফ দেখিবার ভার লওয়া এবং যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দর অন্যান্য প্রেস অপেক্ষা বেশি নহে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পোষ্ট—শান্তিনিকেতন, } শ্রীকালাচাঁদ দালাল

ষ্টেশন—বোলপুর। } প্রেস-ম্যানেজার।

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত।

Sl. 425
[illegible] 1925

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৬—৮

১৩৩০

Birbhum 19. 9. 25

শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব

২ বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাল নির্ণয়

৩ যুগধর্ম্ম—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান

৪ গ্রন্থ-সমালোচনা

CALCUTTA 6.10.25

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র।]

শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব।

১। পৌরাণিক ঘটনার শ্রেণী বিভাগ

শ্রীমদ্ভাগবতের টিকার প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিলেন, এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত,—বেদান্তের ভাষ্য। এই কথা হইতে বুঝিতে হইবে, প্রথমে তত্ত্ব তাহার পর লীলা। পৌরাণিক ঋষি সমাধিস্থ হইয়া তাঁহার বর্ণনীয় ব্যাপার জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া বর্ণিত ব্যাপার সমূহ বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম, দিব্য—অপ্রাকৃত ও অলৌকিক, সুতরাং ইহা তত্ত্বতঃ বুঝিতে হইবে।

পুরাণ-সমূহে যে সমুদয় ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই এক শ্রেণীর ঘটনা নহে, তাহা পুরাণ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক পুরাণেই চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্পমিত্র প্রভৃতি রাজার কথা আছে, আরও পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম আছে। এই সমুদয় নাম ও ঘটনা, সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনারূপেই বিবেচিত হইবে। এই গেল সাধারণ ঘটনা। এ সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই। কিন্তু অন্যান্য দ্বীপ বা অন্যান্য মন্বন্তরের অনেক ঘটনা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ঘটনাগুলি বুঝিবার সময় আমাদের কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করিতে হইবে। বিশ্বচরাচর আজ যে অবস্থায় রহিয়াছে, চিরকাল সে অবস্থায় ছিল না, প্রাণশক্তি বা মননশক্তির ক্রিয়া আজ যে প্রকারে সাধিত হইতেছে, দশলক্ষ বা দুইকোটি বৎসর পূর্ব্বে ঠিক সে প্রকারে হইত না। জম্বু-দ্বীপের জীবন আর প্লক্ষদ্বীপের জীবন, একরূপ নহে, একই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের মধ্যেই কত বিভিন্নতা। এই সব প্রাথমিক বিষয় কিছু কিছু জানা থাকিলে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাপারগুলির ভিতরের রহস্য কিছু কিছু ধরিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর ঘটনা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলিই প্রকৃত

প্রস্তাবে "লীলা"। এই ঘটনাগুলির নায়ক শ্রীভগবান্ স্বয়ং। এইগুলি "রহস্য" নামে পরিচিত। এই ঘটনাগুলি ঠিক্‌মত বুঝিলে শ্রীভগবান্‌কেই বুঝিতে ও ধরিতে পারা যাইবে। সুতরাং এগুলি উন্নততম সাধনশাস্ত্র ও তত্ত্ববাদের সাহায্যে বুঝিতে হইবে। যোগশাস্ত্রে, জ্ঞানশাস্ত্রে, ভক্তিশাস্ত্রে যে সমুদয় চরম ও পরমতত্ত্ব কথিত হইয়াছে সেই তত্ত্বসমূহ আমরা যে পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিব, এই "লীলা" আমরা সেই পরিমাণে আস্বাদন করিতে পারিব। পুরাণে শ্রীভগবানের অনেক লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও মধুর এবং এই কারণেই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। আবার এই বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীরাধাতত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য। সুতরাং খুব ধীরতার সহিত এই তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। তত্ত্ব না জানিয়া, তত্ত্বের দ্বারা হৃদয় মার্জ্জিত না করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বা গীতগোবিন্দ প্রভৃতি নিগূঢ় গ্রন্থ তাড়াতাড়ি করিয়া আলোচনা করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে এবং প্রাচীন ভারতের সাধন-শাস্ত্রের প্রতি অবিচার করা হইবে।

২। বেদে পুরুষ-কথা।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত অনেকেরই পরিচিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণলীলা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে এই পুরুষ-সূক্তের আলোচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। সেই পুরুষের পরিচয়ে বৈদিক সাহিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্য পরিপূর্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই পুরুষের কথা আছে। ঋগ্বেদে আমরা তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাই।

তাঁহার মস্তকাদি অবয়ব অসংখ্য, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অসংখ্য, পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় অসংখ্য। এই প্রকারের বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি আবার মানবের নাভিপ্রদেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সমস্তই এই পুরুষ। ইনি মোক্ষের অধিপতি। অন্নের দ্বারা যাহা কিছু পরিবর্দ্ধিত হয়, ইনি তৎসমুদয়ের অধিপতি।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২

এ সমুদয় তাঁহার মহিমা, কিন্তু তিনি এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বভূতগ্রাম তাঁহার এক-পাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত স্বরূপ।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩

ইহার পর বেদ বলিলেন সেই পুরুষ হইতে বিরাট জন্মিয়াছিলেন, বিরাট হইতে অধিপুরুষ। সেই অধিপুরুষ দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিলেন, তাহার পর পঞ্চভূত ও জীবশরীরাদি সৃষ্ট হইল।

৩। উপনিষদে পুরুষ-কথা

ঋগ্বেদে যে পুরুষের কথা পাওয়া যায়, তাঁহারই কথা উপনিষদ্-সমূহে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽহপঃ শরীরং সোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-ঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

যিনি পৃথিবীতে আছেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী তাঁহাকে জানে না, পৃথিবী তাঁহার শরীর, তিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে যমন বা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তিনি আত্মার অন্তর্য্যামী অমৃত।

এই প্রকারে তিনি অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, আকাশে, সূর্য্যে, সকল দিকে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে আছেন কিন্তু ইহারা কেহই তাঁহাকে জানে না, ইহারা তাঁহার শরীর, তিনি ভিতরে থাকিয়া ইহাদের যমন করিতেছেন। ইনি আত্মার অন্তর্য্যামী পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইঁহাকে অধিদৈবত পুরুষ বলিয়াছেন, কারণ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতা। সেই আত্মার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন, তিনি অধিভূত পুরুষ। আর প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে,

মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে ও রেতে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তিনি অধ্যাত্ম পুরুষ। তিনি—

অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা। নাঽন্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা। ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি সকলই শুনিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না। তিনি সকলকে মনন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, তাঁহাকে কেহ বিশিষ্টরূপে জানে না, কিন্তু তিনি সকলকে বিশিষ্টরূপে জানেন। তিনি ছাড়া অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই আত্মার অন্তর্যামী অমৃত।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ এই প্রকারে সেই অন্তর্যামী পুরুষের কথা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত সঙ্গীতটি সেই পুরুষেরই ধ্যানসম্ভূত।

নয়ন তোমারে, পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে॥
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে॥
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর;
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে॥
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে॥
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,

লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে—

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি
ভূতানি মধুযশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ
পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ
পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্।

এই পৃথিবী সর্ব্বভূতের পক্ষে মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ব্বভূত মধু। এই পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন, এবং এই শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী তেজোময় অমৃতময়, অধ্যাত্মপুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের মধু, এবং সকল ভূতই তাঁহার পক্ষে মধু, তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল।

পুরুষ, অন্তর্যামী পুরুষ; তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, তিনি মধু। তাঁহার পর আনন্দ ব্রহ্ম, রস ব্রহ্ম; এই সমুদয় উপনিষদের বা বেদান্তের তত্ত্ব যাঁহারা হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার তত্ত্ব ও লীলার মধ্যে প্রবেশ করা খুব কঠিন কথা নহে। কিন্তু বেদান্তের এই সমুদয় তত্ত্ব ধ্যানযুক্ত হইয়া যাঁহারা হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে একেবারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্বে প্রবেশ কেবল কঠিন নহে, অসম্ভব বলিলেই হয়।

ভগবদ্গীতাতে এই পুরুষ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা আছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা সবলই পূর্ণ অথবা যিনি পুরে শয়ন করেন, তিনি পুরুষ;—আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি, পুরেশয়নাদ্বা পুরুষঃ।"

আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ অধিদৈবত পুরুষ, তিনি সকল প্রাণির সকল ইন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিয়া শক্তিযুক্ত করেন। অধিযজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু সকল যজ্ঞের অভিমানিনী দেবতা। এই সমুদয় শ্রুতিবাক্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টিকায় ও ভাষ্যে আচার্য্যগণ বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং 'পুরুষ' সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের

তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলে শ্রীরাধার তত্ত্ব আর বিশেষ কঠিন হইবে না।

৪। পুরুষোত্তম

বেদে আছে—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"

তিনিই মহান্ পুরুষ, পুরুষোত্তম। প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে আমি পুরুষ। আমাদের সাংখ্যদর্শনে বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে কেহ কেহ সাংখ্যদর্শনের ভূমি হইতেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভুল। মানুষ বোঝে আমি পুরুষ—ইহার অর্থ—আমি এই দেহপুরের অধিবাসী, কর্ত্তা, ভোক্তা ও শাসক। এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি আমার জন্য। আমার ইচ্ছা-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি আছে, আমার দায়িত্ব আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্য আছে। জন্মজন্মান্তরে এই বোধ বিকশিত হইতেছে। এই বোধ বিকশিত হইলে, আরও গভীর চিন্তার উদয় হয়, তখন চিন্তা হয় আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, অন্যান্য সকলের জ্ঞান, আমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা, অন্যান্য সকলের ইচ্ছা ; আমার প্রেম, তোমার প্রেম, অন্যান্য সকলের প্রেম ; ইহা আসেই বা কোথা হইতে, আর ইহাদের পূর্ণতাই বা কোথায় ? তখন আমরা আমাদের অন্তরেই অন্তর্যামীরূপে সেই পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ পাই। ক্রমশঃ বুঝি, তিনিই চিরকাল অবিশ্রাম আমাদের প্রত্যেকের সহিত লীলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহার পরের অবস্থা লীলা ; সেই পুরুষোত্তম, যিনি অন্তরে পরিপূর্ণরূপে চিরদিন রহিয়াছেন, তিনি ভিতর ও বাহিরের বিরোধ মিটাইয়া, ভিতর ও বাহির এক করিয়া প্রকট হইয়াছেন। ইহারই নাম লীলা বা নিত্যের প্রাকট্য। শ্রীমদ্ভাগবতের বহু বহু শ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে।

৫। শ্রীকৃষ্ণ—রসরাজ

এইবার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নায়ক। পুরুষোত্তম-বাদ হইতে এই তত্ত্বটি অনুভব করা কঠিন নহে।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি নায়কগণের শিরোরত্ন। তাঁহারই প্রেমলীলা একমাত্র কার্য্য। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন কার্য্য নাই। আমাদের যখন মনে হয়, ইহা ছাড়া অন্য কিছু আছে, তখন আমরা মিথ্যায় জড়াইয়া পড়ি। এই প্রেমলীলাই তাঁহার স্বভাব—তাঁহার স্বরূপ।

"নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত।"

তিনি আনন্দ, তিনি রস, তিনি মধু।

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, নায়কের ছেয়ানব্বই প্রকার গুণ ও অবস্থা পরিপূর্ণরূপে এক শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত। ইহার প্রত্যেকটি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমভেদে তিন প্রকার। এই দ্বাদশ প্রকারের আবার প্রত্যেকটি পতি ও উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। এই চব্বিশ প্রকারের প্রত্যেকটি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারি প্রকার। এই প্রকারে নায়ক ছেয়ানব্বই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণে এই সমুদয়গুলিই লীলায় প্রকট হইয়াছে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা ভক্তগণের আস্বাদিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন। আদিরসই যখন মূলরস, তখন পূর্ণতম ও একমাত্র নায়করূপে সেই রসরাজ ও রসিকশেখরের চিন্তা, নিতান্তই স্বাভাবিক। অতএব আমরাও ভক্তের ভাষায় সেই নায়ক-শিরোরত্নের বন্দনা করি।

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং।
অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং॥

যাঁহার শৃঙ্গাররসই সর্ব্বসম্পত্তি, ময়ূরপুচ্ছই যাঁহার বিভূষণ, যিনি নরাকার আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ত্রিভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি।

৬। শ্রীরাধা—মহাভাব

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, যাহা সংক্ষেপে বলা হইল তাহা হইতে শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক রসময় কলেবর ॥
প্রেমময় বপুঃ কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করায় পরম সন্তোষ ॥
বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ।
নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্নখনি ॥

সংসারে মানুষ মাত্রেই সুখের জন্য পরিশ্রম করিতেছে। এই সুখ আস্বাদন,—রসের আস্বাদন। ভাবের দ্বারা রসের আস্বাদন হয়, ইহা সামান্যমাত্র চিন্তা করিলেই লোকে বুঝিতে পারে। খাদ্য দ্রব্য অতি উপাদেয় ও মধুর, তাহাতে রস আছে এবং সেই রস আস্বাদনের জন্য মানুষ লোলুপ। খাদ্য জুটিল খাইবার অধিকারও পাইলাম, কিন্তু মোটেই ভাল লাগিল না, রসের আস্বাদন হইল না। ইহার কারণ কি? ভাব ছিল না। যেরূপ অবস্থায় থাকিলে রসের আস্বাদন হয়, আমি সেরূপ অবস্থায় ছিলাম না। আমার ক্ষুধা ছিল না, দেহ সুস্থ ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ইহাকে ইংরাজীতে বলা যায় Mood। প্রত্যেক সুখাস্বাদনেই একটা অনুকূল ভাব বা Mood দরকার। সংসারে প্রকটিত প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষয়শীল সুখ বা রস, এক পরম রসের খণ্ড খণ্ড প্রতিবিম্বমাত্র। একদিন মানুষ বলে—

"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"

এই খণ্ড খণ্ড সুখ, ইহারা প্রবঞ্চক, ইহাদের চাহি না, চাই সেই নিত্য সুখ। সেই নিত্য সুখের নামই অমৃত। বেদে এই অমৃত-পিপাসার কথা আছে। বেদে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ তিনিই রসরাজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। অতএব সেই রসরাজকে চাই। কিন্তু সেই রসরাজকে পায় কে? রসকে পাইতে ভাবের দরকার সুতরাং রসরাজকে পাইতে মহাভাবের দরকার। এই মহাভাবই শ্রীমতী রাধিকা।

আমি চাই রসরাজকে। কিজন্য চাই? আমার ভোগের জন্য? তাহা হইলে পাইব না। আমার ভোগের জন্য যখন লোলুপ হইয়া জীবনের পথে চলিয়াছি, তখন বঞ্চিত হইয়া মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিতেছি। যাহা খুঁজিতেছি তাহা পাইব না। বেদ বলিয়াছেন—

"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"

ত্যাগের দ্বারাই ভোগ সিদ্ধ হয়, ভোগের দ্বারা নহে। অতএব রসরাজকে চাই, রসরাজেরই তৃপ্তির জন্য। তাঁহার কাম নাই একমাত্র সত্য ব্যাপার, আর সব কল্পনা। অতএব—

"কুরুষম বচনং সত্বর রচনং পূরয় মধুরিপু কামং ॥"

একমাত্র মধুরিপু, তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই সত্য, তাঁহার কামনাই একমাত্র সত্য। অতএব তাঁহার কামনা পূর্ণ কর।

কিন্তু তুমি যে নিজের কামনার আগুনে দিনরাত্রি জ্বলিতেছ, এ অবস্থায় তুমি মধুরিপুর কামনা কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে? তুমি যে কেবল নিজের কথাই ভাবিতেছ, এ অবস্থায় তুমি অন্যের কথা ভাবিবে কি করিয়া? তুমি যে খণ্ড লইয়া মাতিয়া রহিয়াছ, অখণ্ডের চিন্তা করিবে কি প্রকারে? অতএব সাধনা চাই, সৎসঙ্গ চাই, তত্ত্ববিচার চাই; শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ চাই। কি শুনিবে? শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রবণ কর।

৭। হ্লাদিনী শক্তি।

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ইহাই প্রথম কথা। হ্লাদিনী শক্তি কি? আমরা ভগবান্‌কে তিন প্রকারে অনুভব করিতে পারি। তাঁহার অবশ্য অনন্ত শক্তি, আমাদের নিকট এই তিনটি প্রধান। ভগবান্ আমাদের নিকট সচ্চিদানন্দ। প্রথম তিনি সৎ, তিনি আছেন, তিনিই আছেন। আমি মনে করিতেছি আমি আছি, আপনি মনে করিতেছেন আপনি আছেন, আমি ও আপনি মনে করিতেছি পাহাড় আছে, নদী আছে, সমুদ্র আছে, দেবতা আছে, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি আছে। কিন্তু এই সমুদয়

সত্তা (Existence) ব্যবহারিক (Phenomenal) সাপেক্ষ (Relative)। একমাত্র আছেন তিনি সেই এক, অদ্বিতীয় ভূমা, পরম পুরুষ। তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া আমরা আছি। তাঁহার জন্য আমরা আছি, তিনি মূলে আশ্রয়তত্ত্বরূপে (as substantial reality) আছেন বলিয়াই আমার সত্তা সম্ভব হইয়াছে। ইহাই প্রথম চিন্তা প্রণালী—তিনি সৎ—তিনি অসীম সত্তা—Infinite and Absolute Existence। সেই পুরুষোত্তমকে অসীম সত্তারূপে অনুভব করিতে গেলে তাঁহাতে বা তাঁহার স্বরূপে যে শক্তির (Attribute) বিলাস বা ক্রিয়া অনুভব করি, তাহার নাম সন্ধিনী শক্তি। অনন্ত সত্তাসম্পন্ন শ্রীভগবান্ যে শক্তির দ্বারা নিজে সত্তাবান্ হন, ও অপরকে সত্তাবান্ করেন, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী শক্তি।

সেই পুরুষোত্তমকে অনুভব করার দ্বিতীয় প্রণালী, তিনি চিৎ—তিনি জ্ঞানরূপ ;—একমাত্র তিনিই জ্ঞানরূপ, অন্যসকলের জ্ঞান, এমন কি হিরণ্যগর্ভেরও জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও সাপেক্ষ, একমাত্র তিনিই অসীম ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ—Infinite and Absolute Consciousness। অন্য সকলে তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছে। শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপের যে শক্তির বিলাসের দ্বারা নিজেকে জ্ঞানবান্ করেন ও অপর সকলকে জ্ঞানযুক্ত করেন, সেই শক্তির নাম সম্বিৎশক্তি। একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে—সত্তা ছাড়া চৈতন্য নাই, চৈতন্য ছাড়া সত্তা নাই।

এই দুই শক্তির মূলরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপে আর এক শক্তি রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্ আনন্দ—সমগ্র আনন্দই তাঁহার. তাঁহার আনন্দের আশ্রয়েই জগৎ আনন্দযুক্ত। শ্রীভগবানের স্বরূপের যে শক্তির বিলাসের দ্বারা শ্রীভগবান্ নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে আনন্দিত করেন—সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি।

হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

৮ স্বরূপ-চিন্তা

শ্রীভগবান্ সুখ আস্বাদন করিতেছেন। ইহা অনুভব করা কিছু কঠিন। ভগবানের স্বরূপ-চিন্তাই কঠিন কাজ। ভাব-চিন্তায় (In abstract thinking) বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে ইহা করা যায় না। কিন্তু কিছু চেষ্টা করিয়া ধীরভাবে কিছুদিন অভ্যাস করিয়া যদি আমরা এই চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে সব কথা আমাদের নিকট এখন অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, সেগুলি অন্যরূপ মনে হইবে। ব্যাপারখানা এই—সাধারণ মানুষ শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত নহে, ভগবান্‌কে জগতে আনিয়া জগতের মধ্য দিয়া অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণে উপলক্ষিত করিয়া শ্রীভগবান্‌কে দেখে। Not God as He is in Himself, but God as He is reflected in our universe. কাজেই জগতের নৈতিক শাসনকর্ত্তারূপে শ্রীভগবান্‌কে বুঝাইতে পারা যায় এবং সাধারণ লোকে এই পর্য্যন্তই বোঝে। কিন্তু তাহার উপরের কথা সাধারণ লোককে বুঝাইয়া দেওয়া খুবই কঠিন, তবে সে ব্যক্তি যদি বুঝতে চাহে, অর্থাৎ সে যদি শ্রদ্ধাবান্ হয় এবং সাধুসঙ্গ করিয়া ভজনা করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে বুঝাইতে পারা যায়। নতুবা বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। এই কারণেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে এত লোকের এত সংশয় ও অসুবিধা।

সুখরূপ কৃষ্ণ সুখ আস্বাদন করিতেছেন,—ইহাই চরম কথা। এই বিশ্বপ্রক্রিয়ার মূলে এক পরম পুরুষের আস্বাদন ও উপভোগ রহিয়াছে। আমার জীবনে তাহারই উপভোগ—আমাদের সকলেরই জীবনে তাঁহারই উপভোগ। আমরা যে রহিয়াছি, জানিতেছি, সকলেরই মূলে তাঁহারই আস্বাদন ও উপভোগ। তাঁহারই আস্বাদন ও উপভোগের জন্যই আমরা রহিয়াছি এবং থাকিব। জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই। এই বোধই মানবের চরম বোধ। আমার জীবনে তাঁহার উপভোগ ও আস্বাদন বাধা প্রাপ্ত হইতেছে—আমি অভক্ত। আপনার জীবনে তাঁহার উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত—আপনি ভক্ত, আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। যাঁহার জীবনে রস-আস্বাদক শ্রীগোবিন্দের আস্বাদন ও উপভোগ যে পরিমাণে অব্যাহত, তিনি সেই পরিমাণে ভক্ত বা সত্যপথে অগ্রসর।

ভক্ত সত্য, ভক্তিই সত্য, আর সব ব্যবহারিক। ব্রহ্মাণ্ডে অনেক ভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রহিয়াছেন। জল যেমন নানাস্থানে নানা আকারে রহিয়াছে—ঠিক সেইরূপ। আকাশে মেঘরূপে জল বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে; বায়ুমণ্ডলে বাষ্পরূপে জল অদৃশ্য-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় পাথরের মত শক্ত হইয়া জল রহিয়াছে। তাহা ছাড়া নদীতে জল, সরোবরে জল, প্রস্রবণে জল, আবার নারিকেল গাছের মাথায় জল। একই জল নানা মূর্ত্তিতে নানাস্থানে বিরাজিত। কিন্তু জল যেখানেই যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে সমুদয় জল সেই এক মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছে এবং সমুদয় জল চলিবার পথ পাইলে পুনর্ব্বার সমুদ্রে গিয়া পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করিবে। ঠিক্ সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্ত জন্মিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে জন্মিবেন, তাঁহাদের যাঁহারই যে ভাব হউক, সকলই সেই মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধারূপ মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছেন এবং সকলেই পরিণামে সেই মহাভাব সমুদ্রে সঙ্গতি লাভ করিয়া, তাহার পর সার্থকতা লাভ করিবেন। "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ" ইহার এই অর্থ।

৯। শক্তি ও শক্তিমান্

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা—শক্তি ও শক্তিমান্ পৃথক্ নহে। শক্তিকে বাদ দিলে শক্তিমান্‌কে জানা যায় না, আবার শক্তিমান্‌কে বাদ দিলে শক্তিকে জানা যায় না।

"মৃগমদ যৈছে তার-গন্ধ অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥"

যেমন কস্তুরি ও তাহার গন্ধ, আর অগ্নি ও তাহার উত্তাপ। চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎস্না, এরূপ উদাহরণও দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণও সেইরূপ। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের যেন ঘনীভূতা মূর্ত্তি,—প্রণয়-বিকৃতি।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহার সাহায্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নের অংশগুলি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ॥

সৎ চিৎ আনন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরয়ে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয়োকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে॥ বিষ্ণুপুরাণ।

[হে ভগবন্, হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিত, এই তিনটি বৃত্তিসম্পন্না মুখ্যা শক্তি, সর্ব্বাশ্রয় যে আপনি, আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু হ্লাদকারী যে সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং উভয়মিশ্রা যে রাজসী শক্তি তাহারা, গুণাতীত যে তুমি, তোমাতে অবস্থিত নহে। অর্থাৎ এই তিনটি শক্তি তোমার স্বরূপশক্তি, প্রাকৃত গুণময়ীশক্তি তোমাতে নাই।]

(ক) সন্ধিনী শক্তি

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা যত তাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে একবিংশ শ্লোকে শিব বলিতেছেন—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং,
যদীয়তে তত্র পুমানকাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজে মে মনসা বিধীয়তে॥

[বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বে পুরুষ শ্রীভগবান আবরণশূন্য অবস্থায় প্রকাশিত, এই জন্য তাঁহার নাম বাসুদেব। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন অন্তঃকরণে আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই শ্রীবাসুদেবকে বিশেষরূপে ভাবনা করিয়া থাকি।]

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ লোক ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, তাহাতে

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—পুরুষোত্তমের চিন্তা (God as the Supreme Person) কি প্রকারে উদিত হইয়াছে। আমার দেহ একটি পুর, আমি সেই দেহে পুরুষ। আমি পুরুষরূপে বিবিধ ও বিচিত্র সম্বন্ধে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছি, আমার পিতা, মাতা, সখা, আমার শয্যা, আসন প্রভৃতি। যিনি যত বড় তাঁহার এই সম্বন্ধময় জগৎও তত বড়। এই সম্বন্ধগুলিকে বাদ দিলে আমার কি থাকে? আমার যাহা পুরুষত্ব বা চৈতন্যময় আত্মত্ব, তাহার প্রকাশ বা বিলাস (Manifestation) কেবল দেহের দ্বারাই হয় না, আমার পুত্রত্ব, বন্ধুত্ব, পতিত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধে এই ধারণাটি আমাদের জগতে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া উহা শ্রীভগবানে আরোপ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগের আলোচনা আবশ্যক। সেখানে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি সকল ক্ষেত্রের একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই চিন্তাপ্রণালীর মধ্য দিয়া গেলে আমরা বুঝিব পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে এই সমুদয় সম্বন্ধও বিদ্যমান। কিন্তু আমি যে অপূর্ণ ও পরিমিত, আর তিনি যে পূর্ণ ও অপরিমিত, সুতরাং এই যে পিতা মাতা শয্যা আসন দেহ গেহ প্রভৃতি, এ সকল লইয়া তাঁহাতে ও আমাতে বিশেষরূপ প্রভেদ থাকিবে। সে প্রভেদ কি? আমার এই সব সম্বন্ধের বস্তু বা ব্যবহারের বস্তু, আমার হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আমার নহে, যদিও আমি ইহাদিগকে 'আমার আমার' বলি, কিন্তু ইহারা আমার, প্রকৃত 'আমার' নহে। ইহারা আমার 'অনাত্ম'। (Not-self) কারণ আমার পক্ষে এই 'আমি' বলাটাই যে একটা আয়ত্তাধীন ব্যাপার নহে। 'আমি, আমি' বলিতেছি, কিন্তু কাহাকে 'আমি' বলি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই আমার চক্ষু স্থির। কিন্তু এই সব দোষ বা ত্রুটি (Imperfections) পুরুষোত্তমে বা শ্রীভগবানে নাই, সুতরাং তাঁহার পিতা মাতা শয্যা আসন প্রভৃতি তাঁহারই চিচ্ছক্তির বা সন্ধিনী শক্তির মূর্ত্তি বা বিকার। শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় বা স্বরূপে এইরূপ অনুভব করা তো কঠিন নহে; আবার চিন্তা করুন, দেখিবেন, এইরূপ অনুভবই স্বাভাবিক। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তাই স্বভাবতঃ মানুষের মনে আসিয়া থাকে। যাহাদের না আসে তাহারা স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম চিন্তায় অভ্যস্ত হইয়াছে। নিত্যলীলার প্রাকট্য অর্থাৎ সেই

নিত্য পিতা নিত্য মাতা (The Eternal and Ideal Father and Mother বা The Eternal and Ideal Child) যখন প্রপঞ্চে আসিবেন, তখন তাঁহাদের প্রপঞ্চে আগমন বা আবির্ভাবের পদ্ধতি একটু কঠিন। অন্যপ্রকারের চিন্তাপদ্ধতি, যাহাকে অবরোহন পদ্ধতি বলিব, তাহাতে আবার অভ্যস্ত হইতে হইবে। এই গেল সান্ধিনী শক্তি।

(খ) সম্বিৎ শক্তি

কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞান, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামান্য জ্ঞান বিশেষজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত; অতএব সামান্য জ্ঞানকে বিশেষজ্ঞানের পরিবারভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্, এই জ্ঞানই চরম ও পরম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমাত্মাজ্ঞান ঐ চরমজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র। (different stages)

এই যে জ্ঞান—কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান, এই জ্ঞান কাহার? এই জ্ঞানের জ্ঞাতা কে? যদি বলেন—ভগবান্ বা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেহ, তাহা হইলে দোষ হইল। কারণ কৃষ্ণ বা ভগবান্ তাহা হইলে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কে কৃষ্ণকে জানেন? উত্তর—কৃষ্ণই কৃষ্ণকে জানেন। Who knows the Divine? It is the Divine who knows the Divine. আপনি যদি কৃষ্ণকে জানেন তাহা হইলে বুঝিবেন—কৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি, আপনাকে আশ্রয় করিয়া বা অপনার মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে জানিতেছে। ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পরমেশ্বর।

হে পরমেশ্বর, তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান। এখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, ও ক্রিয়া একই।

(গ) হ্লাদিনী শক্তি

কে কৃষ্ণকে ভালবাসে, কে কৃষ্ণকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করে? Who loves the Divine? It is the Divine that loves the Divine. এই ভালবাসার ও তৃপ্তি-বিধানের যিনি পূর্ণতা, তিনিই শ্রীরাধা।

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি সর্ব্বকান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সাররূপা। শ্রীকৃষ্ণের যাঁহারা কান্তা, শ্রীমতী রাধিকা হইতেই তাঁহাদের বিস্তার হইয়া থাকে। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকার অংশবিভূতি, মহিষীগণ শ্রীরাধিকার বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপা। লক্ষ্মীগণকে বৈভব বিলাসাংশরূপ আর মহিষীগণকে প্রাভব প্রকাশস্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা।

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা শিরোমণি॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সমোহিনীপরা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত বা আস্বাদিত হইয়াছে।

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণক্রীড়া-পূআর বসতি নগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বসয়ে তাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥

শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শক্তিমাত্রেই অমূর্ত্ত, শক্তিমান্‌কে আশ্রয় করিয়াই শক্তির বিলাস হয়। ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন—

"তত্র তাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্ বিগ্রহাদ্বৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ।"

শক্তি যখন কেবল শক্তিমাত্র, তখন ভগবানের বিগ্রহের সহিত এক হইয়া অবস্থিত। লীলা-বিলাসে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তখন তাহার দ্বিরূপত্ব সাধিত হয়।

হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ-প্রধানকে গুহ্যবিদ্যা, সংবিৎ শক্তির সারাংশ-প্রধানকে আত্মবিদ্যা; আর সন্ধিনী শক্তির সারাংশ-প্রধানকে অব্যয়শক্তি বলে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্যস্থানে কথিত হইয়াছে—

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

১০। শ্রীরাধার স্বরূপ

শ্রীল রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন, যাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥
সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্ট শাটি পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্যকুঙ্কুম সখী প্রণয়চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্বগুণ অঙ্গে পট্টবাস।
রাগতাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল।
সুদীপ্ত সাত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী॥
এই সব ভাবভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥

মধ্যবয়স্থিতা সখীস্কন্ধে করন্যাস।
কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ পাশ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥
যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুণের কৃষ্ণ না পান পার।
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয়-কৃত "প্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য স্তবরাজঃ" নামে একটি স্তব আছে, পূর্ব্বের অংশটি সেই স্তব হইতে গৃহীত। সেই স্তবটি এই প্রসঙ্গে অস্বাদনীয়।

মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতাবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধঃবরোদ্বর্ত্তনসুপ্রভাং॥
কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নাপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং।
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য ঘুস্থণাঞ্চিতাং।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরী বিচিত্রিত কলেবরাং॥
কম্পাশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ গদ্গদরক্ততা।
উন্মাদোজাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥

কৃষ্ণালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং।
ধারাধীরাত্বসদ্বাস পটবাসৈঃ পরিস্কৃতাং॥
প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্য তিলকোজ্জ্বলাং।
কৃষ্ণনামযশঃ শ্রাববতংসোল্লাসিকর্ণিকাং॥
রাগতাম্বুলরক্তৌষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাং।
নর্ম্মভাষিত নিঃস্যন্দ স্মিতকর্পূরবাসিতাং॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরিলীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য বিচলত্তরলাঞ্চিতাং॥
প্রণয়ক্রোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং।
সপত্নীবক্ত্র হুচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীবরাং॥
মধ্যতাম্রসখীস্কন্ধ লীলান্যস্তকরাম্বুজাং।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ মধূলী পরিবেশিকাং॥

১১। প্রেম

উপরে যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে "প্রেম" জিনিসটি কি, তাহার আলোচনা করা দরকার। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই প্রেমতত্ত্ব নানা প্রকারে অতিশয় বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ব্যাখ্যার ও বর্ণনার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার।

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ রূপ-গোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' নামক গ্রন্থাবলম্বনে নিম্নের কথা-গুলি লিখিত হইল।

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমাপরিকীর্ত্তিতঃ॥

ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসরহিত, কিছুতেই ধ্বংস হইতেছে না, যুবক যুবতীর ভিতর এই প্রকারের যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নামক উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রেমের কথা আছে। শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাসিতেন, বালিকা বয়স হইতেই প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন।

সেই ভালবাসার প্রেরণায় শৈবলিনী পতির গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, অতি ভয়ঙ্কর বিপদ-সমূহের সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রথমে মনে হইবে ইহা প্রেম। কিন্তু যখন মহাপুরুষের সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে তাহার সেই ভাববন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, যে হৃদয় প্রতাপের জন্য এত করিয়াছে, সেই হৃদয়েরই গতি আবার ফিরিল, তখন বোঝা গেল, ইহা ধ্বংসরহিত নহে, অতএব প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর যে ভাববন্ধন বা ভালবাসা, তাহা প্রেম নহে।

নরলোকে মানুষকে বিষয় করিয়া মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় না। প্রেম নিত্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ নিত্য যে শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্যই জাগরিত হয়। যদি কখনও সত্যপ্রেমের উদয় হয়, তাহা হইলে দেহরক্ষা অসম্ভব। এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বলা হইয়াছে।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
এ প্রেম নৃলোকে নাহি হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

'প্রেমসম্পুট' নামক গ্রন্থে প্রেম-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

লোকদ্বয়াৎ স্বজনতঃ পরতঃ স্বতোবা
প্রাণপ্রিয়াদপি সুমেরুসমা যদিস্যুঃ।
ক্লেশাস্তদপ্যতিবলী সহসা বিজিত্য
প্রেমৈব তান্ হরিরিভানিব পুষ্টিমেতি॥

ইহলোক বা পরলোক হইতে, স্বজন হইতে পরজন হইতে বা নিজের নিকট হইতে, যিনি প্রাণপ্রিয় তাঁহার নিকট হইতে যদি সুমেরু পর্ব্বতের সমান ক্লেশসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সিংহ যেমন হস্তিসমূহকে পরাজিত করেন, সেইরূপ প্রেম সেই সমুদয় ক্লেশকে পরাজিত করিয়া পুষ্টিলাভ করেন।

বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আলোচনায় এই সংজ্ঞাটি যদি সকল সময়ে মনে রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা বৈষ্ণব কবিতার ভিতরের কথা ও আধ্যাত্মিকতা আস্বাদন করিতে পারিব।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে, প্রেম—'আনন্দ-চিন্ময় রস'; আর আছে—প্রেম হ্লাদিনী শক্তির সার। প্রেম যে শক্তি বা শক্তিসার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শক্তি জড়ীয় নহে, মানবীয় নহে, ইহা চিন্ময়, ইহা ঐশ। Love is Divine। মৃত্যুময় জগৎ—প্রেমই এখানে অ-মৃত। জগতে সকলই নশ্বর—একমাত্র প্রেমই অবিনশ্বর ও নিত্য। আমার যতক্ষণ আত্মতৃপ্তির বা আত্মসুখের বোধ থাকে, ততক্ষণ প্রেম কি তাহা আমি বুঝিতেই পারি না। আত্মসুখদুঃখ বোধ পরিত্যাগ করিলে প্রেমের আবির্ভাব হয়, অথবা প্রেমের আবির্ভাব হইলে আর আত্ম-সুখ-দুঃখের বোধ থাকে না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেই আছে—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

আচার্য্যগণ প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ ভেদে প্রেমের তিন প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থা তিনটি দুইদিক্ হইতে আলোচনা করা যায়। এক নায়কের দিক্ হইতে আর নায়িকার দিক্ হইতে। এই প্রেম, একটি বিশেষ প্রকারের পুষ্ট বা পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হইলে তাহার নাম হয়—স্নেহ।

১২। স্নেহ

আরুহ্য পরমাংকাষ্ঠাং প্রেমাচিদ্দীপদীপনং
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।

প্রেম যখন পরম উৎকর্ষের অবস্থায় আরোহণ করে তখন উহা চিদ্দীপদীপন। 'চিৎ'-শব্দে প্রেম-বিষয়ের উপলব্ধি বুঝায়। "প্রেক্ষোপলব্ধিশ্চিৎ সম্বিৎ"—অমরকোষে এই অর্থ আছে। প্রেমবিষয়ের যে উপলব্ধি বা সম্যক্ জ্ঞান তাহা দীপের মত অর্থাৎ তাহার দ্বারা আমার ভিতরের ও বাহিরের সকল প্রকার অন্ধকার বা সংশয় দূরীভূত হয়। প্রেম

যখন পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া স্নেহের অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন উহা দ্বারা সেই চিদ্দীপের দীপন হইয়া থাকে; সেই চিদ্দীপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তৈলাদি স্নেহ পদার্থের দ্বারা দীপ যেমন উজ্জ্বল হয় ঠিক্ সেইরূপ। স্নেহের দ্বারা হৃদয়ও দ্রব হয়। দীপ উজ্জ্বল হইলে তাহার উষ্ণতাযোগে যেমন অনেক পদার্থ গলিয়া যায়, সেইরূপ প্রেম স্নেহ-অবস্থায় উপস্থিত হইলে, হৃদয় সর্ব্বদাই দ্রব-অবস্থায় থাকে।

এখানে, ভাবিয়া দেখিবার কথা এই। মানুষে মানুষে ভালবাসা হয়। কিন্তু এই ভালবাসা রক্ষা করিতে হইলে দেখাশুনা প্রয়োজন। অনেকদিন দেখাশুনা না হইলে ভাববন্ধন শিথিল হইয়া যায়, শেষে হৃদয় শুকাইয়া যায়, আর প্রেম থাকে না। ইংরাজীতে বলে—Out of sight, out of mind। দৃষ্টির বাহির হইলেই মনের বাহির হইয়া যায়—ইহাই প্রাকৃত জগতের নিয়ম। এখন স্নেহের অবস্থা দেখুন; স্নেহ আমার ভিতরে জাগিয়াছে, আমার যিনি প্রেমাস্পদ বা প্রেমের বিষয় তিনি আলোকের ন্যায় আমার ভিতরে রহিয়াছেন। তিনি আসুন আর না আসুন, দেখা হউক আর না হউক, তিনি আদরই করুন আর অনাদরই করুন, স্নেহ আমার ভিতরে। সেই স্নেহের সাহায্যে আমার হৃদয়ের দীপের সর্ব্বদাই উদ্দীপন হইতেছে, যতই সময় যাইতেছে সেই মূর্ত্তি আমার হৃদয় মধ্যে ক্রমেই অধিক উজ্জ্বল হইতেছে, অদর্শন তাহার উজ্জ্বলতা কমাইতে অক্ষম, স্নেহ ভিতর হইতে তাহার উজ্জ্বলতা বাড়াইয়া দিতেছে! সেই প্রেক্ষ বা প্রেম-বিষয়, তাঁহার উজ্জ্বলতা যত বাড়িতেছে, আমার হৃদয়ও তত বিগলিত বা দ্রবীভূত হইতেছে। ইহার জন্য আর বাহিরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। এই অবস্থার নাম স্নেহ।

অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তি দর্শনাদিষু।

স্নেহ উদিত হইলে দর্শনাদির দ্বারা কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

এই স্নেহকে আচার্য্যগণ ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। রতির উদ্ভব দুই প্রকারে হইয়া থাকে—'তাহার আমি' এই এক প্রণালী, আর 'আমার তিনি' এই এক প্রণালী। ঘৃতস্নেহে প্রথম প্রকারের চিন্তা প্রবল (dominant), আর মধুস্নেহে দ্বিতীয় প্রকারের চিন্তা প্রবল। শ্রীজীব গোস্বামীকৃত লোচনরোচনী টীকায় নিম্নরূপ কথিত হইয়াছে—

রত্যুদ্ভবো হি দ্বিধা ভবতি। তদীয়াহমিতি মদীয়ঃ স ইতি ভাবনাভেদাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বং যো ঘৃতস্নেহ উক্ত স তদীয়াহমিতি ভাবনাময়ঃ। মধুস্নেহস্ত্বয়ং মদীয়ঃ স ইতি ভাবানাতিশয় ময়ঃ।

'শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি' বলিয়াছেন—

আত্যন্তিকাদরময়ঃ স্নেহোঘৃতমিতীর্য্যতে।

যে স্নেহ অতিশয় আদরময় তাহাকে ঘৃতস্নেহ বলে।

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু।

'আমার তুমি' এই ভাবের আতিশয্যময় যে স্নেহ, তাহার নাম মধুস্নেহ।

১৩। মান

স্নেহের পরিণত অবস্থার নাম মান।

স্নেহস্তূৎ কৃষ্টতা বাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

স্নেহ অর্থাৎ চিত্তদ্রব, উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়া যখন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেকে গোপন করিবার জন্য যখন অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য অবলম্বন করে, তখন তাহার নাম মান।

আমরা পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে আছে—

প্রচ্ছন্ন-মান, বাম্য, ধম্মিল্ল-বিন্যাস।

আর আছে—

প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল।

উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান দুই প্রকার। ঘৃতস্নেহই উদাত্ত মান হয়।

মধুস্নেহস্তু কৌটিল্যং স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ঙ্গমং।
বিভ্রন্নর্ম্মবিশেষঞ্চ ললিতোঽয়মুদীর্য্যতে॥

মধুস্নেহবতী যখন স্বাধীন ভর্ত্তৃকারূপে,—কান্ত, হৃদয়ের দ্বারা বুঝিতে পারেন এ প্রকারের কৌটিল্য ও নর্ম্ম বা কৌতুক অবলম্বন করেন, তখন তাহাকে ললিত মান বলা হইয়া থাকে।

মানের পরের অবস্থার নাম প্রণয়।

মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

মান যখন এমন অবস্থায় আসে যে আর কোনরূপ সম্ভ্রমবুদ্ধি বা পার্থক্য বুদ্ধি থাকে না, কান্তের সহিত একেবারে অভেদ মনন হয়, সেই অবস্থার নাম প্রণয়।

১৪। প্রণয় রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব

এই অবস্থায় নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, বুদ্ধি দেহের ঐক্যভাবন হইয়া থাকে।

বিস্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসই প্রণয়ের স্বরূপ। বিস্রম্ভ দুই প্রকার, মৈত্র ও সৌখ্য। বিনয়ান্বিত বিস্রম্ভকে মৈত্র বলে আর ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত যে বিশ্রম্ভ তাহার নাম সখ্য। আচার্য্যগণ বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি লীলাগ্রন্থের বর্ণনা হইতে এই সমুদয় অবস্থা দেখাইয়াছেন।

প্রণয়ের পরের অবস্থার নাম রাগ।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

প্রণয়ের উৎকর্ষ নিবন্ধন চিত্তের এমন অবস্থা হয় যে যাহা নিতান্ত দুঃখ, তাহাকেও সুখ বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থার নাম রাগ। নীলিমা ও রক্তিমাভেদে রাগ দ্বিবিধ।

রাগের পরের অবস্থা অনুরাগ।

সদানুভূতমপি যং কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবেন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।

যে রাগ সর্ব্বদাই নূতন হইতেছে, আর অনুভূত প্রিয়জনকে সর্ব্বদা নূতনের মত বোধ করাইতেছে, তাহাকে অনুরাগ বলে।

অনুরাগের পর ভাব।

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

এই অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে অর্থাৎ ইহার চরম অবস্থায় উপস্থিত হয়, রাগের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সেই লক্ষণ যখন তাহার উৎকর্ষ লাভ করে, এবং

স্বসংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজের ভিতরেই নিজের সাফল্য লাভ করে, তাহার নাম ভাব। ভাব আর মহাভাব, ইহাদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। যেমন ভগবান্ আর স্বয়ং ভগবান্। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার টিকায় এইরূপ বলিয়াছেন। এই অবস্থা একমাত্র ব্রজদেবীগণের মধ্যেই সম্ভব, মহিষীগণের মধ্যেও এ অবস্থা হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব-স্বরূপিনী।

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্যতার।

সেই মহাভাব কি তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। এই আলোচনা যথেষ্ট নহে। মহাভাব কি, তাহা বুঝিতে হইলে সুদৃঢ় চিন্তা অর্থাৎ অন্তর্মুখী হইয়া ধারণা ও ধ্যান আবশ্যক। মোট কথা, আচার্য্যেরা কিভাবে এই রাধাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন আমরা তাহা মোটামুটি দেখিলাম। শ্রীরাধাতত্ত্ব লইয়া তাড়াতাড়ি যাহা হউক একটা সমালোচনা আমরা যেন না করি।

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেক সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥
বরামৃত স্বরূপশ্রীঃ স্বংস্বরূপং মনোনয়েৎ॥

এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীসকলে অতি দুর্ল্লভ। কেবলমাত্র ব্রজ-সুন্দরীগণেরই ইহা সংবেদ্য, ইহাই মহাভাব। এই মহাভাব, শ্রেষ্ঠ অমৃতের স্বরূপ সম্পত্তি বিশিষ্ট হওয়ায় চিত্তকে নিজের স্বরূপে লইয়া যায়।

এই মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। অধিরূঢ় মহাভাবের মোদন ও মাদন, এই দুই প্রকার ভেদ। এই মোদন ভাব, বিরহ দশায় মোহন নামে কথিত হয়। এই মোহন ভাব হইতে দিব্যোন্মাদ হইয়া থাকে। দিব্যোন্মাদের উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পা প্রভৃতি বহু বহু অবস্থাভেদ আছে। চিত্রজল্প দশাঙ্গ। অঙ্গগুলির নাম—প্রজল্প,-পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প প্রতিজল্প, সুজল্প। শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতায় এই অবস্থাগুলি পরিদৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম মাদন।

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

হ্লাদিনীসার প্রেম। ঐ প্রেম যদি রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্তের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাদন বলা যায়। এই মাদন পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সতত ইহা শ্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্যত্র ইহার উদয় হয় না। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টিকায় বলিয়াছেন,—মাদনে বিরহাভাবাৎ—মাদনে বিরহ নাই।

এই সমুদয় চিন্তাপ্রণালীর মধ্যদিয়া শ্রীরাধাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও প্রেম জয়যুক্ত হউক।

আস্থৈরক্ষয়িষ্ণুং হৃদয়বিধুমণিদ্রাবণং বক্রিমাণং
পূর্ণত্বেঽপ্যুদ্বহন্তং নিজরুচিঘটয়া সাধ্বসং ধ্বংসয়ন্তং।
তন্বানং শং প্রদোষে ধৃত নব নবতা সম্পদং মাদনত্বা-
দদ্বৈতং নৌমি রাধাদনুজবিজয়িনোরদ্ভুতং ভাবচন্দ্রঃ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্ভুত ভাবচন্দ্রকে প্রণাম করি। এই ভাবচন্দ্র প্রাকৃতী ও অপ্রাকৃতী সৃষ্টিকে অভিব্যাপ্ত করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সর্ব্বকালব্যাপিনী। ইহার কখনও ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। (ধ্বংস-সম্ভাবনা নাই—ইহা প্রেমের লক্ষণ) এই প্রেমচন্দ্র হৃদয়রূপ চন্দ্রকান্তমণিকে দ্রবীভূত করেন। (দ্রবীভূত করা স্নেহের লক্ষণ) এই ভাবচন্দ্র পূর্ণ হইয়াও বক্রভাব ধারণ করিয়াছেন। (ইহা মানের লক্ষণ) এই ভাবচন্দ্র স্বীয় কান্তিসমূহের দ্বারা ভয়রূপ অন্ধকার ধ্বংস করিতেছেন। (প্রণয়) এই ভাবচন্দ্র প্রদোষে—সন্ধ্যায় অথবা প্রকৃষ্টরূপ দোষে বা অপরাধে অর্থাৎ কালদেশকৃত দুঃখরূপ দোষে সুখ বিস্তার করেন। (রাগের লক্ষণ) এই ভাবচন্দ্র মাদন অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের আনন্দবিষয়ক। এই ভাবচন্দ্র দ্বিতীয়রহিত, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত আর কিছু নাই। (মহাভাব)

শ্রীরাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে ইহাই প্রাথমিক কথা। আমরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণবন্দনা করি

সাধ যায় ইহ চন্দ্রম কিরণে, কুসুমিত কুঞ্জবিতানে।
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশাওব বাঁশিক সুমধুর গানে॥

প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়, রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা, চরণে প্রণমে ভানু॥

১৫। রাধাপ্রেম—সাধ্যশিরোমণি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে সাধনতত্ত্ব প্রবর্ত্তিত করেন তাহার শেষ কথা শ্রীরাধাতত্ত্ব। শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহার শেষ কথা এই—

রায় কহে রাধা-প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

মানবজীবনে ধর্ম্মসাধনার দ্বারা যে চরম ফল লাভ করা যাইবে তাহা শ্রীরাধার প্রেম বা শ্রীরাধাতত্ত্বের সহিত প্রকৃত পরিচয় বা শ্রীরাধারাণীর করুণালাভ। রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কথোপকথন তাহাতে সাধনার নিম্নলিখিত স্তরগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১। স্বধর্ম্মাচরণ ২। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ৩। স্বধর্ম্মত্যাগ ৪। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ৫। জ্ঞানশূন্যাভক্তি ৬। প্রেমভক্তি ৭। দাস্যপ্রেম ৮। সখ্যপ্রেম ৯। বাৎসল্যপ্রেম ১০। কান্তাপ্রেম ১১। রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি।

স্বধর্ম্মাচরণে ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ আর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের পরিচয়লাভই ধর্ম্মজীবনের চরম পরিণতি। এই মাধুর্য্যের পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—

কর্ম্মতপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি জপধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

এই রাগ ও রাগমার্গ কি, তাহা না বুঝিলে শ্রীরাধাতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে না।

উপসংহার

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে পৌরাণিক ঘটনাবলীর শ্রেণী-বিভাগের কথা

বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে ইহা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আজ কাল পুরাণকে ইংরাজী ভাষায় Mythology বা Myth বলে। সকলেই জানেন ইংরাজী ভাষায় Myth কথার অর্থ মিথ্যা। সুতরাং পুরাণের কথা বলিলেই অনেকের মনে হয় ইহা মিথ্যা বা কাল্পনিক কথা। তবে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ইহার ভিতর হইতে কিছু কিছু সত্য বাহির করিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ের এই ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। এই চিন্তা ও ধারণার দ্বারা ভারতবর্ষের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। সুপরিচিত চিন্তাশীল লেখক রাস্কিন্ (Ruskin) তাঁহার Queen of the Air নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—

Never confuse a myth with a lie. The thoughts of all the greatest and wisest men hitherto have been expressed through mythology.

পৌরাণিক আখ্যানকে মিথ্যা ভাবিও না। পৃথিবীতে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বড়লোক ও জ্ঞানীলোক তাঁহাদের চিন্তাসমূহ এতকাল ধরিয়া পুরাণের মধ্য দিয়া আসিয়াছে।

তিনি আবার বলিয়াছেন—

To the mean person the myth always meant little; to the noble person, much.

অজ্ঞ লোকের নিকট পুরাণের কোন অর্থ নাই, কিন্তু যাঁহারা মহৎলোক তাঁহাদের নিকট পুরাণ গভীরার্থ-পূর্ণ।

Novalis বলেন—mythology contains the history of the archetypal world. It comprehends past, present and future. পুরাণ ভাবজগতের নিত্য ইতিহাস।

বর্ত্তমান সময়ের একটি শুভলক্ষণ এই যে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত আজকাল আর প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ঘটনাসমূহ অশ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন না। তাঁহারা গভীর শ্রদ্ধাও চিন্তার সহিত পৌরাণিক ঘটনাসমূহের তত্ত্বনির্দ্ধারণের জন্য বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। সেই পরিশ্রমের ফলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইতেছে। গ্রীস্ রোমের পৌরাণিক ঘটনাসমূহ ইংরাজী সাহিত্যে নানাপ্রকারে

প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এখন অনেক চিন্তাশীল সমালোচক সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

এই সমুদয় আলোচনার ফলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইতেছে। প্রাচীন জগতের যাবতীয় সভ্যদেশে রহস্য বিদ্যার আলোচনার জন্য অনেক গুপ্তসমিতি ছিল। এই সমুদয় সমিতিতে যাঁহারা উচ্চাধিকারী তাঁহারা বিশ্বরহস্যের চরম সত্য সম্বন্ধে গোপনে আলোচনা করিতেন। এই সমুদয় সত্য সাধারণ লোকের অবোধ্য, কাজেই গোপনে ইহার অনুশীলন হইত। গোপনে যাহার অনুশীলন হইত, তাহাই আবার নানারূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা,—কাব্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত। সাধারণ লোকেরা নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী এই সমুদয় কথা বুঝিয়া লইত। ক্রমে ক্রমে অবশ্য গূঢ় অর্থ তাহারা বুঝিতে পারিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন সংশয় প্রকাশ করিয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্রীশুকদেব সাতটি উত্তর দিলেন। এই যে সাতটি উত্তর ইহা সাত প্রকারের লোকের জন্য।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক জ্ঞানীলোক বলিতেছেন, পূর্ব্বদেশের প্রাচীন রহস্যশাস্ত্রের অন্ততঃপক্ষে সাত প্রকার তাৎপর্য্য বা গূঢ় অর্থ আছে। ইহার সকলগুলি বুঝিয়া উঠা খুবই কঠিন, তবে যাঁহারা অন্তর্মুখী হইয়া সাধনা করেন তাঁহারা চেষ্টা করিলে কয়েকটি অর্থ, অন্ততঃপক্ষে তিনটি করিয়া অর্থ বুঝিতে পারিবেন। আমরা ইহাকে পুরাণের সপ্তদ্বার বলিতে পারি। আমরা প্রধানতঃ ইংরাজী ভাষায় ঐ সাতটি দ্বারা বা সপ্তদ্বারের সাতটি চাবি নিম্নে বিবৃত করিলাম—

I. The Spiritual key—আধ্যাত্মিক
II. The Astronomical key—জ্যোতিষিক
III. The Metaphysical key—তাত্ত্বিক
IV. The Anthropological key—নৃতত্ত্ববিদ্যাগত
V. The Geometrical key—জ্যামিতিক
VI. The Psychic key—মনস্তত্ত্বগত
VII. The Physiological key—দেহতত্ত্বগত

এইগুলি প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার সাতটি করিয়া ছোট চাবি বা সন্ধান আছে। প্রথম ও সপ্তমের ছোট চাবিগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

a. The astronomical
b. The geometrical
c. The numerical
d. The real-mystical
e. The allegorical
f. The moral
g. The Literal

যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা চিন্তা করিবেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাল নির্ণয়

[শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়কে বৈষ্ণব সাহিত্য-সম্বন্ধে ১৪টী প্রশ্ন করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন—]

প্রিয় অচ্যুত,

তুমি বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছ। আজও বৈষ্ণব-কবি ও চৈতন্য-পার্ষদগণের কাল যথার্থভাবে নিরূপিত হইল না দেখিয়া ব্যথিত হইতেছি। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাল সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহার তারিখ dogmatically assert করিয়াছেন। ঠিক original source of information কি, বা কোন যুক্তিবলে কি তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। ফলে, প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। তুমি এই পত্রের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি দাও, তবে ঐতিহাসিকভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার সাহায্য হয়। তবে, প্রত্যেকটী উত্তরই প্রমাণসহ ও যুক্তিগর্ভ হয়, তাহাই ইচ্ছা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করাইয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির নাম—Chaitanya and his Companions ও Vaishnava Literature. দীনেশবাবু ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু উক্ত দুই গ্রন্থে, দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ও "বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়ের" ভূমিকার মতের সহিত বিরোধ আছে। দীনেশবাবু যথার্থ ঐতিহাসিকের ন্যায় নিজমত পরিত্যাগ করিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইলেও, ১৯২১ সালের "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যে"র চতুর্থ সংস্করণে সেই নব মত গৃহীত হয় নাই দেখিয়া মনে হয়, দীনেশবাবুর নিজের মত সম্বন্ধে এখনও হয়তো কিছু সন্দেহ আছে, তাহা না হইলে দুই গ্রন্থে দুইরূপ মত কেন?

যাহা হউক, এখন দীনেশবাবুর নবমত এই যে—"বিশ্বকোষে" লেখা আছে যে, বীর হাম্বীর ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুরে আগমন তাহার পরে। অতএব ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের আগে খেতুরীর মহোৎসব হইতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, এই খেতুরীর

মহোৎসবের তারিখের উপর, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ এমন কি, ছয় গোস্বামী ও অধিকাংশ বৈষ্ণব সাহিত্যিকের তারিখ নির্ভর করে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা প্রয়োজন। দীনেশবাবু আর একটি যুক্তিদ্বারা উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন—তাহা এই যে, রূপ ও সনাতনের নির্দ্দেশমত ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হয় ও শ্রীনিবাস সেই মন্দির দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই মতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি, "প্রেম-বিলাস" যে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ও "কর্ণানন্দ" ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইল বলিয়া গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, সে কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন। শ্রীনিবাস যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের কথা নীলাচলে যাইতে যাইতে শুনিয়াছিলেন, তাহাও অবিশ্বাস করিয়াছেন। আর রূপ ও সনাতন ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের পর তিরোধান করেন—এইরূপ অভিনব কথা শুনাইয়াছেন। এখন উপযুক্ত External ও Internal প্রমাণদ্বারা এই মত ঠিক কিনা, তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

তোমাকে বলা বাহুল্য যে, দীনেশবাবু "বিশ্বকোষের" উপর নির্ভর করিয়া বীরহাম্বীরের রাজ্যাধিরোহণের তারিখ সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছেন। কেননা Archeological Survey of India র ১৯০৩—৪ খৃষ্টাব্দের T. Bloch সাহেবের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মল্লাব্দ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু "বিশ্বকোষে" ৭১৫ খৃষ্টাব্দে মল্লাব্দের আরম্ভ ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে। আর দীনেশবাবু স্বীকার না করিলেও দেখা গেল যে, গোবিন্দের মন্দির সম্বন্ধে সংবাদ তিনি "বিশ্বকোষ" হইতেই লইয়াছেন। গ্রাউস সাহেবের মথুরার ইতিহাস হইতে সেই গোবিন্দের মন্দিরের insription পাঠ করিয়া দেখা গেল যে তাহাতে রূপ সনাতনের নাম গন্ধও নাই। এ ক্ষেত্রেও "বিশ্বকোষ" দীনেশ বাবুকে ভ্রান্ত করিয়াছে। আর 'ভক্তি রত্নাকরে'র ২য় তরঙ্গে ৯১ পৃষ্ঠায়

গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি॥

এই কথায় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনায় মনে হয় যে মানসিংহের মন্দিরের পূর্ব্বেও গোবিন্দের মন্দির ছিল। এ সম্বন্ধে তোমার মত, প্রমাণ সহ লিখিয়া সুখী করিবে।

(২য় প্রশ্ন) ছয় গোস্বামীর তারিখ নির্দ্ধারণের উপায় কি? বৃন্দাবনে রক্ষিত "সেবা প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়" পুঁথি, "ভক্ত দিক্ দর্শিনী" ও "সজ্জনতোষিণী"তে প্রকাশিত জনৈক ভক্তের বিবরণ হইতে জানা যায় (ঐ তিনটী মত প্রায়ই একরূপ) ইহাদের তিরোভাবের তারিখ একরূপ;—

রূপ	১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ, জগদ্বন্ধু ভদ্র মতে				১৫৫৮
সনাতন	১৫৫৮	"	"	"	১৫৬৪

গোপাল ভট্ট	১৫৮৫	"	"	" ১৫৭৮
রঘুনাথ দাস গোস্বামী	১৫৮১			
রঘুনাথ ভট্ট	১৫৭৯			
শ্রীজীব	১৬০৮ ভদ্র ও 'ভক্ত দিক্‌দর্শিনী'			১৬১৮

সনাতনের তিরোভাব রূপের আগে হইয়াছিল, এ কথা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক হইতে জানা যায়। সুতরাং ভদ্র মহাশয়ের মত, ওস্থলে ভুল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সনাতন রূপের কতদিন পূর্ব্বে তিরোধান করেন? উক্ত তালিকাগুলির মতে ৫ বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু প্রেম-বিলাসের পঞ্চম-বিলাসে চারি মাসের মধ্যে উভয়ের অপ্রকট লিখিত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে শ্রীনিবাসকে এক ব্রজবাসী বলিতেছেন:—

কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথা।
সনাতনের অপ্রকটে পাইলু বড় ব্যাথা॥
চারিমাস হইলেন তিহোঁ অপ্রকট।
শুনিতেই মাত্র প্রাণ করে ছটফট॥

বৃন্দাবনে যাইতেই শুনিলেন—

প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতদিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে হইলা অপ্রকট।
শরীরে না রহে প্রাণ করে ছটফট॥

'অনুরাগবল্লী'তে আছে—

শ্রীনিবাস যাইয়া শুনিলেন—
সনাতন অপ্রকট অনেক দিবস।
তার পরে রঘুনাথভট্ট স্বেচ্ছাবাস॥
সম্প্রতি কয়েক দিন রূপ অদর্শন।
কহিল তোমারে এ তিনের বিবরণ॥

'ভক্তি রত্নাকরে'র বর্ণনাতেও বোধ হয় রূপ সনাতন অল্পদিন ব্যবধানে তিরোহিত হয়েন।

রঘুনাথভট্ট ভাগবত বক্তা যেহোঁ।
প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈলা তিহোঁ॥

এই কথোদিন শ্রীগোসাঞি সনাতন।
মো সবায় নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন॥
এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাই॥

(৩য় প্রশ্ন) তারপর 'প্রেমবিবাস','অনুরাগবল্লী' ও 'ভক্তি রত্নাকর' হইতে জানা যায় যে, শ্রীনিবাস নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সংবাদ পান। এরূপ অবস্থার তিনি বাঙ্গলার কয়েকটী স্থান ভ্রমণ করিয়াই বৃন্দাবনে যান। সেখানে যাইয়া শুনেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে অস্থির হইয়া রঘুনাথ-ভট্ট, রূপ ও সনাতন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তবে কি তাঁহারা ১৫৩০ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েন? এস্থানে উক্ত গ্রন্থগুলি স্পষ্টতঃ কোন তারিখ উল্লেখ না করিলেও, ঐরূপ ভাব মনে আনিয়া দেয়।

'অনুরাগবল্লী'তে শ্রীনিবাস—

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান।
মুর্চ্ছিতে পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি যান॥

'ভক্তি রত্নাকর'—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কতদূরে শুনিল চৈতন্য সংগোপন॥

কিন্তু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্পকাল পরে রূপসনাতনাদির তিরোভাব হইতে পারে না॥ কেননা, শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষিণী নামক সনাতনকৃত টিপ্পনীর সংক্ষেপ করিয়া যে বৈষ্ণবতোষিনী লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন যে, ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সনাতন টিপ্পনী শেষ করেন। অতএব সনাতন ১৫৫৪ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন জানা গেল। এ স্থলে উল্লিখিত গ্রন্থ-গুলিকে অবিশ্বাস করিতে হয়।

যদি বল, শ্রীনিবাসের গৌড় ভ্রমণ করিতে ১৪৩৩ হইতে ১৫৫৫ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২২ বৎসর লাগিয়া-ছিল, তাহাও হয় না। কেননা, ঐ সব গ্রন্থেই প্রকাশ, শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখনও তিনি তরুণ। অতএব (১৩+২২=৩৫) ৩৫ বৎসর তখন তাঁহার বয়স হয় না। তাহা ছাড়া, তিনি ২৫ বৎসরে বিবাহ করেন লিখিত আছে। এ সম্বন্ধে তোমার সমাধান কি লিখিবে।

(৪র্থ প্রশ্ন) ছয় গোস্বামীর উদ্ধৃত তালিকায়, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তারিখের সহিত প্রেম-বিলাসাদি গ্রন্থেরও মিল নাই, ইহা দেখিতে পাইতেছ। অতএব বিশেষ প্রমাণ সহ গোস্বামীদের তারিখ সম্বন্ধে জানাইবে।

(৫ম প্রশ্ন) শ্রীনিবাসের এখন জন্ম হয়। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদ তরঙ্গিণীতে' একস্থানে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে, অন্যস্থলে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন। দীনেশবাবু বলেন, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বহু পরে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, একথা তিনি 'প্রেমবিলাসে' পাইয়াছেন। তিনি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 'প্রেমবিলাসে'র প্রথম বিলাসে দেখিতেছি যে, শ্রীচৈতন্য পৃথিবীকে চৈতন্য দাসের খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পৃথিবী তিনদিন পরে আসিয়া নীলাচলবাসী শ্রীচৈতন্যকে বলিতেছেন—

চাকন্দিতে বাস তাঁর অতি শুদ্ধাচার
তাঁর দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার
পুত্র নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরম্ভিলা
জগন্নাথে রাখি তেঁহো অল্পকাল গেলা॥

* * * *

এথায় চৈতন্যদাস বিপ্র পুরশ্চরণ করে।
সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে॥
স্বচ্ছলে আজ্ঞা হইল গৌরবর্ণরূপে।

স্বপ্নদর্শন করার পর লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিতেছেন—"আমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষ্ঠান"। নানারূপ মঙ্গল হইতে লাগিল—তাহাতে কবি বলিতেছেন—"গর্ভেতে প্রবেশমাত্র এত ফল হইল"। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, 'প্রেম বিলাস' মতে শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত "বৃন্দাবন কথায়" লিখিয়াছেন যে, তিনি আচার্য্য বংশীয়দের গৃহে রক্ষিত পুথি হইতে জানিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

(৬ষ্ঠ প্রশ্ন) তুমি 'সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায়' ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যায় লিখিয়াছ যে, শ্রীনিবাসাদি গ্রন্থ লইয়া "১৫০৪ শকে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন"—এ কথার প্রমাণ কি?

এদিকে 'গোপালচম্পূ'র শেষে শ্রীজীব বলিতেছেন যে, ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তোমার ও ভদ্রমহাশয়ের মতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাদি গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল—তখন কি 'গোপাল-চম্পূ' সঙ্গে যায় নাই?

(৭) শ্রীনিবাস বাল্যকালে নরহরি সরকারকে দেখিয়াছিলেন—সরকার ঠাকুর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন, ইহা সকলেই বলেন। একথার প্রমাণ কি? অবশ্য এই তারিখ ধরিলে বেশ সঙ্গতি হয়; তবে দীনেশবাবুর মত মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

(৮) খেতুরীর মহোৎসব কোন তারিখে হইয়াছিল? প্রবাদ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে, দুই চারি বৎসরের মতভেদও দেখা যায়। যাহা হউক ইহার ভিত্তি কি?

(৯) বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' কবে রচিত হয়? তুমি একবার সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৩ মাঘ) লিখিয়াছ: "বৃন্দাবন দাসের ভাগবত ১৪৯২ শকে অর্থাৎ ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।" আবার নগেন্দ্রবাবু (সাঃ পঃ পঃ ১৩০৪. তৃতীয় সংখ্যায়) বলিতেছেন—শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন—১৪৫৭শকে অর্থাৎ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।" তোমার যথার্থ মত কোনটি এবং কেন এরূপ মত পোষণ কর?

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে'র ন্যায় গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে এত মতভেদ আজও দেখা যায়—আজও তাহার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল না। জগদ্বন্ধুভদ্রের মতে ১৫১৫ খৃঃ অঃ, রামগতি ন্যায়রত্ন মতে ১৫৪৮ খৃঃ অঃ, অম্বিকা ব্রহ্মচারীর মতে ১৫৫৭ খৃঃ অঃ, 'প্রেমবিলাসে'র ২৪শ বিলাস মতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ ও দীনেশবাবুর মতে একবার ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দ, আর একবার ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ। মোটের উপর আমার মনে হয় যে, কবিকর্ণপুর যখন ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' রচনা করেন, তখন বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ এত প্রচলিত যে, তাঁহাকে ব্যাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১০) চৈতন্য চরিতামৃতের ১৫৮১ খৃঃ অঃ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ তোমার অভিমত। প্রেম-বিলাসের ২৪ বিলাসেও ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। দীনেশবাবু দুইবার দুইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১) লোচনের "চৈতন্য-মঙ্গলের" তারিখ কি? জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ বলেন। দীনেশ-বাবু একবার ১৫৩৭ ও আর একবার ১৫৭৩ খৃঃ এর পর বলেন! নগেন বাবু ১৫৫৮এর অনেক পরে ইহা রচিত বলেন। (সাঃ পঃ পঃ ১৩০৪)। তোমার মত জানাইবে।

(১২) ঈশান নাগরের উল্লিখিত অদ্বৈতের তিরোভাব তারিখ ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ, বিশ্বাস কর কি? যদি শ্রীনিবাস ১৫১৯এ জন্মেন বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে অদ্বৈতের ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিরোভাব বিশ্বাস করা যায় না। কেননা শ্রীনিবাস অদ্বৈতকে দেখিতে পান নাই, ইহা 'প্রেমবিলাস', 'অনুরাগবল্লী', 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে। আর 'প্রেমবিলাসে' আছে—শ্রীনিবাস নীলাচল হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিবার পথে বলিতেছেন—"তৃতীয় বৎসর গোসাঞির অপ্রকট"। 'ভক্তি রত্নাকর' বলেন, শ্রীনিবাস নীলাচল হইতে ফিরিতেই দেখিলেন—

কেহো অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে হৈলা অদর্শন॥

এই বর্ণনা হইতেও অদ্বৈতের অপ্রকটের তারিখ ১৫৩৩ হইতে ১৫৩৫ মনে হয়। মহাপ্রভুর

তিরোধানের পরই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিরোহিত হয়েন—এই বিশ্বাস বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত। এ অবস্থায় ঈশানের তারিখ কিরূপ বোধ হয়?

(১২ক) নিত্যানন্দের অপ্রকটের তারিখ লিখিও।

(১২খ) প্রেমবিলাসে অদ্বৈত ও তৎপুত্র কৃষ্ণমিশ্রের উপর জ্ঞানবাদ প্রচারের দোষার্পণ করা হইয়াছে—তুমি কি মনে কর গ্রন্থের বহু প্রক্ষিপ্তাংশ নিত্যানন্দ শিষ্যগণের দ্বারা পরবর্ত্তীকালে হইয়াছে?

(১৩) জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'—"শ্রীচৈতন্য অষ্টাদশবর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করেন" প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ কথা আছে। তাহার সম্বন্ধে তোমার মত প্রার্থনীয়।

(১৪) গোবিন্দের কড়চাকে প্রামাণ্য মনে কর কি?

(১৫) মুরারী গুপ্তের "চৈতন্য চরিতে" শেষের শ্লোকে, একবার আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থে ছাপা হইয়াছে যে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ শেষ হইল, আর একবার শ্লোকার্থে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। যাহাই হউক, উভয় মতেই শ্রীচৈতন্যের বয়স তখন ১৮ বা ২৮ বৎসর। কিন্তু ঐ গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া বৃন্দাবনাদি দর্শন করতঃ প্রতাপরুদ্র ত্রাণ করিয়া নীলাচলে বিরহোন্মাদ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৬এর বেশী নিশ্চয়ই হইবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শুধু বাল্যলীলা মুরারি বর্ণনা করিয়াছেন এই কথা বলিয়াছেন,—এ অবস্থায় মুরারিগুপ্তের কড়চার ২৮ বৎসরের পরের বর্ণিত লীলা তুমি প্রক্ষিপ্ত মনে কর কি?

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

যুগধর্ম্ম—বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ,—প্রত্যক্ষ দর্শনের যুগ। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-সমূহের পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া জড়বিজ্ঞানসমূহ গড়িয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান-সমূহের উন্নতি বিধানের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনা ও তপস্যা চলিতেছে। এই সাধনায় মানবজাতি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাও বিস্ময়াবহ। বিজ্ঞানের এই উন্নতি উপেক্ষনীয় নহে। অনেকে মনে করেন আমরা ধার্ম্মিক লোক, আমরা অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুশীলন করি, পরমার্থ-লাভের জন্য সাধনা করি, আমরা পারলৌকিক মঙ্গলের কামনা করি, আমরা এই সব জড়বিজ্ঞান লইয়া কি করিব? আবার এমন উৎকট কথাও শুনিতে পাওয়া যায়—এই সমুদয় মায়া বা মিথ্যা। এই মত সর্ব্বনাশকর; ভগবান্ এই সর্ব্বনাশকর সিদ্ধান্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের কোনই বিরোধ নাই। প্রাচীন ঋষিগণ বিজ্ঞান-সমূহকে অপরাবিদ্যা বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার চর্চ্চা করিতে নিষেধ করেন নাই—বরং উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের অনেক বৈদিক ঋষি এমন কথা বলিয়াছেন যে, আপরাবিদ্যার অনুশীলন না করিলে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। ঈশোপনিষদে এই কথা আছে। ধর্ম্ম বলিতে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়কেই বুঝায়—অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা উভয় বিদ্যাকেই বুঝায়।

প্রাচীন ভারতের বৈদিক ঋষিগণই যে মানবজাতির আদিগুরু ও পথপ্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রাথমিক কথাগুলি সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদেরই উপদেশসমূহ আরব, মিশর, গ্রীস, রোম্ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশ-সমূহের মধ্যদিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে প্রচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সাধন খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু বিজ্ঞানরাজ্যের অনেক প্রাথমিক কথা তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালের প্রভাবে ভারতবর্ষ জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পিছাইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি এ বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছে। বহুকাল পরে আবার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হইয়াছে। ইহা ভগবানেরই লীলা। জড়বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ পিছাইয়া পড়িলেও তত্ত্ববিদ্যায় ভারতবর্ষ সত্য করিয়া অধঃপতিত হয় নাই। অন্তর্জগতের জ্ঞান—আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব, প্রভৃতি, যাহা ভগবান্ স্বয়ং বেদরূপে অবির্ভূত হইয়া তপোবনবাসী শুদ্ধসত্ত্ব আর্য্যঋষিগণকে শিখাইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান এখনও ভারতবর্ষে রহিয়াছে। এই জ্ঞানকে আমরা তত্ত্ববিদ্যা বা যোগবিদ্যা বলিতে পারি। এই বিদ্যায় পারদর্শী অসংখ্য সাধু মহাপুরুষ এখন ও রহিয়াছেন। কেহ কেহ হিমালয় পর্ব্বতের সুদুর্গম গুহায় ধ্যানমগ্ন, আবার কেহ কেহ কৃপা করিয়া আমাদিকে ঐ সমুদয় বিদ্যাদান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা, গ্রহণ করে কে? ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে সংযম চাই, ব্রহ্মচর্য্য চাই, সদাচার চাই, তপস্যা চাই। কিন্তু অমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, জড়জগতের বিষয়ভোগের মোহ আমাদিগকে নিরতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—কাজেই, ভারতবর্ষের ঐ প্রাচীন বিদ্যা লাভ করিবার জন্য আমাদের তেমন চেষ্টা নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক লোক তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের পথ অবলম্বন করিয়া আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের ঐ সমুদয় বিদ্যা, ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা এখনও নিশ্চেষ্ট! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এখনও ভারতবর্ষে সেই বৈদিক ঋষিগণের বংশধরেরা বাস করিতেছেন, শাস্ত্রও রহিয়াছে, সাধনার পথও রুদ্ধ হয় নাই,—কিন্তু ঐ সাধাপথে অগ্রসর হয় কে?

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একজন বড় সাহেব, তাঁহার নাম সিনেট; তিনি প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ

ইংরাজী সংবাদপত্র 'পায়োনিয়ারের' সম্পাদক ছিলেন। তিনি হঠাৎ একখানি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিলেন, তাহার নাম The Occult World বা অন্তর্জগৎ। এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি লিখিলেন—ভারতবর্ষে হিমালয় পর্ব্বতে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের জ্ঞান ও শক্তির তুলনায় পাশ্চাত্য জগতের সমগ্র জ্ঞান ও শক্তি, সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জলের মত। তিনি বলিলেন যে—তিনি নিজে এই প্রকারের অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জ্ঞানের ও শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছেন। এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখনও বিলাতের টেলিগ্রাম আবিস্কৃত হয় নাই। সেই সময়ে তিনি লিখিলেন যে -ভারতবর্ষে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের একজন বসিয়া আছেন হিমালয় পর্ব্বতে, আর একজন বসিয়া আছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে, অথচ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই কথোপকথন চলিতেছে। এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা স্থূলদেহ কোনস্থানে ফেলিয়া রাখিয়া, সূক্ষ্ম দেহে ইচ্ছামত দূরদূরান্তে বিচরণ করিতে পারেন। সিনেট্ সাহেব, এই সব কথা লোকের মুখে শুনিয়া লেখেন নাই, স্বয়ং দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া তিনি এই সমুদয় কথা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হওয়ার পর, ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশের অনেক মনীষি ও সাধুব্যক্তি ভারতবর্ষের এই যোগবিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য, বহুল পরিমাণে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কিছু কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্যালাভ করিবার পক্ষে ভারতবাসীর দেহ যেমন উপযুক্ত, রজোগুণপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের লোকদিগের দেহ তেমন উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা আছে, আমাদের চেষ্টা নাই।

ভারতবর্ষে যে এই প্রকারের এক বিদ্যা ছিল, এবং এখনও সেই বিদ্যায় পারদর্শী মহাপুরুষগণ আছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই বিদ্যারই সাধারণ নাম ব্রহ্মবিদ্যা। স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে এই বিদ্যা ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অথর্ব্বণ ঋষিকে দিয়াছিলেন। এই বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, এই প্রকারের কথা উপনিষদে আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—এই বিদ্যা তিনি অর্থাৎ গুরুরূপী শ্রীভগবান্, সূর্য্যদেবকে দিয়াছিলেন, সূর্য্যদেব মনুকে দিয়াছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে দিয়াছিলেন। পুরাণে দেখিতে পাই, এই বিদ্যা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক প্রভৃতির মধ্য দিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায় জগতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আজকাল অনেকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বা গুরুপ্রণালীতে বিশ্বাস করেন না এবং দীক্ষা ব্যাপারটিকে একটি অনাবশ্যক ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে দীক্ষাদান একটি প্রাণহীন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে, এবং একথাও বহুল পরিমাণে সত্য যে, গুরুগিরি একটি লৌকিক ব্যবসায়মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই ব্যাপারটিকে আমরা যেন অনাবশ্যক ব্যাপার বলিয়া মনে না করি এবং হয় ইহার নিন্দা করিয়া, না

হয় এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, এই ব্যবস্থাটি নষ্ট করিয়া না ফেলি। এখন প্রয়োজন,—এই ব্যবস্থা যাহাতে সংস্কৃত হয়, এবং আবার সদগুরু, উপযুক্ত শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে সাধন-পথে পরিচালনা করেন। এই প্রাচীন ব্যবস্থা পুনর্ব্বার সত্যোপেত ও প্রাণময় না হইলে, ভারতের এই প্রাচীন বিদ্যার পুনরুত্থান হইবে না। এই বিদ্যার পুনরুত্থান না হইলে, কেবল ভারতের নহে,— সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি কতদূত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানসমূহ কোথায় আসিয়া উপস্থিত, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সম্মুখে এখন কি কি সমস্যা রহিয়াছে, আমরা যদি তাহার আলোচনা করি, তাহা হইলে বিশ্বব্যবস্থার অনেক রহস্য জানিতে পারিব। সংক্ষেপে দুএকটি কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ মনোবিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এখন আমরা যে মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা করি, উহা জড়বাদের ভিত্তি হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। শারীর বিদ্যা বা Physiology উহার মূল ভিত্তি। জড়বাদী পণ্ডিতগণের ধারণা—স্নায়ুমণ্ডলী না থাকিলে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু এক্ষণে সম্মোহন বিদ্যার (Hypnotism) আলোচনার ফলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সম্মোহনের অবস্থায় একজন লোকের স্নায়ুমণ্ডলী যে সময়ে একেবারে নিষ্ক্রিয়, মানুষটি সে সময়ে খুব বড় বড় জ্ঞানগর্ভ কথা বলিতেছে। শুধু তাহাই নহে, সেই সময়ে লোকটি দুইশত চারিশত ক্রোশ দূরের জিনিস দেখিতে পাইতেছে, দুইশত চারিশত ক্রোশ দূরের কথা শুনিতে পাইতেছে। তাহার Clairvoyance (সূক্ষ্মদৃষ্টি) ও Clairaudience (সূক্ষ্মশ্রুতি) খুলিয়া গিয়াছে। অথচ সে সময়ে তাহার স্নায়ুমণ্ডলী ও স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই প্রকারের সম্মোহিত অবস্থায় পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে,—একজন মূর্খ লোক খুব বড় পণ্ডিতের ন্যায় সাধু ভাষায় তত্ত্বকথা বলিতেছে। একজন মানুষের ভিতর তিনজন মানুষ রহিয়াছে, এমন ব্যাপারও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। স্বপ্ন সঞ্চরণের কথা অনেকেই জানেন। স্বপ্নের অবস্থায় মানুষ খরস্রোতা ও গভীরজলপূর্ণা নদী পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শরীর বা কাপড় ভিজিয়া যায় নাই, এপ্রকারের ঘটনাও পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার পর চিন্তাবিনিময় বা Thought Transference, চিন্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য বিধান—এই সমুদয় ব্যাপারও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে।

এই সব ব্যাপার দেখিলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে—স্থূল ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়ীয় উপকরণ বা ইন্দ্রিয় ব্যতীত সংবিৎ, জ্ঞান বা চৈতন্য (Consciousness) ক্রিয়া করিতে পারে। স্থূলভূত ও স্থূল ইন্দ্রিয় ব্যতীত সূক্ষ্মভূত বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে এবং যথারীতি চেষ্টা করিলে, মানুষ সেই

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণকে ক্রিয়ান্বিত করিয়া এমন অনেক কার্য্য করিতে পারে, যাহা সাধারণ মানুষের নিকট অলৌকিক ও ইন্দ্রজালের ন্যায় বিস্ময়াবহ।

প্রেততত্ত্ব বা পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বিলাতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের একটি বিশিষ্ট মণ্ডলী আছে। উহার নাম Psychical Research Society। আমরা যদি শুনি—কোন স্থানে প্রেতের উপদ্রব হইতেছে, তাহা হইলে হয় তাহা মানিয়া লই, না হয় উহা কিছুই নহে, বলিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু এই পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহা করেন না। তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিয়া উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া তাহার তথ্যানুসন্ধান করেন। অবশ্য কোন কোন ব্যাপার হয়ত মিথ্যা, অশিক্ষিত লোকের ভ্রান্তধারণা হইতেই তাহা জন্মিয়াছে। কিন্তু সমুদয় ঘটনাই মিথ্যা নহে। এই সমুদয় ঘটনা লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা চলিতেছে; কেবল তাহাই নহে, পরলোকগত মানবের সহিত কথোপকথন করারও চেষ্টা চলিতেছে। আর একদিকে কেহ কেহ সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির ও প্রাকৃতিক দেবযোনিসমূহের ছায়াচিত্র বা ফটোগ্রাফ্ লইতেছেন। এই সমুদয় বিষয়ের যাহারা আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা মায়ার্স সাহেবের Human Personality নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এই গ্রন্থখানি ডাব্‌লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে। আমরা আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই ইহা আমাদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইবে। এই গ্রন্থ পড়িলে আমাদের আস্তিক্য-বুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে, এবং প্রাচীন কালের যে সমুদয় সংস্কার ও অনুষ্ঠানকে আমরা অর্থহীন ও অযৌক্তিক আড়ম্বর বলিয়া মনে করি, তাহার অনেক ব্যাপারই যে ঋষিদের গভীরতর তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে পারিব।

জড়বাদীগণের মত এই যে—চৈতন্য, জ্ঞান বা প্রাণ জড়পরমাণুর সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য হইতেই জন্মিয়াছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে চার্ব্বাক এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই মতের নাম, চার্ব্বাক মত, লোকায়াত মত, বার্হস্পত্য মত বা নাস্তিক মত। এই মতই বর্ত্তমান কালের জড়বাদ, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, ইহসর্ব্বস্ববাদ, প্রভৃতি। ইহারা সকলেই নাস্তিক্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি-মাত্র। জড়বিজ্ঞান প্রথম হইতেই এই জড়বাদের পুষ্টিবিধান করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানসমূহ উন্নতিরগথে অগ্রসর হইতে হইতে এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে জড়বাদ আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এখন আর অচেতন জড়পরমাণুকে বিশ্বজগতের মূলতত্ত্ব বলিয়া ধরিয়া থাকা চলে না। পরমাণু কি? (What is an atom)—এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইতে হইতে বৈজ্ঞানিকগণ কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পরমাণুও ভাঙিয়া গিয়াছে, এখন আয়ণ্, ইলেক্ট্রন্ প্রভৃতির কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আবার দেখা যাইতেছে —স্থূল পরমাণু বলিয়া একটা জিনিসই নাই। শক্তিপ্রবাহের বিভিন্নমুখী গতির সংঘাতের নামই পরমাণু।

বিজ্ঞানের এই সমুদয় শেষ কথার আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দ্বার, একটির পর অপরটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম পদার্থবিজ্ঞান শ্রেণীর বিজ্ঞান-সমূহ Sciences of the Physical group, তাহার পর রসায়ণ শ্রেণী Chemical group, তাহার পর প্রাণ-বিজ্ঞান Biological group—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পশুবিদ্যা প্রভৃতি, তাহার পর মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, Psychological, Moral and Sociological group। এই সমুদয়ের আলোচনা করিতে করিতে বিজ্ঞান জড়ের বা স্থূলের সীমা ছাড়াইয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যের দুয়ারে আসিয়া পরলোকের প্রাচীরে আঘাত করিতেছে। কিন্তু জড়বিজ্ঞানের আর বর্ত্তমান পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন—ধাতু প্রস্তরেরও প্রাণ আছে, জীবন মরণ আছে—Response in the living and non-living—উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্রী আছে, সুখ দুঃখের অনুভব আছে। সুতরাং জড়বাদের পথে আর বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে পারিবে না, প্রত্যেক বিজ্ঞানের সম্মুখেই দুরতিক্রমণীয় বাধা (Deadlock)। সুতরাং অধ্যাত্মবাদ, বা ভারতের ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের ও প্রতিষ্ঠার সুসময় উপস্থিত।

ভারতবর্ষের উন্নতি বা জাগরণ শব্দের অর্থ—এই ব্রহ্মবিদ্যা বা যোগবিদ্যার অনুশীলন। ভারতবাসীগণ এই বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই প্রাচীন ও বিস্মৃত বিদ্যা আবার জগতে প্রচার করুন, তাহা হইলে ভারতের দুর্দ্দশাও দূর হইবে, সমগ্র জগতেরও দুর্দ্দশা দূর হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্য। এই কার্য্য করাইবার জন্যই বিধাতাপুরুষ এত বাধাবিঘ্নের মধ্যেও ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারতের কল্যাণের আর পথ নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ যাহা করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসাও করিতে হইবে। কিন্তু আর বিজ্ঞানের দ্বারা চলে না, এখন প্রজ্ঞানের আসিবার সময় হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি আমরা জানি। যন্ত্রের উন্নতি এবং যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ—বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি। কিন্তু প্রজ্ঞান যাঁহাদের সাধনা আশ্রয় করিয়া জগতে আসিবেন, তাঁহাদের পদ্ধতি ও উপকরণ কি, তাহাই এখন আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

উভয় প্রকারের আলোচনার প্রণালী এইরূপ। একটি বৃক্ষে তাহার অসংখ্য পত্র, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ইহার এক একটি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে বহু হইতে শ্রেণীবিভাগের দ্বারা (By Induction) ঐক্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞানের প্রণালী অন্যরূপ। বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, আমারও প্রাণ আছে। আমি আমার প্রাণের দ্বারা বৃক্ষের প্রাণকে ধরিতে পারি এবং সেই প্রাণশক্তির প্রেরণা বুঝিয়া তাহার ক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

কিন্তু আমার চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, যেরূপ ব্যবহার করিবার উপযুক্ত অবস্থায় আসিয়াছে, আমার প্রাণ সেরূপ অবস্থায় আসে নাই। আমার ভিতরে প্রাণ আছে, এই প্রাণ আছে বলিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি, কিন্তু এই প্রাণ আমার আয়ত্তাধীন নহে। আমি যদি আমার প্রাণকে আয়ত্ত করিয়া আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রাণের দ্বারা কেবল বৃক্ষের প্রাণ কেন, নিখিল বিশ্বের সকলের প্রাণই ধরিতে ও বুঝিতে পারিতাম। আমি যদি আমার প্রাণের দ্বারা বৃক্ষের প্রাণ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে বৃক্ষের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে আমাকে আর বাহির হইতে পত্রপল্লব প্রভৃতি একটি একটি বুঝিতে হইত না, আমি ভিতর হইতে, ঐক্যের ভূমি হইতে, বাহিরের এই বহু বা বিচিত্রের জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তন, মৃত্যু প্রভৃতির নিয়ম বুঝিয়া ফেলিতে পারিতাম। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের পদ্ধতির ভিতর ইহাই প্রভেদ। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয় ঐক্যের অভিমুখী, বিজ্ঞানের পথ বাহির হইতে ভিতরের দিকে —from outside inwards. প্রজ্ঞানের পথ ঠিক ইহার বিপরীত। প্রজ্ঞান এককে ধরিয়া বহুর দিকে আসিতেছে—from inside outwards.

প্রাণের কথা বলা হইল। প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, বৃক্ষের বা অপর কোন প্রাণীর তত্ত্ব ধরিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই প্রাণকে আয়ত্ত করার উপায় কি? উত্তর —প্রাণায়াম।

বর্ত্তমান কালের মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ মনের বাহিরের ক্রিয়া বা স্থূল স্নায়ুমণ্ডলীতে মনের প্রভাব দেখিয়া মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। ইহা বাহির হইতে আলোচনা। কিন্তু কেহ যদি মনকে আয়ত্ত করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজের মনের দ্বারা অপরের মনের ক্রিয়াবৈচিত্র্য অনায়াসেই ধরিতে ও বুঝিতে পারেন। এই প্রকারে মনকে আয়ত্ত করার উপায় কি? উত্তর—ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি।

কিন্তু প্রাণায়াম, ধারণা প্রভৃতি প্রাণের ও মনের ক্রিয়া করিতে গেলে, যে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া এই প্রাণ ও মন ক্রিয়া করিতেছে সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়কে উপযুক্ত করিতে হইবে। দেহ ও ইন্দ্রিয়কে উপযুক্ত করিতে হইলে যম, নিয়ম প্রভৃতি প্রয়োজন। দেহ নানা কারণেই অনুপযুক্ত হয়। পুত্রকন্যার দেহেন্দ্রিয়ের অনুপযুক্ততার জন্য পিতামাতা দায়ী। পিতামাতাকে প্রথমেই সাবধান ও সাধনশীল হইতে হইবে। দেবতারা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, পিতৃগণ প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাতা। এই প্রকারে তত্ত্বচিন্তা করিলে আমরা গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সংস্কার সমূহের এবং পিতৃলোক ও দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার, এবং আহারশুদ্ধি, সদাচার, ব্রত উপবাস, যম নিয়ম প্রভৃতির প্রয়োজন বুঝিতে পারিব। ইহাই সমগ্র সনাতন ধর্ম্ম। সনাতন ধর্ম্ম কেবল তত্ত্ববিচার বা Philosophy নহে।

ইহা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ। ইহা সমগ্র জীবনের দ্বারা, জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের দ্বারা অনুষ্ঠেয়।

প্রজ্ঞানের যুগ আসিতেছে। এই প্রজ্ঞান ভারতের সুপ্রাচীন নিজস্ব সম্পত্তি। আমাদিগকে আজ সাধনার দ্বারা এই প্রজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং লাভ করিয়া মানবজগতে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভারতের বেদান্ত যে আজ জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে, তাহার হেতু এই। কিন্তু এই প্রজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রথম হইতেই ইহার অনুষ্ঠান না করিলে, পারিবারিক জীবনে ইহা প্রতিষ্ঠিত না করিলে, কেবলমাত্র গ্রন্থ পাঠের দ্বারা প্রজ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন সমস্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আমরা আমাদের কর্ম্মদোষে পিতৃলোক, দেবলোক ও ঋষিলোকের আনুকূল্যে বঞ্চিত হইয়াছি। আমরা আজ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে অক্ষম। গুরুপুরোহিতের অভাব হইয়াছে, তীর্থস্থান কলুষিত হইয়াছে। আজ আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার দিন নাই। আহ্বান আসিতেছে, ইহা বিধাতার আহ্বান, সমগ্র পৃথিবীর আহ্বান। সমগ্র মানবজাতি আজ দারুণ দুর্দ্দশায় নিপীড়িত হইয়া ভারতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদেশ হইতে আবার নবালোক সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। ভারতবর্ষ ব্রহ্মণ্যশক্তির দেশ। ভারতের ব্রহ্মণ্যশক্তি আবার জাগরিত হউক, ভারতের তপস্যা আবার জয়যুক্ত হউক, ভারতের প্রজ্ঞান আবার বিজ্ঞানের সহিত মিলিত হউক। তাহা হইলেই জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুমাত্রেরই দৈনন্দিন জীবন, যে নিয়মে পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, প্রাত্যহিক অভ্যাসের দ্বারা মানব কি প্রকারে তাহার নিম্নপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভ করিত। এই প্রকারে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপার পরিচালনা না করিলে, মানবের উন্নততর প্রকৃতি বিকশিত হয় না এবং মানুষ প্রজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

সমগ্র দিনমানকে ষোলটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগ দেড় ঘণ্টা পরিমিত কাল। ইহাকে যামার্দ্ধ বলে। কোন্ যামার্দ্ধে কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা এইরূপ।

ঊষা ৪½টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিনের শেষ যামার্দ্ধ। এই সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা ও ধ্যান। প্রথম যামার্দ্ধ ৬টা হইতে ৭½টা—দেবপূজা, গুরুপূজা। দ্বিতীয় যামার্দ্ধ ৭½টা হইতে ৯টা—বেদাদি শাস্ত্রপাঠ। তৃতীয় যামার্দ্ধ ৯টা হইতে ১০½,—পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিষয় কর্ম্ম। এই গেল পূর্ব্বাহ্নকৃত্য। তাহার পর মধ্যাহ্নকৃত্য। মধ্যাহ্নকৃত্যের ব্যবস্থা এইরূপ। ১০½টা হইতে ১২টা—স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, সূর্য্যোপস্থান, ব্রহ্মযজ্ঞ, গণেশ শিব বিষ্ণু প্রভৃতি

দেবপূজা। ১২টা হইতে ১½টা,—পঞ্চযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ। আহার। অপরাহ্নকৃত্য, ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধ ১½টা হইতে ৪½টা,—কাব্য ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠ। সন্ধ্যাকৃত্য, ৪½টা হইতে ৬টা বন্ধুগণের সহিত দেখাশুনা ও সন্ধ্যাবন্দনা। রাত্রিকৃত্য, নবম ও দশম যামার্দ্ধ, ৬টা হইতে ৯টা—কাজ কর্ম্ম যাহা শেষ হয় নাই তাহা দেখাশুনা, শয্যানির্ম্মাণের ব্যবস্থা, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত কথোপকথন। ৯টা হইতে ৪½টা পর্য্যন্ত—নিদ্রা।

দৈনিক জীবন পরিচালনার ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। বর্ত্তমান সময়ে জীবন-সংগ্রাম যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িয়াছে, উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য মানুষকে গ্রাম দেশ ছাড়িয়া বিদেশে সহস্র অসুবিধার মধ্যে যে ভাবে থাকিয়া দিনরাত্রি অপ্রীতিকর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে এই ব্যবস্থা অনুসারে চলা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অসম্ভব। পূর্ব্বকালে মানুষ পরিবার প্রতিপালনের জন্য মাত্র দেড়ঘণ্টা পরিশ্রম করিত। তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। জীবন এতই সরল ছিল। এখন অনেকে দৈনিক ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে বাধ্য, নতুবা পেটের ভাত সংগৃহীত হয় না। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, মানুষ মানুষ। যথেষ্ট অবসর না পাইলে, মানুষের উন্নততর বৃত্তিসমূহ বিকশিত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণও ইহা বুঝিয়াছেন, এবং শ্রমজীবিগণের দৈহিক পরিশ্রম করার সময় কমাইবার জন্য সর্ব্বদাই আন্দোলন হইতেছে এবং এই আন্দোলনের ফলে নূতন নূতন আইনও হইতেছে। জীবনসংগ্রাম বর্ত্তমান সময়ে অতিশয় কঠিন হইয়াছে সত্য, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের উন্নতি-নিবন্ধন মানুষের পরিশ্রমের প্রয়োজনও কমিতেছে। এখন এই বৈজ্ঞানিক শক্তির সদ্ব্যবহার আবশ্যক। এখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় নাই, বরং বহুলপরিমাণে অসদ্ব্যবহার হইয়াছে। মানুষের লালসা ও দম্ভ, এই অসদ্ব্যবহারের হেতু। চিরদিন মানবের এইরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে না। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, অবার একদিন সেই ব্যবস্থা সকলের পক্ষে প্রতিপালন করিবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। দ্বিতীয় কথা—এই ব্যবস্থা যদি সঙ্গত ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে যতদূর পারি, আমাদিগকে এই ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলা উচিত। মধ্যাহ্নকৃত্যগুলি অনেকেরই পক্ষে আজকাল করা অসম্ভব, কারণ সে সময় চাকুরীর সময়। কিন্তু রবিবারের দিন অথবা ছুটির দিন করিলেও তো হয়! মোট কথা, আমরা এই দিন চর্য্যা যেন ভুলিয়া না যাই। এই প্রকারে যদি প্রতিদিন চলিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। চিত্তশুদ্ধ হইলেই প্রজ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে এবং তাহা হইলেই মানব ধন্য হইবে।

মানুষ জড়দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ, মন, বুদ্ধি নহে, মানুষ চিদানন্দরূপ, অজর, অমর, নিত্য ও শুদ্ধ। মানুষ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির প্রভু। কিন্তু এখন মানুষ অবিদ্যাচ্ছন্ন আপনাকে ভুলিয়া

দেহেন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মানুষকে তাহার স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবন যাপনের যে ব্যবস্থা বলা হইল তাহা অবলম্বনীয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি! ঐ প্রকারের সুপরিচালিত জীবন না হইলে প্রজ্ঞান লাভ হইবে না, এবং প্রজ্ঞানলাভ না হইলে ভারতের ও জগতের এই বিভীষিকাময় দুর্দ্দশাও দুর্গত হইবে না। অতএব—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উত্থিত হও, জাগ্রত হও, সাধুমহাপুরুষগণের শরণ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হও।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

গ্রন্থ-সমালোচনা

শুশ্রূষা-শিক্ষা—[ডাক্তার শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজি আকারের ২৯১ পৃষ্ঠা। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, মূল্য দেড় টাকা মাত্র।]

গ্রন্থকার বোলপুরের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বহুদর্শী চিকিৎসক। সচিত্র সফল স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ট্রিটিজ্ অন্ ফিবার,—এই দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ গ্রন্থকারের পূর্ব্বের রচনা। কেবল সুচিকিৎসক নহেন, গ্রন্থকার একজন কর্ম্মী। তিনি মফঃস্বলের চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার সেই চেষ্টা অনেকটা ফলবতীও হইয়াছে। 'চিকিৎসক' নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্রের তিনি সম্পাদক।

আলোচ্য-গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে :—

১। শুশ্রূষাকারিণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। ২। শুশ্রূষার ভার স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, কোন্ শ্রেণীর উপর দেওয়া উচিত। ৩। চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর কর্ত্তব্য। ৪। রোগীর প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর কর্ত্তব্য। ৫। শুশ্রূষাকারিণীর নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। ৬। রোগীর গৃহ পরিষ্কার করণ প্রণালী, গৃহের আসবাব ও আলোকদান প্রণালী। ৭। তাপমানযন্ত্র ব্যবহার-প্রণালী। ৮। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা প্রণালী। ৯। নাড়ী পরীক্ষা ও গণনাপ্রণালী। ১০। ঔষধ প্রয়োগবিধি ও ঔষধ এবং ব্যবস্থাপত্র রক্ষা প্রণালী। ১১। পুল্‌টিস্, গরমজলের সেক, শুষ্ক উত্তাপ ও জলপট্টি-সম্বন্ধে উপদেশ। ১২। বিবিধ প্রকার স্নান বিধি। ১৩। এনিমা-প্রয়োগ বিধি ১৪। লক্ষণ-পর্য্যবেক্ষণ। ১৫। উপসর্গ-দমন প্রক্রিয়া।

বিষয়গুলি সরল-ভাষায়—কথোপকথন আকারে—কথিত হইয়াছে। আমাদের দেশের লোক রোগীর শুশ্রূষা-বিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ। চিকিৎসা-অভাবে যত লোক মরে, শুশ্রূষা-অভাবে তদপেক্ষা অধিক লোক মরে। ভাড়া-করা শুশ্রূষা-কারিণী সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও তাহার ব্যয় বহন করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এই শ্রেণীর গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। গৃহস্থগণ বাড়ীর সকলকে বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে এই গ্রন্থখানি পড়াইবেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর গ্রন্থ পারিতোষিক দিয়া এই গ্রন্থগুলির প্রচারে সাহায্য করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন

"বীরভূমি" মাসিক পত্রিকা, পূর্ব্বে চারি বৎসর ছয় মাস কাল পরিচালনা করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহির হওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়া লওয়া হইত। শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, অন্যান্য কার্য্যের ভার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট মূল্য লওয়া হয় নাই। আমি এখন অন্যান্য কর্ম্ম হইতে বহুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে পুনর্ব্বার 'বীরভূমি' প্রচার আরম্ভ করিলাম। বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যা, ষষ্ঠ ভাগ অষ্টম সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে। বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র।

প্রত্যেক সংখ্যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, (Complete in itself) এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। কলিকাতা—কলেজ স্কোয়ারে ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যালয়ে এবং ঢাকা—পাটুয়াটুলি, রিপন-লাইব্রেরীতে নগদ বিক্রয় হয়।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে "সুখ পাঠ্য" "প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৸৹ ও কাপড় বাঁধা ৸৷৹। ভি পি ১৲ ও ১৷৹ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষ্ণনগর—শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুকক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান

(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Serial 1324
826
3 Sept 1925

১৩৩০

Birbhum 17.9.25

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও শ্রীরাধা

২ সাধনার তিনটি পথ বা মার্গত্রয়

BENGAL LIBRARIAN'S OFFICE CALCUTTA

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও শ্রীরাধা

১। শ্রীকৃষ্ণ-পারম্যবাদ

দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, স্বয়ং ভগবান্, "সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান"। তিনিই আদিতত্ত্ব। আর শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার স্বরূপশক্তি, অন্যান্য সকল শক্তির মূলীভূতা, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি। এই যুগলতত্ত্ব শ্রীরাধাগোবিন্দই উপাসনার চরম বস্তু। এই মত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে এই মত ছিল না, তিনি এই মত প্রথম উদ্ভাবিত করিলেন, ভক্তগণ তাহা বলেন না। ভক্তেরা বলেন,—এই মত চিরকালই আছে, ইহা নিত্য ও অনাদিকাল সিদ্ধ। সাধারণ লোকে এই মত জানিত না। জীবের পরম সৌভাগ্য, তাই শ্রীভগবান্ করুণা করিয়া আবির্ভূত হইয়া, ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, নিজে আচরণ করিয়া, উপযুক্ত ভক্ত-গণের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, এই চরমতত্ত্ব ও পরমকথা প্রচারিত করিলেন এবং কৃপা করিয়া আপামর সাধারণ সকলকে এই উন্নততম ও অতিগূঢ় শ্রীরাধাগোবিন্দ-আরাধনার অধিকার ও সামর্থ্য দান করিলেন।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূর্ব্বে কেহ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের, কেহ শ্রীরামচন্দ্রের, কেহ শ্রীনৃসিংহদেবের আরাধনা করিতেন। তাহা ছাড়া, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শিব, দুর্গা প্রভৃতিকে চরম ও পরমতত্ত্ব বোধে উপাসনা প্রচলিত ছিল। কেহ গণেশকে, কেহ সূর্য্য প্রভৃতিকেও পরব্রহ্ম-বুদ্ধিতে আরাধনা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে তত্ত্ব ও সাধন প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য। শ্রীমদ্ভাগবত উত্তমরূপে আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, বেদের সার শ্রীমদ্ভাগবত, এই তত্ত্বকেই চরমতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। কিন্তু অসতর্কভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিলে, এই মতই যে শ্রীমদ্ভাগবতের মত, তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাভাজন গোস্বামীপাদগণকে অনেক পরিশ্রম করিয়া, অনেক বিচার করিয়া দেখাইতে হইয়াছে যে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের মত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অন্য প্রকারের গ্রন্থ। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 'শ্রীকৃষ্ণ-পারম্যবাদ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই চরম ও পরমতত্ত্ব,—এই মত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অতিশয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের উত্তমরূপে এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রথমেই পরদেবতার যে বন্দনা আছে, সৃষ্টিকার্য্য বর্ণনার প্রারম্ভে আদিতত্ত্বের যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলেই আমরা এই পুরাণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব। ইহা ছাড়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আর একটি কারণে বিশেষরূপে আলোচ্য। বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্মে যে সব দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে, এই পুরাণে সে সমুদয় দেবতার প্রত্যেকেরই তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও মিলনের ভূমি কোথায়, তাহাও এই গ্রন্থে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য, এই সমন্বয় একটি সুনির্দ্দিষ্ট অধিষ্ঠানভূমি (from a definite and particular stand point) হইতে করা হইয়াছে। অন্য ভূমি হইতে দেখিলে অন্যরূপ সমন্বয় ও করা যায়, ইহা অবশ্য বলাই বহুল্য।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে সমুদয় শ্লোকের দ্বারা পরদেবতার বন্দনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নের শ্লোকটিই প্রধান—

বন্দে কৃষ্ণং গুণাতীতং পরং ব্রহ্মাচ্যুতং যতঃ।
আবির্ব্বভূবুঃ প্রকৃতি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ॥

সেই গুণাতীত, পরব্রহ্ম, অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। প্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

এইবার এই পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম কথা আলোচনা করা যাউক। মহাপ্রলয়ে কেবল জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতির ভিতরে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক। এই তিন লোকের দুই প্রকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা, আর সৃষ্টি

সময়ের অবস্থা। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ের সময় গোলোকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ, আর সৃষ্টির সময়ে কৃষ্ণ-ব্যতীত গোপগোপী প্রভৃতি থাকেন। সেইরূপ, প্রলয়ের সময় বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক শূন্য, আর সৃষ্টির সময়ে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ আর শিবলোকে সপার্ষদ শিব থাকেন। এই তিন নিত্যলোকের মধ্যে গোলোক সকলের উপরে। গোলোকের দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ, আর বামে শিবলোক। সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই গোলোক কেমন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—

গোলকাভ্যন্তরে জ্যোতিরতীব সুমনোহরম্।
নবীন নীরদশ্যামং রক্তপঙ্কজলোচনম্॥
শারদীয় পার্ব্বণেন্দুশোভামুষ্টশুভাননম্।
কোটি কন্দর্পলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং পীতবাসসম্।
সদ্রত্নভূষণৌঘেন ভূষিতং ভক্তবৎসলম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষঃ সম্রাজৎ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥
সদ্রত্নসাররচিতং কিরীট মুকুটোজ্জ্বলম্।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্॥
তদেব পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং সর্ব্বাধারং পরাৎপরম্॥
কিশোরবয়সং শান্তং গোপবেশবিধায়িনম্।
কোটি পূর্ণেন্দুশোভাঢ্যং ভক্তানুগ্রহ কারকম্।
নিরীহং নির্ব্বিকারঞ্চ পরিপূর্ণতমং বিভুম্।
রাসমণ্ডল মধ্যস্থং শান্তং রাসেশ্বরং পরম্॥
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্।
পরমানন্দবীজঞ্চ সত্যমক্ষরমব্যয়ম্।
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরং সর্ব্বসিদ্ধিরূপঞ্চ সিদ্ধিদম্।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং নির্গুণং নিত্যবিগ্রহম্॥
আদ্যং পুরুষমব্যক্তং পুরুহূতং পুরুষ্টুতং।
সত্যং স্বতন্ত্রমেকঞ্চ পরমাত্মস্বরূপকম্।

ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তৎ পরমায়ণম্।
এবং রূপং পরং বিভ্রদ্ ভগবানেক এব সঃ।
দিগ্‌ভিশ্চ নভসা সার্দ্ধং শূন্যং বিশ্বং দদর্শ হ॥

গোলকের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে অতি মনোহর নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল, রক্তপদ্মের ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ। শরতের পূর্ণচন্দ্রের শোভা তাঁহার মুখশোভার নিকট পরাজিত। তাঁহার লাবণ্যের নিকট কোটি মদনের লাবণ্য পরাজিত। তিনি লীলাধাম ও মনোহর। তিনি দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী, অধরে হাসি, পরিধান পীতবসন। মূল্যবান্ রত্নসমূহে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, তিনি ভক্তবৎসল। চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত, বক্ষঃদেশ শ্রীবৎস-চিহ্নযুক্ত এবং কৌস্তুভমণি শোভিত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন-রচিত উজ্জ্বল কিরীট ও মুকুট, তিনি রত্ন সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি বনমালা-বিভূষিত। তিনি পরব্রহ্ম, সনাতন ভগবান্। তিনি স্বেচ্ছাময়, সকলের বীজ, সকলের আধার ও পরাৎপর। তিনি কিশোরবয়স, শান্ত, ও গোপবেশধারী। তাঁহার শোভা কোটি পূর্ণেন্দুর শোভার সমতুল্য, তিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহকারী। তিনি নিরীহ, নির্ব্বিকার পরিপূর্ণতম ও বিভু। তিনি রাসমণ্ডলের মধ্যে বিরাজিত, শান্ত, রাসেশ্বর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মঙ্গলদাতা, মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলের দ্বারা পূজ্য। তিনি পরমানন্দের বীজ, সত্য, অক্ষর ও অব্যয়। তিনি সকল সিদ্ধির ঈশ্বর, সকল সিদ্ধিরূপ ও সকল সিদ্ধিদাতা। তিনি প্রকৃতির পরম, ঈশান,—একমাত্র নিয়ন্তা, নির্গুণ এবং তাঁহার বিগ্রহ নিত্য। তিনি আদ্য ও অব্যক্ত পুরুষ, নিখিল যজ্ঞের দ্বারা তিনিই সম্পূজিত। তিনি সত্য, স্বতন্ত্র, এক ও পরমাত্মাস্বরূপ। শান্ত বৈষ্ণবগণ সেই পরমাশ্রয়কে সর্ব্বদা ধ্যান করেন। এই প্রকারের রূপধারী শ্রীভগবান্ একাকী ছিলেন, তিনি দিক্ আকাশ সমস্তই শূন্য দর্শন করিলেন।

২। সমন্বয়—যোগী ও বৈষ্ণব

ইহার পর ভগবানের মনে সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা হইবে এবং বিশ্ব ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-সম্বন্ধে আমরা প্রথমে যে কথা বলিয়াছি, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দ্বিভুজ মুরলীধর গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ বৃন্দাবনচন্দ্রকে, পরতত্ত্ব বলিয়া স্থাপনা করা হইয়াছে, কিন্তু

অন্যান্য দেব-দেবীর উপাসনা বা অন্য ক্রিয়াকর্ম্ম, কিছুই বর্জ্জন করা হয় নাই, ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণের সহিত যোগীদের মতভেদ ছিল এবং দ্বন্দ্বও ছিল, এখনও যে নাই তাহা নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রারম্ভেই বলিলেন—

বৈষ্ণবা যোগিনঃ সন্তো ন চ ভিন্নাশ্চ শৌনক।

হে শৌনক, বৈষ্ণব ও যোগী ভিন্ন নহে। এই কথা বলার পর পুরাণকার বলিয়াছেন, যাঁহারা যোগী তাঁহারা অজ্ঞান নিবৃত্তির ফলে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইয়া বৈষ্ণব পদবাচ্য হইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ যে রুচিভেদে ও অধিকারভেদে স্বাভাবিক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাহা অতিশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সেই উদার বোধশক্তি নাই—এই কারণে আমরা বন্ধুভাবে মিলিত হইতে পারি না, ভিন্ন ভিন্ন পথ ও ভিন্ন মত লইয়া বিরোধ করিয়া থাকি।

৩। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে বৈষ্ণবপুরাণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল বৈষ্ণব পুরাণ বলিলেই হইবে না, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে, যে মতকে সর্ব্বশেষ বৈষ্ণব মত বলিয়া মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সেই মতের প্রচারক। সেই মত—শ্রীবৃন্দাবনের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের আরাধনা। বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে অনেক দিন হইতে একটি বাদানুবাদ চলিতেছে। বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান কোথায়? শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নিজের জীবনের দ্বারা সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের সম্মান ও পূজা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবদিগের স্মৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে ব্রাহ্মণগুরুর শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম, বিশেষতঃ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম, নরনারী সকলকেই ধর্ম্মরাজ্যে উন্নততম অধিকার দান করিয়াছে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হরিভক্তি-সমন্বিত চণ্ডাল, হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ, একথা স্পষ্টভাবেই ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে, ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করা ও উপেক্ষা করা বৈষ্ণবধর্ম্মের অভিপ্রায়?

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে অনেকে এই মত প্রচার করিতেছেন। একজন বৈষ্ণব বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণেরা শাক্ত, কারণ তাঁহাদের গায়ত্রী-দীক্ষা হয়। তাঁহারা যখন

শাক্ত, তখন তাঁহাদের বৈষ্ণবী দীক্ষা দান করিবার অধিকার নাই। এই প্রকারের কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে চলিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষা—শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আর এই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীধরস্বামীর মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং।

আর—

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখান॥

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে বলিলেন,—এই শ্রীমদ্ভাগবত গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, আর বলিলেন—

গায়ত্রাখ্য—ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ।

গায়ত্রী যে ব্রহ্মবিদ্যার নাম, শ্রীমদ্ভাগবত সেই ব্রহ্মবিদ্যা। অতএব মহাপ্রভুর সুস্পষ্ট উপদেশ যদি মানিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে শক্তি বলিয়া গায়ত্রীকে বা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া ব্রাহ্মণকে, উপেক্ষা করার অধিকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নাই। তবে অন্য কারণে ব্রাহ্মণ বর্জ্জনীয় বা উপেক্ষনীয় হইবেন কিনা, তাহার অবশ্য বিচার চলিতে পারে।

ব্রাহ্মণকে অস্বীকার করিয়া কি জগতে ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে? ইহা একটি খুব বড় প্রশ্ন। বৈষ্ণবমাত্রেরই এবং হিন্দুমাত্রেরই, এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে দেশে একদল ব্যবসায়ী সমাজ-সংস্কারকের উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা জাতিভেদ প্রথা বাহির হইতে জোর করিয়া তুলিয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা অবশ্য ব্রাহ্মণ-বিরোধী। অনেক বৈষ্ণবও আজকাল মনে করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মও ব্রাহ্মণ-বিরোধী। এই প্রকারের ভ্রান্তমত বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। কি প্রকারে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে। দেশের ও সমাজের ইতিহাস একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান যুগের অনেক শক্তিশালী প্রতিপত্তিকামী লোক, দশজনের মধ্যে একজন হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা প্রথমাবস্থায় সমাজসংস্কার-ব্যবসায়িগণের দলে মিশিয়াছেন, সেখানে সুবিধা করিতে পারেন

নাই। শেষে বৈষ্ণব হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিপত্তিকামনাও ছাড়িতে পারেন নাই। আবার এমন ঘটনাও আছে যে চিরদিন গোলামী করিয়া, উপরওয়ালার পদলেহন করিয়া চাকুরী করিয়া সারাজীবন কাটাইয়া, শেষকালে কৌশলের দ্বারা গুরুগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে?

প্রকৃত কথা বুঝিয়া উঠা বেশী কঠিন নহে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিবাদ সংস্কারের পক্ষপাতী। প্রত্যেক নরনারী বিকশিত হইবে, তাহার বিকাশের সম্মুখে কোনরূপ কৃত্রিম প্রতিবন্ধক থাকিবে না, সমাজে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অ-ন্যায্য সুবিধা উপভোগ করিবে না, এই সব কথা যে ভক্তি-ধর্ম্মের অনুমোদিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্য সাধিত হইবে কিরূপে? উত্তর—বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতে। কথাটা বুঝিতে হইলে, একটু ধীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

আমি সংস্কারক; সমাজের দোষগুলি যাহাতে সংশোধিত হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু একটা কথা যে আমি প্রায়ই ভুলিয়া যাইতেছি। আমি আমার নিজের দোষ দেখিতে পাই না, আমি আমার নিজের দোষ সংশোধিত করিতে চেষ্টা করি না। এইখানেই প্রকৃত সমস্যা।

সংসারে দুই প্রকার মানুষ আছে। এক বহির্মুখী, আর এক অন্তর্মুখী। যাহারা বহির্মুখী, তাহারা মনে করে—বাহির হইতে সমাজকে সংশোধিত করিব। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। বাহির হইতে চেষ্টা করিয়া যদি একটা দোষ সংশোধিত করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সেই দোষ আর একদিক্ দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। বহির্মুখী মানুষ অহঙ্কারবশতঃ মনে করিবে, দোষ সারিয়া গেল, কিন্তু সেই দোষ যে অন্য জায়গায় অন্য মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, ইহা সে দেখিতে পাইবে না এবং বুঝাইলেও বুঝিতে পারিবে না। যাঁহারা অন্তর্মুখী তাঁহাদের প্রণালী অন্যরূপ। তাঁহারা আত্মার ভূমি হইতে সমুদয় ব্যাপারের চরম অর্থ ও পরম তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। তিনি বলিলেন—প্রত্যেক নরনারী শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসুক। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র প্রেমাস্পদ। তিনি সুন্দর, তিনি মধুর। তিনি প্রত্যেক মানুষের আত্মার অন্তর্যামীরূপে রহিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসা কেমন, তাহা কতদূর ঐকান্তিক ও বিপুল হইতে পারে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু

জগতের জীবকে দেখাইয়া গেলেন এবং কি প্রকারে সাধনার দ্বারা এই প্রেমের অনুশীলন করিতে হইবে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রত্যেক নরনারী এই ভজনার অধিকারী। প্রত্যেকে এই পথে অগ্রসর হউক। মানুষ সরল হৃদয়ে এই সাধনপথ আশ্রয় করিলে সামাজিক ব্যবস্থা আপনা আপনি ভিতর হইতে সংশোধিত হইবে। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত।

মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হইলে, বিশ্বব্যবস্থার নিয়মগুলি মানুষ সহজেই বুঝিতে পারিবে। তখন আর কেহ কাহারও নিন্দা করিবে না, কেহ কাহারও দোষ দেখিবে না। আমরা যে কেবল অপরের দোষই দেখি, তাহার গুণ দেখিতেই পাই না। এই কারণে সমাজে হিংসা, নিন্দা, ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সমাজে যত পাপ ও দুর্নীতি আছে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য দায়ী। আমি আমাকে সংশোধিত না করিয়া, আমার ভিতরে যে দোষের ও পাপের বীজ রহিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করার জন্য চেষ্টা না করিয়া, বাহিরে অপরের সংস্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। তাহার ফলে জগতের পাপ না কমিয়া দিনের পর দিন কেবলই তাহা বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে একটি উপদেশ আছে—

পরনিন্দা পরিহরি লহ কৃষ্ণনাম।

সমগ্র বৈষ্ণবসাধন এই এক কথার ভিতরে রহিয়াছে। কিন্তু 'পরনিন্দা-পরিহার' কি, কত প্রকারে আমরা পরনিন্দা করিতেছি, তাহা সুগভীর চিন্তার বিষয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে নিম্নরূপ কথা বলিয়াছেন—

দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যঃ সুসম্ভ্রমাৎ।
কালসূত্রং ব্রজতি স যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
হরির্ব্রাহ্মণরূপেণ শশ্বদ্ ভ্রমতি ভারতে।
সুকৃতী প্রণমেৎ পুণ্যং ব্রাহ্মণং হরিরূপিণং॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে দেখিয়া যে ব্যক্তি অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত প্রণাম না করে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন তাহাকে কালের প্রভাবে তাড়িত হইয়া ভবচক্রে ঘুরিতে হইবে। হরি, ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন। যিনি সুকৃতী, তিনি অবশ্য অবশ্য এই হরিরূপী ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি প্রধান উপদেশ—"মর্য্যাদালঙ্ঘন" করিবে না। এই উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলেই, সামাজিক জীবন কিরূপভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব।

৪। শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার প্রাচীনতা

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা অনাদিকাল-সিদ্ধ, ইহা চিরদিনই আছে। পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ লোক ইহা পাইতেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই উপাসনায় সকলকে অধিকার দিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই উপাসনাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছিল, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই পুরাণ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে—

ইদং পুরাণসূত্রঞ্চ পুরা দত্তঞ্চ ব্রহ্মণে।
নিরাময়ে চ গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা॥
মহাতীর্থে পুষ্করে চ দত্তং ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা।
ধর্ম্মেনেদং স্বপুত্রায় প্রীত্যা নারায়ণায় চ॥
নারায়ণোঽয়ং ভগবান্ প্রদদৌ নারদায় চ।
নারদো ব্যাসদেবায় প্রদদৌ জাহ্নবী তটে॥
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রং তৎ সংব্যস্য বিপুলং মহৎ।
মহ্যং দদৌ সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যদে সুমনোহরম্॥

সিদ্ধক্ষেত্র হইতে সমাগত সৌতি নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণকে বলিলেন—এই পুরাণের সূত্র নিরাময় গোলোকধামে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন। মহাতীর্থ পুষ্করে ব্রহ্মা ইহা ধর্ম্মকে দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রীত হইয়া নিজপুত্র নারায়ণকে ইহা দিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ঋষি নারদকে দিয়াছিলেন। নারদ গঙ্গাতীরে ইহা ব্যাসদেবকে দিয়াছিলেন। ব্যাসদেব সেই পুরাণসূত্র সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত করিয়া বিপুলায়ত করেন, এবং এই মহৎ ও সুমনোহর পুরাণ পুণ্যস্থান সিদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দান করেন।

৫। শিব ও কৃষ্ণ

ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মতামত আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম হইতে শৈবসম্প্রদায়ের সহিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রীতি ছিল না। এখনও তত্ত্ব-জ্ঞানহীন অনেক লোক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ করিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক।

শ্রীভগবান্ শিবকে বলিলেন—

অদ্য প্রভৃতি জ্ঞানেন তেজসা বয়সা শিব।
পরাক্রমেণ যশসা মহসা মৎসমো ভব।
প্রাণানামধিকস্ত্বঞ্চ ন ভক্তস্ত্বৎপরো মম॥

হে শিব, তুমি জ্ঞান, তেজ, বয়ঃক্রম ও পরাক্রমে সর্ব্বতোভাবে আমার সমান। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিক, তোমা অপেক্ষা আর বড় ভক্ত আর কেহ নাই।

অনেকে না জানিয়া শিবকে তমোগুণের দেবতা বলিয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

পরমাজ্ঞানিনো মূর্খা বদন্তি তামসং শিবম্।

যাহারা পরম অজ্ঞান ও মূর্খ, তাহারাই বলে শিব তামস।

প্রকৃত কথা কি?

রাজসশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুশ্চ সাত্ত্বিকৌ।
গোলোকনাথঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥

ব্রহ্মা রাজস, শিব ও বিষ্ণু সাত্ত্বিক, আর গোলোকনাথ কৃষ্ণ নির্গুণ ও প্রকৃতির পর।

এই পুরাণে আরও বলা হইয়াছে, যিনি কালাগ্নি রুদ্র, তিনিই তামস এবং তিনি নিখিলের বিনাশকর্ত্তা। এই পুরাণে শিবলিঙ্গ পূজার অশেষ ও অসীম ফল এবং 'শিব,' 'মহাদেব' প্রভৃতি নামগ্রহণের ফল কথিত হইয়াছে। তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, শৈব ও বৈষ্ণবমতের কিরূপ মৈত্রী এই পুরাণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৬। বিশ্বসৃষ্টি

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করা যাইতেছে।

স্বেচ্ছাময় প্রভু সমুদয় শূন্য দেখিয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। পর পর নিম্নলিখিত ক্রমে সৃষ্টি হইল। ১। মূর্ত্তিমন্তস্ত্রয়োগুণাঃ—মূর্ত্তিমান তিন গুণ,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ২। মহতত্ত্ব ৩। অহঙ্কার ৪। পঞ্চতন্মাত্রা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ৫। স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ—স্বয়ং প্রভু নারায়ণ। তিনি কেমন?

শ্যামো যুবা পীতবাসা বনমালী চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ স্মেরমুখাম্বুজঃ॥

৬। মহাদেব—বামপার্শ্ব হইতে ইনি আবির্ভূত হইলেন। ইনি কেমন?

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ পঞ্চবক্ত্রো দিগম্বরঃ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাভারধরো বরঃ॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধারী জপমালাকরঃ পরঃ॥

৭। ব্রহ্মা—ইনি শ্রীকৃষ্ণের নাভিপঙ্কজ হইতে আবির্ভূত হইলেন। ইনি কেমন?

মহাতপস্বী বৃদ্ধশ্চ কমণ্ডলুধরো বরঃ।
শুক্লবাসা শুক্লদন্তঃ শুক্লকেশশ্চতুর্ভুজঃ॥

৮। ধর্ম্ম—পরমাত্মার বক্ষঃ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি কেমন?

সস্মিতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ শুক্লবর্ণো জটাধরঃ।
সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
সমঃ সর্ব্বত্র সদয়ো হিংসাকোপবিবর্জ্জিতঃ॥

৯। সরস্বতী—পরমাত্মার মুখ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি কেমন?

একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী।

১০। মহালক্ষ্মী—শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি কেমন?

একা দেবী গৌরবর্ণা রত্নালঙ্কারভূষিতা।
পীতবস্ত্রপরিধানা সস্মিতা নবযৌবনা॥

১১। মূল প্রকৃতি—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি কেমন ?

নিদ্রাতৃষ্ণাক্ষুৎপিপাসাদয়াশ্রদ্ধাক্ষমাদিকাঃ।
তাসাঞ্চ সর্ব্বশক্তিনামীশাধিষ্ঠাত্রীদেবতা॥
ভয়ঙ্করী শতভূজা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
আত্মনঃ শক্তিরূপা সা জগতাং জননীপরা॥
ত্রিশূলশক্তিশার্ঙ্গঞ্চ ধনুঃখড়্গাশরাণি চ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমক্ষমালা কমণ্ডলু॥
বজ্রমঙ্কুশপাশঞ্চ ভুষণ্ডীদণ্ডতোমরম্।
নারায়ণাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং রৌদ্রং পাশুপতং তথা।
পার্জ্জন্যং বহ্নিগান্ধর্ব্বং বারুণং বিভ্রতী সতী॥

এই দেবী নিদ্রা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, ক্ষমা প্রভৃতি সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। ইনি ভয়ঙ্করী, ইঁহার একশত হস্ত, ইনি দুর্গা এবং দানব কর্ত্তৃক উৎপাদিত বাধা (দুর্গ) ও যাবতীয় ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাকেন। ইনি আত্মার শক্তিরূপা, জগতের পরাজননী। ইনি ত্রিশূল, শক্তি, শার্ঙ্গ, ধনু, খড়্গ, শর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বজ্র, অঙ্কুশ, পাশ, ভুষণ্ডী, দণ্ড, তোমর, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতি সমন্বিত। [মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর বর্ণনার সহিত এই অংশ তুলনীয়]

১২। সাবিত্রী। শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৩। মন্মথ। শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। ইনি মারণ, স্তম্ভন, জৃম্ভণ, শোষণ ও উন্মাদন—এই পঞ্চবাণের দ্বারা সমুদয় কামিজনের মন মন্থন করেন বলিয়া ইঁহার নাম মন্মথ।

মনোমথ্নাতি সর্ব্বেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্।
তন্নাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

১৪। রতি। মন্মথের বামপার্শ্ব হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৫। অগ্নি—মন্মথ ও রতির প্রভাবে ব্রহ্মা হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৬। বরুণ—অগ্নিকে প্রশমিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখবিন্দু হইতে ইঁহার উৎপত্তি।

১৭। স্বাহা—ইনি অগ্নির পত্নী। অগ্নির বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূতা।

১৮। বারুণী—বরুণের বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূতা।

১৯। বায়ু—বিষ্ণুর নিশ্বাসবায়ু হইতে উদ্ভূত।

২০। বায়বী—বায়ুর বামপার্শ্ব হইতে উদ্ভূত।

২১। বিরাট্-মূর্ত্তি মহাবিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। সহস্র বৎসর পরে তাহা ডিম্বমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই ডিম্ব হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইঁহার একটি লোমবিবরে বিশ্বের অবস্থান। যত কিছু স্থূল বস্তু আছে, ইনি তাহার মধ্যে স্থূলতম। ইনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ। তিনি সর্ব্বাধার ও সনাতন। তিনি যখন মহার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যের জন্ম হয়। ইহারা ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলে ভগবান্ নারায়ণ তাহাদের বিনাশ করেন। সেই দৈত্যযুগলের মেদ হইতে মেদিনীর উৎপত্তি।

এই পর্য্যন্ত শ্রীভগবান্ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইল। এই সৃষ্টি-পর্য্যায়ের শেষ কথা মহাবিষ্ণুর সৃষ্টি। মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, এবং তাহার পরের সৃষ্টি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সাধিত। পুরাণে সমগ্র সৃষ্টি-পর্য্যায়কে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। সর্গ ও বিসর্গ। বিসর্গের অপর নাম প্রতিসর্গ। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টির এই দ্বিবিধ স্তর বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টিকার্য্যের যে অংশ সাধিত হয়, তাহার নাম সর্গ বা তত্ত্বসৃষ্টি। আর ব্রহ্মা হইতে সেই তত্ত্বের অনুবর্ত্তনে যে সৃষ্টি হয়, তাহার নাম বিসর্গ। যিনিই যাহা সৃষ্টি করুন, তত্ত্ব বিশেষের বা ভাবের অনুবর্ত্তনে (According to an Idea or Arche-ype) তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে। সৃষ্ঠির এই মূল তত্ত্বগুলি শ্রীভগবান্ হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মার মধ্য দিয়া আসিতেছে।

৭। রাসমণ্ডল ও শ্রীরাধা

যাহা হউক, গোলোকবিহারী শ্রীভগবান্ এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। এই রাসমণ্ডল সুরম্য ও অতীব কমনীয়। পূর্ব্বে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন,

তৎসমুদয়কে লইয়া তিনি এই রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। রমণীয় কল্পবৃক্ষসমূহের মধ্যে এই রাসমণ্ডল পরম শোভাময়। সেই রাসমণ্ডল দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ঠিক্ সেই সময়ে

আবির্ব্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ।
ধাবিত্বা পুষ্পমানীয় দদাবর্ঘ্যং প্রভোঃ পদে॥
রাসে সম্ভূয় গোলোকে সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আবির্ব্বভূব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥

শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে একটি কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি আবির্ভূত হইয়াই ধাবিত হইলেন, এবং পুষ্প আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্ঘ্যদান করিলেন। রাসে সম্ভূত হইয়া হরির সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাকে 'রাধা' বলিয়া থাকেন। এই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষা গরীয়সী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমূহ হইতে তিনি আবির্ভূত হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার সাহায্যে আমরা রাধাতত্ত্বের ধ্যান করিতে পারি। রূপের ধ্যান ও তত্ত্বের ধ্যান, এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। এই উভয়েরই ধ্যান আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহার সাহায্যে তত্ত্বের ধ্যান করা যাইতে পারে।

বেদে আছে আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বের উদ্ভব, আনন্দের আশ্রয়েই বিশ্ব রহিয়াছে, আর আনন্দেই বিশ্বের পরিণতি। বিশ্বের আদি, অন্ত, মধ্য, সবই আনন্দ। আবার বেদে আছে, যিনি সর্ব্বকারণকারণ ও পরমার্থ সত্য, তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার আনন্দাংশই আমরা জানিতে পারি। আমাদিগকে এই আনন্দ জানিতে হইবে। তাঁহার এই আনন্দ জানিলেই আমরা পূর্ণ ও ধন্য হইব। "ন বিভেতি কুতশ্চন"—আর কোথায়ও কোনরূপ ভয় থাকিবে না। সেই আনন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপের আনন্দ, বিষয়ানন্দ নহে। আমরা যে সেই আনন্দ জানিতে পারিব, আমাদের পক্ষে সেই আনন্দের পরিচয় লাভ যে সম্ভবপর, ইহা কি প্রকারে হইল? যাঁহার আনন্দ বা যিনি স্বয়ং এই আনন্দ, তিনি আপনার গুণে আমাদিগকে এই আনন্দ জানাইয়াছেন বা জানাইতেছেন বলিয়াই

আমাদিগের পক্ষে সেই আনন্দের পরিচয় লাভ সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপের সেই আনন্দ জানাইতেছেন। তিনি তাঁহারই স্বরূপ হইতে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপের সেই আনন্দ জানাইতেছেন। সমগ্র সৃষ্টিপদ্ধতির ইহাই গূঢ়-তত্ত্ব। এই গূঢ়-তত্ত্ব, জীবনের এই চরম ও পরম অভিপ্রায় আমাদিগকে ধ্যানযুক্ত হইয়া অনুভব ও উপলব্ধি করিতে হইবে। এই অনুভূতি ও উপলব্ধিই আমাদের জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন।

পূর্ব্বের বর্ণনায় আমরা দেখিলাম—শ্রীভগবান্ ত্রিগুণ হইতে বিরাট্ বা মহাবিষ্ণু পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। ইহার দ্বারা ভাবরূপে ও বীজরূপে সৃষ্টি-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। প্রকৃত কথা, সৃষ্টি শেষ হইবার নহে—সৃষ্টি-প্রবাহ অনন্ত। তবে আমরা ইহার শেষ সীমা কল্পনা করিয়া থাকি, কারণ এই প্রকারের একটা সমাপ্তি বা চরম অবস্থা আমরা অনুমান না করিয়া পারি না। প্রকৃত কথা সমাপ্তি একমাত্র শ্রীভগবানে বা বিভুচৈতন্যেই আছে, অনুচৈতন্যে বা জীবচৈতন্যে তাহা নাই। সৃষ্টি কার্য্য শেষ হইয়া গেলে শ্রীভগবান্ সকলকে রাসমণ্ডলে লইয়া গেলেন। রাসমণ্ডল অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ছিল। শ্রীভগবান্ রসরূপ, ইহা বেদের কথা। যে অবস্থায় শ্রীভগবানের স্বরূপের এই রসবত্তা অবাধে প্রকটিত বা পরিব্যক্ত, তাহাই রাসমণ্ডল। এই রাসমণ্ডলেই শ্রীভগবানের স্বরূপের বা প্রাণের যাহা গূঢ়-তত্ত্ব তাহা প্রকাশিত হয় না। অন্যত্র শ্রীভগবান্ গীতায় যাহা বলিয়াছেন—তাহাই সত্য।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়া আমি সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। এই সমুদয়ের পরম বা শ্রেষ্ঠ যে আমি, মূঢ় সেই আমাকে জানিতে পারে না।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।

ত্রিগুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে।

ইহাই জীবের বা জগতের সাধারণ অবস্থা। এই কারণেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সৃষ্টি বর্ণনার প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রথম ত্রিগুণের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। আপাততঃ জীব ও জগৎ এই অবস্থায় আছে, ইহা সত্য। কিন্তু চিরকাল এই অবস্থায় রাখা শ্রীভগবানের ইচ্ছা নহে।

তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ। আমরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না। সে জন্য আমাদের অশেষ ক্লেশ হইতেছে। আমরা যদি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আর সংসারের বদ্ধজীব হইয়া ত্রিগুণের প্রভাবে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া কর্ম্মডোরে বদ্ধ হইয়া ভবচক্রে বিঘূর্ণিত হইতাম না। তাহা হইলে আমরা শ্রীগোবিন্দের নিত্যদাস হইয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতাম।

পূর্ব্বের বর্ণনায় দেখিলাম, সমুদয় সৃষ্টপদার্থকে তিনি রাসমণ্ডলে লইয়া গেলেন, সকলেই রাসমণ্ডল দেখিলেন ও অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। এই বিস্ময়, জীবচৈতন্যের আত্মলাভের বা পরমার্থপ্রাপ্তির প্রথম সোপান। আমরা লৌকিক জগতে বলিয়া থাকি যাহার বিস্ময় নাই, কৌতূহল নাই, সে মৃত। বিস্ময়ী ও কৌতূহলীর নিকট সত্য প্রকাশিত হয়। যাহার বিস্ময় নাই, কৌতূহল নাই, আগ্রহ নাই, অনুসন্ধান নাই, তাহার প্রাণ নাই, সে মৃত, সে আত্মহত্যার পথে চলিয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ চিরবিস্ময়ের বিষয়। তিনি—

সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার লীলাকল্লোলবারিধিঃ।

সর্ব্বপ্রকার অদ্ভুত ও চমৎকার লীলার কল্লোল সেই সমুদ্রের বুকে জাগিতেছে।

শ্রীভগবানের স্বরূপের রসের বা আনন্দস্ফূর্ত্তির দর্শনে নিখিল বিশ্ব বিস্মিত ও মুগ্ধ, নিখিলের সেই বিস্ময়ের মধ্যে, সেই বিস্ময়ের চির উদ্দীপনার হেতুস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা আবির্ভূতা হইলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক নহেন। শ্রীভগবানের ইনি প্রাণরূপা। শ্রীরাধিকা যখন প্রকটিত হইলেন, তখনই ভগবান সত্য করিয়া আমাদের আপনার হইলেন। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির যে ব্যবধান সেই ব্যবধান দূরগত হইল। স্রষ্টার উপর একটি আবরণ ছিল—কোন কোন আচার্য্যের মতে এই আবরণই যোগমায়া—এই আবরণ আজ দূরগত হইল। বিশ্বসৃষ্টির চরম ও পরম অভিপ্রায় আজ ধরা পড়িয়া গেল—শ্রীমতী রাধিকা আবির্ভূতা হইলেন।

এই ব্যাপারটি অবশ্য অত্যন্ত কঠিন ও গূঢ়। কে কাহাকে বুঝায়? অন্তর্য্যামী গুরুরূপে শ্রীভগবান্ প্রত্যেক জীবের ভিতর রহিয়াছেন। বিশ্বস্রষ্টা প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থে পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছেন। মানুষকে অন্তর্মুখী হইতে হইবে। অন্তর্মুখী হইয়া ধ্যানযোগে নিজের ভিতরে সেই বিশ্বস্রষ্টা অন্তর্যামীকে অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায়

কি, তিনিই বলিয়া দিবেন। তাঁহার কথাই সংসারচ্ছেদী। তিনি বলিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

সাধারণভাবে এই ব্যাপার আর এক প্রকার চিন্তাপ্রণালীর মধ্য দিয়া মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। আমি বাঁচিয়া আছি, আমি প্রাণময়। ইহাই আমার নিকট প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান সত্য। মন বলুন, বুদ্ধি বলুন, ইন্দ্রিয় বলুন, দেহ বলুন, প্রাণ আছে তাই ইহারা আছে। আমি বাঁচিয়া আছি, ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই। ইহা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কেহ কেহ মনের দুঃখে বলে—মরিলে বাঁচি। এই কথা মানুষ যখন বলে, তখন সে সত্য করিয়া মরিতে চায় না, ইহা তাহার কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে বলিতেছে—মরিলেই বাঁচি। সে মরিতে চাহিতেছে, কিন্তু মরিবার জন্য নহে—ভাল করিয়া বাঁচিবার জন্য। এই বাঁচা, তাহার পসন্দ হইতেছে না। সে আরও ভাল করিয়া বাঁচিতে চায়। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, আমরা বাঁচিতে চাই, ভাল করিয়া বাঁচিতে চাই—অর্থাৎ সুখে বাঁচিতে চাই। এই বাঁচিয়া থাকার মূলে একটা সুখ বা আনন্দ আছে। ক্রমে ক্রমে সেই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে। নিত্যজীবন, নিত্যআনন্দ। জীবন সেই নিত্যানন্দের অভিমুখে চলিতেছে। ভগবান্ নিজের প্রাণ দিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিল তিল করিয়া তাঁহার অসীম প্রাণ বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই খণ্ড প্রাণগুলিকে তিনি অখণ্ডতায় লইয়া যাইতেছেন—তাঁহার স্বরূপের নিত্যানন্দের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপের এই নিত্যানন্দের বিলাসই শ্রীরাসমণ্ডল, আর শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের ও শ্রীরাসমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধার প্রাকট্য ও রাসমণ্ডল, বিশ্বসৃষ্টির চরম ও পরম অভিপ্রায়। এইভাবে পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীরাধাতত্ত্বের ধ্যান করা যাইতে পারে।

৮। শ্রীরাধার রূপ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার পর শ্রীরাধার রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দেবী ষোড়শবর্ষীয়া নবযৌবনসংযুতা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা সস্মিতা সুমনোহরা॥
সুকোমলাঙ্গী ললিতা সুন্দরীষু চ সুন্দরী।
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তা পীনশ্রোণীপয়োধরা॥

বন্ধুজীবজিতারক্ত সুন্দরোষ্ঠাধরা বরা ।
মুক্তাপংক্তিজিতা চারুদন্ত পঙ্‌ক্ত্যা মনোহরা ॥
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুশোভামুষ্ট শুভাননা ।
চারুসীমন্তিনী চারুশরৎপঙ্কজলোচনা ।
খগেন্দ্রচঞ্চুবিজিতচারুনাসা মনোহরা ।
খগেন্দুকবিজিতে গণ্ডযুগ্মে চ বিভ্রতী ॥
দধতী চারুকর্ণে চ রত্নাভরণ ভূষিতে ।
চন্দনাগুরুকস্তুরীযুক্ত কুঙ্কুমবিন্দুভিঃ ॥
সিন্দুরবিন্দুসংযুক্তসু কপোলামনোহরা ।
সুসংস্কৃতং কেশপাশং মালতী মাল্যভূষিতম ॥
সুগন্ধ কবরীভারং সুন্দরং দধতী সতী ।
স্থলপদ্ম-প্রভামুষ্টং পাদযুগঞ্চ বিভ্রতী ॥
গমনং কুর্ব্বতী সা চ হংসখঞ্জনগঞ্জনম্ ।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণাং বনমালাং মনোহরাম্ ॥
হারং হীরকনির্ম্মাণং রত্নকেয়ূরকঙ্কণম্ ।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণং পাশকং সুমনোরমম্ ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
নানাপ্রকারচিত্রাঢ্যং সুন্দরং পরিবিভ্রতী ॥

৯। শ্রীরাধাও ব্রজগোপী

এই শ্রীরাধা। তিনি গোবিন্দকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের মুখপঙ্কজের প্রতি হাস্যমুখে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখপঙ্কজের প্রতি বিহ্বলভাবে চাহিয়া থাকিবার সময় শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপাঙ্গনাগণ আবিভূ্র্তা হইলেন। ইঁহারা রূপে ও বেশে প্রায়ই শ্রীরাধার ন্যায়। ইঁহারা সকলেই স্থির যৌবনা। গোলোকে গোপিকাগণের সংখ্যা লক্ষকোটি, সংখ্যা গণনা হয়। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ আবিভূর্ত হইলেন। তাঁহাদের বয়স ও বেশ, শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমতুল্য। ইঁহাদের সকলেরই মূর্ত্তি মনোহর ও অতীব কমনীয়। ইঁহাদের সংখ্যা ত্রিশকোটি। তাহার পর

শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে নানাবর্ণ গো আবিভূর্ত হইল। বলীবর্দ্দ, সুরভি, বৎস, কামধেনু, দেখিতে পরম সুন্দর। ইহাদের মধ্যে একটি বলিবর্দ্দের বল কোটিসিংহের সমতুল্য। শ্রীকৃষ্ণ এই বলীবর্দ্দটি বাহন করিবার জন্য শিবকে দিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের নখশ্রেণী হইতে হংস ও হংসীগণ আবিভূত হইল। এই হংসগণের মধ্য হইতে একটি রাজহংস শ্রীকৃষ্ণ বাহন করিবার জন্য ব্রহ্মাকে দান করিলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামকর্ণের বিবর হইতে শ্বেতবর্ণ অশ্বসমূহ আবিভূর্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ একটি শ্বেত অশ্ব বাহন করিবার জন্য ধর্ম্মকে দান করিলেন। দক্ষিণ কর্ণের বিবর হইতে সিংহগণের আবির্ভাব হইল। একটি সিংহ, ভগবান্ বাহন করিবার জন্য প্রকৃতিকে দান করিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ পাঁচখানি রথ সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর কুবের, তাঁহার পত্নী ও অনুচরগণের উৎপত্তি হইল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল আদি দেবযোনি, ভগবানের গুহ্যদেশ হইতে আবিভূর্ত হইল। তাঁহার মুখকমল হইতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বনমালশোভিত, পীতবস্ত্রপরিধান, শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ, কিরীট, কুণ্ডল ও রত্নভূষণভূষিত পার্ষদগণ আবিভূর্ত হইলেন। এই পার্ষদগণ নারায়ণকে দেওয়া হইল। কুবের গুহ্যকগণকে পাইলেন, শঙ্কর ভূতগণকে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ ও দক্ষিণ চক্ষু হইতে ভৈরবগণের উৎপত্তি হইল। বামনেত্র হইতে দিক্‌পালগণের অধীশ্বর দিগম্বর ঈশানের আবির্ভাব। অতঃপর ডাকিনী যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, দেবস্ত্রী প্রভৃতির জন্ম। ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সৃষ্টিতত্ত্ব।

৯। পঞ্চপ্রকৃতি

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রথম খণ্ডের নাম ব্রহ্মখণ্ড। ঐ খণ্ডে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা বলা হইল। এইবার দ্বিতীয় খণ্ড আলোচনা করা যাইতেছে। দ্বিতীয়খণ্ডের নাম প্রকৃতিখণ্ড। এই খণ্ডের প্রথমেই বলা হইল—প্রকৃতি পঞ্চধা। পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করিতেছেন।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃপঞ্চধা স্মৃতা ॥

গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী সৃষ্টিবিধানে প্রকৃতির এই পঞ্চরূপ।

প্রকৃতির পঞ্চরূপ বুঝিবার পূর্ব্বে, প্রকৃতি কি তাহাই দেখা যাউক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই আমরা তাহার উত্তর পাইব।

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃসাপ্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টসত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসিকৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানং সৃষ্টিকারণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

'প্র' কথার অর্থ প্রকৃষ্ট, আর 'কৃতি' শব্দে সৃষ্টি বুঝায়; অতএব সৃষ্টিকার্য্যে যে দেবী প্রকৃষ্টা বা সর্ব্বপ্রধানা তিনি প্রকৃতি। বেদে আছে, প্র-শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট সত্বগুণ, 'কৃ' বলিতে বুঝায় রজোগুণ, আর 'তি' তমোগুণ। যিনি ত্রিগুণাত্মস্বরূপা ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা, এবং সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানা, তিনি প্রকৃতি। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রথম, 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি। যে দেবী সৃষ্টির আদ্যা, তিনি প্রকৃতি।

বিশ্বে যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতেছি, সমস্তই শক্তির খেলা। এই শক্তির যিনি সমষ্টি তিনি প্রকৃতি। The sum-total of the cosmic forces. শক্তি মূলে এক, তিনি বহুমূর্ত্তি ধরিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। বৈষ্ণব-দর্শনে এই শক্তিকে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি, ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, এই তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শক্তির ক্রিয়ার রহস্য আমাদিগকে জানিতে হইবে, এই শক্তির আনুগত্য করিয়া এই শক্তিকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের কল্যাণ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে—

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

এই মহাশক্তি প্রসন্না ও বরদা হইয়া জীবসকলের মুক্তির বা পরমমঙ্গলের হেতুভূতা হইয়া থাকেন। যিনি শক্তিমান্ তিনি পুরুষ, সর্ব্বশক্তি যাঁহার তিনি আদ্য পুরুষ। প্রকৃতি বা শক্তির সাহায্যেই আমরা পুরুষের পরিচয় পাই। সেই পুরুষকে ধরিতে বা বুঝিতে অন্য কোন উপায় নাই।

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শক্তি-কথা বা প্রকৃতি-কথা আলোচনা করা যাউক। এই কথারও শেষে আমরা শ্রীরাধাতত্ত্বের পরিচয় পাইব।

যিনি আদ্যপুরুষ তিনিই পরমাত্মা শ্রীভগবান্। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য যোগশক্তির দ্বারা আপনাকে দুই অংশে ভাগ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ অংশ পুরুষ আর বাম অংশ প্রকৃতি। অগ্নি এবং তাহার জ্বালা বা দাহিকাশক্তি যেমন, এই পুরুষ, ও প্রকৃতি, ঠিক্ তেমনই। ইঁহারা সত্য করিয়া কখনই পৃথক্ নহেন। যেখানে পুরুষ সেইখানে প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতির যে পার্থক্য দেখা যায়, ইহা কেবল আমাদের চিন্তার সুবিধার জন্য। এই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা মায়া, নিত্যা ও সনাতনী।

স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টির ইচ্ছাবশতঃ ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন। সৃষ্টিকার্য্যের ভেদনিবন্ধন—সৃষ্টিকর্ম্মণি ভেদতঃ, অথবা ভক্তের অনুরোধে—ভক্তানুরোধাদ্বা —ভক্তানুগ্রহকারিণী সেই দেবী পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন।

১। গণেশমাতা দুর্গা। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।

২। লক্ষ্মী। তিনি শুদ্ধ সত্বস্বরূপা, 'সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।' তিথি সর্ব্বশস্যরূপা, ও সর্ব্ববিধ জীবনোপায়রূপিণী। মহালক্ষ্মী, স্বর্গলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী ও গৃহলক্ষ্মীরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। সকল প্রাণীতে এবং সকলদ্রব্যে তিনি শোভারূপা: পুণ্যবান্ ব্যক্তিতে তিনি প্রীতি, নৃপতিতে তিনি প্রভা, বণিকে বাণিজ্যরূপা।

৩। সরস্বতী। তিনি বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিদেবতা ও সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপা। সুবুদ্ধি, কবিতা, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতি সজ্জনগণ এই দেবীর কৃপায় পাইয়া থাকেন। তিনি আবার

সর্ব্বসঙ্গীতসন্ধানতালকারণরূপিণী।
তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী, হরির প্রিয়তমা পত্নী॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া॥
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী।
সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাসদা॥

তিনি হিম, চন্দন, কুন্দফুল, চন্দ্র, কুমুদ ও শ্বেতপদ্মের ন্যায় অঙ্গকান্তিসম্পন্না। তিনি রত্নমালার দ্বারা সর্ব্বদাই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। তিনি তপঃস্বরূপা, তপস্যার ফলদাত্রী, সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা এবং সর্ব্বদা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন।

৪। সাবিত্রী। তিনি চারিবেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দসমূহের মাতৃস্বরূপা। সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি ক্রিয়ামন্ত্রের ও তন্ত্রাদির তিনি মাতা। তিনি ব্রাহ্মতেজোময়ী।

৫। শ্রীরাধিকা।

প্রেমপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণ স্বরূপিণী।
প্রাণাধিক প্রিয়তমা সর্ব্বাদ্যা সুন্দরী বরা॥
সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা চ মানিনী গৌরবান্বিতা।
বামার্দ্ধাঙ্গ স্বরূপা চ গুণেন তেজসাময়া॥
পরাবরা সর্ব্বব্রতা পরমাদ্যা সনাতনী।
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা॥
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা॥
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা॥
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী॥

ইনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ প্রাণস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা ও প্রিয়তমা, সকলের আদি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সমুদয় সৌভাগ্যসম্পন্না, মানিনী, গৌরবান্বিতা, শ্রীকৃষ্ণের বাম অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা, গুণে ও তেজে শ্রীকৃষ্ণের সমতুল্যা। তিনি পরাবরা —সগুণা ও নির্গুণা, সর্ব্বব্রত বা সর্ব্ববিধ সেবানিরতা, পরমাদ্যা ও সনাতনী। তিনি পরমানন্দরূপা, ধন্যা, মান্যা ও পূজিতা। তিনি রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসমণ্ডলসম্ভূতা ও রাসমণ্ডলমণ্ডিতা অর্থাৎ রাসমণ্ডলের কেন্দ্র বা শৃঙ্খল-স্বরূপা। রাসেশ্বরী, সুরসিকা, রাসাবাসনিবাসিনী। তিনি গোলোকবাসিনী ও গোপীবেশবিধায়িকা। তিনি পরমাহ্লাদরূপা, সন্তোষ ও হর্ষরূপিণী, নির্গুণা, নিরাকারা, আত্মস্বরূপা ও নির্লিপ্তা।

তাহার পর, ভক্তগণকে কৃষ্ণদাস্য দান করিবার সামর্থ্য একমাত্র তাঁহারই আছে। তিনি বারাহকল্পে বৃকভানু-সুতারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইনিই পঞ্চমী প্রকৃতি।

এই স্থলে বারাহকল্প কি, জানা আবশ্যক। ব্রাহ্ম, বারাহ ও পাদ্মভেদে কল্প ত্রিবিধ। ব্রহ্মার পরমায়ুকালকেই কল্প বলা যায়, আবার ব্রহ্মার একদিনের নাম ও কল্প। মার্কণ্ডেয় মুনি সপ্তকল্পান্তজীবী। এই কল্প ব্রহ্মার পরমায়ু নহে, ব্রহ্মার দিন। ব্রাহ্মকল্পে বিধাতা মধু ও কৈটভ, এই দৈত্যযুগলের মেদদ্বারা মেদিনীকে সৃষ্টি করিয়া পরে অন্য সব সৃষ্টি করিয়াছেন। বারাহকল্পে বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হইতে উত্তোলন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পাদ্মকল্পে বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়া সমুদয় লোক সৃজন করিয়াছেন। এখন শ্বেতবারাহকল্প চলিতেছে। এই কল্প অবশ্য ব্রহ্মার দিন। পুরাণের এই কল্পতত্ত্ব অত্যন্ত কঠিন।

পূর্ব্বে যে পঞ্চপ্রকৃতির কথা বলা হইল, তাহার প্রথমটি অর্থাৎ গণেশজননী শক্তি বিস্তারিণী শক্তি। দ্বিতীয় লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য ও ভোগশক্তি, তৃতীয় সরস্বতী বিদ্যাশক্তি, চতুর্থ সাবিত্রী ব্রহ্মতেজঃশক্তি, আর পঞ্চম শ্রীরাধা প্রেমশক্তি। এইভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

এই যে পঞ্চশক্তি বা প্রকৃতির পঞ্চমূর্ত্তি ইহারা স্বরূপতঃ পৃথক্ নহে, একই মহাশক্তি বা মূলপ্রকৃতি লীলায় বা বিশ্বব্যবস্থায় প্রকাশের অনুরোধে এই পঞ্চমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাঁচে এক, একে পাঁচ, শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই সত্য যিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহারই সত্যবোধ হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের এই ঐক্য ও বহুত্ব একই সঙ্গে বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণবসাধনায় ও শক্তিসাধনায় নানারূপ ব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইস্থানে শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আছে, তাহাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দেবী ব্রহ্মাদির দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন, অথচ সমুদয় জগৎ তাঁহাকে জানিতেছেন। তিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে রহিয়াছেন। ব্রহ্মা তাঁহার শ্রীচরণের দর্শন লাভ করিবার জন্য ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া স্বপ্নেও দেখিতে পান নাই। কিন্তু বৃন্দাবনে সমুদয় লোক তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। মূল শ্লোকগুলি এই—

স্বৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রা চ বসুন্ধরা।
ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা যা সর্ব্বদৃষ্টা চ ভারতে।
স্ত্রীরত্নসারসম্ভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
তথা ঘনে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুখে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রানি প্রতপ্তং ব্রহ্মণা পুরা।
তৎপাদপদ্মনখরদৃষ্টয়ে চাত্মশুদ্ধয়ে।
ন চ দৃষ্টঞ্চ স্বপ্নেঽপি প্রত্যক্ষস্যাপি চা কথা॥
তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভূরি বৃন্দাবন বনে॥

এই পঞ্চপ্রকৃতির কথা বলার পর বলা হইয়াছে, যাবতীয় দেবীগণ ও নারীগণ, কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ তাঁহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহবা কলাংশের কলা হইতে উৎপন্না।

তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গা, তুলসী, মনসা, দেবসেনা বা ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, কালী, স্বাহা, দক্ষিণা, স্বধা, স্বস্তি, পুষ্টি, সম্পত্তি, ক্ষমা, রতি, দয়া, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, মিথ্যা, শান্তি, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, মূর্ত্তি, নিদ্রা প্রভৃতি শক্তির কথা বলিয়া কে কোন্ শক্তিকে পূজা করিয়াছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

১০। শ্রীরাধার পূজা

শ্রীরাধার পূজাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

প্রথমে পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মন॥
গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ।
গবাং গণৈঃ সুরগণৈস্তৎপশ্চান্মায়য়া হরেঃ॥
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভির্মনুভিস্তথা।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা॥
পৃথিব্যাং প্রথমে দেবী সুযজ্ঞেন চ পূজিতা।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে॥
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সুরৈঃ॥

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব্বপ্রথম গোলোকে রাসমণ্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধা পূজিতা হন। তাহার পর গোপিকাগণ, গোপগণ, বালিকাগণ, বালকগণ, গোগণ, দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। তাহার পর হরির মায়া। তাহার পর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, মনুগণ কর্ত্তৃক পুষ্প ও ধূপাদির দ্বারা তিনি পূজিতা ও বন্দিতা হন। পৃথিবীতে শঙ্কর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সুযজ্ঞ তাঁহার প্রথম পূজা করেন। তাহার পর পরমাত্মার আজ্ঞায় তিন লোকে পুষ্প ধূপ প্রভৃতির দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক মুনিগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হইলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ। শ্রীমতী রাধিকা এই রাসলীলার সঙ্গিনী। এই রাসলীলারই ফলে বরুণাদি দেবতা, ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট পুরুষের উৎপত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতী দেবীকে বৈকুণ্ঠপতি চতুর্ভুজধারী নারায়ণের নিকট প্রেরণ করিবার সময় তাঁহাকে বলিলেন—আমি সকলের ঈশ্বর, সকলকেই শাসন করিতে সক্ষম; কিন্তু আমার শ্রীরাধাকে শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীরাধা, তেজে রূপে ও গুণে আমার সমান। তিনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোন্ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে পারে? প্রাণ হইতে কেহই প্রিয় নহে।

সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাং রাধিতুমক্ষমঃ।
তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ।
প্রাণতোঽপি প্রিয়ঃ কুত্র কেষাং বাস্তি কশ্চন॥

১১। শ্রীরাধার তপস্যা

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিদেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গসম্ভূতা শ্রীরাধিকার তপস্যা-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নিম্নরূপ কথিত হইয়াছে—

তপশ্চকার সা পূর্ব্বং শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।
দিব্যং যুগসহস্রঞ্চ নিরাহারা কৃশা সতী॥
কৃশাং নিশ্বাসরহিতাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রকলোপমাম্।
কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে কৃত্বা রুরোদ কৃপয়া বিভুঃ॥

বরং তস্মৈ দদৌ সারং সর্ব্বেষামপি দুর্ল্লভম্।
মম বক্ষঃস্থলে তিষ্ঠ ময়ি তে ভক্তিরস্থিতি ॥
সৌভাগ্যেন চ মানেন প্রেম্ণা চ গৌরবেণ চ।
ত্বং মে শ্রেষ্ঠা চ প্রেষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ সর্ব্বযোষিতাম্ ॥
বরিষ্ঠা চ গরিষ্ঠা চ সংস্তুতা পূজিতা ময়া।
সন্ততং তব সাধ্যোঽহং রাধ্যশ্চ প্রাণবল্লভে ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথশ্চকার চেতনাং ততঃ।
সপত্নীরহিতাং তাঞ্চ চকার প্রাণবল্লভাম্ ॥

তিনি পূর্ব্বে শতশৃঙ্গপর্ব্বতে দৈব সহস্রযুগ পর্য্যন্ত সময় কৃশাঙ্গী হইয়া অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন। ক্ষীণচন্দ্রের কলার ন্যায় শ্রীরাধার এই নিশ্বাসরহিত ও কৃশ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার বক্ষঃদেশে গ্রহণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ সকলের দুর্ল্লভ এই সার বর তাঁহাকে প্রদান করিলেন—"তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই সর্ব্বদা বাস কর, তোমার ভক্তি আমাতেই স্থিরা হউক। সৌভাগ্য, মান, প্রেম ও গৌরবে তুমিই আমার সর্ব্বনারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, প্রিয়তমা ও জ্যেষ্ঠা। তুমি বরিষ্ঠা, গরিষ্ঠা, সংস্তুতা ও পূজিতা। আমি সর্ব্বদাই তোমার বশীভূত ও আরাধ্য হইব"। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চৈতন্য উৎপাদন করিলেন ও তাঁহাকে সপত্নীশূন্যা প্রাণবল্লভা করিলেন।

১২। গঙ্গা ও রাধা

গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধাকৃষ্ণকথা কথিত হইয়াছে। ঘটনাটি এই—কার্ত্তিকমাস, পূর্ণিমা; আজ রাধামহোৎসব। গোলোকে শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধিকার পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে শ্রীরাধার পূজা করিলেন। তাহার পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। দেবী সরস্বতী বীণায় ঝঙ্কার দিয়া সুললিত তানে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত-মাধুরীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর স্বয়ং মহাদেব সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। শিবের সঙ্গীতে দেবগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর সকলেই চাহিয়া দেখিলেন, রাসমণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাই, সমগ্র রাসমণ্ডল একেবারে

জলাকীর্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শনে সকলেই নিরতিশয় ব্যাকুল ব্রহ্মা ধ্যানযুক্ত হইয়া বুঝিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গলিয়া গিয়াছেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ কাতর-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দৈববাণী হইল। অলক্ষ্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে দেবগণ, তোমরা যদি পুনরায় আমাকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে মহাদেব শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ প্রণয়ন করুন। সেই শাস্ত্রে মন্ত্র, পূজাবিধি, স্তব, ধ্যান ও কবচাদি থাকিবে। ভক্তগণ সেই শাস্ত্রের উপদেশমত আমার উপাসনা করিবে, তাহা হইলে তোমরা আবার দর্শন পাইবে।' শিব গঙ্গাজল হস্তে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রকাশিত হইলেন। কালক্রমে শম্ভু শাস্ত্রসমূহ প্রকাশিত করিলেন। গোলোকে এই প্রকারে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হইল।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কথা এই—একদিন গঙ্গাদেবী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে গোপীগণসহ শ্রীরাধিকা তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা মধুরবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"প্রাণনাথ, তোমার পার্শ্বে ঐ সুন্দরী কে? কপট! তুমি গোলোক হইতে চলিয়া যাও, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই।"

তাহার পর শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন—

১। আমি দেখিয়াছি, চন্দনকাননে তুমি বিরজার সহিত মিলিত হইয়াছিলে। সখীগণের কথায় তোমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, বিরজার সহিত যখন মিলিত হইয়াছিলে, তখন তুমি আমাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলে। বিরজা ভয়ে নিজের দেহ ছাড়িয়া নদী হইয়া গেল। বিরজা কোটি যোজন বিস্তীর্ণা, দৈর্ঘ্য তাহার চতুর্গুণ। বিরজা আজিও নদীরূপে রহিয়াছে। আমি চলিয়া গেলে তুমি গোপনে বিরজার তীরে গিয়া কাতরস্বরে বিরজাকে ডাকিতে লাগিলে। বিরজা সিদ্ধযোগিনী। তোমার আহ্বানে সুন্দর ও সুবেশপরিহিত মূর্ত্তি লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই বিরজা হইতে সপ্ত সমুদ্রের উৎপত্তি। সে কথা কি তোমার মনে নাই?

২। চম্পকবনে তুমি শোভানাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলে। আমি আসিবামাত্রই শোভা ভয়ে দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে পলাইয়া গেল। তাহার শরীর সুস্নিগ্ধ তেজে পরিণত হইল। তুমি সেই তেজঃ বিভাগ করিয়া কিছু কিছু করিয়া রত্নে, স্বর্ণে, মণিতে, স্ত্রীলোকের মুখে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, রৌপ্যে, চন্দনে, জলে, পুষ্পে,

পল্লবে, ফলে, শস্যে, দেবগৃহে, রাজপ্রাসাদে রাখিয়া দিলে। সে কথা কি তোমার মনে নাই ?

৩। তুমি বৃন্দাবনের বনমধ্যে প্রভানাম্নী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াছিলে। আমি আসিবামাত্রই তুমি অন্তর্হিত হইলে। প্রভা দেহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে পলাইয়া গেল। তাহার দেহ তীব্র তেজে পরিণত হইল। তুমি প্রেমে রোদন করিয়া সেই তেজঃ নিজের বক্ষে গ্রহণ করিলে, তাহার পর আমার ভয়ে ও লজ্জায় বিভাগ করিয়া কিছু কিছু করিয়া অগ্নিতে, রাজাতে, পুরুষে, দেবতায়, দস্যুতে, নাগে, ব্রাহ্মণে, মুনিতে, তপস্বীতে, সৌভাগ্যবতী নারীতে, ও যশস্বীব্যক্তিতে রাখিয়া দিলে, তাহা কি তোমার মনে নাই ?

৪। তুমি রাসমণ্ডলে বসন্তকালে রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে শান্তি নাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়াছিলে। আমার আগমনমাত্রেই তুমি অন্তর্হিতা হইয়াছিলে ; আর শান্তি দেহত্যাগ করিয়া তোমাতেই লীনা হইয়াছিল। তুমি রোদন করিতে করিতে তাহাকে বিভক্ত করিয়া অনাসক্ত ব্যক্তিতে, সত্বরূপ বিষ্ণুতে, শুদ্ধসত্বরূপিণী লক্ষ্মীতে, তোমার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণে, তপস্বীতে, ধর্ম্মে ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে তাহাকে রাখিয়া দিলে। তাহা কি তোমার মনে নাই ?

৫। তুমি ক্ষমানাম্নী গোপিকার সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে। আমি তোমাদিগকে জাগরিত করাইয়াছিলাম। তাহা কি তোমার মনে নাই ? আমি তোমার পীতবসন, মনোহর মুরলী, বনমালা, কৌস্তুভমণি, রত্নকুণ্ডল প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সখীদের একান্ত অনুরোধে আবার ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। তোমাদের সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে। আজও তোমার বর্ণ সেই কারণে কৃষ্ণ। ক্ষমা, লজ্জায় শরীর ছাড়িয়া পৃথিবীতে গিয়াছিল এবং শ্রেষ্ঠগুণে পরিণত হইয়াছিল। তুমি তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া রোদন করিতে করিতে বিষ্ণুতে, বৈষ্ণবে, ধর্ম্মে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে, কিছু দুর্ব্বল ব্যক্তিতে, তপস্বীতে, দেবতায় ও পণ্ডিতে তাহাকে ভাগ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলে। আর কি বলিব, তোমার এই প্রকারের বহুগুণ আমার জানা আছে।

এই সময়ে সিদ্ধযোগিনী গঙ্গাদেবী যোগবলে বুঝিলেন যে, শ্রীরাধিকা তাঁহাকে

গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গা গোপনে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধা গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান অন্বেষণ করিয়া গঙ্গাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। গঙ্গার এই আত্মগোপনের ফলে ব্রহ্মাণ্ডে জলাভাব উপস্থিত। ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মনু, মানব, সিদ্ধতাপস প্রভৃতি সকলেই শুষ্ককণ্ঠে গোলোকে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করার পর তাঁহারা দেখিলেন—

জ্যোতির্ম্ময়ং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণচিত্রসিংহাসনস্থিতম্॥
সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা।
গোপালিকানৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা॥
পরিতো ব্যাবৃতং শশ্বদ্গোপৈশ্চ শতকোটিভিঃ।
চন্দনেক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্॥
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসম্।
যথাদ্যাশবর্ষীয়বালং গোপালরূপিণম্॥
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্টপুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহম্।
স্বতেজসা পরিবৃতং সুখদৃশ্যং মনোহরম্॥
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যলীলালাবণ্যধামকম্।
দৃশ্যমানঞ্চ গোপীভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততম্॥
ভূষণৈর্ভূষিতাভিশ্চ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতৈঃ।
পিবন্তীভির্নোচ্চাভাং মুখচন্দ্রং প্রভোর্মুদা॥
ওঁ রাধাধিকপ্রিয়তমরাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্।
তয়া প্রদত্তং তাম্বূলং ভক্তবন্তং সুবাসিতম্॥

জ্যোতির্ম্ময় পরম ব্রহ্ম, সকল কারণের কারণস্বরূপ। অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত বিচিত্র সিংহাসনে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। গোপালগণ শ্বেতচামরবীজনের দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছেন। তিনি আনন্দিত হৃদয়ে হাস্যবদনে গোপালিকা নৃত্য দর্শন করিতেছেন ও গীত শ্রবণ করিতেছেন। শতকোটি গোপগণ কর্ত্তৃক তিনি সকল সময়েই

পরিব্যাপ্ত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও রত্নভূষণভূষিত। তাঁহার অঙ্গ নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামল, তাঁহার বয়স কিশোর, পরিধান পীতবস্ত্র, তিনি গোপবালকমূর্ত্তি, দেখিয়া মনে হয় দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। কোটিচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের প্রভা ও শ্রী। তিনি আপনার তেজের ছটায় আবৃত, সুখদৃশ্যও মনোহর। তিনি কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যলীলা ও লাবণ্যের ধামস্বরূপ। হাস্যবদনা গোপবালাগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। এই গোপবালাগণ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র চক্ষুদ্বারা পান করিতেছে। প্রাণের অধিক প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃস্থলে তিনি রহিয়াছেন এবং শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাম্বূল তিনি ভোজন করিতেছেন।

রাসমণ্ডলের সকল স্থানেই দেবগণ এইরূপ দর্শন করিলেন। দেবগণের অনুরোধে সকলের অভিলষিত বিষয় প্রভুকে বলিবার জন্য ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন—তাঁহার দক্ষিণ ভাগে বিষ্ণু আর বামভাগে বামদেব। তাহার পর যেন রাসমণ্ডল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সকলেই দেখিলেন উহা কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। এক কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সকল মূর্ত্তিই দ্বিভুজমুরলীধর, বনমালাভূষিত, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, বক্ষে কৌস্তুভমণি। সকলেই একরূপ। কৃষ্ণ কখন জ্যোতির্ম্ময়, কখন মূর্ত্তিমান, কখন নিরাকার, কখন সাকার। একবার দেখা যাইতেছে, এককৃষ্ণ এক রাধাসহ রহিয়াছেন, কখন প্রত্যেক কৃষ্ণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রাধা। কখন কৃষ্ণ, রাধারূপ ধারণ করিতেছেন, কখন রাধা কৃষ্ণরূপ ধারণ করিতেছেন, কে স্ত্রী, কে পুরুষ, ভগবান্ পুরুষ কি নারী, কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এইপ্রকারে রাসমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শেষে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—গঙ্গাদেবী ভয়ে আমার চরণে লুকাইয়া আছেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে গণ্ডুষে পান করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, সেইজন্য তিনি লুক্কায়িত। ব্রহ্মা তখন শ্রীরাধার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃতা হইলেন। গঙ্গাদেবী নির্ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন, ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ জল কমণ্ডলুতে গ্রহণ করিলেন, চন্দ্রশেখর মস্তকস্থিত চন্দ্রার্দ্ধে কিঞ্চিৎ জল ধারণ করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা গঙ্গাকে রাধিকা-মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ,

পূজাবিধি, ধ্যান এবং সামবেদোক্ত পুরশ্চরণক্রম উপদেশ করিলেন। গঙ্গাদেবীও শ্রীরাধিকাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের অষ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাধা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখানে মহাদেব বলিতেছেন, আর দেবী পার্ব্বতী শুনিতেছেন। পার্ব্বতী দেবী বলিতেছেন—বেদবাক্যে আপনার মুখে বিস্তারিতরূপে শ্রীরাধার প্রশংসা শুনিয়াছি। বেদের কাণ্বশাখায় এই প্রশংসা আছে।

শ্রুতৌ শ্রুতং প্রশংসা চ রাধায়াশ্চ সমাগতঃ।
তন্মুখাৎ কাণ্বশাখায়াং ব্যাসেন তাবতাধুনা॥

কিন্তু আগম বা তন্ত্র বলিবার সময় শ্রীরাধার কথা কিছুই বলেন নাই, তবে সেই সময়ে আপনি বলিয়াছিলেন, ইহার পর বলিব। এখন আপনি আমাকে সেই কথা বলুন।

পার্ব্বতীর এই অনুরোধে শিব শ্রীরাধাতত্ত্ব তাঁহাকে সমুদয় বলিলেন। প্রারম্ভে বলিলেন,—আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদেশ পাইয়াছি, তাই এই সব কথা তোমাকে বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের আদেশব্যতীত একথা বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের বিরংসা বা রমণেচ্ছাই শ্রীরাধার উদ্ভবের হেতু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান।

রাধা ভজতি শ্রীকৃষ্ণং স চ তাঞ্চ পরস্পরম্।
উভয়োঃ সর্ব্বসাম্যঞ্চ সদা সন্তো বদন্তি চ॥
রা-শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্ল্লভাম্।
ধা-শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদম্॥

'রা' এই শব্দ উচ্চারণমাত্রেই ভক্তগণ সুদুর্ল্লভ মুক্তিপদ লাভ করেন, ধা-শব্দ উচ্চারণমাত্রেই হরির পদে ধাবিত হন।

যাবতীয় দেবী শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে উৎপন্না। চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রিয়তমা মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবাসিনী, শ্রীরাধার বামভাগে তাঁহার উৎপত্তি। মহালক্ষ্মীর অংশ রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মীর অংশ মর্ত্ত্যলক্ষ্মী।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পার্ব্বতি।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্॥

হে পার্ব্বতী, ব্রহ্ম হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর জগৎ সকলই মিথ্যা, ত্রিগুণাতীত রাধাকান্ত পরব্রহ্মই সত্য, তাঁহার ভজনা কর।

১৩। শ্রীরাধার অভিশাপ।

গোলোক বৃন্দাবনে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের একপ্রদেশে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিরজানাম্নী গোপীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। চারিজন দূতীর নিকট শ্রীরাধিকা এই সংবাদ পাইলেন। শ্রীরাধিকা কুপিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিতেছেন, এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণের সহচর সুদাম জানিতে পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিয়া অন্যান্য গোপগণসহ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। বিরজা নদীরূপ ধারণ করিলেন, বিরজার সখীগণও ছোট ছোট নদী হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা দেখিলেন—রাসমণ্ডলে কেহই নাই। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অষ্ট সখার সহিত শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদাম সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধাকে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতে শ্রীমতী রাধিকা সুদামের উপর অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"সুদাম তুই অসুরযোনিতে অধঃপাতিত হ।"

শ্রীরাধার অভিশাপ শুনিয়া সুদাম অভিশাপ দিলেন—"তুমিও গোলোক হইতে পৃথিবীতে যাইয়া গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ কর, শতবৎসর শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ অনুভব করিবে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সুদামকে শ্রীকৃষ্ণের সখা ও শ্রীরাধার পুত্র বলা হইয়াছে। অভিশপ্ত সুদাম শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গোলোক হইতে চলিয়া যাইতেছেন, শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন ও কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বৎস, তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ?"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"কাঁদিও না, শীঘ্রই পুত্রের সহিত মিলিত হইবে।"

সুদাম মাতৃশাপে শঙ্খচূড় নামক অসুর হইলেন এবং কাল পূর্ণ হইলে শিবের শূলে নিহত হইয়া গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরাধা বারাহকল্পে গোকুলনগরে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ বৃষভানুর কন্যা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাতার নাম কলাবতী। শ্রীরাধার

প্রাকৃত জন্ম হয় নাই। কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সহিত রায়াণের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্য নহে। শ্রীরাধা বৃষভানুসুতায় নিজের ছায়া রাখিয়া অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হইয়াছিল। তখন শ্রীরাধার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদাপুত্ররূপে ব্রজে আগমন করেন। রায়াণ যশোদার সহোদর, গোলোকে নিত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অংশ। জগৎস্রষ্টা পুণ্যতম বৃন্দাবনের বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিহার করিতেন—রায়াণের গৃহে ছায়ারূপে থাকিতেন।

১৪। সুযজ্ঞের আরাধনা

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাসমণ্ডলে শ্রীরাধার পূজা করিয়া তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, চন্দ্র, সূর্য্য, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণ, পর পর শ্রীরাধার পূজা করেন। তাহার পর রাজা সুযজ্ঞ পাত্রমিত্রগণ সহ শ্রীরাধার পূজা করেন। সুযজ্ঞ ভারতবর্ষে সপ্তদ্বীপপতি ছিলেন। তিনি দৈবদোষে ব্রহ্মণ-শাপে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কশ্যপকুলচূড়ামণি সুতপা ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শ্রীরাধার স্তব সামবেদোক্ত ধ্যান, কবচ প্রভৃতি দান করেন। এই কবচ ধারণ করিয়া মহারাজা সুযজ্ঞ শতবৎসরকাল পুষ্কর তীর্থে নিয়ম পূর্ব্বক শ্রীরাধার ধ্যান ও পূজা আচরণ করেন। তিনি ইহলোকে পরহস্তগত রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করেন এবং অন্তে অনন্ত গোলোকধাম লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া সুযজ্ঞ মহারাজকে শ্রীরাধার আরাধনা করিবার উপদেশ কেন দেওয়া হইয়াছিল, পার্ব্বতী দেবী মহাদেবকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মহাদেব বলিয়াছিলেন—

তৎসেবয়া চ তল্লোকং প্রাপ্স্যসে বহুজন্মতঃ।
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীং ভজরাধাং পরাৎপরাম্॥
কৃপাময়ীপ্রসাদেন শীঘ্রং প্রাপ্স্যসি তৎপদম্॥

শ্রীকৃষ্ণসেবায় শ্রীকৃষ্ণলোক পাওয়া যায়; কিন্তু বহুজন্মপরে; শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকা, তিনি পরাৎপরা—তাঁহার ভজনা কর। কৃপাময়ীর কৃপায় শীঘ্র তাঁহার চরণ লাভ করিবে।

শ্রীরাধিকার ধ্যান—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্॥
সুশ্রোণীং সুনিতম্বাঞ্চ পক্কবিম্বাধরাং বরাম্।
মুক্তাপঙ্‌ক্তি বিনিন্দৈকদন্তপঙ্‌ক্তিমনোহরাম্॥
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং রত্নমালাবিভূষিতাম্॥
রত্নকেয়ূরবলয়াং রত্নমঞ্জীররঞ্জিতাম্।
রত্নকেয়ূরযুগ্মেন বিচিত্রেণ বিরাজিতাম্॥
সূর্য্যপ্রভাচ্ছাদিতেনগণ্ডস্থলবিরাজিতাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণবহুলীযুগ্মভূষিতাম্॥
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণকিরীটমুকুটোজ্জ্বলাম্।
রত্নাঙ্গুরীয়সংযুক্তাং রত্নপাশকশোভিতাম্॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমালাভূষিতাম্।
রূপাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্॥
গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ॥
কস্তূরীবিন্দুভি সার্দ্ধমধশ্চন্দন বিন্দুনা।
সিন্দূর-বিন্দুনা চারু সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্॥
নিত্যং সুপূজিতাং ভক্ত্যা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
কৃষ্ণসৌভাগ্যসংযুক্তাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং বরাম্॥
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ নির্গুণাঞ্চ পরাৎপরাম্।
মহাবিষ্ণুবিধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বসম্পদম্॥
কৃষ্ণভক্তিপ্রদাং শান্তাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্।
বৈষ্ণবীং বিষ্ণুমায়াঞ্চ কৃষ্ণপ্রেমময়ীং শুভাং॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
রাসে রাসেশ্বরযুতাং রাধাং রাসেশ্বরীং ভজে॥

শ্বেতচম্পকের বর্ণের ন্যায় অঙ্গের আভা, কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভা, শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়

বদন, শরতের পদ্মের ন্যায় চক্ষু, সুন্দর শ্রোণী ও নিতম্ব শোভিত। সুন্দর ও সুপক্ক বিম্বফলের ন্যায় অধর, মুক্তাপঙক্তি বিনিন্দিত মনোহর দন্তপঙক্তি। ঈষৎহাস্যযুক্ত প্রসন্নবদন, ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদাই করুণার্দ্র। অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও রত্নমালা দ্বারা শোভিত। গণ্ডস্থল সূর্য্য অপেক্ষা অধিকতর তেজঃসম্পন্ন। মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বারা কর্ণযুগল, উৎকৃষ্ট রত্নরাজি নির্ম্মিত মুকুট ও কিরীট দ্বারা কান্তি অতিশয় উজ্জ্বল। রত্নাঙ্গুরীয় ও রত্ন নির্ম্মিত পাশকদ্বারা সুশোভিত। মস্তকে কবরীভার মালতী মালাশোভিত। রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও মঞ্জীর দ্বারা সুশোভিত। রত্ননির্ম্মিত কেয়ূরযুগল মনোহর হস্ত-যুগলে শোভা পাইতেছে। গজেন্দ্রের ন্যায় মন্দগামিনী, তিনি রূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রিয়তমা গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সর্ব্বদা সেবিত। কেশকলাপ কস্তূরীবিন্দু যুক্ত চন্দন এবং সিন্দূর-বিন্দু দ্বারা সুশোভিত। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে ভক্তিসহকারে পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এবং পরমা প্রাণাধিকা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী নির্গুণস্বরূপিণী। তিনি পরাৎপর মহাবিষ্ণুর জননী ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। তিনি মূলপ্রকৃতি, পরমেশ্বরী, শান্তা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুমায়া, কৃষ্ণপ্রেমময়ী সুন্দরী হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। রাসমণ্ডলের মধ্যে রত্নসিংহাসনে সমাসীন হরির সহিত বিলাসরতা, সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে উপাসনা করি।

শ্রীরাধার মন্ত্র—"ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পূজার বিধি, পাদ্য, অর্ঘ্যদান প্রভৃতি আনুপূর্ব্বিক কথিত হইয়াছে। পূজাপদ্ধতি অন্যান্য পূজার ন্যায়। অতএব বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক। শ্রীরাধার পূজার পর দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে শ্রীরাধিকার প্রিয়পরিচারিকাগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বকোণে মালাবতী, অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণদিকে রত্নমালা, নৈঋর্তকোণে সুশীলা, পশ্চিমদিকে শশিকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা, উত্তরদিকে পদ্মাবতী, এবং ঈশানে সুন্দরীর পূজা করিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কথিত শ্রীরাধার স্তব এবং শ্রীরাধার কবচও আছে। শ্রীরাধাকেই সকল শক্তির মূলাধাররূপে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের অনেক সম্প্রদায় আছে, এমন কি যাঁহারা কৃষ্ণ-উপাসক, তাঁহারাও সকলে শ্রীরাধার উপাসক নহেন। আসামে শঙ্করদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীরাধার

উপাসনা একেবারেই নাই। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে বলে গোপালের উপাসক আছেন, সখ্যভাবের উপাসকও অল্পসংখ্যক আছে, কিন্তু অধিকাংশই শ্রীরাধা-গোবিন্দের ও গোপীভাবের উপাসক। যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের এই শ্রীরাধাকথা তাঁহাদিগের অতি উত্তমরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রচলিত উপাসনা-পদ্ধতি হয়ত সকল স্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতানুযায়ী নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানিলে, সাধক ও জিজ্ঞাসুর উপকার হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড ও প্রকৃতিখণ্ড হইতে যে সব কথা বলা হইল, তাহা সমস্তই তত্ত্বকথা, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের কথা নহে। কিন্তু যে ভাষায় উহা বলা হইয়াছে, তাহা এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতেরই ভাষা। এইরূপ ভাষা কেন প্রযুক্ত হইল? এইরূপ ভাষা ছাড়া, অন্য কোন ভাষা নাই যাহার সাহায্যে ঐ তত্ত্ব মানবজগতে মানবের জ্ঞানের নিকট ব্যক্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং কেবল ভাষা বা বর্ণনার স্থূল চিত্রের দ্বারা বাহিত না হইয়া, ভাষা ও চিত্রের পশ্চাতে যে তত্ত্ব বা নিত্যসত্য রহিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ইহারই নাম "তত্ত্বতঃ" বুঝিয়া লওয়া। পুরাণ বা পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে, এই চাবিটি সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করিতে হইবে। এই চাবি যাঁহারা ব্যবহার করিতে না পারেন, অর্থাৎ অন্তর্মুখী হইয়া এই সমুদয় বর্ণনার ভিতরের নিত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাহাদের অভ্যাস বা সামর্থ্য নাই, তাহাদের পক্ষে পুরাণ পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। কিন্তু একটি কথা আছে। যাহারা স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবান্, এবং কল্পনাশক্তি যাহাদের মধ্যে বেশ সবল, তাহারা তত্ত্ব না বুঝিয়াও যদি এই সমুদয় বর্ণনা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে শ্রবণ করিয়া যায়, প্রথমেই কোনরূপ সংশয় বা বিরুদ্ধভাব হৃদয়ে যদি না জাগে, তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তিসমূহ ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত ও অনুশীলিত হইবে এবং অনেক প্রকারের সূক্ষ্ম ও তীব্র অনুভব-শক্তি যাহা আমাদের ভিতরে সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে, তাহা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহারা এমন সূক্ষ্ম বিষয় ও ব্যাপার জানিতে ও ধরিতে পারিবে, যাহা অন্যে জানিতে পারে না। এই পথই সাধনার সুগমপথ। পূর্ব্বকালে অনেকেই এই পথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছে। এখন আর সেদিন নাই। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে, মানুষ অতিরিক্ত পরিমাণে অধীর ও সংশয়ী হইয়াছে। সকল বিষয়েই তাড়াতাড়ি যাহা হউক একটা মতামত দিতেই হইবে। গভীরভাবে চিন্তা করার ও ধীরভাবে অপেক্ষা করার অভ্যাস মানব প্রকৃতিতে নাই, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক বিবরণ-সম্বন্ধে অনেকের মনে নানারূপ সংশয় জাগিয়া উঠিয়াছে।

১৫। প্রকৃতি ও পুরুষ

প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এবং সৃষ্টিপ্রক্রিয়া উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। নানা-দর্শনে, নানাপুরাণে, নানাতন্ত্রে এই কথা নানাভাবে কথিত হইয়াছে। এই সব কথা যে কল্পনামাত্র আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। মূল সত্যগুলি সকলের মধ্যেই একরূপ, কিন্তু মূলসত্যের আনুষঙ্গিক কথাগুলি দ্রষ্টার বা ঋষির অধিষ্ঠানভূমিভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে। এই গেল দার্শনিক তত্ত্বালোচনার কথা। কিন্তু এই কথার সহিত উপাসনা ও আরাধনার কথা রহিয়াছে, সম্প্রদায় রহিয়াছে, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কেহ পুরুষকে প্রধান বলিয়া কেহ বা প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া উপাসনা করিয়াছেন। দ্বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে নানারূপ বৈষম্য ও বিরোধ হইয়াছে। তাহার পর আবার দুই মতে সামঞ্জস্যও হইয়াছে। অধ্যাত্মসাধনার এই ইতিহাসও ক্রমবিকাশ যাঁহারা জানেন তাঁহাদের উচিত, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কিভাবে কথিত হইয়াছে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাহার আলোচনা করা। এই প্রকারের আলোচনা করিতে করিতে সত্য একদিন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। যাঁহারা আলোচনা করিবেন না, সকল দিক্ দেখিবেন না, যাহা হউক একটা কিছু ধরিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাঁহারা চিরদিন বঞ্চিত হইবেন।

সৃষ্টির প্রথম কথা বড়ই কঠিন কথা। ইহা কথার দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। কিন্তু সকলকেই এই তত্ত্বের একটা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। বেদে আছে—

স ঐক্ষত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।

তিনি মনে করিলেন, আমি বহু হইব।

এই যে ঈক্ষণ বা মনে হওয়া, ইহাতেই আমরা শক্তির বা প্রকৃতির প্রকাশ দেখিতেছি। তন্ত্রে স্থানে স্থানে এই শক্তিকে 'পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তি' বলা হইয়াছে, আবার বলা হইয়াছে—এই শক্তিই ব্রহ্ম। এই পরশক্তিময় ব্রহ্ম হইতে নাদ, নাদ হইতে

বিন্দু। সারদাতিলকতন্ত্রে আছে—"সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ আসীচ্ছক্তি-স্ততো নাদো, নাদাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ।" এই বচনে আমরা দেখিতেছি—পরমেশ্বরে সচ্চিদানন্দ বিভব ও প্রকৃতি (কলা) রহিয়াছে। তাহা হইতে শক্তি, তাহা হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু। মূল বিভব ও প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। শৃঙ্গার রসকে আদিরস ধরিয়া যদি এই তত্ত্বের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে শ্রীরাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্বে বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

যিনি আদিতত্ত্ব, তিনি আনন্দময়। এই আনন্দ, মায়িক আনন্দ নহে। এই আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। এই আনন্দই শ্রীরাধা বা এই আনন্দের বিলসিত বা প্রকটিত অবস্থার নামই শ্রীরাধা। আনন্দময় পরমপুরুষ, আপনিই আপনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, আপনিই আপনার মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। এইজন্য যেন তিনি নিজকেই নিজ-হইতেই পৃথক্ করিয়াছেন। ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ। সমগ্র সৃষ্টি সেই আত্মারামের রমণের আয়োজন মাত্র, অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য। চিন্তা করিলে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যে খুব কঠিন তাহা নহে—তবে চিন্তা করা আবশ্যক।

তবে সেই যুগলতত্ত্ব, আমাদের অন্তরে ও বাহিরে জয়যুক্ত হউক, বিশ্বব্যবস্থার সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিজয়গীতি ধ্বনিত হউক।

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, হে গোপীপ্রাণবল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি।
হেম গোরীশ্যাম গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধেকৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পুরাও মনোসাধে॥

পূর্ব্বে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হইল, তাহার সহিত বেদের আনন্দব্রহ্ম, রসব্রহ্ম ও মধুব্রহ্ম মিলাইয়া দেখিলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। আমাদের জীবনে নবীনতা

নাই, আমরা দুশ্চিন্তা ও অসচ্চিন্তার দ্বারা অবসন্ন, কাজেই নবীনা কিশোরী বা 'নওল কিশোর'-এর লীলা বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনে সকলই নবীন, চিরদিনই নবীন।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দি-পুলিন, কুঞ্জ নবশোভন, নব নব প্রেমবিভোর॥
নবীন রসাল-মুকুল-মধুমাতিয়া নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতারই নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতিমতি মাতি॥

হৃদয় যখন নবীন ও রসপূর্ণ, মানুষ যখন আপনাকে ছড়াইয়া ও বিলাইয়া দিবার জন্য আকুল, যে অবস্থায় বিশ্বের সকলই সুন্দর ও মধুময়, সেই অবস্থারই নাম "প্রসন্নোজ্জ্বল-চিত্ততা।" এই অবস্থায় সেই মধুব্রহ্মের উপলব্ধি ও আস্বাদন হয়। সেই মধুব্রহ্মই মথুরার বা মধুরার অধিপতি, তাঁহার সকলই মধুময়।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং।
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং।
বেণুর্মধুরঃ রেণুর্মধুরঃ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং।
গীতং মধুরং পীতং মধুরং।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং।
করণং মধুরং তরণং মধুরং।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং।
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং।
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
পাণির্মধুরো পাদৌমধুরৌ।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
হরণং মধুরং রমণং মধুরং।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
যমুনা মধুরা বীচি মধুরা।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥

গোপী মধুরা লীলা মধুরা।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং।
গোপা মধুরা গাবো মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং।
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥
যষ্টির্মধুরাঃ সৃষ্টির্মধুরাঃ।
মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং॥

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই মধুব্রহ্মের আস্বাদন করিয়াছেন,—

মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আস্বাদন এইরূপ—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
সব পিতে করে মতি,
মোর মন সান্নিপাতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥
মধুর হৈতে সুমধুর,
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর,
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
তাহা হৈতে সুমধুর,
মধুর হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
তাহা হৈতে সুমধুর,
মধুর হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
আপনার এককণে,
দশদিগে বহে যায় পুর॥

সাধনার তিনটি পথ বা মার্গত্রয়।

ধর্ম্মসাধনার তিনটি পথ নিতান্তই স্বাভাবিক। শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ, তিনি সত্য, শিব ও সুন্দর। তিনি অনন্ত, সুতরাং তাঁহার শক্তি বা বিভূতিও অনন্ত। এই অনন্ত বিভূতির মধ্যে এই তিনটিই প্রধান। আমাদের পক্ষে এই তিনটি ছাড়া আর কিছু জানিবার উপায় নাই। ভগবান্ যখন আমাদের আরাধ্য হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করেন, তখন তিনি যেন একটি ত্রিভুজ। সত্তা (Existence) চৈতন্য (Consciousness), আনন্দ (Bliss), এই তিনটি যেন ঐ ত্রিভুজের তিনটি বাহু। অন্যভাষায় বলিলে এই তিনটি বাহু যথাক্রমে সত্য (Truth), শিব (Good), সুন্দর (Beauty)। মানুষ তিন দিক্ হইতে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কেহ সত্য বা সত্তারূপে, কেহ শিব বা চিৎ-রূপে, কেহ সুন্দর বা আনন্দরূপে তাঁহার অভিমুখী। কেন এরূপ হয়? মানুষে মানুষে প্রকৃতি-গত প্রভেদ আছে। সকলের রুচি ও অধিকার একরূপ নহে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মের দ্বারা মানুষে মানুষে এই প্রভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাও বাহিরের কথা। ভগবানের ইচ্ছাই মানুষে মানুষে পৃথক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই সাধনার তিনটি পথ।

মানুষও অস্ফুট সচ্চিদানন্দ। মানুষের প্রকৃতিও তিনভাগে বিভক্ত। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, প্রত্যেক মানুষেরই আছে। কাহারও ইচ্ছাশক্তি প্রবল, কাহারও জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি প্রবল। ইংরাজী ভাষায় বলে Knowing, Willing, Feeling মানুষের এই তিনটি বৃত্তি, মানুষের চৈতন্য এই তিনটি পথে ক্রিয়া করিতেছে। যে মানুষের জ্ঞানশক্তি প্রধান, তিনি ভগবানের সৎভাবের বা সত্যভাবের অভিমুখে স্বভাবতঃ অগ্রসর হইয়া থাকেন। যাঁহার ক্রিয়াশক্তি প্রবল, তিনি স্বভাবতঃ শিবভাব বা চিদ্ভাবের উপাসক। আর যাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, সুন্দর বা আনন্দ তাঁহাকে লুব্ধ করিয়া থাকেন। সাধনার তিনটি পথের মূল কথা এই।

এই যে তিনটি পথ, ইহারা পৃথক্ হইয়াও পৃথক্ নহে। অনেকে মনে করেন ভক্তির পথ, জ্ঞান বা কর্ম্মের পথ হইতে একেবারে পৃথক। তাহা নহে। যাহাকে ভক্তি বলি তাহাতে জ্ঞান ও আছে কর্ম্ম ও আছে, কিন্তু ভক্তি (Emotion, feeling) সেখানে প্রবল ও প্রধান। সেইরূপ যাহাকে কর্ম্ম বলি, তাহাতে ভক্তি বা জ্ঞান যে নাই তাহা নহে তবে কর্ম্ম বা ক্রিয়াশক্তি সেখানে প্রবল। সেইরূপ যাহাকে জ্ঞান বলি তাহাতে কর্ম্ম বা ভক্তি যে নাই তাহা নহে, তবে জ্ঞান সেখানে প্রবল ও প্রধান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক পরম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী-সঙ্গম পরিদৃষ্ট হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই তিন প্রকারের সাধনপথের মধ্যে কোন্ পথের কে অধিকারী তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন।

যোগাস্ত্রয়োময়া প্রোক্তা নৃনাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্মচ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাং॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যান্যান্ন সমাচরেৎ॥
অস্মিল্লোঁকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃশুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন, মনুষ্যগণের পরম মঙ্গল যাহাতে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য মৎকর্ত্তৃক ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। ইহা ছাড়া কল্যাণসাধনের আর অন্য উপায় নাই। যোগ শব্দের অর্থ উপায়, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি টিকাকার সকলেই বলিয়াছেন। এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

"বিষয়াভেদেঽপ্যধিকারিভেদেনাবিরোধং বক্তুং"

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, এই তিনপ্রকার উপায় সত্য, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, বিষয় অভিন্ন, অধিকারীভেদে উপায় ভেদ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম শ্লোকের পরের শ্লোকগুলির অর্থ এইরূপ। যাঁহারা কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখময় ভাবিয়া কর্ম্মের ফলে বিরক্ত এবং কর্ম্মত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ; আর যাহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবিষয়ে দুঃখবুদ্ধিশূন্য, অতএব কামী ও অবিরক্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

কোনরূপ ভাগ্যবশে ভগবৎ-প্রসঙ্গে যাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, আর যিনি কর্ম্ম ও তাহার ফলসম্বন্ধে অতিশয় বিরক্তও নহেন, আবার অতিশয় আসক্তও নহেন, ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মাদি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মে, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসঙ্গে বিশেষ শ্রদ্ধা উৎপাদিত না হয়, ততদিন নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মযোগী জ্ঞানও ভক্তির ভূমিতে কি প্রকারে

আরোহণ করেন, তাহাই কথিত হইতেছে। যিনি স্বধর্ম্মে থাকিয়া কামনা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদি যাজন করেন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তাহা হইলে তাহাকে স্বর্গ বা নরকে যাইতে হয় না। নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রকারের শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ লাভ করেন, ভাগ্যবশতঃ ভগবদ্ভক্তিও লাভ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে স্বধর্ম্মস্থ হইয়া কর্ম্মযোগের পথ অবলম্বন করাই সাধারণ মানুষের অধিকার। এই পথে থাকিলে জ্ঞান ও ভক্তি-লাভের কোন বাধা নাই। জ্ঞানযোগের যে অধিকার বলা হইল, সে অধিকার কয়জন লোকের আছে, ইহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করা আবশ্যক। অনধিকারী ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি অভিমান-পূর্ব্বক বিবেচনা করে আমরা জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারী, তাহা হইলে সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হয়, যথেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। সমাজের এইরূপ অবস্থা বড়ই সর্ব্বনাশের অবস্থা।

ভক্তিসাধনায় কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেই ব্যবস্থা কোন্ সময়ের ব্যবস্থা ও কাহার জন্য সেই ব্যবস্থা, তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ ১১।৫।৩৭

যিনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শরণাগতপালক মুকুন্দের চরণে শরণ লইয়াছেন, তিনি দেবতা ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য বা পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী নহেন।

এই শ্লোকে বিধিনিষেধ ও কৃত্যাকৃত্যের পরিহার উপদিষ্ট হইল। বলা হইল নিত্য-নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম্ম করিতে হইবে না। পঞ্চযজ্ঞ, দেবপূজা করিতে হইবে না, যাহারা পোষ্য, যেমন পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি, ইহাদিগকে পালন করিতে হইবে না। কিন্তু এই উপদেশ কাহার জন্য? যিনি সর্ব্বভাবে মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের অবস্থা মনুষ্যলোকে কয়জন লোকের হয়? লক্ষজনের মধ্যে একজনের হইলেও ধরণী পবিত্রা হয়। যাঁহার এই অবস্থা হয় নাই, তিনি যদি এই শ্লোকের দোহাই দিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের আমি কিঙ্কর নহি, তাহাদের আমি ঋণী নহি, এই কথা বলিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে সে ব্যক্তিরও ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়, সমাজেরও অনিষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

কাম ত্যাগি কৃষ্ণভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিগের কভু নহে ঋণী ॥

ইহার পরের শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

ভগবানের পাদমূল-ভজনাকারী অন্যভাবরহিত প্রিয়ভক্ত, যদি কখন প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়প্রবিষ্ট হরি তদীয় সমুদয় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখিয়াছেন—

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥

এই যে অবস্থা অর্থাৎ কাম ত্যাগ করিয়া রাগমার্গে ভজনার অধিকার লাভ, ইহা অনেক উপরের কথা। দেহে যতক্ষণ আত্মবুদ্ধি আছে, মান অপমান, লাভ ক্ষতি, প্রভৃতির বোধ আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া সংসারে চলিতে হয়, বুঝিতে হইবে ততক্ষণ এ অবস্থা হয় নাই। এই কারণে আমাদের উচিত পিতৃকৃত্য, দেবকৃত্য প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ম্মল চিত্তে অনুষ্ঠান করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা। রামানুজাচার্য্য বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সদাচারপালন ব্যতিরেকে ভক্তিলাভ হয় না, ইহাই রামানুজাচার্য্যের অভিমত। এখনকার দিনে অনেকে মনে করেন, খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু রামানুজাচার্য্য আহারশুদ্ধির উপরে খুব বেশী রকম জোর দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—"আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ।" আহারশুদ্ধি হইলে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন প্রভৃতি শুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ভগবানে ভক্তি হইবে। এই ভক্তিই ধ্রুবানুস্মৃতি। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় সেই ভগবানের স্মরণ হয়, এবং সকল কার্য্য সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে, ও ভগবানের আদেশে সাধিত হয়, সেই যে অবস্থা, তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের জন্য রাগমার্গ ভক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন সামাজিক মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করে। শাস্ত্রানুগত বৈধ অনুষ্ঠান-সমূহ যাহাতে রক্ষা পায় এবং সেই অনুষ্ঠান-সমূহ প্রাণহীন আড়ম্বর-মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া যাহাতে সত্যোপেত ও প্রাণময় হয়, সে বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রায় রমানন্দের সহিত গোদাবরী তীরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বপ্রথম বর্ণাশ্রমাচারের

কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তিপথের আচার্য্যগণ এ বিষয়ে একমত, সুতরাং রাগমার্গের দোহাই দিয়া কর্ম্মযোগ পরিত্যাগ করা কল্যাণের পথ নহে, অকল্যাণের পথ।

ভক্তি-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল জ্ঞান-সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই। জ্ঞানের পথের প্রারম্ভেই সাধন-চতুষ্টয়। বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। ষট্‌সম্পত্তি বলিতে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয়টি গুণকে বুঝায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে বলিয়াছেন, প্রথমে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে, কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্ত সাধক পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া সদ্‌গুরুর শরণাগত হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহাই জ্ঞানপথের সাধন। সুতরাং এখানেও কর্ম্মযোগ আবশ্যক। অনধিকারী ভক্তির দোহাই দিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া যেমন নিজের ও সমাজের অনিষ্ট করে, ঠিক্ সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তি জ্ঞানের দোহাই দিয়া অপরিপক্ক অবস্থায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহাতে তাহারও অনিষ্ট, সমাজেরও অনিষ্ট।

আচার্য্যগণের শিক্ষা ও শাস্ত্রের উপদেশ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, সনাতন ধর্ম্মে যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পথ ও ভিন্ন ভিন্ন মত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সত্য সত্য কোন বিরোধ বা বিবাদ নাই। যাহারা শাস্ত্র বোঝে না, বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চাহে না, তাহারা কথা লইয়া মারামারি করে। রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, জ্ঞানপূর্ব্বক কৃত বা অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই প্রকৃত ভক্তি। জ্ঞানহীন কর্ম্ম অন্ধ আর কর্ম্মানুষ্ঠানহীন জ্ঞান পঙ্গু, এই পঙ্গু ও অন্ধের মিলন আবশ্যক। অন্ধের স্কন্ধের উপর চক্ষুষ্মান্ পঙ্গুকে বসাইতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা সত্য লাভ করিব। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, ভক্তি এক প্রকার জ্ঞান। জ্ঞান দুই প্রকার, কটাক্ষ বীক্ষণ ও নির্নিমেষ বীক্ষণ। নির্নিমেষবীক্ষণই ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে ঐক্য কোথায়, তাহা ভগবদ্গীতার আলোচনা করিলেই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভক্তের লক্ষণ, গুণ ও চরিত্র বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণঃ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥

সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, শ্রীভগবানে স্থিরলক্ষ্য, ও মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী, আমার ভক্ত ও আমার প্রীতিভাজন।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চমে প্রিয়ঃ॥

যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ বলিতে গিয়া শ্রীভগবান্ এই সমুদয় সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।

এইগুলিকে জ্ঞান বলা হয়, যাহা হইার বিপরীত তাহাই অজ্ঞান।

অতএব জ্ঞান বলিতে শ্রীভগবান্ যে লক্ষণ ও গুণ বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলির সহিত ভক্তের গুণ ও লক্ষণ তুলনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। সেই গুণগুলি এই—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষুবৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসাদি॥

যিনি নিজের গুণের শ্লাঘা করেন না, যাঁহার দম্ভ নাই, যিনি পরপীড়া বর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি সহিষ্ণু, যিনি সরল, যিনি গুরুসেবাপরায়ণ, যাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শৌচ আছে, যিনি স্থিরচিত্ত, যাঁহার মন সংযত, বিষয়-সমূহে যিনি বৈরাগ্যযুক্ত, যাঁহার অহঙ্কার নাই, পুত্র স্ত্রী ও গৃহাদিতে যাঁহার আসক্তি নাই, পুত্র প্রভৃতির সুখদুঃখে যিনি নিজেকে সুখী বা দুঃখী বলিয়া বিবেচনা করেন না, ইষ্ট ও অনিষ্টে যিনি সমচিত্ত, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যিনি ভগবানে একান্ত ভক্তি করিয়া থাকেন, যিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন, বহুজনের সভায় যাঁহার বিরক্তি, তিনিই জ্ঞানী।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত এই গুণ ও লক্ষণগুলির তত্ত্ব বুঝিয়া আমরা যদি সেই গুণগুলির অনুশীলন করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব জ্ঞান ও ভক্তির মিলনভূমি কোথায়।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিনটি পথ। কেহ কেহ বলেন যোগ একটি স্বতন্ত্র পথ, কিন্তু তাহা

মনে করিবার কোনই কারণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী-প্রমুখ সর্ব্বজনসম্মানিত আচার্য্যগণ যোগের অর্থ বলিয়াছেন "উপায়"। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রত্যেক অধ্যায়কে 'যোগ' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের নাম যোগদর্শন। ইহার অপর নাম সেশ্বর সাংখ্য। পাতঞ্জল দর্শন ছাড়া আরও অনেক প্রকার যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও 'কুণ্ডলীযোগ' প্রভৃতি অনেক যোগের পন্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগকে ক্রিয়া বা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে যে পূর্ণাঙ্গযোগ আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতার পূর্ণাঙ্গযোগের আদর্শও সেইরূপ, তাহাতেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয়।

যোগের দ্বারা নানারূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়, এই জন্যই যোগের এত আদর। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের অনেক লোক,—স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তিকামনায় নানারূপ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং তাহার ফলে কিছু কিছু শক্তিও লাভ করিয়াছেন। যোগসাধনার প্রধান কথা, যাহা পাতঞ্জলদর্শনে কথিত হইয়াছে, তাহা সার্ব্বজনীন, অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, সকলেরই প্রয়োজন। তবে এই প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন উপায় সাধিত হইতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই নিষ্ফল পরব্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা পাওয়া যায়। সুতরাং সত্যলাভ করিতে হইলে প্রথম কার্য্য বহির্ম্মুখী চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী করা, চঞ্চল মনকে স্থির ও শান্ত করা। চিত্তের শক্তি অসীম বলিলেও হয়, সেই শক্তি আমাদের প্রত্যেকেরই অধিকারে রহিয়াছে। আমরা তাহার তত্ত্ব জানিনা, আমরা তাহার ব্যবহার জানিনা, এই জন্যই আমরা দুর্ব্বল ও বিপন্ন। চিত্তের শক্তি বাহিরের বিষয়ে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই শক্তি যদি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে এখন যাহা অসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাও করিতে পারা যায় এবং অতি অনায়াসেই করিতে পারা যায়।

আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি দুয়ারের ন্যায়। তাহাদের ভিতর দিয়া বাহিরের বিষয়-জগতের ছবি মনের উপর পড়িতেছে, আর মন চঞ্চলভাবে সেই বিষয়সমূহের অভিমুখে ছুটিতেছে। আহার, বেশভূষা, অর্থ, পদোন্নতি, মানসম্ভ্রম, পুত্রকন্যা আরও কত কি। চিন্তা ও উদ্বেগের শেষ নাই। চিত্তের এই চঞ্চলতা-নিবন্ধন, আমি আমার প্রকৃতশক্তির পরিচয় পাই না, আর সেই পরমার্থ সত্য যিনি, তাঁহারও পরিচয় পাই না। এই জন্যই এই দুর্দ্দশা। মনকে স্থির করিতে হইবে। পাতঞ্জলদর্শন বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধের নাম যোগ। (Inhibition of the functions of the mind) চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারিবে, তাহার শক্তি কত তাহা বুঝিতে পারিবে। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যিনি দ্রষ্টা তিনি স্বরূপে অবস্থিত হইবেন,—তিনি সত্য করিয়া যাহা, তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে

এখন স্বরূপ-ভ্রষ্ট, আমি আমাকে—আমার আসল, ও খাঁটি আমিটাকে ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আমার এত ক্লেশ, এত বিপদ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে আত্মলাভ হইবে, আত্মদর্শন হইবে।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ, চিত্তের এই পাঁচটি অবস্থা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহাই রাজযোগ অর্থাৎ যত প্রকার যোগ বা ধর্ম্মসাধনার উপায় আছে, এই উপায় তাহাদিগের মধ্যে রাজা বা শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রত্যেক অঙ্গ যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ইহার ভিতর কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি রহিয়াছে। রাজযোগকে অনেকে কর্ম্মযোগও বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনের শক্তি অসীম। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে মানুষ করিতে পারে না, এমন কাজ নাই। যোগশাস্ত্রের গ্রন্থে নানাপ্রকার সিদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যোগসিদ্ধির কথায় বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজকাল ক্রমে ক্রমে অনেকেই ইহাতে বিশ্বাস করিতেছেন, আবার অনেকে অল্প স্বল্প পরীক্ষা করিয়াও দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাতঞ্জলদর্শনে এবং আরও অনেক গ্রন্থে যোগৈশ্বর্য্য ও যোগসিদ্ধি-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সমুদয় সিদ্ধির কথা কথিত হইয়াছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র

বিজ্ঞাপন

"বীরভূমি" মাসিক পত্রিকা, পূর্ব্বে চারি বৎসর ছয় মাস কাল পরিচালনা করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহির হওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়া লওয়া হইত। শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিয়াছিলাম, অন্যান্য কার্য্যের ভার যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট মূল্য লওয়া হয় নাই। আমি এখন অন্যান্য কর্ম্ম হইতে বহুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে পুনর্ব্বার 'বীরভূমি' প্রচার আরম্ভ করিলাম। বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যা, ষষ্ঠ ভাগ নবম সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে। বার্ষিক মূল্য—ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র।

প্রত্যেক সংখ্যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, (Complete in itself) এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। কলিকাতা—কলেজ স্কোয়ারে ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যালয়ে এবং ঢাকা—পাটুয়াটুলি রিপন-লাইব্রেরীতে ... বিক্রয় হয়।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে "সুখ পাঠ্য" "প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৸০ ও কাপড় বাঁধা ৸৵০। ভি পি ১৲ ও ১৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— কৃষ্ণনগর—শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুকক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান

(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Seen Library

১৩৩১

Birbhum 19. 9. 25
BENGAL LIBRARY 19 SEP 1925 ... CALCUTTA.

বৃন্দাবনে শ্রীরাধা

২ কলিকাতায় আত্মবিদ্যা (Spiritualism)
৩ যোগসিদ্ধি
৪ বঙ্কিমচন্দ্র
৫ নিত্যধামে—আশুতোষ
৬ মফঃস্বলের কাগজ

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

বৃন্দাবনে শ্রীরাধা

১। কল্পান্তর

একই উপাখ্যান একাধিক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে এবং নানারূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের সুধীগণ যে সব উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। সে আলোচনায় এখন প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতে চাই পৌরাণিকগণ কি বলেন? পৌরাণিকগণ বলেন, কল্পভেদ ইহার কারণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এমন কথা আছে, যাহা অন্য পুরাণে নাই এবং যাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের সামঞ্জস্য করা খুবই কঠিন; অনেক স্থলে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কল্পান্তরের, একথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই আছে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিলেন—

যত্রকল্পে তথা চেয়ং তত্র ত্বমুপবর্হণঃ।
পঞ্চাশৎ কামিনীনাঞ্চ পতির্গন্ধর্ব্বপুঙ্গবঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের জন্মকথা ও বাল্যলীলা বলিতে বলিতে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিলেন, হে নারদ, তুমি যে কল্পে উপবর্হণ নামে পরিচিত গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলে, এবং তোমার পঞ্চাশটি পত্নী ছিল, এই সব কথা সেই কল্পের। তুমি তখন সেই রমণীগণকে লইয়া আমোদপ্রমোদ করিয়া বেড়াইতে। তাহার পর তুমি ব্রহ্মার অভিশাপে দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এই দ্বিতীয় জন্মে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজন ও সাধুসঙ্গের

প্রভাবে শ্রীভগবানে তোমার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মে। এখন, এই বর্ত্তমান কল্পে, তুমি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছ ও দেবর্ষিত্ব লাভ করিয়াছ। এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান কল্পের পূর্ব্ব কল্পেরও পূর্ব্ব কল্পে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইয়াছিল ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বের কথাগুলি খুব দরকারী কথা। এত দরকারী যে এই কথাগুলিকে চাবির মত ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বৈশিষ্ট্য, আর শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীবৃন্দাবনলীলার বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনার যে প্রভেদ তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে না।

আজ যিনি দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মার মানসপুত্র ও ভক্তচূড়ামণি; আজ যিনি শুদ্ধা-ভক্তির প্রবর্ত্তক, একদিন তিনি গন্ধর্ব্ব ছিলেন ও পঞ্চাশটি রমণী লইয়া কামক্রীড়া করিতেন। এই কথাটি মনে রাখিয়া সেই উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের মানসিক অবস্থা বেশ দৃঢ়রূপে চিন্তা করুন।

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পাঠ করুন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কামভোগের চিত্র ও কামজ স্খলনের বর্ণনা খুবই বেশী। প্রচলিত ভাষায় আমরা যাহাকে "কাঁচারস" বলি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার বাড়াবাড়ি অনেক সময়েই আমাদের নিকট অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কি করা যাইবে? বিশ্বপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে বিকশিত বা উন্নত হইতেছে। নিজ নিজ মর্য্যাদাপালনের দ্বারা ভূতসমূহের যে ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, পুরাণ তাহাকে "স্থান" বলে। এই স্থানতত্ত্ব সত্য। বৎসরে বৎসরে যেমন পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ হয়, যুগে যুগেও তেমনি হয়। আবার মন্বন্তরে মন্বন্তরে এবং কল্পে কল্পেও তাহা হইয়া থাকে। একদিনের মধ্যেই চারিযুগ, আবার একজন মানুষের জীবনেও চারি যুগ। ব্রহ্মার জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে। এই যে সাদৃশ্য, (Analogy) পুরাণ বুঝিতে হইলে ইহার তত্ত্ব জানা চাই। উপরেও যাহা নীচেও তাহাই। As above so below, স্থূলেও যাহা সূক্ষ্মেও তাহাই, ভাণ্ডেও যাহা ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই। ইহার নাম সাদৃশ্যবিধি—The Law of Analogy and Correspondence পৌরাণিকের চিন্তাপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্তর্মুখী হইয়া এই বিধি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। কামের ধ্বংস নাই, বিশ্বসৃষ্টির মূলই কাম। কামই

পরিচালক। এই কাম ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উৎকর্ষ লাভ করে। এই কাম মার্জ্জিত (Transmuted) হইয়া নব নব মূর্ত্তি ধারণ করে। এই কাম আমার ভিতর এখন যে স্তরে বা অবস্থায় রহিয়াছে, আমার অনুভূতি ও কল্পনা ঠিক্ সেইরূপ হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা নিত্য, প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া থাকে। প্রপঞ্চের অবস্থাভেদে এই প্রাকট্যের বা প্রাকট্যের অনুভূতি ও আস্বাদনের ভেদ হইয়া থাকে। অন্তর্মুখী হইয়া উপবর্হণ গন্ধর্ব্বকে চিন্তা করুন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনা বুঝিবেন। অন্তর্মুখী হইয়া তাঁহারই আর এক অবস্থা অর্থাৎ দেবর্ষির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করুন, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা বুঝিবেন। দুই প্রকারের বর্ণনায় প্রভেদ কেন তাহা বুঝিবেন এবং ক্রমশঃ বুঝিবেন, এই প্রভেদ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন না করিলে ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না।

কল্প কি? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতেই আমরা তাহার উত্তর পাইব। প্রকৃতি খণ্ডের ৫৪ অধ্যায়ে এই সমুদয় কথা আছে। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ চৌদ্দ মন্বন্তর বা এক হাজার চতুর্যুগের নাম ক্ষুদ্র কল্প, আর ব্রহ্মার রাত্রির নাম ক্ষুদ্র-প্রলয়। Daily Exhibition and Inhibition in the Life of Brahma. ইহা যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে আমাকে একটু তপস্যা করিতে হইবে। আমার দিন যায়, রাত্রি আসে। আবার দিন আসে, রাত্রি আসে। দিন যখন যায়, দিনমণি অস্তমিত হন, তখন কি আপনি সেই দিনকে ও দিনমণিকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হে দিবাভিমানী দেবতা, আমায় কোথায় রাখিয়া গেলে? প্রভাতে উঠিয়া রাত্রির অভিমানী দেবতাকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহাদের উত্তর পাওয়া যায়। ভারতের দ্বিজগণ উত্তর পাইতেন। সেই উত্তর পাইলে আমি আমার দৈনন্দিন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। নিজের দিবারাত্রি বুঝিলে তখন আর ব্রহ্মার দিবারাত্রি বুঝিতে বাকি থাকিবে না। ইহাই পৌরাণিকের সাধনা।

ব্রহ্মণো বাসরে রাজন্ ক্ষুদ্রঃ কল্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মনিশায়াঞ্চ ক্ষুদ্রঃ প্রলয়ঃ উচ্যতে॥

ব্রহ্মার এই রাত্রির নাম কালরাত্রি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এই নাম পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় ঋষি সপ্ত কল্পজীবি। এই কল্প, ক্ষুদ্র কল্প বা ব্রহ্মার একদিন। মার্কণ্ডেয় ঋষির এক এক বৎসর আমাদের এক এক মন্বন্তর। অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য ধারণা করার পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-

চৈতন্যের ধারণা করুন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপাসনার প্রারম্ভেই মার্কণ্ডেয়-চৈতন্যের চিন্তা করার ব্যবস্থা শ্রীরূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে দিয়াছেন। আর আমাদের প্রত্যেক শুভকর্ম্মের প্রারম্ভে ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের পূজার বিধান।

বেদে যাহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে তাহা ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসরে হইয়া থাকে।

এবং পঞ্চাশদাব্দে তু গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ।
দৈনন্দিনস্তু প্রলয়ো বেদেষু পরিকীর্ত্তিতঃ॥

এই দৈনন্দিন প্রলয়কে মোহরাত্রি বলে।

একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রাহ্মী শত বর্ষের অবসানে ব্রহ্মার নিপাত হয়। ইহার নাম মহাকল্প। ব্রহ্মার নিপাতের পর যে প্রলয়ের অবস্থা তাহার নাম মহারাত্রি। এই মহাকল্প ও মহারাত্রি একত্র করিলে যে পরিমাণ সময় হয়, তাহা প্রকৃতির এক নিমেষ। এই নিমেষ ধরিয়া শতবর্ষ গণনা করিলে যে সময় হয়, তাহার অবসানে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে।

অনন্তের চিন্তা করিতে হইলে প্রথমেই অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। সুতরাং এই প্রকারে সময়ের হিসাব করা নিতান্তই স্বাভাবিক। ভারতের পৌরাণিকগণ এই প্রকারেই অনন্তকে অনন্তকালের সাহায্যে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনন্তকালের বুকে কোন ঘটনাই নূতন হইতে পারে না। এখন যাহা ঘটিতেছে, তাহা যে আর কখন ঘটে নাই, এই প্রথম ঘটিল, ইহা হইতেই পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। অনন্তকালের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দেশ বা অসংখ্য ও অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাও স্বাভাবিক। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে।

এই তিন প্রকারের অসংখ্য ও অগণ্য। কাল, দেশ ও ঘটনা। ঘটনার নামই নিমিত্ত বা পাত্র। তিনই অসংখ্য। মানবের পক্ষে কোন অবস্থায় এই প্রকারের ভাবনা আসিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন পুরাণ পড়িবার সময় স্বভাবতঃই মনে হয়। এই প্রকারের ভাবনা সঙ্গত ও প্রয়োজন কিনা, এই প্রশ্ন তুলিয়া অনন্ত-প্রসারী মানব-মনের অবাধ গতি সঙ্কুচিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই প্রকারের ভাবনা পৃথিবীতে অনেকেরই মনে জাগিয়াছিল। যাঁহাদের মনে খুব ভাল করিয়া জাগিয়াছিল এবং যাঁহারা নির্ভয়ে এই ভাবনার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের পৌরাণিক ঋষি। বেদে আছে

"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, নূতন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অনন্তের বুকে নূতন কিছুই নাই। প্রত্যেকেরই অসংখ্য ও অগণ্য স্থান যাঁহাতে আছে, তিনিই অনন্ত। কাজেই পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই অনুস্মৃতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন। Eternal Recurrence.

এই অনন্তের চিন্তায় ও আলোচনায় কল্পনা ব্যতীত মানুষের অন্য কোন বৃত্তি আপাততঃ কার্য্যকরী নহে। একালের কোন পণ্ডিতলোক যিনি প্রত্যক্ষের এই প্রয়োজন বা ব্যবহারকেই একান্তভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তিনি বলিবেন,—"এ যে নিছক কল্পনা"। বেশ কথা। ইহা কল্পনা। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি বলিবেন,—"ইহা যখন কল্পনা, তখন মিথ্যা। মিথ্যার জাল বুনিয়া কি হইবে?" এইখানেই মতভেদ, দুর্জ্জয় মতভেদ। আমরা যেন সত্য পাইয়াছি, সত্যকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছি! এই ধারণাই আমাদের সর্ব্ববিধ সর্ব্বনাশের মূল। সত্যকে আমরা এখনও পাই নাই। যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া আমরা অহঙ্কার করিতেছি, তাহা ব্যবহারিক সত্য, পারমার্থিক সত্য নহে। সুতরাং "কল্পনা" মিথ্যা নহে। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক প্রকারের কল্পনা মিথ্যা হইতে পারে। সীমা বাড়াইলেই আগেকার সত্য মিথ্যা হয়, আর আগেকার মিথ্যা সত্য হয়। ইহা বুঝা কঠিন নহে। অনন্তের বুকে সর্ব্ববিধ কল্পনারই স্থান আছে, ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা কল্পনা, তাহাকে হঠাৎ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সত্য করিয়া অনন্তের উপাসনা করিতে পারিবেন না। সীমার মধ্যে বাঁধা পড়িয়া যাইবেন।

মানবাত্মার অসীমদর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিম্ব অগণ্য বৈচিত্র্যময়। মানুষ স্বরূপে নিত্য ও অনন্ত, কিন্তু সে এখন নিজেকেই ভুলিয়া রহিয়াছে। চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, দেহ, প্রভৃতি লইয়া মানুষ একটা গোলযোগের ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু এই গোলযোগ বা অবিদ্যার দুঃস্বপ্নের মধ্যেও সেই অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। কিন্তু দর্পণ বন্ধুর হইলে প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত হয়, সাধারণ মানবের চিত্ত-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্বও সেইরূপ বিকৃত ও বিসদৃশ। অনন্তের প্রতিবিম্বপাতের দ্বারাই মানবের কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা সিদ্ধ কল্পনা নহে, কারণ তাঁহার চিত্তদর্পণে অনন্তের যে প্রতিবিম্বপাত হয় তাহা নিখুঁত প্রতিবিম্ব নহে। এই

কল্পনাশক্তি আমি যদি হারাইয়া বসি বা চেষ্টা করিয়া সঙ্কুচিত করি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব ও আত্মঘাতী হইব। এই কল্পনার অনুশীলনের জন্য সাধনা আবশ্যক। এই সাধনাই সর্ব্বোত্তম।

মানুষের বৈজ্ঞানিকী শক্তি বা বৃত্তি আছে। এই শক্তির অনুশীলন চলিতেছে। গণিত হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ব্যবহারিক বিদ্যা (Exact science) এই শক্তির অনুশীলনে সাহায্য করিতেছে। খুব ভাল কথা। এই শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হউক। কিন্তু এই শক্তি বা বৃত্তি ছাড়া মানুষের কি আর কোন শক্তি বা বৃত্তি নাই? কে বলিল? আরও অনেক শক্তি বা বৃত্তি আছে।

মানুষ কবি হয়, মানুষ দার্শনিক হয়, মানুষ সাধু বা মহাপুরুষ হয়। একজন কবি, একজন দার্শনিক বা একজন মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যুগ যুগ ধরিয়া কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। তাঁহারা যে মানবজাতিকে উন্নীত করেন, মানবের কোন্ শক্তির অনুশীলনের দ্বারা? এখানে মূলতঃ কল্পনাশক্তিরই জাগরণ ও হৃদয়বৃত্তির প্রসারণই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কল্পনাশক্তিকে অবজ্ঞা করিবেন না। কল্পনা-শক্তির কার্য্যকে মিথ্যা বলিবার দুঃসাহস বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে ভারতের ও প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ঋষিগণের চিন্তা-প্রণালী ও সাধনপ্রণালীর মর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমে অনন্তের চিন্তা করুন। দেশ ও কালের মধ্যে এই অনন্তের লীলা দর্শন করুন। যাবতীয় ঘটনাই অগণ্য ও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, ইহা আপনা হইতেই হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিবে। প্রত্যেক ঘটনারই চারিদিকে যেন লেখা রহিয়াছে—'আমি নূতন নহি, অসংখ্যবার আমি ঘটিয়াছি, এবং অগণ্যবার আমি ঘটিব।'

কিন্তু, আমার যে একটি প্রয়োজনীয় কাজ রহিয়াছে। ঘটনাটিকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহা না পারিব, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই। যদিও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ঘটনাটি একই ঘটনা। কাজেই ঘটনাটির যাহা প্রাণ, আত্মা বা তত্ত্ব, তাহা এক, কিন্তু প্রকাশগত পার্থক্য থাকিতে পারে। এই বহু বা বিচিত্রের মধ্যে একই রহিয়াছেন। তত্ত্ব কত প্রকারে কল্পিত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিলে আমরা কল্পভেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। যদি কেহ বলেন—'ইহা কল্পনা, কেবল কল্পনা mere imagination তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু, তাই বলিয়া যদি কেহ বলেন, 'ইহা মিথ্যা' তাহা হইলে যথেষ্ট আপত্তি আছে। সত্য কি, মিথ্যা কি, এই লইয়া আলোচনা চলিবে এবং পূর্ব্বে যে কথাগুলি বলা হইল, তাহাই আবার নূতন করিয়া বলা হইবে,—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির কল্পান্তর হইবে। কল্পনাভেদ কি, তাহা আর বুঝাইতে পারা যাইবে না, পূর্ব্বে যে চিন্তা ও অনুভব প্রণালী বলা হইল, তাহার অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে।

২। শ্রীরাধার আবির্ভাবের পূর্ব্বকথা

শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার আবির্ভাবের মূলে এক কলহ ও অভিশাপ। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ। এক পুরুষ বহু প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করেন। আজ বিরজার সহিত ক্রীড়া হইতেছে—এমন সময়ে তথায় শ্রীরাধিকা উপস্থিত! বিরজা ভয়ে নদী হইলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সুদাম গোপ শ্রীরাধার পুত্র আবার শ্রীকৃষ্ণের সখা। তিনি শ্রীরাধার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্রীরাধা সুদামকে শাপ দিলেন—"তুমি অসুর হও"। সুদামও শ্রীরাধাকে শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে গোপকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ কর। ভগবান্ ভূভার হরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন ও তোমার সহিত মিলিত হইবেন।" শ্রীরাধার অভিশাপে সুদাম শঙ্খচূড় হইয়াছিল। শ্রীরাধার আবির্ভাবের ইহাই আদি কথা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া অনেক ভক্তই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের কারণ, এই ক্রোধ ও অভিশাপ। ক্রোধ ও অভিশাপ পুরাণের সর্ব্বত্রই। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সহিত যেখানেই সম্বন্ধ স্থাপনা করিতে হইবে, সেইখানেই ক্রোধ ও অভিশাপ। ইহাই পুরাণের সনাতন ব্যবস্থা। বৈকুণ্ঠের সহিত বা গোলোকের সহিত মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে, বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বস্তুকে মর্ত্ত্যে আনিতে হইবে, সেতু প্রয়োজন। ক্রোধ ও অভিশাপ সেই সেতু। সনকাদি ঋষির ক্রোধ ও অভিশাপের ফলে জয় বিজয়ের অসুরযোনিতে জন্ম, আর ভগবানের যোদ্ধৃবেশে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব অতএব এই ক্রোধ ও অভিশাপের কথা একটু ভাবা দরকার। নাটকেও তাই। শকুন্তলায় দুর্ব্বাসার ক্রোধ ও অভিশাপ।

৩। ক্রোধ ও অভিশাপ

পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব জানা আবশ্যক। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথাগুলি পৌরাণিক মানিয়া লইয়া সেই তত্ত্বের সাহায্যে লীলাদর্শন করিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্বেও কল্পভেদ আছে, তবে মূলকথায় মতভেদ নাই। যিনি মূল তিনি পরব্রহ্ম, তিনি অজ্ঞেয়, ভাষার সাহায্যে তাঁহার স্বরূপের প্রতিবিম্বেরও প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইবার নহে। তিনি এক। এই ঐক্যের ভিতরে সর্ব্ববিধ অনৈক্য বা বৈচিত্র্যের স্থান আছে। This unity co-ordinates all diversity তিনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহার অতীত, এই সমষ্টির বহির্ভূত। এই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম নিজেকে সীমার ভিতর আনিয়াছেন। এই সীমার ভিতর প্রবেশ বা আগমনই বিরজার সহিত বিহার। আমাদের চৈতন্যের সমুদয় অবস্থাগুলি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে এই দুরূহ তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। স্বরূপে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছি, সকলই দেখিতেছি অথচ বিশেষ করিয়া কিছুই দেখিতেছি না, সকলই আছে অথচ যেন কিছুই নাই, আমি যেন থাকিয়াও নাই, এই এক অবস্থা তাহার পর একটা কিছুতে দৃষ্টি (ঈক্ষণ) বা মনোযোগ অবরুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সেই বিষয়ে সঙ্গ বা প্রীতি, তাহার পর কামের উদয় হইল, কাম প্রতিহত হইল ক্রোধ হইল। আমাদের এই প্রকারে ক্রোধের উদয় হয়, ভগবদ্গীতায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

একজন কবি তাঁহার নিজের ভাবে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ। তাহার পর ক্রমশঃ হঠাৎ এক অমরকাব্যের আভাস বা চিত্র তাঁহার মনে জাগিল। ভিতরে ভাব ও ভাবোন্মাদ থাকিল, কিন্তু তিনি সীমার ভিতর আসিলেন, একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ অবরুদ্ধ হইল। বিশ্বস্রষ্টাও যে কবি। বেদে তাঁহাকেও কবি বলা হইয়াছে, আবার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও শ্রীমদ্ভাগবতে আদিকবি বলা হইয়াছে। সত্যই তিনি কবি, প্রকট বিশ্বপ্রপঞ্চ, এই কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেণী তাঁহার মহাকাব্য, এক এক সৌরমণ্ডল এক একটি সর্গ, এক একটি গ্রহ যেন সেই মহাকাব্যের এক একটি চরণ, আমরা যেন সেই মহাকাব্যের একটি একটি শব্দ।

অসীম স্বরূপে সীমার রেখাপাতই বিরজার সহিত বিহার। শ্রীরাধার সহিত কলহ

ও স্বরূপে সীমার রেখাপাত বা একটি স্বাতন্ত্র্য-বোধের কল্পনা। এই কলহ অবশ্য প্রেম-কলহ। মিলনকে মধুরতর করার জন্যই এই কলহ। আদর্শ ও বাস্তব, ভাব ও ভব Norm and form, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের যে প্রয়াস ও পদ্ধতি, তাহাই অভিশাপ। আপাততঃ সংক্ষেপেই এই বড় কথাটি বলা হইল। ইহাও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিজের চৈতন্যের ক্রিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে।

৪। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাহার হেতু

বরাহকল্পে বসুন্ধরা দৈত্যভারে পীড়িতা হইয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সকল কথা শুনিয়া কৈলাস-শিখরে মহাদেবের নিকট গেলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী সকল কথা শুনিলেন। তাহার পর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ও মহেশ্বর ধর্ম্মের সহিত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্তব-স্তুতি শুনিয়া বলিলেন—"আমি ভূভারহরণের জন্য আবির্ভূত হইব। তোমরা সকলে অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর।" তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"যাও, তোমরা সকলে অবতীর্ণ হও।" শ্রীরাধিকাকেও অবতীর্ণ হইতে বলিলেন।

শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু রাজা, মাতার নাম কলাবতী। কলাবতী লক্ষ্মীরূপা ও পিতৃগণের মানস-কন্যা, দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে মনুষ্য জন্ম লাভ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এই স্থানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে বিষ্ণু, নারায়ণ, নরনারায়ণ ঋষি প্রভৃতি, রাধিকেশ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে এই সময়ে লীন হইলেন। ব্রহ্মা প্রভৃতি ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীপাদগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে তত্ত্ব প্রচারিত করাইলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা তাহার প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥

সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুরসংহারে॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কথাই এখানে আরও বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইবার যে অন্তরঙ্গ হেতু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই। সেই অন্তরঙ্গ হেতু এই। অসুরবিনাশ করিয়া ভূভার হরণ করা স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নহে। উহা স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুর কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যে অসুর বিনাশ করিয়াছেন, উহা ঠিক্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য নহে। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের দেহে ছিলেন, তিনিই অসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে স্বয়ং ভগবানের কার্য্য কি? শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীত॥

এই কারণ শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গ ভক্তি প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উদ্দেশ্য —

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে লীলায় অবতীর্ণ হওয়ার এই উদ্দেশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বিধিমার্গেরই উপদেশে পরিপূর্ণ এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সহিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মতের এই প্রভেদও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে তাহা রহস্যাবৃত। শ্লোকগুলির স্পষ্টার্থ গ্রহণ করিলে যাহা পাইব, গোস্বামীপাদগণের টিকা পড়িলে অন্যরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বর্ণনার প্রভেদও অনেক।

প্রথম প্রভেদ এই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে ব্রহ্মা শিব ও ধর্ম্ম, এই তিনজনে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৃথিবীর দুঃখের কথা জানাইতে গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে ব্রহ্মা দেবগণকে এবং মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরপয়োনিধির তীরে গমন করিয়া পুরুষসূক্তের দ্বারা সর্ব্বকাম-বর্ষুক বা সর্ব্বক্লেশ-নিবারক পুরুষের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে ব্রহ্মা প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কথোপকথন হইল, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আছে দৈববাণী হইল, ব্রহ্মা তাহা শুনিতে পাইলেন ও অন্যান্য দেবতাগণকে তাহা বলিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টিকাকার গোস্বামীপাদগণ বলেন ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদসাগরের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে যে ভগবৎ-পুরী আছে, ব্রহ্মা প্রভৃতি সেখানেও যাইতে পারেন নাই। কারণ ঐ ভগবৎপুরী সাতিশয় দুর্ল্লভ। ব্রহ্মা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈববাণীতে জানিলেন স্বয়ং ভগবান্‌ই আসিবেন।

দ্বিতীয় প্রভেদ এই, ব্রহ্মা যখন দৈববাণীতে জানিতে পারিলেন পরমপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, তখন তিনি দেবগণকে বলিলেন সেই পরমপুরুষের প্রিয়কার্য্য-সাধনের জন্য দেবরমণীগণ জন্মগ্রহণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপগোপীগণের কথা আছে, কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবের কথা নাই। মধুর-রসবতী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী স্থানীয়া গোপিকাদিগের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাঁহাদের নাম নাই। এই পার্থক্যগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। ইহা হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তসমূহ উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভক্তগণ কত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। যাহা হউক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপাখ্যান অনুসরণ করা যাউক।

৫। শ্রীকৃষ্ণের মিলন

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাধার আবির্ভাব হয়। যশোদার সহোদর ভ্রাতা রায়াণ। দ্বাদশ বৎসর যখন বয়স, তখন শ্রীরাধার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়। এই বিবাহ সত্য করিয়া শ্রীরাধার সহিত হয় নাই, ছায়ার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। রায়াণ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে, গর্গাচার্য্য যে সময়ে নন্দগোকুলে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের নামকরণ করিতে আসেন, সে সময়ে তিনি নন্দ মহারাজকে শ্রীরাধার তত্ত্বও আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছিলেন। গর্গাচার্য্য বলেন—একই তত্ত্ব লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। গোলোকের অভিশাপের কথাও গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজকে বলেন। সেই হইতেই নন্দমহারাজের দৃষ্টি ও মনোযোগ শ্রীরাধার প্রতি ছিল। তাহার পর একদিন নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন নিতান্ত শিশু। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও ভীষণ বজ্রগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শিশু কৃষ্ণ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা অবশ্য তাঁহার মায়া। নন্দমহারাজ নিতান্তই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধিকা তথায় উপস্থিত। শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া নন্দ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এসময়ে এস্থানে শ্রীরাধার আগমন একেবারেই অসম্ভব।

নন্দমহারাজ শ্রীরাধার তত্ত্ব জানিতেন। গর্গাচার্য্যের নিকট সকল কথা শুনিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকে এই সঙ্কটের সময় হঠাৎ দেখিতে পাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ও নতমস্তকে শ্রীরাধিকাকে বলিলেন—"দেবি, গর্গমুনির নিকট আপনার মহিমা যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী অপেক্ষাও হরির প্রিয়পাত্রী। গোকুলবিহারী এই কৃষ্ণই হরি। আপনি আপনার প্রাণনাথ হরিকে গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া গোপরাজ নন্দ রোদনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মণিময় রাসমণ্ডল নির্ম্মিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ আর বালক নহেন। তিনি কিশোর মূর্ত্তি

ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া স্তব পাঠ করিলেন। তাহার পর হোমানল প্রজ্বলিত হইল। ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদবিধিমতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রাধাকে কৃষ্ণের বামে বসাইলেন এবং পিতা যেমন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, ঠিক সেই প্রকারে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার পৌরহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যথাবিধি বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার শিশু হইলেন, শ্রীরাধিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদাকে দিলেন। ইহার পর হইতে শ্রীরাধা নিজের ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসমণ্ডলে বিহার করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে যে উপাখ্যান লিখিত হইল তাহা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে। তাহার কয়েকটি শ্লোক নিম্নে দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে--

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্॥
বৃষ্টিধারাসমতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপহ॥

শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতেছেন, নন্দ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে তথায় শ্রীরাধিকা আসিয়া উপস্থিত।

এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।
গমনং কুর্ব্বতী রাজহংসখঞ্জনগঞ্জনম্॥
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভ—চারুবক্ত্রমনোহরা।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা॥

নন্দ মহারাজ শ্রীরাধার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন।

ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্যৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া।
জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বর্ণনার সহিত শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক তুলনীয়। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক এই।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ বা স্পষ্টার্থ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অনুরূপ। মেঘসমূহের দ্বারা গাঢ়স্নিগ্ধ আকাশতল, বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে তমালবৃক্ষসমূহের দ্বারা; রাত্রিকালে ভীরু হয় অর্থাৎ ভয় পায় এই ছেলেটি। অতএব হে রাধে, ইহাকে বাড়ী লইয়া যাও। নন্দ মহারাজের এই আদেশে পথসমীপবর্ত্তী কুঞ্জের অভিমুখে প্রচলিত রাধামাধবের যমুনা-তটের নির্জ্জন বিহারসমূহ জয়যুক্ত হউক।

শ্রীগীতগোবিন্দের একজন প্রাচীন টিকাকার পূজারি গোস্বামী। ইনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা তাঁহার টিকা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় ইনি শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য এবং শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া এই টিকা রচনা করিয়াছিলেন।

পূজারি গোস্বামী এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থ এইরূপ। লীলা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে প্রথমে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্ব না জানিলে লীলা বুঝিবার উপায় নাই। সেই তত্ত্ব এই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, আর শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। "নন্দনিদেশ" কথার অর্থ নন্দমহারাজের নিদেশ নহে। "নন্দশ্চাসৌ নিদেশশ্চেতি নন্দনিদেশঃ"—ইহার অর্থ আনন্দকর সখী বচন। "নক্তং ভীরুঃ" ইহার অর্থ—পূর্ব্বরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত ছিলেন না, অতএব কৃষ্ণ অপরাধ করিয়াছেন, এই অপরাধ স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে ব্যথা হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ—হে রাধে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বরাত্রিতে অপরাধ করিয়া ভয় পাইয়াছে, অতএব তুমিই তাঁহার নিকট যাও। যদি বল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, পথে অনেক লোক কেমন করিয়া যাইব? তাহা বলিতে পার না। স্নিগ্ধ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে। এই গেল পূজারি গোস্বামীর টিকা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার ঐতিহাসিক ভিত্তি নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রীরাধাগোবিন্দ যাঁহাদের উপাস্য তাঁহারা প্রকট লীলায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা

বলেন লীলা সত্য সত্য প্রপঞ্চে বা আমাদের পৃথিবীতে প্রকট হইয়াছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিকতা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার ভিত্তি নহে। উপাসনার ভিত্তি নিত্যলীলা। আজও সে লীলা চলিতেছে। নিত্য কৃষ্ণ ও নিত্য রাধা আর নিত্য বৃন্দাবন, কিন্তু ইহাকে রূপক বলিবেন না।

কিন্তু এই রাধাকৃষ্ণের লীলা নানাভাবে নানাগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমুদয় বর্ণনাও উপেক্ষণীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাসম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই আপাততঃ আমাদের নিকট চরমতত্ত্ব ও পরম কথা। সেই কথায় আমরা দেখিব শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা পবিত্রতম চিন্ময় রসের অফুরন্ত উৎস, ভক্তহৃদয়ের সকল সাধ পূর্ণ করার জন্য এই রস আস্বাদন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। যাঁহারা মুক্ত ও আত্মারাম, তাঁহারা ও এই রস পরম সমাদরে আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই লীলায় কামগন্ধ নাই, প্রাকৃত মালিন্যের কণামাত্রও নাই। সুতরাং অন্যান্য পুরাণে এই লীলার যে বর্ণনা আছে, তাহা যদি আস্বাদন করিতে হয়, তাহা হইলে স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়জগৎ ও কামজগৎ হইতে চিত্তকে একেবারে সরাইয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় রসিক ও ভাবুক হইয়া—From the standpoint of the highest abstraction ইহা আস্বাদন করিতে হইবে। ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটক, গোপালচম্পূ ও পদাবলী সাহিত্য, এই সকলের মধ্যে যে শ্রীরাধাকথা আছে, তাহাও আমাদের সযত্নে আস্বাদনীয়। লীলা বুঝিতে হইলে তত্ত্ব জানা দরকার।

৫। শ্রীরাধার ষোড়শ নাম

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে সামবেদে শ্রীরাধার সহস্র নাম কথিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ষোলটি নাম প্রসিদ্ধ।

রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী॥
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী।
কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী॥
চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শতচন্দ্রনিভাননা।
নাম্নামেতানি সারাণি তেষামভ্যন্তরাণি চ॥

রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ।
ধা নির্ব্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা ॥১

রা শব্দ দানবাচক, আর ধা বলিতে নির্ব্বাণ বুঝায় অতএব যিনি নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন তিনি রাধা। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন না, বরং শুনিলে ভয় পাইয়া থাকেন।

রাসেশ্বরস্য পত্নীয়ং তেন রাসেশ্বরী স্মৃতা ।২
রাসে চ বাসো যস্যাশ্চ তেন সা রাসবাসিনী ॥৩

তিনি রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী বলিয়া তাঁহার নাম রাসেশ্বরী। আর রাসমণ্ডলে বাস করেন বলিয়া রাসবাসিনী ॥২।৩

সর্ব্বাসাং রসিকানাঞ্চ দেবীনামীশ্বরী পরা।
প্রবদন্তি সদা সন্তস্তেন তাং রসিকেশ্বরীম্ ॥৪

সমুদয় রসিকা দেবীগণের ঈশ্বরী বলিয়া তাঁহার নাম রসিকেশ্বরী।৪

প্রাণাধিকা প্রেয়সী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সা চ কৃষ্ণেন পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৫

তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণঅপেক্ষাও অধিক প্রিয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বলিয়া থাকেন।৫

কৃষ্ণস্যাতি প্রিয়া কান্তা কৃষ্ণো বাস্যাঃ প্রিয়ঃ সদা।
সর্ব্বৈদেবগণৈরুক্তা তেন কৃষ্ণপ্রিয়া স্মৃতা ॥৬

তিনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়কান্তা, অথবা কৃষ্ণ তাঁহার সর্ব্বদাই প্রিয়, এই কথা সমুদয় দেবগণ বলিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার নাম কৃষ্ণপ্রিয়া।৬

কৃষ্ণরূপং সংবিধাতুং যা শক্তি চাবলীলয়া।
সর্ব্বাংশৈঃ কৃষ্ণসদৃশী তেন কৃষ্ণস্বরূপিনী ॥৭

তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থা এবং সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী বলিয়া কৃষ্ণস্বরূপিনী নামে প্রসিদ্ধ।৭

বামার্দ্ধাঙ্গেন কৃষ্ণস্য যা সম্ভূতা পুরা সতী।
কৃষ্ণবামাংশ সম্ভূতা তেন কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা ॥৮

তিনি শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য নাম কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা। এই নামও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।৮

পরমানন্দরাশিশ্চ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী।
শ্রুতিভিঃ কীর্ত্তিতা তেন পরমানন্দরূপিনী ॥৯

তিনি স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পরমানন্দরাশি, এজন্য বেদ তাঁহাকে পরমানন্দরূপিনী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।৯

কৃষির্মোক্ষার্থবচনো ণ এবোৎকৃষ্ট বাচকঃ।
আকারো দাতৃবচনস্তেন কৃষ্ণাত্র কীর্ত্তিতা ॥১০

কৃষ শব্দে মোক্ষ, ণ-কার অর্থে উৎকৃষ্ট, আকার অর্থে দান, তিনি উৎকৃষ্ট মোক্ষদায়িনী বলিয়া কৃষ্ণানামে বিখ্যাত।১০

অস্তি বৃন্দাবনং যস্যাস্তেন বৃন্দাবনী স্মৃতা।
বৃন্দাবনস্যাধিদেবী তেন বাথ প্রকীর্ত্তিতা ॥১১

তাঁহার বৃন্দাবন আছে, অথবা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই কারণে তাঁহার নাম বৃন্দাবনী ॥১১

বৃন্দঃ সংঘবচঃ সখ্যুরকারোঽপ্যস্তিবাচকঃ।
সখীবৃন্দোঽস্তি যস্যাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীর্ত্তিতা ॥১২

বৃন্দ শব্দে সখীসমূহ আর অকার বলিতে আছে বুঝায়। অতএব যাঁহার সখীবৃন্দ আছে, তিনি বৃন্দা নামে অবিহিত।১২

মুদ্বাচকো বিনোদশ্চ সা অস্যা অস্তি তত্র চ।
বেদা বদন্তি তাং তেন বৃন্দাবনবিনোদিনীম্ ॥১৩

বিনোদ শব্দ আনন্দ-বাচক, বৃন্দাবনে তাঁহার বিনোদ আছে বলিয়া বেদসমূহ তাঁহাকে বৃন্দাবনবিনোদিনী বলিয়া থাকেন।১৩

নখচন্দ্রাবলী যস্যা বক্ত্রচন্দ্রোঽস্তি সন্ততম্।
তেন চন্দ্রাবলী সা চ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা পুরা ॥১৪

শ্রীরাধার নখসমূহ চন্দ্রের ন্যায়, মুখও সর্ব্বদাই চন্দ্রের ন্যায় এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলেন ১৪

কান্তিরস্তি চন্দ্রতুল্যা সদা যস্যা দিবানিশম্ ।
সা চন্দ্রকান্তা হর্ষেণ হরিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥১৫

শ্রীরাধিকার কান্তি দিবারাত্রি সকল সময়েই চন্দ্রতুল্য। এই কারণে হরি হর্ষভরে তাঁহাকে চন্দ্রকান্তা বলিয়া থাকেন ।১৫

শতচন্দ্রপ্রভা যস্যাশ্চাননেঽস্তি দিবানিশম্ ।
মুনিনা কীর্ত্তিতা তেন শতচন্দ্রপ্রভাননা ॥১৬

শ্রীরাধার মুখমণ্ডলে সর্ব্বদাই শতচন্দ্রের প্রভা বিরাজমান, এই কারণে মুনিগণ তাঁহাকে শতচন্দ্রনিভাননা বলিয়া থাকেন ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলা হইয়াছে শ্রীরাধার বয়ঃক্রম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা চতুর্দ্দশ বৎসর অধিক। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাচিন্তায় অন্যরূপ বয়ঃক্রম আরোপ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর, বয়স পনর বৎসর, নয় মাস সাত দিন, পীতাম্বর, নবীনমেঘবর্ণ। শ্রীরাধিকা নিত্যকিশোরী, বয়স চৌদ্দ বৎসর, দুই মাস চৌদ্দ দিন, নীলবসনা, ললিত হেমবর্ণা শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর বর্ণ, বস্ত্র, সেবা, ভাব, কুঞ্জের বর্ণ ও বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত আছে। ললিতা ও বিশাখা, শ্রীরাধিকা অপেক্ষা বয়সে একদিনের বড়, চিত্রা দুই দিনের, ইন্দুরেখা পাঁচ দিনের বড়, চম্পকলতা দুই দিনের ছোট, রঙ্গদেবী ছয় দিনের বড়, তুঙ্গবিদ্যা ও সুদেবী যথাক্রমে এক দিনের ও ছয় দিনের ছোট। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট প্রধানসখীর বর্ণ যথাক্রমে গোরোচনা, বিদ্যুৎ, কাশ্মীর, হরিতাল, চম্পক, পদ্মকিঞ্জল্ক, চন্দ্রকুঙ্কুম, ও সুবর্ণের ন্যায়। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ যথাক্রমে ময়ূরপুচ্ছ, তারাবলী, কাচপ্রভা, দাড়িম্বকুসুম, চাসপক্ষী, জবাকুসুম, পাণ্ডুর ও প্রবালবর্ণ। ইঁহারা যথাক্রমে নিম্নরূপ সেবা করিয়া থাকেন তাম্বুল, চন্দন, বস্ত্রালঙ্কার, নৃত্য, চামর, অলক্ত, গীতবাদ্য ও জল। অষ্টসখীর অষ্টভাব যথাক্রমে খণ্ডিতা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, দিবাভিসারিকা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতা। ইঁহাদের কুঞ্জের বর্ণ যথাক্রমে বিদ্যুৎ, মেঘ কিঞ্জল্ক, স্বর্ণ, তপ্তস্বর্ণ, শ্যাম, অরুণ ও হরিদ্বর্ণ। এই সমুদয় বর্ণনা অশ্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নাই। ভক্তগণ এই প্রকারে চিন্তা করেন। এই সমুদয় বর্ণ ও ভাব চিন্তা করিলে হৃদয়বৃত্তির যে অনুশীলন হয় তাহা অদ্ভুত। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

—০—

কলিকাতায় আত্মবিদ্যা (Spiritualism.)

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) মহাশয়ের On the Soul নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক আছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—প্রথম বয়স হইতেই আমার দর্শন ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর খুব ঝোঁক ছিল। এসম্বন্ধে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলাম। শেষে আমি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলাম। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই অনুভব করিতাম যে আমরা মনের দ্বারা যে ঈশ্বর তত্ত্বের আলোচনা করি, তাহা আত্মার দ্বারা অনুভূত ঈশ্বর তত্ত্ব হইতে পৃথক্। The God of the mind was not the God of the Soul. ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়। আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি। সেই সময়ে আমি Spiritualism বা বিলাতী আত্মবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ করি। স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্ত না হইলে, এই আলোচনা বোধ হয় করিতাম না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আমি জজ এড্‌মণ্ডস্‌কে একখানি পত্র লিখি এবং এই আত্মবিদ্যার কি প্রকারে অনুশীলন করিতে হয়, তাহার উপদেশ প্রার্থনা করি। পত্রের উত্তরে তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি আমার Stray Thoughts on Spiritualism নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে ডাক্তার বেরিণী কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া প্রেতানয়ন-মণ্ডলীর (Seance) অধিবেশন হইত। হঠাৎ একদিন এই অধিবেশনে আমি মিডিয়ম হইয়া পড়িলাম; অর্থাৎ আমার দেহে প্রেতের আবেশ হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি খুব গভীর ভাবে এই আত্ম-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছি। বহুবর্ষ এই পদ্ধতিতে কার্য্য করিয়া আমি বুঝিয়াছি—আমাদের যোগ-বিদ্যা ও বিলাতী আধুনিক আত্ম-বিদ্যা, ইহাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। এই সাধনার দ্বারা আমাদের নিম্ন-জীবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শাসিত পশুভাব ক্রমে ক্রমে দূরীভূত বা সংযত হইয়া থাকে। স্যর্ হাম্‌ফ্রে ডেভি, নাইট্রাস্ অক্সাইডের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া এই প্রকারের অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নাই; ভাবের দ্বারাই বিশ্ব গঠিত।

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়,—জজ এড্‌মণ্ডস্ ব্যতীত জেমস্ বার্ণস্, জে, জে, মর্স, শ্রীমতী এমা, এইচ্ ব্রিটেন্ এবং মার্কিন দেশের অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ আত্মবিদ্যাবিদের সহিত নিয়মিতভাবে

পত্র-ব্যবহার করিতেন। আমাদের দেশে প্রথম সময়ে যাঁহারা এই বিলাতী আত্ম-বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, প্রবন্ধ-বিশেষে বলিয়াছেন—বিলাতী আত্ম-বিদ্যাই রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের ধর্ম্ম ছিল। তিনি এই বিদ্যায় এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে, প্রায়ই বলিতেন যে মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার মৃত বন্ধুগণের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবেন। এখানেও যেমন, সেখানেও ঠিক্ তেমনি। তবে সেখানকার খাদ্য, স্থূল নহে, সূক্ষ্ম। তাঁহার এক পুত্র একবার ছাদের উপর হইতে পড়িতে পড়িতে দৈব-যোগে বাঁচিয়া যায়। এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজা বলিতেন যে, তাঁহার মৃত পিতা গিরিশচন্দ্রই, ঐ শিশুকে বাঁচাইয়াছেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, সুপ্রসিদ্ধ আত্ম-বিদ্যাবিৎ ডাক্তার জে, এম্ পীবল্‌স্ কলিকাতায় আসেন। আত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র আত্ম-বিদ্যার পক্ষপাতী; কারণ এই বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্ম উদার হইয়া যাইবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্টতা হইয়াছিল এবং তিনি দেশে ফিরিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতায় মিত্র মহাশয়েরও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ডাঃ পীবল্‌স্ Around the world নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নাম—The Oriental Spiritualists অর্থাৎ প্রাচ্য আত্ম-বিদ্যাবিৎগণ। এই অধ্যায়ে তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় প্রথমাবস্থায় আবিষ্ট হইয়া লিখিয়া যাইতেন—অর্থাৎ Writing medium ছিলেন। তাহার পর, তাঁহার আরও উন্নতি হয় এবং তিনি অন্তর্দৃষ্টি (Spiritual insight) লাভ করেন। তিনি তাঁহার মৃত পত্নীকে খুব স্পষ্টভাবে নিতান্ত কাছে দেখিতে পাইতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় The Development of Female Mind in India নামক স্বলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ ডাঃ পীবল্‌স্‌কে উপহার দিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের রমণীগণের স্বাধীন অবস্থা এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মহেন্দ্রনাথ পাল ও রমানাথ সেন নামক দুইটি ভদ্রলোক, আমেরিকা দেশের আত্মবিদ্যাবিষয়ক ব্যাপার সম্বন্ধে ডাঃ পীবল্‌সের সহিত নানারূপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়ে কি করিয়া, প্রেতানয়নমণ্ডলী (বা Seance) করিতে পারা যায়, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই দুইটি ভদ্রলোক পীবল্‌সের আসিবার পূর্ব্বেই ইংলণ্ড হইতে আত্মবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি আনিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় আর একজন আত্ম-বিদ্যার অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ

মিত্র মহাশয়ের মধ্যস্থতায় পীবল্‌সের সহিত ইঁহার আলাপ হয়। এই পরিচয়ের পূর্ব্বেই, শিবচন্দ্র দেব মহাশয়, আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ডেভিস্, টাটন্, সার্জ্জেণ্ট ডেণ্টন, এড্‌মণ্ডস্ প্রভৃতি বিখ্যাত আত্মবিদ্যা প্রচারকগণের গ্রন্থ হইতে এই সমুদয় বাঙ্গলা গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি ডাঃ পীবল্‌সের Seers of the Ages নামক ইংরাজী গ্রন্থের বহু অংশ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের সহিত ডাক্তার পীবল্‌সের যখন প্রথম পরিচয় হয় এবং পীবল্‌স্ যখন জানিতে পারেন যে, দেব মহাশয় পূর্ব্বেই তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তখন পীবল্‌সের আনন্দের ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

কলিকাতা রিভিউ পত্রের ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়, The Psychology of the Aryas অর্থাৎ আর্য্যজাতির মনস্তত্ত্ব নামক প্রবন্ধ লেখেন। আমেরিকার আত্ম-বিদ্যাবিষয়ক Banner of Light নামক পত্রে এই গ্রন্থের সুবিস্তৃত সমালোচনা ও ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে লেখক হিন্দু মনোবিজ্ঞানের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অথবা বহিঃপ্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ, উভয়তঃপ্রাজ্ঞ ও তুরীয়—মানব-চৈতন্যের এই চারিটি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সমুদয় আলোচনা পাঠ করিয়া আমেরিকাবাসী আত্মবিদ্যাবিদগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাহা এই সমালোচনা পাঠেই বুঝিতে পারা যায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের Spiritual Stray Leaves নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা প্রবন্ধগুলির তালিকা দিলাম—

(1) The Psychology of the Aryas, (Published in the Calcutta Review 1877)
(2) The psychology of the Budhists (Spiritualist, August 1877)
(3) God in the soul (Do—7 Septr. 1877)
(4) The spirit Land (Do—16 Nov. 1877)
(5) The spiritual State (Do—23 Nov. 1877)
(6) The Soul Revelations.
(7) The Soul (Spiritualist—30 May, 1878)
(8) Occultism & Spiritualism.
(9) Avedi or the Spiritualists (Banner of Light—August. 1878)

(10) Progression of the Soul (Do—12 January. 1878)

(11) Soul Revelation in India (Do—5 April, 1878)

(12) Culture of Hindu females in Ancient Times (Calcutta Review—1878)

(13) The Human & Spiritual.

এই পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন—প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস—প্যারীচাঁদের রচনা; প্রথম হাস্যরসের রচনা (satirical work) প্যারীচাঁদের, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রথম বাঙ্গলা গ্রন্থ তাঁহারই রচনা; ঈশ্বরতত্ত্ব (Theism) বিষয়ক প্রথম বাঙ্গলা শৃঙ্খলাবদ্ধ গ্রন্থ তাঁহার; প্রথম আধ্যাত্মিক উপন্যাস তাঁহার। এখন তিনি আত্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থ লিখিলেন—এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইহাই প্রথম গ্রন্থ। Theosophists প্রভৃতি কাগজেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।

আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের আত্ম-বিদ্যাবিদ্‌গণের সমিতি সমূহ এই প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদের সমিতির সম্মানিত সদস্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে Theosophists পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম—The Inner God. এই প্রবন্ধে লেখক আর্য্যজাতির শিক্ষা বর্ণনা করিয়া Theosophists ও Spiritualists দিগকে সম্মিলিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে কলিকাতা সহরে The United Association of Spiritualists নামক একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার On the Soul নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে এই সমিতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক রবিবারে ৩নং চার্চ্চলেনে জে, জি মিউজেন্‌সা-এর আফিসে কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই বন্ধুমণ্ডলী পূর্ব্বোক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মিউজেনস্ সাহেব সভাপতি ছিলেন—নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। বিলাত হইতে মিডিয়ম্ আনিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়, কিন্তু মিডিয়ম্ আসিয়া সময়ে উপস্থিত হইতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে, হাইকোর্টের সলিসিটর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। বেলগাছিয়ায় পূর্ণবাবুর একটি বাগান ছিল—সেই বাগানে এই সমিতির অধিবেশন হইত। ইংলণ্ডের British National Association of Spiritualists এর সভাপতি মিঃ আলেক্‌জাণ্ডার কেল্ডার এই সময়ে কলিকাতায় আসেন। তিনি বেলগাছিয়ার বাগানে এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই সমিতি, নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ নামক একটি খুব ভাল মিডিয়ম্ পাইয়াছিলেন। ডাঃ রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই মিডিয়ম্‌টিকে আনিয়াছিলেন। এই মিডিয়ম্ একটি যুবা পুরুষ—তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একটি লোক খুন হইয়াছিল—সেই লোকটিই প্রেত হইয়া ইহাকে আবিষ্ট করে। সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একটি মিডিয়ম্ এই সমিতি পাইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার আর, মিত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় 'শোক-বিজয়' নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে, অনেকগুলি প্রেতানয়নমণ্ডলীর বিবরণ কথিত হইয়াছে। এই সমুদয় মণ্ডলীতে নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বিলাতী আত্মবিদ্যা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের ভিতর প্রসার লাভ করিল। যোগ, আত্মবিদ্যা, Theosophy সম্বন্ধে মহারাজা, রাজা, ব্যারিষ্টার, উকীল, হাকিম, কলেজের ছাত্র, এমন কি, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল। নানা স্থানে নানা প্রকারে প্রেতানয়নের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এই সময়ে সভাপতি স্বামী নামক একজন মাদ্রাজী সাধু কলিকাতা সহরে আগমন করেন। আলবার্ট হলে আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় সেই সমুদয় সভায় সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা সহরের কতকগুলি ভদ্রলোক আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া মিঃ ডব্লিউ এগ্‌লিংটনকে নিমন্ত্রণ করিয়া কলিকাতা সহরে আনয়ন করেন। এগ্‌লিংটন সাহেবের তখন পৃথিবীময় খ্যাতি। তিনি প্রেত আনয়ন করিয়া তাহাকে মূর্ত্তিদানপূর্ব্বক দেখাইতে পরিতেন; অর্থাৎ তিনি একজন physical and materialising মিডিয়ম্ ছিলেন। ১৮৮১ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় আসেন। মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে প্রথম মণ্ডলীর অধিবেশন হয়। তাহার পর বাবু দীননাথ মল্লিকের বাটীতে দুইটি অধিবেশন হয়। এগ্‌লিংটন যাহা দেখাইলেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও আত্মবিদ্যায় বিশ্বাসবান হইলেন। এগ্‌লিংটন যে সময়ে কলিকাতায় প্রেতানয়ন-মণ্ডলীতে নানারূপ অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে কর্ণেল অলকট্ ও মেডেম্ ব্লেভেট্‌স্কি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া পশ্চিম ভারতে থিয়সফি প্রচার করিতেছিলেন। সুতরাং এই সময়টি নব্যভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি খুব বড় উত্তেজনা ও কৌতূহলের সময়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় মিঃ এগ্‌লিংটনের একটি প্রেতানয়ন-মণ্ডলীর ব্যাপার বর্ণন করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

আমাদের দেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, এই সমুদয় আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত করা আবশ্যক। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাতেও, এই সমুদয় বিবরণ আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আত্মবিদ্যা বা Theosophy প্রভৃতির প্রচার-

কার্য্যে, স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমরা আমাদের সাহিত্যালোচনায়, মিত্র মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা করি নাই। একমাত্র "আলালী ভাষা" মিত্র মহাশয়ের কীর্ত্তি নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও মনীষা, এখনও আলোচিত হয় নাই। *

শ্রীশিবরতন মিত্র

যোগসিদ্ধি।

১

যোগসিদ্ধি সর্ব্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার। এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে আটটি শ্রীভগবানের আশ্রিত আর দশটি গুণের কার্য্য দেহের বা মূর্ত্তির সিদ্ধি তিন প্রকার অনিমা, মহিমা ও লঘিমা। "অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা"। যোগিদেহস্য শিলাদাবপি প্রবেশপ্রযোজকোঽণুত্বলক্ষণোগুণোঽণিমা। যোগী তাঁহার দেহকে শিলাপ্রভৃতির ভিতর প্রবেশ করাইবার জন্য অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে পারেন, এই শক্তির নাম অণিমা। সর্ব্বব্যাপনলক্ষণো মহিমা। অবার যোগী তাঁহার দেহ এত বড় করিয়া প্রসারিত করিতে পারেন যে তিনি সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন। এই শক্তির নাম মহিমা। "যেন সূর্য্যমরীচীরবলম্ব্য দেহস্থ সূর্য্যলোকপ্রাপ্তির্ভবতি সলঘুত্বলক্ষণোগুণো লঘিমা।" যোগী সূর্য্যের কিরণ ধরিয়া সূর্য্যলোকে যাইতে পারেন, দেহকে এত বেশী লঘু করিতে তিনি সক্ষম। এই শক্তির নাম লঘিমা। এই তিনটি দেহগতসিদ্ধি।

"প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ" সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতারূপ হইয়া যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা তাহার নাম প্রাপ্তি। এই অবস্থায় যোগী অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারেন। অঙ্গুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমসং। (ক্রমসন্দর্ভ)। সকল ইন্দ্রিয়ে প্রবেশের শক্তি থাকায় যোগী এই সিদ্ধি লাভ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় ইচ্ছানুসারে পাইতে পারেন।

"প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু।" শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষ্বপি সর্ব্বেষু ভূবিবরাদি পিহিতেষ্বপি প্রাকাম্যং ভোগদর্শনসামর্থ্যং সিদ্ধিঃ। (শ্রীধর) শাস্ত্রাদিতে পরলোকাদি-সম্বন্ধে যাহা যাহা

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় লিখিত National Magazine পত্র (১৯১৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা) হইতে সঙ্কলিত।

শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সমুদয়ে এবং দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনের যোগ্য সমুদয় ভূবিবরাদির ভিতর অবস্থিত ভোগদর্শনের যে সামর্থ্য, তাহার নাম প্রাকাম্য। এই সিদ্ধি লাভ হইলে যোগীর ইচ্ছার কোথায়ও অভিঘাত বা বাধা হয় না। জলে যেমন ডুবিতে ও উঠিতে পারা যায়, যোগী সেই প্রকার মাটিতেও ডুবিতে উঠিতে পারেন। যতো ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জিত যথোদকে।

"শক্তিপ্রেরণমীশিতা" মায়া ও তাহার অংশভূত শক্তিসমূহকে প্রেরণ করিবার যে সামর্থ্য, তাহার নাম ঈশিতা। এই সিদ্ধির বলে যোগী জীবসমূহের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। জীবেষু স্বশক্তিসঞ্চারণং ঈশিতা নাম সিদ্ধিঃ। (বিশ্বনাথ)

"গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা" গুণে অর্থাৎ বিষয়ভোগসমূহে যে অনাসক্তি, তাহার নাম বশিতা। "যৎকামস্তদবস্যতি" যে যে সুখ কামনা করা যাইবে, তাহার একবারে চরম বা সীমা আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই যে সিদ্ধি ইহার নাম কামাবসায়িতা। এই অষ্টসিদ্ধি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবসায়িতা, এই গুলি শ্রীভগবানের স্বাভাবিকী।

অনূর্ম্মিমত্ব অর্থাৎ ক্ষুধা পিপাসাপ্রভৃতি ছয় প্রকারের ঊর্ম্মি বা তরঙ্গবিহীনতা, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, মনোজব অর্থাৎ মনের বেগে দেহের গতি, কামরূপ অর্থাৎ দেবতাদি যাহার রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই রূপগ্রহণের সামর্থ্য, পরকায়প্রবেশ, স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরা ও দেবতাগণের সহিত ক্রীড়াকরণ, যথাসঙ্কল্প সংসিদ্ধি, অপ্রতিহত আজ্ঞা ও অপ্রতিহত গতি। এই দশটি সিদ্ধি। ক্ষুদ্রসিদ্ধি পাঁচপ্রকার। ত্রিকালজ্ঞতা, শীত উষ্ণ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত না হওয়া, পরের চিত্ত বুঝিতে পারা, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতির স্তম্ভন ও তৎকর্তৃক অপরাজয়।

এই সিদ্ধিসমূহ ধারণার দ্বারাই লাভ করা যায়। কিরূপ ধারণায় কিরূপ সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ ভূতসূক্ষ্মরূপউপাধিবিশিষ্ট, ভগবানের সেই উপাধিতে যদি কেহ মনের ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে অণিমা-নামক সিদ্ধি লাভ হয়। ভগবানের মহত্তত্ত্ব-উপাধিতে মনের ধারণা করিলে মহিমা, আর পরমাণুতে মনের ধারণা করিলে লঘিমা সিদ্ধি লাভ করা যায়। ভগবানের একটি উপাধির নাম বৈকারিক অহঙ্কার, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে তিনি অধিষ্ঠাতারূপে রহিয়াছেন। এই বৈকারিক অহংতত্ত্বে মনের ধারণা করিতে পারিলে, সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। ইহার নাম প্রাপ্তি। ভগবান্ সূত্রাত্মা ও মহত্তত্ত্বরূপ উপাধিবিশিষ্ট, এই উপাধিতে মনের ধারণা করিতে পারিলে প্রাকাম্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ কালের কলয়িতা, ত্রিগুণের ও মায়ার অধীশ্বর, এই যে তাঁহার রূপ ইহার নাম বিষ্ণুরূপ, এই রূপে মনের ধারণা সিদ্ধ হইলে ঈশিত্ব, তুরীয় নারায়ণে ধারণার দ্বারা বশিত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ধারণাদ্বারা কামাবসায়িত্ব সিদ্ধিলাভ করা যায়।

শুদ্ধ ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপপতিতে ষড়ূর্ম্মিরাহিত্য, প্রাণরূপ আকাশাত্মায় দূর-শ্রবণ, চক্ষুকে সূর্য্যে আর সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযুক্ত করিয়া যিনি তাহার মধ্যে ভগবান্‌কে ধ্যান করেন, তিনি বিশ্বদর্শন-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কথা উল্লিখিত বা উপদিষ্ট হইয়াছে।

২

আজ কাল পাশ্চাত্য দেশে ইচ্ছাশক্তির সংযম ও অনুশীলনের জন্য নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। Control and culture of the will-power. আরও Mesmerism, Hypnotism, Clairvoyance, Clairaudience, Thought-Reading, Thought-Transference, Telepathy, Artificial Somnambulism প্রভৃতি সিদ্ধির বিষয়ও অনেকদিন হইতে আলোচিত হইতেছে। এই সমুদয় ব্যাপার ভারতীয় যোগবিদ্যারই বিলাতী সংস্করণ মাত্র।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা দেখিলাম, ভগবান্ নানারূপে নানাস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে লীলা করিতেছেন। তাঁহার এক এক রূপ বা এক এক বিভূতি চিন্তা করিলে বা সেই বিভূতিতে মনের ধারণা করিতে পারিলে এক এক প্রকারের সিদ্ধি লাভ হয়। এক ভগবান্‌কে নানামূর্ত্তিতে ও নানাভাবে কেন উপাসনা করা হয়, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সমুদয় ভ্রান্ত একেশ্বরবাদী ভগবানের এই বহুরূপের উপাসনাকে বহুদেবদেবীর পূজা বলিয়া, কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করেন, এই আলোচনায় তাহাদের জ্ঞানোদ্রেক হইতে পারে। এক এক দেবতার পূজা করিলে এক এক প্রকারের অভীষ্ট পূরণ হয়, তাহাও পুরাণাদি শাস্ত্রে নানাস্থানে কথিত হইয়াছে। যেমন, যিনি ব্রহ্মতেজ চাহেন তিনি বেদপতি ব্রহ্মার পূজা করিবেন, যিনি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা চাহেন তিনি ইন্দ্রের পূজা করিবেন। প্রজার জন্য দক্ষাদি প্রজাপতির, সৌভাগ্যের জন্য দুর্গাদেবীর, তেজের জন্য অগ্নির, ধনের জন্য বসুর, বীর্য্যের জন্য রুদ্রের, ভক্ষ্যের জন্য অদিতির, স্বর্গের জন্য দ্বাদশ আদিত্যের রাজ্যের জন্য বিশ্বদেবগণের, প্রজাদের স্বাধীনতার জন্য সাধ্যগণের, আয়ুর জন্য অশ্বিনীকুমার যুগলের, পুষ্টির জন্য পৃথিবীর, পদভ্রংশ নিবারণের জন্য অন্তরীক্ষের, রূপের জন্য গন্ধর্ব্বদিগের, স্ত্রীলাভের জন্য উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণের, আধিপত্য লাভের জন্য পরমাত্মার, যশোলাভের জন্য যজ্ঞনামা বিষ্ণুর, ধনসঞ্চয়ের জন্য বরুণের, বিদ্যার জন্য গিরিশের, দাম্পত্যপ্রণয়ের জন্য উমার, ধর্ম্মের জন্য নারায়ণের, সন্ততিবৃদ্ধির জন্য পিতৃগণের, বিঘ্ননাশের জন্য যক্ষগণের, বললাভের জন্য দেবগণের, রাজকার্য্য লাভের জন্য মনুগণের, শত্রুর উচ্ছেদের জন্য রাক্ষসের, ভোগের জন্য সোমের, বৈরাগ্যের জন্য পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। যিনি নিষ্কাম, সর্ব্বকামী বা মুক্তিকামী তিনি অনন্যভক্তিযোগে পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন। এই তালিকা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ষষ্ঠী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবীগণের মন্ত্র, কবচ, ধ্যান, পূজাপ্রণালী প্রভৃতি আছে। বহুদেবদেবীগণের ও শ্রীভগবানের বহুরূপের এই পূজা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তর্জগতের রহস্য The mysteries of the unseen world যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন। এখন প্রয়োজন, এই সমুদয় যাহাতে লুপ্ত না হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা। এই সমুদয় পূজা ও উপাসনা যথাযথ প্রচলিত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সংগঠন হইবে। হিন্দুসংগঠনের অন্য কোন উপায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে পূজা ও উপাসনা-পদ্ধতি যেভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতেও বুঝিতে পারা যায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সকল অঙ্গেরই অনুষ্ঠান রহিয়াছে। সুতরাং এই পদ্ধতিও সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে এবং সাধুসঙ্গে সৎশাস্ত্রের আলোচনা করিলে মানুষ নিজের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা বুঝিতে পারে। তখন নিজের রুচি ও অধিকারানুযায়ী জ্ঞান, ভক্তি বা যোগের পথ অবলম্বন করিয়া পরমার্থলাভের জন্য চেষ্টান্বিত হয়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।

৩

শ্রীমদ্ভাগবতে যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইল। তাহার উপর আর কোন কথা নাই। পাতঞ্জলদর্শনের নাম যোগদর্শন। পাতঞ্জলদর্শন চারিটি-পাদে বিভক্ত। যোগপাদ, সমাধিপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। তৃতীয়-পাদে অর্থাৎ বিভূতি-পাদে নানারূপ যোগসিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আশ্রয় করিলে অর্থাৎ সংযম সাধন করিলে এই সমুদয় বিভূতি লাভ করা যায়। পাতঞ্জলদর্শন-মূলে সূত্রগ্রন্থ, অতিশয় সংক্ষেপে অতি গূঢ় ও গভীর কথা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি সজীবভাবে প্রচলিত ছিল, তখন উপযুক্ত গুরুর অধীনে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছাত্রগণ এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এখন যোগসিদ্ধগুরু নিতান্তই দুর্ল্লভ, তাহার উপর অনেক প্রবঞ্চক সহজে যোগ শিখাইব বলিয়া ধর্ম্মের দোকান খুলিয়া অনেক সরলচিত্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

যোগশাস্ত্রের অনেক ভাষ্য ও বৃত্তি আছে। ব্যাসভাষ্য, বিজ্ঞানভিক্ষুরচিত যোগবার্ত্তিক, বাচস্পতি-মিশ্রবিরচিত তত্ত্ববৈশারদাখ্য ভাষ্য টীকা, নাগেশভট্টরচিত সূত্রভাষ্যবৃত্তিব্যাখ্যা, অনন্তরচিত যোগচন্দ্রিকা, আনন্দশিষ্যরচিত যোগসুধাকর, উদয়শঙ্কররচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ, উমাপতি ত্রিপাঠিকৃত যোগসূত্রবৃত্তি, ক্ষেমানন্দদীক্ষিতকৃত ন্যায়রত্নাকর, বা নবযোগকল্লোল, গণেশদীক্ষিতকৃত পাতঞ্জলবৃত্তি, জ্ঞানানন্দকৃত যোগসূত্রবিবৃতি, নারায়ণভিক্ষু বা নারায়ণেন্দ্রসরস্বতীকৃত যোগসূত্রগূঢ়ার্থদ্যোতিকা,

ভবদেবকৃত পাতঞ্জলীয় অভিনবভাষ্য, ভবদেবকৃত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পণ, ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডাখ্যবিবৃতি বা ভোজবৃত্তি, মহাদেবপ্রণীত যোগসূত্রবৃত্তি, রামানন্দসরস্বতীকৃত যোগমণিপ্রভা, রামানুজকৃত যোগসূত্রভাষ্য, বৃন্দাবনশুক্লরচিত যোগসূত্রবৃত্তি, শিবশঙ্করকৃত যোগবৃত্তি, সদাশিবরচিত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তি, রাঘবানন্দযতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য, শ্রীধরানন্দযতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। এই সমুদয় গ্রন্থের কিছু কিছু আলোচনা করিলে আর কিছু না হউক যোগসিদ্ধিসমূহ যে কাল্পনিক নহে, পরন্তু সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, যতদিন আমরা পুনর্ব্বার এই সাধনপথ অবলম্বন না করিব, ততদিন ভারতের যোগিগণ কি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব না।

আমরা সংক্ষেপে পাতঞ্জলদর্শনে কথিত যোগসিদ্ধিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করিলাম।

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। ১৬

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে বস্তুমাত্রেরই তিনপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে। এই পরিণামত্রয়ে সংযম করিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ, সমুদয় বিষয় জানিতে পারা যায়।

শব্দের অর্থ প্রত্যয়াদিতে সংযম করিলে সমুদয় প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারা যায়। সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথা জানিতে পারা যায়। অন্য লোকের মুখের বিকার প্রভৃতি কোন লক্ষণে যদি সংযম অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে অপরের চিত্তে কি আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার নাম পরচিত্তজ্ঞান। শরীরের রূপে সংযম করিলে অন্তর্ধানবিদ্যা লাভ হয়। এমন করা যাইতে পারে যে যোগী বসিয়া রহিয়াছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না।

তাহার পর মৃত্যুকাল এবং কখন কি বিপদ ঘটিবে তাহা জানিতে পারা যায়। হস্তী বা সিংহের ন্যায় বললাভ করা যায়। সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। চন্দ্রে সংযম করিলে তারা সকলের ব্যূহ বা সংস্থান বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারা যায়। ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করিলে তারকা সমূহের গতি জানিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্য এই উপায়েই সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শরীরের মধ্যে নাভিস্থলে ষোড়শদল চক্র আছে, তাহাতে সংযম করিলে দেহের ভিতর নাড়ী প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়। কণ্ঠকূপে অর্থাৎ জিহ্বামূলের গর্ত্তে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কণ্ঠকূপের নিম্নদেশে কূর্ম্ম-নামক নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রে সংযম করিলে সিদ্ধ দিব্যপুরুষগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সর্ব্বজ্ঞতা-লাভেরও উপায় আছে।

আমরা কিছুদিন অতীত ভারতের শাস্ত্র ও সাধনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন তাহার প্রতি আবার অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক না করিয়া এই সমুদয় সাধনের প্রতি আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে তাহাতে আমাদেরও উপকার, জগতেরও উপকার। ইহাই প্রকৃত উপকার।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র

কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি

দেশবন্ধু শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের অভিভাষণ।

(১)

আজিকার এই সভায় আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি করা উচিত ছিল। কেন না বঙ্কিম-সাহিত্য আমার অপেক্ষা আপনাদের মধ্যে অনেকেই বেশী জানেন। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সভাপতি করিলে আপনারা তাঁহার নিকট অনেক নূতন বিষয় শুনিতে পারিতেন। আমার নিকট আপনারা সে আশা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি এত অধিক ব্যতিব্যস্ত যে আজ আমি আপনাদের নিকট আছি, কিন্তু কাল আমি কোথায় থাকিব তাহার স্থিরতা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তি নয়,—যদিও তিনি খুব প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষই ছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ। বঙ্কিম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস—দুই ই। দুঃখের বিষয় এইরূপ একটী গভীর ও জটিল বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার মত শুভ অবসর সম্প্রতি আমার নাই। কিন্তু বাংলার একটা যুগ-সাহিত্যের যিনি স্রষ্টা, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে আপনাদের সে আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

(২)

দশ বৎসর অতীত হয়, যখন "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদনের ভার আমার উপর ছিল, তখন ঐ পত্রিকার ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা "সচিত্র বঙ্কিম-স্মৃতির সংখ্যা" বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

ঐ স্মরণীয় সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি ১৬ জন বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমসাহিত্যকে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিয়াছিলেন। আজিকার এই সভায় বঙ্কিম সংখ্যার "নারায়ণ" খানিকে পুনরায় মুদ্রিত করিয়া যদি আপনারা বিতরণ করিতেন, তাহা হইলে আমি খুব সুখী হইতাম।

(৩)

সমগ্র এবং সম্পূর্ণ বঙ্কিম সাহিত্যের সমালোচনা একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে আপনারা আশা করিতে পারেন না। তাহার জন্য একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে হয় এবং অদ্যাবধি সেই গ্রন্থের অভাব বাংলা সাহিত্যের দুরপনেয় কলঙ্ক। আপনারা অনেকে হয়ত জানেন অথবা শুনিয়াছেন যে, আমি বাংলার ও বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া সাহিত্যে আমার একটা দুর্নাম আছে। এজন্য অনেক সাহিত্য-রথী আমার মধ্যে বিশ্বাত্মবোধের একান্ত অভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং উষ্মার সহিত সে কথা তাঁহারা ভাষায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমি সেজন্য লজ্জিত নই। এমন কি আজ বাংলার যুগ-সাহিত্যের একজন স্রষ্টা, নেতা ও ত্রাতার স্মৃতিশেখরের দিকে ঊর্দ্ধে করজোড়ে তাকাইয়া বাঙ্গালীকে, আবার আমি বলিতে সাহস করিতেছি যে, ভাই বাঙ্গালী,—তুমি তোমার বাংলাকে ভুলিও না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি তুমি বাংলাকে ভুল, বাংলার অতীতের ইতিহাস খুঁজিয়া না দেখ—বাংলার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম না বুঝ,—বাংলার ন্যায় দর্শন, বাংলার স্মৃতি, বাংলার তন্ত্র ও দীক্ষা প্রণালী, বাংলার সমাজ-বিন্যাস, বাংলার সাহিত্য—এক কথায় বাংলার সভ্যতাকে প্রাণপাত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না কর, তবে তুমি বাঙ্গালী হইলেও বঙ্কিম-স্মৃতিকে অপমান করিবার জন্য এ সভায় উপস্থিত থাকিও না। মনে রাখিও —"বন্দে মাতরম্" বাংলার গান—ভারতবর্ষের নহে। তথাপি ভারতবর্ষকে এই মহাগীতি, এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মনে রাখিও বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই, পৃথিবীর এই মহাপ্লাবনে সে হয়ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। (যদিও বাঙ্গালী-প্রধানদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রথমে ইহার অসত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।) ইহা পলাশী-প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জীর্ণ দ্বারে ক্লাইবের পদাঘাতও নয়। আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম,—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,—তাহা অপেক্ষাও শোণিত-পিচ্ছল। ইহা অহিংসা নহে—কিছুতেই নহে! আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী কি বাঙ্গালী পড়ে নাই? উপন্যাস ও আর্ট হিসাবে ইহার সমালোচনা এখন স্থগিত থাকুক। বঙ্কিমের পরে বাংলাদেশ উপন্যাসে ছাইয়া

গিয়াছে। বাংলার আধুনিক উপন্যাস-সমুদ্র যদি কেহ মন্থন করিতে চান, তবে দেখিবেন বিরংসার বিষে, —এবং তাহাও আমি বলি, ফেরঙ্গ-বিরংসা,—বাংলার তরুণ তরণী আকণ্ঠ নিমজ্জমান। এত যে বিষ,—তাহা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সত্য হয়, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি—"লাখে না মিলিল এক" একটাও নীলকণ্ঠ আমি বাংলায় পাইলাম না—এই আমার আক্ষেপ। স্বদেশীর আমল হইতে আমি দুই চক্ষে চাহিয়া আছি—এবং সেই হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের নাম গন্ধ ইহাতে নাই। ইহাতে Comte এর Positivism থাকিতে পারে, Europe এর দুর্দ্ধর্ষ Nation-idea থাকিতে পারে, Middle Ageএর সন্ন্যাস থাকিতে পারে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিত্রণে অসঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী Romanticism থাকিতে পারে, আর্টের মাপ-কাঠিতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনার অপরিহার্য্য ত্রুটী থাকিতে পারে—পারে কি, হয়ত আছে। কিন্তু তথাপি ইহাতে বাঙ্গালী আছে—এমন বাঙ্গালী আছে যে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন কি ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাঁড়াইতে পারে। আমি আবার বলি —বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—অন্য কিছু হইতে বলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ (যদিও এই সভার সভাপতিত্বের সম্মান তাঁহার জীবিতকালে একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয় যে সম্প্রতি কোন মতেই তাঁহার নাগাল আমরা পাইতেছি না) এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাংলা দেশের বা বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আজ-কাল কেবল ম্যাপেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংলা দেশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, তাহা হইলে তখন বাংলা সাহিত্য পড়িয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংলা এমন একটা দেশের সাহিত্য যে দেশ কোনও কালে বর্ত্তমান ছিল না।"

আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, বঙ্কিম-সাহিত্য এইরূপ বক্ষ্যমান আধুনিক বাংলা সাহিত্য নয়। ইহা এমন একটা সাহিত্য যে বঙ্গ দেশ লুপ্ত হইলেও এই সাহিত্য পড়িয়া জ্ঞানীরা নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন যে—হ্যাঁ, বাংলা নামে একটা দেশ ছিল। বঙ্কিম-সাহিত্যের ইহাই গৌরব—ইহাই মস্ত বিশেষত্ব।

(৪)

আমি বঙ্কিম-সাহিত্যকে একটা যুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যুগ-সাহিত্যের নানা দিক্ আছে। সেই নানা দিক্—বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেহের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর Europe এর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্য—আত্মস্থ,—সমাহিত, তেজঃপূর্ণ, অথচ প্রশান্ত ও গম্ভীর! ইহা সমুদ্র বিশেষ।

বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবং তাহার সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক আবেষ্টেনের মধ্যে বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার যুগের একটা প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে। ধর্ম্ম-সংস্কারে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ; সমাজ-সংস্কারে সিংহ-প্রতিম বিদ্যাসাগর; রাজনীতিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব বঙ্কিম যুগের উপর অস্পষ্ট নহে। বঙ্কিম-সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী—এই সমস্ত ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের দিক্‌পাল সংস্কারকদিগকে তখনও ভুলিয়া যায় নাই। ইহাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা তখনও সংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন।

বঙ্কিম-সাহিত্য কোন কোন দিকে এই সংস্কারযুগকে বাধা দিয়াছে এবং কোন কোন দিকে ইহাকে উন্নততর এক বিশালক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে বিচক্ষণ সমালোচকগণ—(যেমন ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি) বঙ্কিম-সাহিত্য-যুগকে হিন্দুধর্ম্মের এক নব জাগরণের যুগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহারা নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য-গুলি এবং চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনা সাহিত্যকেও অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া বঙ্কিম-যুগ সাহিত্য, বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ার মত দেখা দিয়াছে। তথাপি বঙ্কিম সাহিত্যকে আমি একটা সমন্বয় যুগের সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। ইহা কেবল প্রতিক্রিয়া যুগের সাহিত্য নহে। বঙ্কিম শুধু গীতার সমন্বয় করেন নাই, বাঙ্গলা সাহিত্যেরও একটা সমন্বয় করিয়াছেন।

(৫)

সাহিত্য-ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যতই পার্থক্য থাকুক;—বঙ্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একটা সেতু নির্ম্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ প্রতিভার বর পুত্র এই দুই মহাকবিই Europeএর সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও—সাহিত্যের দুইটি বিভিন্নক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া সব্যসাচীর মত, বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গালা—এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও ইঁহারা উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঁহারা সুবিধামত পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন নাই। যেমন ইঁহাদের পরবর্ত্তী নাটক নভেলে অন্যান্য ঔপন্যাসিক ও নাটক-রচয়িতাগণ করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং মহা দুঃখের বিষয় যে তাহা করিয়াও তাঁহারা বাহবা পাইতেছেন।

বাঙ্গলা Europe নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল Europeএর সাহিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের এরকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বাঙ্গালা তাহার সুরে

ও রূপে ফুটিয়া উঠিবে। সেই প্রস্ফুটিত, পূর্ণ-বিকশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গালা ও জগৎ ভরপুর হইবে। যদি তাহা না হয়,—যদি বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে তবে,—বাঙ্গালা সাহিত্য লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি?—তবে, বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি—? ভাই, বাঙ্গালী, বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যই অরণ্যে রোদন করিয়া গিয়াছেন?

বঙ্কিম ও গৈরিশ সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও বাঙ্গালীর সাহিত্য হইয়াছে। এই দুই মহাকবির সৃষ্ট বাঙ্গালীর সাহিত্যের মধ্যে একটা মৌলিক ও যৌগিক সম্পর্ক আছে; বা থাকা সম্ভব বলিয়াই আমি আপনাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ ও নিপুণ্ সমালোচককে এই দুই অপূর্ব্ব সাহিত্যর মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তাহা সুস্পষ্ট ফুটাইয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার মত অক্ষমের এই অনুরোধ কেবলমাত্র অরণ্যে রোদন বলিয়া অস্বীকৃত ও অগ্রাহ্য হইবে না।

(৬)

বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক,—স্বদেশী যুগে বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙ্গালায় তাহাই করিয়াছে যাহা ফরাসী দেশে, Voltaire এবং Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। এই দিক্ হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। আমার বিবেচনায়, আর অধিক বিলম্ব না করিয়া তাহা আরম্ভ করা উচিত। আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গালায় বঙ্কিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের—Voltaire ও Rousseau সাহিত্যের একটা তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ, আপনাদের মধ্যে শীঘ্রই কেহ লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেন না আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাঙ্গালার Voltaire ও Rousseau—যদিও এরূপ তুলনা সমস্ত দিক্ দিয়া সমীচিন নয়।

(৭)

বাঙ্গালার ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ এই উভয় শতাব্দীকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। হয়ত বা এই উপন্যাসগুলি তাঁহার অজ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অজ্ঞাতসারেই বা বলি কি করিয়া? যিনি "কৃষ্ণকান্তের উইল" "বিষবৃক্ষ" লিখিতে পারেন—এবং যিনি "কপাল কুণ্ডলা" সৃষ্টি করিতে পারেন—সামাজিক উদ্দেশ্যবাদ তাহার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, তিনি যে কত বড় কারিগর, কত বড় স্রষ্টা, তাহা পরিমাণ করা সহজ-সাধ্য নহে। যদি তাঁহার উপন্যাস-রচনায় কোন উদ্দেশ্যবাদ আসিয়া থাকে, তবে আমি বলিব—তাহারও উদ্দেশ্য ছিল। কেবল ছিল নয়—এখনও আছে।

(৮)

বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব" সম্পর্কে বড় আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। যে মানুষ নয়, সে

বাঙ্গালী হইবে কি করিয়া? ১২০৩ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র দিবস গণনা করিয়া গিয়াছেন। দিবস মাস হইয়াছে,—মাস বৎসর হইয়াছে,—বৎসর শতাব্দী হইয়াছে,—শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার তিনি গনিয়াছেন। কিন্তু যাহা তিনি চাহিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মিলে নাই। "মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না।" এখন আপনারা বুঝুন বঙ্কিমচন্দ্র কি চাহিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের কি পাইতে হইবে। তিনি আমাদিগকে কেবল 'ঘ্যান্ ঘ্যান্' করিতে নিষেধ করিয়াছেন—আমাদের "মধু সংগ্রহ" করিতে বলিয়াছেন—এবং আবশ্যক মত "হুল" ফুটাইতেও বলিয়াছেন। কথাটা সমীচিন কি না আপনারা প্রণিধান করিবেন। দেশ ও জগতের জন্য—অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আমাদিগকে করিতেই হইবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন বোধে হুলও ফুটাইতে হইবে।

(৯)

যেমন রাজা রামমোহন রায়ের হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নামে এক অতিপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গুরু ছিলেন, তেমনি কিম্বদন্তী আছে যে বঙ্কিমচন্দ্রেরও একজন অখ্যাতনামা তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁহার যে সমস্ত চিত্রাঙ্কনে উজ্জ্বল ও নিখুঁত হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা নাকি তাঁহার গুরুর আদর্শে। অবশ্য এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি না! তবে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ভারতীয় কিম্বা গৌড়ীয় নহে, ইহাই আমার মনে হয়। East India Companyর মাল লুণ্ঠিয়া অতর্কিতভাবে কোম্পানীর নিরীহ সিপাহীদিগকে খুন করিয়া,—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশবাসীকে অন্ন দেওয়া; পরোপকারের—বিশেষতঃ দেশাত্মবোধের এই ভয়াবহ উৎকট আদর্শ কেন তিনি অঙ্কিত করিলেন—বুঝিতে পারি না। সন্ন্যাসের যে আদর্শ বাঙ্গালায় আছে তাহা হয় শৈব, না হয় শাক্ত, না হয় বৈষ্ণব। আধার-ভেদে সব আদর্শই এখন মলিন। তথাপি আদর্শ হিসাবে শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের সন্ন্যাস-আদর্শ "আনন্দমঠে" স্থান পায় নাই। উহা পাশ্চাত্যের সংঘাতে গঠিত। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সন্ন্যাসের এক অভিনব মিশ্রন। সমাজ ও রাষ্ট্রে উহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় নহে—আমার এইরূপ বিবেচনা হয়।

(১০)

আমি আর আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিব না। বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় সর্ব্বজন-বিদিত "কমলাকান্তের" দুর্গোৎসবের উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদিগকে অব্যাহতি দিব।

কি স্বপ্ন একদিন এই মহাকবি দেখিয়াছিলেন! তাঁহার ঋষি-কল্প ধ্যানে মাতৃভূমির পূতোজ্জ্বল

আলেখ্যখানি সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সপ্তমী পূজার দিন অহিফেনের নেশায় কমলাকান্ত এই ধ্যানমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল। কি সে মূর্ত্তি?—

"তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির উপর সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা! হাঁ এই মা। এই জননী জন্মভূমি—কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্ন-মণ্ডিত দশভুজ, দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। * * * আমি এই কালস্রোতে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।"

"এস, ভাই সকল! আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি-ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র সকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত-মথিত-ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি,—সেই প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

ইহার পর আর আমি অধিক বলিতে পারি না—কোন বাঙ্গালীই বলিতে পারে না। আসুন—আমরা একবার হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া—দেশ-মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইয়া সমস্বরে বলি—বন্দে মাতরম্।

(আত্ম-শক্তি)

নিত্যধামে—আশুতোষ

১

বাঙ্গালার পুরুষব্যাঘ্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান,—বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা! তিনি অসময়ে চলিয়া গেলেন, হঠাৎ চলিয়া গেলেন, জীবনের কাজ যেন অনেক পড়িয়া থাকিল। তাঁহার আসনে বসিতে পারে, এমন বীরসাধক বাঙ্গালায় বা ভারতে আছে বলিয়া মনে হয় না—ভবিষ্যৎ, বিধাতার হাতে।

তাঁহার তিরোধানের সময়টি বেশ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কাজে চীনদেশে গিয়াছেন, ফিরিয়া

আসিতেছেন। এসিয়ার মানসজীবনের ছিন্ন ঐক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, আবার যাহাতে অবাধভাবে জ্ঞানরাজ্যে সকলদেশের ভিতর আদান প্রদান চলে, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ আপাততঃ তাহার ব্যবস্থার জন্য, চীনদেশে গিয়াছেন। বাঙ্গালার ত্যাগবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর মনে ব্যথা দিয়া, মহাত্মাকে নূতন রকমের ভাবনা ভাবাইয়া,—আত্মকলহে পরিপূর্ণ বাঙ্গালায় চারিদিকের বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী আক্রমণের মধ্যে অভিমন্যুর ন্যায় যুদ্ধরত; দেশে সকলই অনিশ্চিত ও সংশয়িত, ঠিক্ এমন সময়ে আশুতোষের অন্তর্ধান! যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা ভাবিয়া আকুল—আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আশুতোষের তিরোধান, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির মরিবার সূচনা, কি ভাল করিয়া বাঁচিবার সূচনা, কে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে?

বড়লোকের মরণ, আকস্মিক মরণ, অকাল মরণ,—কাজেই অনেকেই, ছাপাইয়া বাহির করার জন্য, অনেক কথা বলিয়াছেন। 'বঙ্গবাণী' কাগজে অনেক ভাললোকের লেখা বাহির হইয়াছে। যিনি যাহা জানেন, ভাল করিয়াই বলিয়াছেন—কিন্তু সাহসের কথা কম—মর্ম্মকথাও কম।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের তরঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন যখন ভাঙ্গন লাগিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্‌লাইতে পারেন, আশুতোষ ছাড়া এমন লোক দেশে কেহই ছিলেন না। একথা, সে দিনের কথা। সেদিন, আশুতোষ অনেক উপহাস, অনেক নিন্দা, অনেক বিদ্রূপ সহিয়াছেন। পূর্ব্বযুগে আর একদিন অনেক মহারথী নূতন বিদ্যায়তন গড়িতে গিয়াছিলেন, পারেন নাই। সেও আশুতোষের জন্য। সেদিনের নেতারা অনেকে ফিরিয়া আসিয়া আশুতোষের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, বর পাইয়াছিলেন, অভয়ও পাইয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গালার নববিদ্যা-অায়তনের স্বপ্ন যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা আশুতোষেরই জন্য, আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁহাদের বিদ্যালয়ে নহে।

নূতন বাঙ্গালার নূতন লাট একদিন চঞ্চলমতি বাঙ্গালীর শত শত ছেলের লেখাপড়ার পথে চিরকালের মত কাঁটা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পারেন নাই,—আশুতোষের জন্য। আজকার লাটও গায়ে হাত তুলিতে গিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন—কেমন শক্ত চিজ্ ছিলেন, এই পুরুষব্যাঘ্র আশুতোষ! চদিকেই সংগ্রাম, দেশের সঙ্গে—বিদেশের সঙ্গে। ইহার ভিতর বিজয়ী বীর আশুতোষ দেশকে কাঁদাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। আমাদের শক্তি নাই, আশুতোষ সম্বন্ধে ঠিকমত ভাবিতে—তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ, অনেক দূরের কথা! মহতের ভাবনা ভাবুন আজ তাঁহারা, যাঁহারা সত্য সত্য মহৎ। দেশবন্ধু দাস আজ কি করিবেন? তাঁহার অনেক কাজ—সময় নাই। কিন্তু আশুতোষের ভাবনা আজ কে ভাবিবে? অধিকার আছে কয়জনের? বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গার জন্য যে দিন তিনি আশুতোষের মুখোমুখি হইয়াছিলেন, সেদিনও তিনি ভক্তি করিতেন আশুতোষকে,—অন্তরের সহিত।

কিন্তু সেদিন, তিনি শুনিয়াছিলেন এক আজবদেশের ডাক! আজ তিনি অন্য পথের পথিক। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি দখল করিয়াছেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয় দখল করিতে চেষ্টান্বিত হইবেন?

পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আজ কোথায়? বহুকাল পূর্ব্বে রোমনগরে বিশ্বমানবের মহাসাধনার যে স্বপ্ন বিবৃত করিয়া বিশ্বপণ্ডিতের সভায় তিনি বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, সেই স্বপ্নকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে আশুতোষ প্রাণপাত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পতাকা কে ধরিবে? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কি খদ্দর লইয়াই থাকিবেন? হীরেন্দ্র নাথ—শান্ত সাধু হীরেন্দ্রনাথ—সরকারী বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াও মাড়াইলেন না; একাগ্রচিত্তে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অংশ সুবিপুল বাধা অতিক্রম করিয়াও গড়িয়া তুলিলেন। তিনিও তাঁহার দেহ, প্রায় পাত করিয়াছেন, আজ কি তিনি আসিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের পতাকা ধরিতে পারেন না? আশুতোষ যে বাঙ্গালী, আশুতোষ যে এ কালের জ্ঞান-প্রচারক ব্রাহ্মণ! একাধারে ব্যাস ও চাণক্য। কোন্ বাঙ্গালী, কোন্ হিন্দু আজ উদাসীন থাকিবে?

২

ইংরাজের শাসনব্যবস্থা একটা বিরাট্ বিশাল কল। যেমন জটিল, তেম্‌নি ভারি। ইহাতে হৃদয় নাই, রস নাই। শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত বলেন—There is no human element in it. রেলষ্টেশন, ডাকঘর, কাছারী, আদালত, স্কুল, কলেজ, সবই তাই। এই যন্ত্রে যাহারা চালিত ও তাড়িত, তাহারা নিষ্পেষিত ও মুহ্যমান। এই যন্ত্রের যাহারা চালক তাহাদেরও অবস্থা তথৈব চ। তাহারাও প্রাণহীন কাঠের পুতুল। মহাত্মা গান্ধি বলিতেছেন—'পালাও, পালাও'—ইহার বাহিরে আসিয়া তপস্যা কর, দরকার হয় হাত তুলিও না, কথা কহিও না,—নিঃশব্দে নিষ্পেষিত ও দলিত হইয়া মরিয়া যাও। কি হইবে, ভগবান্ জানেন! কিন্তু আশুতোষ পলান নাই, এই কলের ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। অন্ততঃ দুইটি বিভাগে ইহার চালক হইয়াছিলেন:—এক বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক হাইকোর্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কি করিয়াছিলেন—সকলেই জানেন। He added the human element in it—বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মানবহৃদয় যোজনা করিয়াছিলেন। এক নম্বরের জন্য ছেলে ফেল হইয়া ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহার অন্তিমের আর্ত্তনাদ কেহ শুনিত না, চোখের জল কেহ দেখিত না—কে শুনিবে? মানুষ নয়—সে যে কল! একদিন বেশী কামাই করিয়া ফেলিয়াছে, গরীবের ছেলে,—ছেলে পড়াইয়া লেখা পড়া শেখে কলিকাতায়,—এবার আর পরীক্ষা দেওয়া হইবে না, আর এক বছর পড়, এই ছিল আগেকার কলের কাজ! আশুবাবু এ সব বদ্‌লাইয়া কলের ভিতর মানবহৃদয় যোজনা করিয়াছিলেন। কে পারে? রক্তমুখের নীলনয়নের রুদ্রদৃষ্টির সম্মুখে বুক

ফুলাইয়া মাথা তুলিয়া কে এমন পারে ? অবারিত দ্বার—প্রবেশের নিষেধ নাই, বিশালবপুতে ভৃত্যের দ্বারা তৈল মর্দ্দন চলিতেছে, আর হাজার লোকের হাজার আব্‌দার হৃদয় দিয়া শুনিতেছেন, কেবল কাণ দিয়া নহে, এমন ধারা কে পারে ?

বিচারালয়ে কি তিনি করিয়াছেন, তাহা জানেন বিশেষজ্ঞেরা--নরেশবাবু কিছু বলিয়াছেন। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বলিবেন !

৩

সাংসারিকের সুবুদ্ধি, তুলনা করিতে চাহে না—কারণ সব সময়ে তুলনা করা নিরাপদ নহে। আবার যাহারা ভাবুক, তাহারা বলিবে তুলনার সময় নহে। কিন্তু তুলনা না করিলে বুঝিবারই উপায় নাই। যাহারা সামাজিক সৌজন্য হিসাবে শোক করে না, যাহারা কেবল স্রোতে ভাসিয়া চলে না, যাহাদের নিজের বলিতে একটা জীবন আছে,—সে জীবন ছোটই হোক্ আর বড়ই হোক্—তাহারা আজ তুলনা না করিলে বুঝিতে পারিবে না।

আশুতোষ একজন মানুষ বা বড় মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটা বড় জাতির এবং একটা বড় দেশের একটা খুব বড় রকমের সঙ্কট ও সংশয়ের যুগের একটা বিশেষ রকমের সাধনাদর্শের একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল মূর্ত্তি। ইতিহাসে বিধাতার খেলা আছে—সে খেলার ক্রীড়নক আছে। এই ক্রীড়নকগুলি অতিমানুষ। একটা যুগের গোটা জীবন (The corporate life of the age) তাঁহাদের ভিতর ফুটিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল—বড় বড় মানুষ,—কেহ ভাবে, কেহ জ্ঞানে—কিন্তু তাঁহাদের জীবনে কত পরিবর্ত্তন দেখা গেল ! এই পরিবর্ত্তন, বিকাশের ধর্ম্ম এবং স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে মিলাইয়া প্রতীচ্যের যন্ত্রের দ্বারা প্রাচ্যকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—এই মতই আজ ইঁহাদের মত। সুতরাং এই মতকেই বাঙ্গলার মত বলিব না তো কি করিব ? আশুতোষ এই আদর্শের মূর্ত্তি, তাঁহার জীবন এই সাধনের পথ।

পুরাতন একটি জাতির ঘাড়ের উপর গোটা পৃথিবীর বিচিত্র সাধনা ও সভ্যতা একেবারে হুড়্‌মুড়্ করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে—সব ওলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছে, এখন এই জাতি বাঁচিবে, কি মরিবে, হিসাব করিয়া কেহই বলিতে পারে না। যাহারা বলে বাঁচিবে, তাহারা জানে না, কেমন করিয়া বাঁচিবে, কোন্ পথে বাঁচিবে। বাঁচিবার শক্তি আছে কিনা, বোঝা চাই—আর কোন্ পথে বাঁচিবে, সেই পথ চেনা চাই। আশুবাবু বাঙ্গালী জাতির শক্তিমত্তার একটি প্রচণ্ড পরিচয়। আরও অনেকে এ পরিচয় দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন--কিন্তু আশুবাবু খুব বড় পরিচয়। আজ যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কাহারও সহিত তুলনা না করিয়া বলিতেছি—যাঁহারা গত শত বৎসরে গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে আশুবাবু সকলের অপেক্ষা বড় পরিচয় ;—অন্ততঃপক্ষে আজ এইরূপ মনে হইতেছে

তুলনা ঠিক অবশ্য হয় না। আশুবাবু দেখাইলেন—বাঁচিবার শক্তি আছে, খুব আছে। এখন চাই অনুশীলনের ব্যবস্থা—সেই ব্যবস্থাই আশুবাবুর প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতীচ্যকে গ্রহণ কর—সাধনা ও তপস্যার দ্বারা, বিজ্ঞাপনের ফাঁকির দ্বারা নহে, বেদান্তের বুক্‌নির দ্বারা নহে, অলৌকিকের দোহাইএর দ্বারা নহে—গ্রহণ কর, জীর্ণ কর,—ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে; এ সংগ্রামে তুমি ধ্বংস হইবে না—ইহাই তোমার আত্মরক্ষার পথ।

জীবনের জটিলতা বাড়িয়া চলিতেছে। ভারতবর্ষ এ জটিলতায় অনভ্যস্ত। আবার এ জটিলতা ভারতের নিজের সৃষ্টি নহে, তাহার নিজের ঐতিহাসিক প্রাক্তনের ফলস্বরূপে এই জটিলতা তাহার ভিতর হইতে গজাইয়া উঠে নাই। বাহিরের ধাক্কায় ভারতবর্ষ বাধ্য হইয়াছে, এই জটিলতার আবর্ত্তের মধ্যে পড়িতে। কিন্তু আমরা আর পারি না ! কি ভয়ানক প্রতিযোগিতার কুরুক্ষেত্র ! ! আমরা যে শক্তিহীন। এখন যদি কেহ বলে, এ কুরুক্ষেত্র মায়া, মিথ্যা, তাহা হইলে আমরা অনেকেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। একটা স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সান্ত্বনা পাই। এই প্রকারের একটা অবস্থা দেশে আসিয়াছে। এই মন্ত্রের যাঁহারা ঋষি, তাঁহারা হয়ত একটা পথ সত্য সত্যই দেখিতেছেন, কিন্তু শিষ্যেরা অনেকেই কোন সত্যপথ দেখে নাই, আলস্যের মোহস্বপ্নের মধ্যে সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ খুঁজিতেছে। এ দুর্দ্দশা আসিয়াছে—বেশ সুনিশ্চিত মরণের পথ। গেরুয়া ও ভিক্ষার ঝুলি, (যাহার ভদ্র নাম চাঁদার খাতা), অলৌকিকের দোহাই, আর সাহেবের সার্টিফিকেট, এই একদিক্। আর একদিকে ভিতরে ভোগের বিষানলের দাহ, আর দায়ে পড়িয়া ত্যাগের ধ্বজাবহন—এই সঙ্কট—এই সংশয়। ইহার ভিতর আশুতোষ ছিলেন, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত কুরুক্ষেত্রের বিজয়ী যোদ্ধা। কিন্তু তাঁহার ভিতরে ছিল—কোমল ও মধুর বৃন্দাবন।

৪

বিচারপতি ও আইনজ্ঞ আশুতোষের কথা বিশেষজ্ঞের মুখ হইতে যৎকিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছে। পৃথিবীতে নানাদেশ, নানাজাতি,—প্রাচীন ও নবীন। সকলেই অগ্রসর হইতে চায়, বসিয়া থাকিলেই মরিতে হইবে। অতএব "আগে চল্ আগে চল্ ভাই।" এই আগাইয়া চলা কেমন ? ইহাতে মারামারি, রক্তারক্তি, কাড়াকাড়ি আছে ;—পশুর মত, রাক্ষসের মত। কিন্তু ভিতরে দেবতাও আছে। জ্ঞানে, ভাবে, সামাজিক ব্যবস্থায় অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব কুড়াইতে হইবে ; ভাল জিনিস যেখানে যা আছে, সংগ্রহ করিতে হইবে। নূতন, পুরাতন, দেশী বিদেশী ছোট বড় সবই লইতে হইবে। প্রাচীন ভারতে আইন ছিল, অন্যান্য প্রাচীন দেশেও আইন ছিল। কোন দেশ চল্‌তি আইনের নজিরের সম্মান করে বেশী, কোন দেশ আইনের মূল সূত্রের ব্যাখ্যার সম্মান করে বেশী। আশুবাবুর বিচার ছিল, দুদিকের মর্য্যাদা সমানভাবে রক্ষা করিয়া চলা। বিচারপতির আসনে বসিয়া আশুতোষ কেবল

বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে; কেবল ভারতবর্ষ নহে, ইংরাজ সাম্রাজ্যও আশুবাবুকে বিচারপতি করিয়া উপকৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। আইনের পণ্ডিত নরেশবাবু একথা বলিয়াছেন। এখন দরকার—আশুবাবুর রায়গুলি একত্র করা, বিশেষজ্ঞের টীকাটিপ্পনি সহ ছাপানো, আর ভারতের আইনের ছাত্রদের পড়ানো।

আশুবাবুর স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে। একটা কলেজের নাম বদ্‌লাইয়া আশুবাবুর নামে তার নাম করা খুবই ভাল কাজ, বিশেষতঃ সেই কলেজ যখন আশুবাবুরই গড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা বড় বাড়ির নাম 'আশুভবন' করাও ভাল—কিন্তু এসব সস্তা কাজ। মর্ম্মর মূর্ত্তিও তাই। শোকের আগুন জ্বলিয়াছে, এ অনল যদি হোমানল হয়, এ শিখা যদি নির্ব্বাপিত না হয়, এ অগ্নি যদি গার্হপত্য অগ্নি হইয়া বাঙ্গালীর ও ভারতের সাধনক্ষেত্রে নিত্য আহুতি পায়, তাহা হইলে আশুবাবু আমাদের জীবনে নিত্যজীবন পাইবেন—তিনি অমর, আমরা তাঁহার অমরত্বে অমর হইয়া উঠিব।

আশুবাবু তাঁহার মর্ম্ম কথা সব বলেন নাই, কিন্তু অনেক বলিয়াছেন। Oriental Conference-এর দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা কয়জনে বুঝিয়াছি, কয়জনে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মনীষি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আসিয়া তাহা কি বুঝাইয়া দিতে পারেন না? আর আশুবাবুর কীর্ত্তিরক্ষার জন্য এককোটি টাকা কি বেশী? রাসবিহারী ঘোষ কি আর বাঙ্গালায় নাই, তবে আর ধনের উপাধির সম্মান, দেশের লোক কেন করিবে?

সিউড়ি,
২রা শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

মফঃস্বলের কাগজ

আমাদের দেশে মফঃস্বল হইতে যে সব খবরের কাগজ বাহির হয়, সেগুলি যদি বেশ ভাল রকম করিয়া চলে, তাহা হইলে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় নানারূপ অন্তরায় আছে, যাহার জন্য মফঃস্বলে ঠিক কাগজের মত কাগজ একখানিও নাই বলিলে কাহারও দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি হইতে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করার কথা হয়। যিনি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী তিনি আমার সুপরিচিত। সেই কাগজখানির জন্য আমি কিছু লেখা দিয়া আসি। সেই লেখাগুলি অবশ্য ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু

কোনদিকেই কাগজখানিকে একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অভিমুখী করা হয় নাই। তবে আশা আছে, ভবিষ্যতে হইতে পারে। সেই কাগজখানির জন্য যে লেখাগুলি দিয়াছিলাম, সেগুলি নীচে ছাপানো হইল, মফঃস্বলের কাগজগুলিকে কাগজের মত কাগজ করার ইচ্ছা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এগুলি পড়িয়া দেখিবেন। এই লেখাগুলি সম্বন্ধে কেবল একটা কথা বলা দরকার। যে কাগজের জন্য এই লেখা দেওয়া হইয়াছিল, সেই কাগজের যিনি কর্ত্তা, তিনি বর্ণাশ্রমব্যবস্থার বিশেষ পক্ষপাতী, সুতরাং তাঁহার যাহা নীতি, ইহাতে সেই নীতিরই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই স্বাধীনতার যুগে সকলেরই নীতি একরূপ হইবে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই, যাহা হউক একটা নীতি থাকা চাই, স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করা চাই এবং সেই মূলনীতির আলোকে যাবতীয় ব্যাপার বুঝিয়া লওয়া চাই। একজনের নীতির সহিত অপরের নীতি না মিলিতে পারে, কিন্তু সেজন্য বিরোধ হওয়ার কোন কারণ নাই। প্রত্যেকেই যদি সরলভাবে এক একটা নীতির অনুবর্ত্তন করেন, আর মতসহিষ্ণুতার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে বৈষম্যের মধ্যেও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

অভিবাদন ও সঙ্কল্প

ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে প্রণাম! তিনি গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী। এই গো ও ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন আর্য্য-সমাজের দুইটী দিক্। একটী গোলকের যেমন দুইটী মেরু, এই মেরুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যেমন গোলকের প্রতিষ্ঠা, তেমনি এই ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজের একদিকে গো, আর একদিকে ব্রাহ্মণ। সমাজদেহ কৃত্রিম নহে, মানবের মনঃ-কল্পিত নহে, মানবের পার্থিব জীবনের সুবিধা-সাধনের একটী সাময়িক চুক্তির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত নহে। বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন সমাজ সেই ব্রহ্মণ্যদেবের মূর্ত্তি। আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এবং যাবতীয় পুরাণে এই কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গো-মাতার পূজা যে দিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, গোজাতির রক্ষা ও সেবা, যেদিন আমাদের একটী অবশ্য-পালনীয় প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের সমাজ তাহার প্রকৃত অবস্থায় আসিয়াছে। গো-মাতার দান ঘৃত; বেদ বলিয়াছেন, আয়ুই ঘৃত। যে ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ব্যবহার করিতে পারে, নীরোগ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া তমঃ ও রজোগুণকে পরাজয় করিয়া সে ব্যক্তি সাত্ত্বিক অবস্থা অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করে। ঘৃতের নাম হবিঃ, ইহা দেবতাদের ভোজ্য, অগ্নির নাম হব্য বাহন; ইনি দেবগণের মুখ। মন্ত্রের দ্বারা এই হব্য, যথাবিধি উৎপাদিত পবিত্র অগ্নিতে সমর্পিত হয়, দেবগণ তাহা গ্রহণ করেন। মনুষ্যগণ দেবতার সেবা করে, দেবতারা পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়া মানবের সেবা করেন। দেবতায় ও মানবে এই প্রকারের প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বিশ্বব্যবস্থাকে কল্যাণের পথে চালাইয়া লইয়া যাইতে

ছেন। এই যে সহযোগ, ইহাই বর্ণাশ্রমের প্রাণ। এই কারণে গো-মাতার সেবা ও পূজা বর্ণাশ্রমের প্রথম ও প্রধান কথা।

* * * *

মানুষ সামাজিক জীব। এই সংসারকে স্বীকার করিয়া, এই সংসারের ও সমাজের কর্ত্তব্য-সমূহ যথাযথ পালন করিয়া মানুষকে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে হইবে। মানব অস্ফুট সচ্চিদানন্দ, কর্ম্মের বিধানে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে তাহাকে বিকশিত হইতে হইবে—প্রস্ফুট সচ্চিদানন্দ হইতে হইবে। সুতরাং এই সমাজ ও সংসার,—এই সামাজিক ও সাংসারিক কর্ত্তব্য, পরিত্যাগ করিবার অধিকার সাধারণ মানুষের নাই, এই সংসারে প্রত্যেক মানুষের একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে, এই স্থান ও কর্ত্তব্য তাহার স্বধর্ম্ম। জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মের দ্বারা এই স্বধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে আমরা বাধ্য। মানুষ মাত্রেই ঋণী, পিতৃ লোকের নিকট ঋণ, দেবতার নিকট ঋণ, ঋষিগণের নিকট ঋণ। ইহা ছাড়া পিতা মাতা ভ্রাতা, ভগ্নি, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী সকলের নিকট মানব ঋণী। মানবের অপরাধ পদে পদে। জীবন ধারণ করিতে হইলে, সর্ব্বদাই অসংখ্য জীব জন্তুর প্রাণনাশ করিতে হয়, এ এক পাপ। শাস্ত্র তাহাকে পঞ্চসূনা বলিয়াছেন। যথাবিধি স্বধর্ম্ম পালন করিয়া সামাজিক ও সাংসারিক কর্ত্তব্য সমূহ শান্ত ও অনলসভাবে প্রতিপালন করিয়া আমাদিগকে ঋণমুক্ত হইতে হইবে। ঋণমুক্তি ব্যতীত আত্মার উন্নতি নাই। সংসারে থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিয়া এই উন্নতি ক্রমেক্রমে সাধন করিতে হইবে। সাংসারিক জীবনের শেষ উন্নতির নাম ব্রাহ্মণত্ব লাভ। কাজেই বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণ। এই কারণে সনাতন সমাজের একদিকে গো, আর একদিকে ব্রাহ্মণ। এই সমাজ, আদর্শ সমাজ। এখন এই সমাজ নাই, ইহার স্মৃতিমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। একদিন ইহা ছিল; এবং এই সমাজের ব্যবস্থা যখন প্রকৃতির সনাতন বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন সেই সমাজ আবার আসিবে। পুরাণে আছে দেবাপি ও মরু নামক দুইজন রাজা কলাপগ্রামে যোগসমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এই কলিযুগ আর বেশী দিন থাকিবে না। এই কলিযুগের অবসানে সত্যযুগের অভ্যুদয়ে সেই দুইজন রাজা আসিয়া আবার বর্ণাশ্রমাচার প্রবর্ত্তিত করিবেন।

* * * *

বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে স্বার্থের সংঘর্ষ নাই, প্রতিযোগিতা নাই, নানা প্রকারের অধিকারের দাবী লইয়া নিত্য বিসম্বাদ নাই। সেখানে সকলেই আত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য তপস্যারত, সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে একনিষ্ঠ। গো-ব্রাহ্মণের হিত বলিতে এই আদর্শ

সমাজের রক্ষা বুঝায়। যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও বেদপুরুষ, এই সমাজ তাঁহার দেহ, এই সমাজের তিনি রক্ষক ও প্রতিপালক। আজ এই সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মানুষে মানুষে হিংসা, ঘৃণা, প্রতিযোগিতা। চারিদিকেই কুরুক্ষেত্র, কিন্তু নিরাশ হওয়ার কারণ নাই; সেই ব্রহ্মণ্যদেব রহিয়াছেন, তাঁহার বাঁশী বাজিতেছে, প্রেমধাম বৃন্দাবনে আবার মিলন হইবে;—এই বৃন্দাবন বর্ণাশ্রমাচার-বৃক্ষের অমৃতময় ফল।

* * * *

ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে পুনরায় প্রণাম। এই প্রাচীনতম সমাজ, এই শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সদাচার তিনি রক্ষা করুন। আমাদিগকে তাঁহার দাস হইবার উপযুক্ত করুন। এই গোব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সনাতন সমাজ আবার তাহার প্রাচীন গৌরব ও সজীবতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, কেবল ভারতের কল্যাণ নহে, সমগ্র পৃথিবীর পরম কল্যাণ সাধিত হইবে। এই কারণেই তিনি জগতের হিতকারী। আমরা সেই জগতের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবের চরণে প্রণাম করি। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও দেশের ভিতর যে হিংসানল ধুমায়িত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া সোণার সংসার দগ্ধ করিতেছে, সেই অনল চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হউক, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব তিনি কৃষ্ণরূপে সকলের মন প্রাণ আকর্ষণ করুন, গোবিন্দরূপে সকলের ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে পরিচালিত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রাজবাড়ী সহর হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইতেছে, তাহার নাম "সংসার"। বর্ত্তমান সময়ে যাহা প্রয়োজন, তাহা সাধন করিতে হইলে নানাস্থান হইতে নূতন নূতন সংবাদ-পত্র বাহির হওয়া আবশ্যক, সুতরাং এই সংবাদ-পত্র-প্রবর্ত্তন একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই কর্ম্মের প্রারম্ভে আপনারা সাধুগণ, বন্ধুগণ, দেশের কল্যাণকামিগণ সকলেই করুণা করিয়া বলুন, এই কার্য্যে মঙ্গল হউক্, মঙ্গল হউক। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে কেবল পরিচালকগণের মঙ্গল নহে, দেশের, রাজা, প্রজা সকলেরই মঙ্গল। সকলের ভিতরে প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত হউক; প্রত্যেকের প্রাণ অপরের হিতসাধনের জন্য, আপনা হইতে ব্যাকুল হউক। ইহাই সংবাদ-পত্র পরিচালনার উদ্দেশ্য, অতএব এই সংবাদপত্রের মঙ্গলে সকলেরই মঙ্গল, আপনারা প্রাণ ভরিয়া সমস্বরে বলুন—ইহার উন্নতি হউক, উন্নতি হউক, উন্নতি হউক। সমাজের জীবনে, ব্যক্তির জীবনে, অনেক গ্লানি ও ভ্রান্তি, পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সংবাদ-পত্রের দ্বারা সমাজ পবিত্র হয়, উন্নত হয়; নিখিল দেবগণ, নিখিল সাধুগণ এই শুভকার্য্যের সহায় হউন, এই সংবাদ-পত্রের পরিচালকগণ যেন, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট না হন, প্রেম হইতে ভ্রষ্ট না হন।

সংবাদ-পত্র পরিচালনা একজনের কর্ম্ম নহে, খুব বেশী শক্তিশালী ও জ্ঞানী লোকও একাকী কখনও সংবাদ-পত্র পরিচালনা করিতে পারেন না। ইহা দশজনের কাজ, দশজনে একতাবদ্ধ হইয়া একটী সাধারণ লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমবেত ভাবে কর্ম্মরত হইলেই সংবাদ-পত্র

পরিচালিত হয়। পৃথিবীতে সঙ্ঘশক্তি বা সমবায়-শক্তি অর্থাৎ দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার সামর্থ্য যত বাড়িতেছে, সংবাদ পত্রেরও তত উন্নতি হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রকারের সুবৃহৎ সংবাদ-পত্রসমূহ প্রচারিত হয়, তাহা এখনও আমাদের কল্পনাতীত। বর্ত্তমান যুগের যাহা লক্ষণ, অর্থাৎ জনসাধারণের জাগরণ, তাহা নিরাপদ পথে পরিচালনা করিতে গেলে, সংবাদ-পত্রকে প্রধান শক্তিরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের দেশে সংবাদ-পত্র পরিচালনার প্রধান অসুবিধা, সংবাদ-সংগ্রহ। উত্তমরূপ সংবাদ সংগৃহীত না হওয়ায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ কাগজই সংবাদ-পত্র নহে, মতপত্র—News Paper নহে, Opinion Paper। এখন প্রয়োজন, প্রত্যেক গ্রামে কতকগুলি করিয়া সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি গড়িয়া তোলা, যাহারা প্রকৃত প্রয়োজনীয় সংবাদ জোগাইতে পারিবে। কিন্তু ইহা বড় কঠিন কথা, পাশ্চাত্য দেশে সংবাদপত্র পরিচালনা শিখাইবার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। স্কুল নহে, কলেজ নহে, একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যাপার কত বড়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা দরিদ্র, দরিদ্র লোকেই সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের সেবা করিতে চাহে, তাহারা অর্থ ব্যয় করিতে পারে না, সুতরাং সংবাদ দিবার জন্য ভাল লোকও নিযুক্ত করিতে পারে না। এখন আমাদের দেশে সকল বিভাগেই ত্যাগশীল কর্ম্মীর প্রয়োজন, যাহারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য পরিশ্রম করিবে, এই প্রকারের সংবাদদাতা প্রথম প্রয়োজন, নতুবা প্রকৃত সংবাদপত্র অসম্ভব।

কিন্তু সংবাদ কি? কোন্ সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক? যাঁহারা সংবাদ পাঠাইবেন, তাঁহাদের এই বোধ News-sense থাকা আবশ্যক। নতুবা এমন সংবাদ আসিবে, যাহার প্রচার, ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থমূলক বা নিন্দামূলক। এ প্রকারের সংবাদ প্রচারিত হইলে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইতে পারে। সংবাদ-পত্র এ যুগে একটী শক্তি—খুব বড় শক্তি। শক্তি সুপথে পরিচালিত হইলে কল্যাণ হয়, কুপথে চালিত হইলে অকল্যাণ হয়। সাধনার দ্বারা শক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু শক্তিকে সংযত করিয়া সুপথে পরিচালনা করা বড়ই কঠিন। সুতরাং সংবাদ-পত্র পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। সকলের কল্যাণ হউক; সকলের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হউক, প্রত্যেকে নিজকে ও অপরকে বুঝিতে শিখুক, এবং এই বোধ ও জ্ঞানের দ্বারা সকলেই উদার হউক, ইহাই এ যুগের প্রার্থনা।

সর্ব্বেঽত্র সুখিনঃ সন্তু, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, ন কশ্চিৎ দুঃখ মাপ্নুয়াৎ॥

এই মন্ত্র সফল হউক।

সংবাদ-পত্র পরিচালনায় সংবাদ-সংগ্রহ বিশেষতঃ স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ বড়ই কঠিন কথা। তাহার

পর কিছু কিছু মতামত দিতেই হবে, এই মতামত দেওয়া বড়ই কঠিন। পৃথিবীর সকল দেশেই দলাদলি খুব বেশী। অধিকাংশ সংবাদ পত্রই, একটি বিশেষ দলের। কোনও দলের নহে, নিরপেক্ষ ভাবে সত্য ও কল্যাণ চাহে, এই প্রকারের সংবাদ-পত্রই বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজন। সুতরাং, মতামত দিবার সময় ব্যস্ত হওয়া অসঙ্গত। কোন পক্ষের কোনও মত প্রচারিত হইবামাত্র অপর পক্ষ তাহার দোষ দেখাইয়া দেয়,—এই প্রকারের বাদানুবাদ যেন যুগধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। সকল পক্ষের মত ধীরভাবে আলোচনা করিয়া, বিবিধ মতের কুয়াশা ভেদ করিয়া, সত্যের সূর্য্যালোক অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে এখনও সংবাদ-পত্রের গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা খুব বেশী নহে, তবে সুখের বিষয় সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দারিদ্র্য অবশ্য একটী কারণ, কিন্তু লোকের পড়িবার বা শিখিবার প্রবৃত্তিও তেমন নাই, এই প্রবৃত্তি চেষ্টা করিয়া বাড়াইতে হইবে। মফঃস্বলের একখানি কাগজ ঠিক্‌মত চালাইতে হইলে সংক্ষেপে অনেক জিনিষের আবশ্যক। প্রথমতঃ সমগ্র পৃথিবীর সংবাদ প্রয়োজন; পৃথিবী জুড়িয়া যাহা যাহা হইতেছে, তাহার অনেক কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে কোনও লোকই স্বতন্ত্র নহে, প্রত্যেকেই অপর সকলের সহিত নাড়ীর টানে বাঁধা হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের হিতাহিতের সহিত প্রত্যেক দেশের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং বিশ্বের সংবাদ চাই। তাহার পর ভারতের সংবাদ; তাহার পর বাঙ্গালার সংবাদ, তাহার পর জেলার ও মহকুমার সংবাদ। এই সংবাদ নানারূপ;—সাহিত্যের সংবাদ, বিজ্ঞানের সংবাদ, রাজনীতি ও সমাজের সংবাদ, যুদ্ধ, বিগ্রহ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের সংবাদ, সকলই দরকার। একটি মহকুমার সদরে অনেক লেখাপড়া জানা লোক আছেন, অনেক এম, এ, বি, এ, আছেন, অনেক বড় বড় কাগজও আসে এবং অনেকেই তাহা পড়েন। তাঁহারা ঐ সমুদায় কাগজ পত্র পড়িবার সময় যদি চিন্তা করেন, যাহা যাহা পড়িলাম, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ দেশের লোকের জানা আবশ্যক, এইটুকু চিন্তা করিয়া যদি তাঁহারা বাঙ্গালায় কিছু কিছু লিখিয়া স্থানীয় সংবাদ পত্রে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে মফঃস্বল হইতে খুব ভাল কাগজ বাহির হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্য করিবেন, তাঁহাদেরও সাধনা আবশ্যক; অর্থাৎ কোন্ কোন্ সংবাদ দেশের লোকের জানা আবশ্যক, তাহা নির্দ্ধারণ করা অনায়াস-সাধ্য নহে। তবে কাজ যদি আরম্ভ করা যায় এবং সকল সময়েই চিন্তা ও চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে অল্প দিনেই আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবেন এবং দেশেরও মহৎ উপকার সাধিত হইবে। যাহারা এই কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদের দৃষ্টি (outlook) খুব উদার ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই। প্রার্থনা করি, ভগবানের কৃপায় এই সাধু চেষ্টা সফলতা লাভ করুক।

* * * * *

গত বৎসর অর্থাৎ ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে আমরা রাজবাড়ী গিয়াছিলাম, সে-সম্বন্ধে 'সংসার' কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। বক্তৃতার সারসঙ্কলনে যে সমুদয় কথা আছে, পরে তাহার অনেক কথা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে বলিয়াই ঐগুলি স্থায়ীরূপে মুদ্রিত করা গেল।

"বঙ্গদেশের সুপরিচিত ধর্ম্মবক্তা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি এ ভাগবতরত্ন বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহোদয় স্থানীয় হরি-সভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এখানে শুভাগমন পূর্ব্বক গত ১লা, ২রা, ৩রা মাঘ তিনদিন এখানে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন, সকল শ্রেণীর লোকে তাঁহার এই বক্তৃতা শুনিয়া আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইয়াছেন। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদের আগমন রাজবাড়ীতে নূতন নহে, হরি-সভার ৩য় বার্ষিক অধিবেশন হইল, এই তিনবারই তিনি আসিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সরস্বতী পূজার উৎসবে রাজা সূর্য্যকুমার বিদ্যালয়ের আহ্বানে তিন বার আসিয়াছেন। এই সহরের সকলেই তাঁহাকে জানেন, তাঁহার এবারের বক্তৃতা কিছু নূতন রকমের, এবং বক্তৃতার প্রারম্ভেই সে কথা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম দিনের বক্তৃতার প্রধান কথা ছিল—

ধর্ম্ম-সমন্বয়

তিনি বলিলেন—পূর্ব্বকালে হিন্দু যাহা ভাবিত, দায়ে পড়িয়া এখন আর তাহা ভাবে না। এখন অনেক হিন্দু মনে করে—ভরেতবর্ষে যদি সকলেই হিন্দু হইত তা'হইলে কোনও গোলযোগ থাকিত না, মুসলমান মনে করে—ভারতবর্ষে যদি সকলেই মুসলমান হইত তাহা হইলে খুব ভাল হইত। খৃষ্টানও তাহাই মনে করে অর্থাৎ খৃষ্টান ভাবে—সকলেই যদি খৃষ্টান হইত তাহা হইলে স্বার্থ-সামঞ্জস্যে গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু যিনি সত্য,—যাঁহাকে আমরা সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর বলি, তিনি বলিতেছেন, তাহা হইবে না,—হইবার নহে। ভারাতবর্ষ কেবল হিন্দুর নহে, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা পার্শীর নহে, ভারতবর্ষ সকলের, ভারতবর্ষ বিশ্ব-মানবের। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা বড়ই কঠিন। তাঁহার চেষ্টায় ও নেতৃত্বে ভারতে ক্ষাত্র-শক্তি ধ্বংস হইয়াছে, সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অনায়াসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর বুদ্ধদেব, তিনি ভারতের বাণী,—আত্মার অমরতা ও অহিংসের বাণী সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। আজ ভারতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের ও জাতির লোক সমবেত। কোনও ধর্ম্ম মিথ্যা নহে, সকল ধর্ম্মই সত্য; কোন ধর্ম্মই ধ্বংস হইবে না, সকল ধর্ম্মই থাকিবে। এক ধর্ম্ম হইতে মানুষকে ধর্ম্মান্তরিত করার চেষ্টা উচিত নহে, প্রত্যেকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হউক, অথচ অন্য ধর্ম্মা-

বলম্বি লোকের সহিত প্রেমে মিলিত হউক, হিন্দুধর্ম্মের বহু পথ ও বহু মত; কিন্তু প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভূমি দেখিতেন; ইহাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বা বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। সেকালের ব্রাহ্মণেরা যেমন হিন্দু ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও মত, মানুষের অধিকার ও রুচিভেদে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে ঐক্য দেখিতেন, সেইরূপ একালের প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা কেবল হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা নহে; পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের সার্থকতা বুঝিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য দর্শন করিবেন। ইহাই নব্যভারতের সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু এই আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের তিনি অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু সেই বৈষ্ণবকে নিজের মতে আনেন নাই, পূর্ব্বে তাহার যে মত ছিল, সেই মতেই তাহাকে দৃঢ় করিয়াছেন। যখন হরিদাসের যখন বিচার হয়, সে সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও এই সমন্বয়ের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিকের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লেখা অসম্ভব। সমুদায় বক্তৃতাটী লিখিয়া না হইলে বুঝিতে পারা যায় না, তিনি কি বলিয়াছেন।—প্রথম দিনের বক্তৃতাতেই তিনি বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, সে বিষয় আলোচনা করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য মানিতে চাহে না, এ বিষয়ের আলোচনা করিলেন এবং বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন য়িহুদি ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহাও খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যেমন জন্মান্তর-বাদ, কর্ম্ম, মন্ত্র, দেবতা, পিতৃলোক প্রভৃতি। বেদ কি, মন্ত্র কি, বেদ সম্বন্ধে মীমাংসকগণের মত; নৈয়ায়িকগণের মত, পানিনীর মত ও বেদান্তের মত আলোচনা করিয়াছিলেন।

* * * * * *

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি আয়র্লণ্ড দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈট্‌স, যিনি এ বৎসর নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিলেন, তাঁহার জীবনের উপর ভারতবর্ষের সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত অধিক, ইহা তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সূক্ষ্ম জগতে যে সমুদয় দেবযোনী রহিয়াছে, কবি ঈট্‌স তাহাদের দেখিতে পান, তাঁহার ভিতরে এই সমুদয় শক্তি বিকশিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক কনাণ্ডয়েল দেবযোনীগণের ফটোগ্রাফ তুলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানব জাতির চিন্তা ও সাধনা কোন্ দিকে চলিতেছে। আমরা দেবতায় বিশ্বাস করি, দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ আছে, মানুষ দেবতার সেবা করিবে, দেবতা মানুষের সেবা করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ব্যবস্থা। অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে দেবকৃত্য, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি করিতে চাহে না, ইহা অন্যায়। ত্রিগুণের সীমা ছাড়াইয়া

গেলে দেবঋণ বা পিতৃঋণ থাকে না, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গুলি যথা-নিয়মে করা আবশ্যক; না করিলে পতন হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক সময় বাদানুবাদ হয়, কিন্তু ভগবদ্গীতা ভাল করিয়া পড়িলে বুঝিবেন, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ নাই। গীতার ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, ১২শ অধ্যায়ে ভক্তির কথা বলিয়াছেন। এইস্থানে, বক্তা গীতার অনেক গুলি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। গীতার এই অংশগুলি পড়িলে বুঝিবেন, জ্ঞানই বলুন আর ভক্তিই বলুন তর্ক করিবার বিষয় নহে, নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিবার জিনিষ। গীতায় সকল প্রকারের সাধনার কথাই আছে, কিন্তু গীতা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন নৈতিক জীবনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাই গীতা-ধর্ম্মের প্রধান কথা। ধর্ম্ম কেবল একটী পারলৌকিক ব্যাপার নহে, পরলোক সত্য কিন্তু ধর্ম্ম-জীবন গঠনে অলৌকিকের বা অদৃষ্টের দোহাই দিবেন না, তাহা হইলে পতিত হইবেন। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় শেষে তিনি বলিলেন যে ধর্ম্মে-সাধন বা ভগবত-অন্বেষণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এক নিত্য ও পারমার্থিক সত্যের জন্য মানবাত্মার যে আকুলতা তাহা একটী মৌলিক বৃত্তি, ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা ও বাংলা বৈষ্ণব কবিতা আবৃত্তি করিয়া, এই কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিলেন।

* * * * * *

তৃতীয় দিনের বক্তৃতা। মানুষের চৈতন্য বা জ্ঞান এখন যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, তদপেক্ষা বৃহত্তর চৈতন্য রহিয়াছে। বক্তৃতার প্রারম্ভেই বক্তা মহাশয় বিলাতের নানারূপ পরীক্ষার ফলের দ্বারা তাহা বুঝাইলেন। একজন লোককে হিপনোটাইজ্ করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহার ভিতর হইতে পর পর দুইটি দুইরকমের মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে উন্নততর মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে এই সব বিষয়ের অলোচনা চলিতেছে। মানুষের এই বৃহত্তর চৈতন্যই ধর্ম্ম সাধনার প্রধান কথা। আত্মায় বিশ্বাস না হইলে, ভগবানে বিশ্বাস হয় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তি বড় এবং ভক্ত বড়, একথার অর্থ ইহাই। তাহার পর তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি, শ্রীবৃন্দাবন কি, তাহা বিস্তারিত রূপে বুঝাইলেন।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান সংখ্যা, ষষ্ঠ খণ্ডের দশম সংখ্যা। আশ্বিন মাসে দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইবে। ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে সপ্তম খণ্ড আরম্ভ হইবে ও মাসে মাসে এক একখণ্ড করিয়া বাহির হইবে। নূতন খণ্ডের প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রীশ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে একটি করিয়া প্রবন্ধ, আর বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে একটি করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অর্থাৎ পূর্ণ একখণ্ডের মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ভি, পি, তে লইলে গ্রাহককে ৩।০ তিন টাকা চারি আনা লাগিবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

সিউড়ী, বীরভূম
শ্রাবণ, ১৩৩১

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে—"সুখ পাঠ্য", "প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৸০ ও কাপড় বাঁধা ৸৶০। ভি পি ১৲ ও ১৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান— কৃষ্ণনগর—শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুকক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান
(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

Bl 829.
3 Sept 1925.
BENGAL LIBRARY
19 SEP 1925
Birbhum 19.9.25
BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE CALCUTTA

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৬—১২
১৩৩১

ললিতমাধবে শ্রীরাধা

২ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৩ সতীশচন্দ্রের গান

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

ISSUE(S) MISSING

ললিতমাধবে শ্রীরাধা

১। নাটকের ইতিহাস ও অভিনয়

দেবাদিদেব মহাদেবের লীলা অতিশয় অদ্ভুত। আমরা জানি তিনি শ্মশানবাসী, ভূত প্রেত লইয়াই তাঁহার খেলা। তিনি বিভূতিভূষণ ও দিগম্বর, তাঁহার গলায় হাড়ের মালা। তিনি জ্ঞানী ও যোগীশ্বর। কিন্তু তিনি গোপীশ্বর; ব্রহ্মকুণ্ডের তীরদেশ প্রফুল্ল কমলসমূহে নিরন্তর শোভিত, তিনি সেই ভূমির অধীশ্বর। বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন রস-সদন, তিনি সেই রসের তত্ত্ববিৎ। ব্রজগোপীর প্রেমের খেলা, আনন্দের মেলা জগতে যাহাতে প্রচারিত হয়, রসজ্ঞ ভক্তগণ যাহাতে তাহা আস্বাদন করেন, সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টিত। শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনিই স্বপ্নে আদেশ করিলেন। সেই আদেশে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় এই ললিতমাধব নাটক রচনা করিয়াছেন।

আজ দীপান্বিতা মহোৎসব। গোবর্দ্ধনের আরাধনার জন্য রাধাকুণ্ডের তটবর্ত্তী মাধবীমাধব-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। সেই ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ বিধানের জন্য এই নাটকের অভিনয়।

২। বিন্ধ্যগিরির তপস্যা

হিমালয় পর্ব্বতের সম্মানের সীমা নাই। পর্ব্বতগণের মধ্যে তিনি যে কেবল মস্তকের উচ্চতায় সকলের বড় তাহা নহে, তাঁহার কন্যা পার্ব্বতীকে বিবাহে দান করিয়া তিনি মহাদেবকে জামাতা করিয়াছেন। ত্রিলোকে তাঁহার গৌরবের সীমা নাই। বিন্ধ্য-পর্ব্বতও ইচ্ছা করিলে উচ্চতায় হিমালয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন। একদিন তিনি সুমেরুপর্ব্বতকে জয় করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহর্ষি অগস্ত্যের সম্মান

রক্ষা করিবার জন্য তাহা করেন নাই। ইহা বিন্ধ্যপর্ব্বতের মহত্বের পরিচায়ক। হিমালয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মার নিকট বিন্ধ্য এই বর পাইলেন, "হে বিন্ধ্য, তুমি অভিলাষানুরূপ দুইটি বালিকা পাইবে। সেই দুই বালিকার যিনি পতি হইবেন, তিনি যুদ্ধে মহাদেবকে পরাজিত করিবেন, আর সমুদয় জগৎ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইবে।

৩। কংসের প্রতি দৈববাণী

দেবকীর কন্যাকে কংস যখন বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন সেই কন্যা আকাশে উত্থিত হইয়া এইরূপ দৈববাণী করিয়াছিলেন।

যস্তঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে
যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদুঃ।
আনন্দামৃতসিন্ধুভিঃ প্রণয়িনাং সন্দোহমানন্দয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী কন্দ্যোঽদ্য চন্দ্রোদয়ে॥
মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বোবা পরশ্বোঽথ বা
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামষ্টৌ মহাশক্তয়ঃ।
বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণৌ গৃহীতা যয়োঃ॥

হে কংস, পূর্ব্বজন্মে তুমি কালনেমি ছিলে, উন্নত চক্রের দ্বারা পূর্ব্বজন্মে যিনি তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, যাঁহার চরণপদ্ম দেবগণসেবিত বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন, এবং যিনি জগতের মূল, তিনি আজ চন্দ্রোদয়ের সময় আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার আবির্ভাব নিবন্ধন যাঁহারা প্রণয়ী, তাঁহাদের আনন্দামৃতসমুদ্র উল্লসিত হইয়াছে।

আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মাধুর্য্যশালিনী অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা, ইঁহারা কল্য হউক আর পরশ্ব হউক, ক্ষিতিমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন। ঐ অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে সদ্‌গুণমণ্ডিতা বলিয়া দুইটি ভগিনী অতিশয় প্রসিদ্ধা হইবেন। ঐ দুই ভগিনীকে যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি রাজেন্দ্র হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাস্ত করিতে পারিবেন।

ইহাই যোগমায়ার দৈববাণী। কংস ইহাই শুনিয়াছিলেন। দৈববাণী শ্রবণের পর

কংস জাতহারিণী পূতনাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছে। পূতনা সদ্যোজাত শিশুগণকে বিনাশ করিতেছে।

৪। রাধা ও চন্দ্রাবলী

শ্রীমতী চন্দ্রাবলী মূলে চন্দ্রভানু রাজার কন্যা, আর শ্রীমতী রাধিকা বৃষভানু রাজার কন্যা। ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগবন্মায়া ভগবতী, এই কন্যা দুইটিকে তাঁহাদের প্রথম মাতার গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের মহিষীর গর্ভে স্থাপন করেন। প্রথম কন্যা চন্দ্রাবলী, আর দ্বিতীয়া শ্রীরাধা। কন্যা দুইটি ভূমিষ্ঠ হইলে পূতনা তাহাদের অপহরণ করিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পুরোহিত এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাক্ষসনাশক মন্ত্র পাঠ করিলেন। পূতনা বিত্রস্ত-বুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে চন্দ্রাবলী নামক কন্যাটি এক নদীর স্রোতে পড়িয়া গেল। এই নদী বিদর্ভদেশের অভিমুখে ধাবিত। দেবী পৌর্ণমাসী পূতনা রাক্ষসীর ক্রোড় হইতে শ্রীমতী রাধিকাকে লাভ করিলেন। কেবল শ্রীরাধিকা নহেন, দেবী পৌর্ণমাসী আরও পাঁচটি কন্যা পাইলেন। এই পাঁচটি কন্যা ললিতা, ইনি শ্রীরাধার সখী; পদ্মা, ইনি চন্দ্রাবলীর সহচরী; মঙ্গলচরিত্রসম্পন্না ভদ্রা, কল্যাণদায়িনী শৈব্যা আর শ্যামকান্তি-বিশিষ্টা শ্যামা। দেবী পৌর্ণমাসী এই পাঁচটি কন্যাকে গোপীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি যশোদার ধাত্রী মুখরাকে কহিলেন—"বৃদ্ধে, এই কন্যাটির নাম শ্রীরাধা, ইহার গুণের তুলনা নাই। এটি তোমার জামাতা বৃষভানুর কন্যা, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর।" এই বলিয়া দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে মুখরার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধার দ্বিতীয়া সখী বিশাখা যমুনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, জটিলা তাহাকে লাভ করিল। চন্দ্রাবলীর কথা এখনও বলা হয় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে তিনি বিদর্ভদেশগামিনী নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। বিদর্ভদেশের রাজা ভীষ্মক তাঁহাকে লাভ করিলেন। এই কন্যার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময়ে বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবকীকন্যা যোগমায়াদেবীর আদেশে, গোবর্দ্ধন ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের গৃহবাসী জাম্ববান্ এই কন্যাকে কোন প্রকারে লইয়া আসিলেন। ইনিই করালার নপ্‌ত্রী চন্দ্রাবলী।

দেবী পৌর্ণমাসী ও গার্গী, এই দুই জনের কথোপকথন হইতে আমরা পূর্ব্বের রহস্য-

ময় ইতিহাস জানিতে পারি। এই ইতিহাস কেবল অলীক কল্পনা নহে, ইহার ভিতর অনেক গভীর তথ্য নিহিত রহিয়াছে, যাঁহারা যথাযথ চিন্তা করিবেন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিব না।

বৃন্দাবনে যে সকল গোপকন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, আর দ্বারকাপুরে রাজরাজেশ্বর হইয়া যাঁহাদিগকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চন্দ্রভানু, বৃষভানু প্রভৃতি গোপদিগের কন্যাগণ, আর ভীষ্মক, সত্রাজিৎ প্রভৃতি রাজন্যগণের কন্যাগণ, ইঁহারা তত্ত্বতঃ অভিন্ন, দেহের দ্বারা ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই চরম রহস্য আমাদের ধ্যানের বিষয়। রুক্মিণী = চন্দ্রাবলী, সত্যভামা = রাধা, জাম্ববতী = ললিতা, পদ্মা = নাগ্নজিতী, শ্যামলা = লক্ষণা, মাদ্রী, ভদ্রা = , শৈব্যা = মিত্রবৃন্দা, বিশাখা = ; ইহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

৫। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

ললিতমাধব নাটকের আলোচনা করিতে হইলে, প্রারম্ভে রসতত্ত্বের দুএকটি কথা আলোচনা করিতে হইবে। এই নাটকের টীকার প্রারম্ভেই পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন,—শ্রীরূপগোস্বামী মহোদয় শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থে, "সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ" কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ' উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই ললিতমাধব নাটকের রচনা।

বৈষ্ণবদর্শনের রসতত্ত্ব আলোচনা করিবার সময় আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, এখানে ভাব লইয়া কারবার। পূজ্যপাদ গোস্বামীগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়া যে রসের ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সেই রস পরমহংসগণের ও আত্মারাম মুনিগণের সেব্য। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামীপাদগণের জীবন, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন আলোচনা করিলেই একথা বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপার সত্য সত্য নাই। আত্মসুখের বা কামের গন্ধমাত্রও এখানে নাই।

পার্থিব ব্যাপারসমূহকে তাহাদের ভাবের দিক্ হইতে দেখা যায়। পারমার্থিক জগতে প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটি নিত্য সত্তা আছে, তাহার নাম ভাব। ভাব ও তত্ত্ব

একই কথা। ভাব যখন সহৃদয়জনের হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তখন তাহার নাম রস। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ভাবুক ও রসিক হইয়া এই ভাগবতরস পান কর। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এই লীলা শ্রবণ করিতে হইবে।

এইবার শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিগ্রন্থে কথিত 'সম্ভোগ' এর লক্ষণ আলোচনা করা যাইতেছে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

দর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতির আনুকূল্যময় নিষেবনের দ্বারা যুবক যুবতীর যে উল্লাস হয়, সেই উল্লাসের উপর সম্যক্‌রূপে আরোহণ করিয়া যে ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই ভাবের নাম সম্ভোগ।

এই সংজ্ঞার সাহায্যে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে দর্শন বা আলিঙ্গন সম্ভোগ নহে। তজ্জাত যে উল্লাস, তাহাও সম্ভোগ নহে। সেই উল্লাসকে অবলম্বন করিয়া যে ভাবের খেলা হয়, তাহাই সম্ভোগ। ললিতমাধব নাটকের আলোচনায় আমরা দেখিব স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন ও আলিঙ্গন যেখানে নাই, সম্ভোগের সেইখানেই পূর্ণতা।

এই সম্ভোগ দ্বিবিধ। মুখ্য ও গৌণ। জাগ্রদবস্থায় মুখ্যসম্ভোগ চারি প্রকার। পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানে সংকীর্ণ সম্ভোগ, কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসে সম্পন্ন সম্ভোগ, সুদূর প্রবাসে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ এইরূপ—

দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥

পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক নায়িকার বিয়োগ ঘটিলে—এবং সাক্ষাৎ অতিশয় দুর্ল্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

স্বপ্নাবস্থায় যে সম্ভোগ হয়, তাহা গৌণ। স্বপ্ন আবার দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশেষ। পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় গৌণ সম্ভোগের সকল কথা বলেন নাই। কারণ উহা অতিশয় উল্লাসপ্রদ। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণে আমরা দেখিলাম উহা স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের সম্ভোগ নহে। এখানে ত্যাগই ভোগ।

৬। পরকীয়বাদ

দেবী পৌর্ণমাসী তাঁহার গুরুদেব নারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণলীলার যাবতীয় রহস্য পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয় শ্রীমতী রাধিকাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু সেই বিবাহ মায়ার বিবর্ত্তমাত্র। "মায়াবিবর্ত্তোঽয়ং"—টীকা—অন্যধর্ম্মস্যান্যত্রারোপো বিবর্ত্তঃ। সাদৃশ্যজ্ঞানেন শুক্তৌ রজতবন্মায়ায়াং শ্রীরাধায়া আরোপোঽয়ং কৃতঃ। শুক্তি বা ঝিনুক দেখিয়া মনে হয় উহা রৌপ্য বা রজত। শুক্তির সহিত রজতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য-জ্ঞানের দ্বারাই এইরূপ হইয়া থাকে। একের ধর্ম্ম এই প্রকারে অন্যত্র আরোপিত হইয়া থকে। ইহারই নাম বিবর্ত্ত। এই প্রকারে মায়াতে শ্রীরাধার আরোপমাত্র করা হইয়াছে।

নচেদ্বিরিঞ্চে-র্বরামৃতেন সমৃদ্ধের্বিন্ধ্যনগস্য তপঃপ্রসূনৈ-র্গুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতা-কারি-মাধুরী-মকরন্দাং রাধিকা-বৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্‌জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত।

নতুবা ব্রহ্মার অত্যুৎকৃষ্ট বরের প্রভাবে সৌভাগ্যশালী, পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের তপস্যা-কুসুম-গুম্ফিতা, মাধবহৃদয়ের স্নিগ্ধতাবিধায়িনী মাধুরী-মকরন্দ-স্বরূপা বৈজয়ন্তী-সদৃশী শ্রীমতী রাধাকে কি মাধবব্যতীত অন্য কেহ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে?

শ্রীরাধার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ যেমন মায়ার বিবর্ত্তমাত্র, অর্থাৎ সত্য করিয়া বিবাহ হয় নাই, অথচ লোকে মনে করিল বিবাহ হইয়াছে, সেইরূপ চন্দ্রাবলী-প্রভৃতি অন্যান্য ব্রজবালিকার বিবাহও মায়ার বিবর্ত্ত।

পতিষ্বন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিদুর্ঘটং॥

গোপেরা মনে করিতেন আমরা এই সকল কুমারীদিগের পতি। কিন্তু কেবল-মাত্র তাহা মনেই করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গোপীদিগের এই দারতা বা ভার্য্যাত্ব ঐ মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত। সত্য করিয়া কিছুই নহে। গোপেরা অর্থাৎ ঐ কুমারীদিগের পতিরা কখন ইঁহাদিগকে ভার্য্যা বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেও পারিতেন না।

গোপীদিগের সহিত তাঁহাদের পতিদিগের এই যে সম্বন্ধ, ইহা অতিশয় রহস্যময়।

কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য যে খুব কঠিন, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্, তিনি প্রপঞ্চে প্রকট হইয়াছেন। ইহাই মূল কথা। এই কথাটি হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া যদি স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের কথাটি বুঝিয়া উঠা, কঠিন নহে। আমরা এই সংসারে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারা কেহই সত্য করিয়া নাই, কেবল আছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই মনে হওয়ার মূলে, সত্য করিয়া শ্রীভগবান্ই আছেন। শ্রীভগবান্ আছেন ইহা যতক্ষণ না বুঝিব, ততক্ষণ মনে হইবে সংসারের যাবতীয় পদার্থ সত্য করিয়াই আছে, আর তিনি আছেন ইহা যখন সত্য করিয়া বুঝিব, তখন দেখিব আর কিছু সত্য করিয়া নাই, সকলই মায়ার বিবর্ত্ত আর এই মায়া-বিবর্ত্তে সত্য করিয়া তিনিই কেবল আছেন। একমাত্র কৃষ্ণই পতি, সকলেরই পতি, ইহাই পারমার্থিক সত্য। অপর কাহারও সত্য করিয়া পতিত্ব নাই, কেবল মায়ার বিবর্ত্তে ঐরূপ মনে হয়। যেখানে ভগবান্ নাই সেখানে ঐ ব্যবহারই সত্য, আর ভগবান্ যেখানে আছেন সেখানে ব্যবহার কেবল ব্যবহার অর্থাৎ কেবল মনে-হওয়া মাত্র। শ্রীবৃন্দাবনে তাহাই হইয়াছে। শ্রীভগবান্ প্রকট হইয়াছেন, অতএব ব্যবহারকে আর সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না। পরকীয়বাদ কি, তাহা এই প্রকারের চিন্তাপদ্ধতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যে অষ্ট কুমারীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বভাবতঃই গরিষ্ঠ অনুরাগ। শতাধিক ষোড়শ সহস্র ব্রজ-কুমারীর সহিত গমন করিয়া চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পঞ্চকুমারী "হে কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে অধিশ্বরি, নন্দগোপসুতকে আমার পতি করুন, আপনাকে প্রণাম করি" এই মন্ত্র জপ করিয়া চণ্ডিকার অর্চ্চনা করেন। কামরূপদেবী কামাখ্যাকে যদি কুমারীগণ পূজা করেন তাহা হইলে তাহাদের কামনা সিদ্ধ হয়, গর্গাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। এই কারণেই ব্রজবালাগণ কামাখ্যাদেবীর পূজা করেন। শ্রীরাধিকা গর্গাচার্য্যেরই উপদেশানুসারে সূর্য্যদেবের পূজা করেন।

শ্রীরাধা ও ব্রজগোপী সম্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা ললিতমাধব নাটকের প্রারম্ভেই আছে। তাহার পর ঐ নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে যে সব কথা আছে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

৭। সায়ং উৎসব—প্রথম অঙ্ক

বিচলিতুমসমর্থং ব্যোম্নি মুক্তপ্রতিষ্ঠৈ
সময়-বিপরিণামাদ্বীর্য্যবিধ্বংসনেন।
শিথিলতরকরেণালম্ব্যভাণ্ডীরচূড়াং
চরমগিরিশিখায়াং লম্বতে ভানুবিম্বং॥

দিবা অবসানপ্রায়। ক্ষীণবল সূর্য্যমণ্ডল শিথিল করে ভাণ্ডীরবনের বৃক্ষচূড়া অবলম্বন করিয়া আশ্রয়শূন্য গগনমণ্ডলে অস্তাচলশিখা আশ্রয় করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাখালবালকসঙ্গে গাভীপাল লইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বদিকে ধূলি উড়িতেছে, সেই ধূলিতে পূর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন। গোপীগণের চিত্ত উৎকণ্ঠিত, কৃষ্ণদর্শনের জন্য হৃদয় নিরতিশয় আকুল। এই অবস্থায় নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময়ে দূরে যেন এক ধ্বনি উঠিল—

মঞ্চস্তাদুরিষ্ঠ পদ্মে মুকুটবিয়চনং মুঞ্চ পিঞ্ছেন ভদ্রে
শ্যামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিন্‌টি মা জাগুড়াণি।
শারিপাঠাদ্বিশাখে ব্যুপরম কবরীসংক্রিয়া মুজ্ঝ শৈব্যে
পূর্ব্বাং বেবেষ্টি কাষ্ঠাং সুরভিখুরপুটী পাংশুপিষ্টাতপুঞ্জঃ॥

পদ্মে, উঠ, উঠ, ক্ষুদ্রখট্টা হইতে গাত্রোত্থান কর; ভদ্রে আর ময়ুরপুচ্ছের দ্বারা মুকুট রচনা করিও না; শ্যামে, মালা রচনা হইতে ক্ষান্ত হও; ললিতে, আর কুঙ্কুমচূর্ণ করার প্রয়োজন নাই; বিশাখে, শারিকাকে আর পাঠ করাইতে হইবে না, বিরত হও; শৈব্যে, কবরী-সংস্কার শেষ কর; ঐ দেখ গাভীগণের ক্ষুরোদ্ধূত সৌরভযুক্ত ধূলিরাশি পূর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে।

গোপীগণ নিজ নিজ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া পথিপার্শ্বে সারিসারি দাঁড়াইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গাভীপাল তখনও অনেক দূরে, কিন্তু গোপীগণের উৎকণ্ঠার যে সীমা নাই। গোপীগণ কিরূপভাবে আসিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন।

ধন্যে কজ্জলমুক্ত বামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদা
সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা।

গণ্ডোদ্ভত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা
মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি॥

ধন্যে, তুমি যে বামনয়নে কজ্জল দাও নাই; পদ্মে, তুমি যে দেখিতেছি চরণে অঙ্গদ পরিধান করিয়াছ; সারঙ্গি, তুমি কেবল একপদে নূপুর দিয়াছ; পালি, তোমার যে মেখলা স্খলিত; লবঙ্গি, তুমি একগণ্ডে তিলক দিয়াছ; কমলে, তুমি চক্ষুতে অলক্তক দিয়াছ; তোমরা এমন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিও না, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী এখনও অনেক দূরে বাজিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের এখানে আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আসিতেছেন। মাথুরচন্দ্র বলরামের পরিধানের বসনখানি গগনমণ্ডলের ন্যায় নীল, তাঁহার চারিদিকের রাখাল বালকগণ, নক্ষত্রমালার মত, আর সম্মুখে গাভীপাল ধবলবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কান্তি নীলবর্ণ, হস্তাগ্রে সরল যষ্টি, কটিতটে পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র, তিনি গোপিকাগণের প্রেমলক্ষ্মীর পরিপাকস্বরূপ। গাভীগণ বেগে দুই চারি পদ অগ্রে গমন করিয়া পুনরায় গ্রীবা বাঁকাইয়া পশ্চাতে চাহিতেছে। বৎসগণের প্রতি ইহাদের যত ভালবাসা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদপেক্ষা অধিক, এই কারণেই পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিতেছে। বলরাম তাঁহার সখাগণকে লইয়া স্নান করিবার জন্য যমুনায় চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন—সখে, দেখ দেখ

দ্রবন্নবধিপল-প্রকরদত্ত-পাদ্যঃ শশী
সরত্নতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্পিতার্ঘক্রিয়ঃ।
উড়ূল্লসিত-দিগ্বধূগণবিকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ
স্ফুরত্তনুরুদঞ্চিতস্মররসোর্ম্মিরুন্মীলতি॥

কন্দর্পরসতরঙ্গে ভূষিত হইয়া চন্দ্রদেব মনোহর মূর্ত্তিতে উদিত হইতেছেন। চন্দ্রকান্তমণি-সকল দ্রবীভূত হইয়া তাঁহাকে পাদ্য দিতেছে, সমুদ্র উথলিত হইয়া রত্নযুক্ত তরঙ্গের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিতেছে, দিগ্বধূগণ সমুদিত নক্ষত্রসমূহের দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

মধুমঙ্গল বলিলেন,—সখে, আকাশের ঐ চাঁদ কলঙ্কপূর্ণ, উহা দেখিয়া কি হইবে? ঐ দেখ লতাজালের মধ্যে ষোলহাজার অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখা যাইতেছে। (ইহারা ব্রজগোপী।)

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ও মধুমঙ্গলের কথা স্বীকার করিলেন। মধুমঙ্গল বলিতেছেন

কদম্বকুঞ্জের দক্ষিণদিকে নিকটেই এক রমণী আকর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

সেয়ং দীব্যতি শৈব্যায়াঃ পাবিকা বিশ্বপাবিকা।
বেণুর্যদ্বিভ্রমারম্ভে স্তম্ভমালম্বতে মম।

শৈব্যা বেণু বাজাইতেছে। ঐ বেণুর নাম পাবিকা, উহা বিশ্বপাবিকা অর্থাৎ বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক। ঐ বাঁশির বাদ্যে আমার বাঁশি স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার পর কৃষ্ণ শুনিতেছেন, ভদ্রা, বল্লকী অর্থাৎ বীণা বাজাইতেছে। বীণার স্বরে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন বল্লবী ভদ্রাও যেমন তাহার বল্লকীও তেমনি, উভয়েই আমার মন হরণ করিতেছে। শ্যামলাও বীণা বাজাইতেছে। পদ্মার প্রকোষ্ঠে অতিমধুর বলয়া-সকল বাজিতেছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দতরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট যাইবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন, এমন সময় উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের স্ত্রী কুন্দলতিকা আসিয়া উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট যাইবার জন্য আকুল। কুন্দলতিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—সুন্দর, ভারুণ্ডার গৃহমধ্যে চন্দ্রাবলী অবরুদ্ধা ছিলেন, আমি কৌশল করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছি। এমন সময়ে পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রাবলী পদ্মাকে বলিতেছেন—

"ভারুণ্ডা আমার প্রতি তর্জ্জনই করুক, আর কুলে কলঙ্কই হউক, আমার এই চক্ষুদুটি ভৃঙ্গরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-দর্শনের লোভ, ইহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত বলিলেন—কুরঙ্গি, তোমার মুখচন্দ্রের ভ্রূভঙ্গিলীলায় পরাস্ত হইয়া উজ্জ্বল চন্দ্র সভয়ে আকাশে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেখানে থাকিতে না পারিয়া তোমার ঐ বদনের সেবা করিবার জন্য তোমার দন্তশ্রেণীতে আসিয়াছে, এই কারণেই তোমার নাম চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলীর সহিত নানারূপ আলাপ হইতেছে, এমন সময়ে বিঘ্ন উপস্থিত। ক্রোধ প্রকাশ করিতে করিতে ভারুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রাবলী ও পদ্মা পলায়ন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, মাতা যশোদার নিকট গেলেন। কুন্দলতা পূর্ব্বেই সেখানে গিয়াছেন। যশোদা চিন্তা করিতেছেন, বিলম্ব হইয়া গেল, এখনও শ্রীকৃষ্ণের দেখা নাই কেন?

কুন্দলতা যশোদাকে সংবাদ দিলেন, গগনচারিণী দেবরমণীগণ হাস্য-কুসুম বর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, এইজন্যই তাঁহার বিলম্ব হইতেছে। রোহিণী বলিতেছেন রাধাও চন্দ্রাবলীর সৌন্দর্য্য দেবরমণীগণ অপেক্ষাও অধিক। যশোদা রোহিণীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন চন্দ্রাবলী নবমালিকা আর শ্রীরাধা মাধবী। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা রাধা স্বকীয় সৌন্দর্য্য-মকরন্দ-দ্বারা সর্ব্বদা আমার নেত্রভৃঙ্গের আনন্দ বিধান করিতেছে। পৌর্ণমাসী ও গার্গী সেখানে রহিয়াছেন। গার্গী কুন্দলতাকে বলিতেছেন—কুন্দলতে, তোমরা প্রতিদিন শ্রীরাধাকে গোকুলেশ্বরীর (যশোদা) গৃহে লইয়া আইস কেন? যশোদা বলিলেন—দেবি, দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীরাধাকে বর দিয়াছেন যে শ্রীরাধা আমার প্রস্তুত সামগ্রী উপভোগ করিলে দীর্ঘায়ু হইবে, এই কারণেই আমরা তাহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া আসি। পৌর্ণমাসী বলিলেন—জটিলা এজন্য বড়ই অসন্তুষ্ট, সে শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করে।

যশোদা হাস্য করিয়া বলিলেন—আমার বাছা দুগ্ধমুখ, তাহার জন্য আবার শঙ্কা!

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার ইহাই প্রধান রহস্য। ভাবভেদে রসভেদ, আর শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশভেদ। যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণ সত্যই দুগ্ধমুখ বালক, কিন্তু অন্যের নিকট অন্যরূপ। তাই যশোদার কথা শুনিয়া কুন্দলতা মৃদুস্বরে বলিলেন—রাজ্ঞীর সন্তান সত্যই দুগ্ধমুখ। তিনি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে ক্রীড়নকের মত হস্তে ধারণ করিয়াছেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। যশোদা ও রোহিণীর বাৎসল্য-রসের খেলা আরম্ভ হইল। রোহিণী দীপমালার দ্বারা সস্নেহে নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া বাল্য-বিলাস প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—মা, আমাকে মণির অলঙ্কার দাও। কুন্দলতা ঈষৎ হাস্য করিয়া পরিহাসের সহিত কৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি কুঞ্জগৃহে বহুপ্রকার ক্রীড়া করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ, এখন স্তনামৃত পান কর। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন। যশোদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; বাৎসল্য পর্য্যন্ত যাঁহার অধিকার, তাঁহার মাধুর্য্যরসের রাজ্যে প্রবেশ নাই। কাজেই যশোদা ভালমানুষের মত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"বৎস! হাসিতেছ কেন? দেখ, আজও তোমার কৌমারকাল অতীত হয় নাই, স্তনপান করায় দোষ কি?

কুন্দলতা যশোদাকে বলিলেন—ভগবতি, আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। আজ

আপনার এই বালক, বালিকাদিগের সহিত মণ্ডল রচনা করিয়া মহারাসে ক্রীড়া করিতেছেন।

মহারাস কি, যশোদা তাহা জানেন না। কাজেই তিনি কুন্দলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাস কাহাকে বলে ?

শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়াছেন। মায়ের নিকট মহারাসের কথা কেন? কাজেই ভ্রূভঙ্গি করিয়া কুন্দলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কুন্দলতা মহারাস-সম্বন্ধে বেশী কিছু যশোদাকে বলিলেন না, এইমাত্র বলিলেন যে, উহা একপ্রকার নৃত্যলীলা।

কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণপ্রান্তে গিয়া বলিলেন—রাধেশ, পিঞ্জরবদ্ধ তৃষ্ণাকুল চকোরিকা দগ্ধ হইতেছে, শীঘ্র অশোককুঞ্জের অভিমুখী হও। শ্রীকৃষ্ণ ঈঙ্গিত করিয়া কুন্দলতার অনুরোধ স্বীকার করিলেন। এইবার নন্দ মহারাজ আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। বাৎসল্যের লীলা এখনকার মত শেষ হইল, এইবার অন্য লীলা।

ললিতা শ্রীরাধাকে বকুলকাননে লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীরাধিকা ললিতাকে বলিতেছেন,—সখি, এই রাত্রির প্রশংসা কর, এই রাত্রিতে তোমরা কোনরূপ বিশেষ সুখলাভ করিবে। কুন্দলতা আসিয়া ললিতাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, ঐ নাম শুনিবামাত্র আমি যে উন্মত্ত হইলাম।

কুন্দলতা বলিলেন—সখি, অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এইরূপ। সর্ব্বদা উপভোগ করিলেও মনে হয় যেন কখন তাহা ভোগ করি নাই।

ললিতা বলিলেন—কেবল অলৌকিক বস্তুর গুণ নহে, গাঢ় অনুরাগেরও ঐরূপ স্বভাব। অনুরাগ যেখানে গাঢ়, সেখানে ঐ অনুরাগের প্রভাবে নিতান্ত অনুগত জনও ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্বের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই বলিয়া ললিতা বলিতে লাগিলেন—

নবাম্বুধরমণ্ডলী মদ-বিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যোযুবা।
সখি স্থিরপতিব্রতা নিকরনীবিবন্ধার্গল-
ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥

নবীন মেঘসমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, এমন দেহের কান্তি ; ঐ ব্রজেন্দ্র-কুল-নন্দন নবীন যুবা

বিরাজ করিতেছেন! হে সুন্দরি, যাহাদের পাতিব্রত্য স্থির, এমন রমণীদিগেরও নীবিবন্ধের অর্গলছেদন-কার্য্যে কৌতুকী তাঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিতেন, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। তিনি দেখিতেন, দুগ্ধমুখ বালক। নন্দ মহারাজাও সেইরূপ দেখিতেন। কেবল নন্দ যশোদা রোহিণী নহেন, তাঁহাদের যাঁহারা 'গণ' অর্থাৎ তুল্যাধিকারী বা একভাবের ভাবুক, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ঐভাবে দেখেন। কিন্তু ললিতা অন্যভাবে দেখিয়া থাকেন। ললিতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'নব্যযুবা' দেখিয়া থাকেন। সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের রূপের অন্যপ্রকার আকর্ষণ। তাই ললিতা পূর্ব্বপ্রকারের কথা বলিলেন। ললিতা যাহা বলিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা বহুস্থানেই কথিত হইয়াছে ;—যথা—

কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, তা'-সভার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে হেন লক্ষ্মীগণ ॥

অন্যত্র—

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে, সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে, ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥
সে ধ্বনি চৌদিগে ধায়, অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়, জগতের বলে পৈশে কাণে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, বিশেষত যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, পতিকোল হৈতে কাঢ়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে ॥
নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে, বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়, ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে, অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন্ বুলিতে বোলায় আন্, এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥

ব্রজগোপীর ভাবে হৃদয় ভাবিত করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি আস্বাদন করিতে হইবে। তাহা না করিলে ঐ কথাগুলির তাৎপর্য্য বা রস, কেবল যে বুঝিতে বা আস্বাদন করিতে পারিব না, তাহা নহে, বিপরীত বুঝিয়া ফেলিব। ভাব-রাজ্যের কথা, আগে ভাব, পরে রস ; অতএব—সাধু, সাবধান।

শ্রীবৃন্দাবন পঞ্চভাবের খেলা। প্রথম ভাবের নাম শান্তভাব। ইহার দুইটি গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ। "শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।" সেখানে কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান হয়, ভক্ত কৃষ্ণকে প্রধানতঃ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মারূপে দেখেন। দাস্যভাবে ভক্ত কৃষ্ণকে পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রভুরূপে দর্শন করেন। সেখানে প্রচুর পরিমাণে সম্ভ্রমের ও গৌরবের বোধ হইয়া থাকে। শান্তভাবের গুণগুলি দাস্যভাবে আছে, তাহা ছাড়া শান্ত অপেক্ষা দাস্যে একটি গুণ অধিক। তাহার নাম 'সেবন' বা সেবা। তৃতীয় ভাবের নাম সখ্য, ইহাতে শান্ত ও দাস্যের গুণ আছে; তাহা ছাড়া একটি নূতন গুণ আছে—

"দাস্যে সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।" সখ্যেও সেবা আছে, কিন্তু এ সেবা অন্যরূপ।

কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য,—গৌরবসম্ভ্রমহীন। অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন॥
মমতা-অধিক কৃষ্ণে—আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্।

বাৎসল্যে, শান্ত, দাস্য ও সখ্য, এই তিনের গুণ ও লক্ষণগুলি আছে। তাহা ছাড়া একটি গুণ আছে; তাহার নাম পালন। অসঙ্কোচ ও অগৌরব সখ্যের গুণ, বাৎসল্যেও ইহা আছে, কিন্তু বাৎসল্যে মমতা অধিক। মমতা অধিক বলিয়া বাৎসল্যে "তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার"।

আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান॥

তাহার পর মধুর, ইহাই চরম ও পরম। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের সমুদয় গুণ ও লক্ষণগুলি বিদ্যমান। তাহা ছাড়া ইহার একটি নিজের গুণ আছে।

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ॥

এই পঞ্চভাব ও ভাবানুযায়ী রসাস্বাদন চিন্তা না করিলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বুঝিতে পারা যাইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥

এই কারণেই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিলাম। এইবার মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে।

শ্রীরাধা, ললিতা ও কুন্দলতা, বকুলকাননে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের নাম করিলেন, ললিতা শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিলেন। শ্রীরাধা অশ্রুমোচন করিয়া ললিতাকে বলিলেন—সখি, তুমি যাহার নাম শুনাইলে, আমি কি একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব? কুন্দলতা বলিলেন—সখি তুমি তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছ, গতকল্য সন্ধ্যাকালে বিশাখা তোমাকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়াছিল।

শ্রীরাধার অবস্থা এই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যতই দেখা হউক, যতই মিলন হউক না কেন, তাঁহার সকল সময়েই মনে হয়, দেখা হইল না। কাজেই কুন্দলতার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন,—প্রিয় সখি, ভাল কথা মনে পাড়াইয়া দিলে, তোমাদের গোকুল-যুবরাজ, বিদ্যুৎবিলাসের মত, শুধু একবার অতি অল্পক্ষণের জন্য এই অভাগিনীর নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিলেন।

এইবার শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। তিনি প্রথমে ললিতার কঙ্কণধ্বনি, তাহার পর শ্রীরাধার কিঙ্কিনীধ্বনি শুনিয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দূরে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতেছেন—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিত দীর্ঘাপাঙ্গ-টঙ্ক-চ্ছটাভি।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষ্মৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥

[এই শ্লোকটি পরিভাবনা-নামক মুখসন্ধির অঙ্গ। শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনা]

শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধ্য ও সৌন্দর্য্যাদি গুণ দর্শন করিয়া শ্রীরাধা চমৎকৃত হইয়া বলিতেছেন, সুমুখি, সম্মুখে এ কোন্ বিশ্বকর্ম্মা! ইনি আপনার সুশাণিত ও দীর্ঘ-কটাক্ষরূপ টঙ্ক বা পাষাণ দারণ-যন্ত্রের দ্বারা কুললননাগণের ধর্ম্মসমূহ ভেদন করিতেছেন, আর আপনার মরকতমণির ন্যায় শ্যামল সৌন্দর্য্যের দ্বারা গোষ্ঠ প্রদেশের সজ্জা করিতেছেন।

ললিতা বলিলেন,—সখি, ইনিই তোমার প্রাণনাথ। শ্রীরাধা উন্মাদসহকারে বলিতেছেন,—

এষ কিমু গোপিকা-কুমুদিনী-সুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুল স্ফুরিত যৌবরাজ্যোৎসবঃ।
স এষ কিমু মন্মনঃ- পিকবিনোদপুষ্পাকরঃ।
কৃশোদরিদৃশোদ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥

সখি, ইনি কি সেই গোপীকুমুদিনী-বিকাশক সুধাদীধিতি চন্দ্র? ইনি কি সেই গোকুলের যৌবরাজ্যোৎসবের স্ফুরণকারী? ইনি কি সেই আমার মানসকোকিলের আনন্দদায়ক বসন্ত? হে কৃশোদরি, ইনি আমার চক্ষুদুটিকে অমৃতরসে সিঞ্চিত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিতেছেন—

অসকৃদসকৃদেষা কা চমৎকারবিদ্যা
মম রসলহরীভিস্তর্ষমন্তন্তনোতি।
বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায়তাপাঙ্গলীলা-
মধুরিমপরিবাহঃ কাপি কল্যাণ-বাপী ॥

এ কোন্ চমৎকারিণী বিদ্যা? যিনি বারম্বার রসতরঙ্গদ্বারা অন্তরে অভিলাষ বাড়াইয়া দিতেছেন? বুঝিলাম, ইনি বিস্তৃত অপাঙ্গ-লীলার মাধুরী-উচ্ছাস-ময়ী কল্যাণ-দীর্ঘিকা।

শ্রীরাধার প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন ভাল করিয়া তত্ত্ব নিরূপণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—সত্যই ত—

যস্যাং শৈবলমঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ং
ফুল্লং পঙ্কজ-পঞ্চকঞ্চ বিসয়োর্যুগ্মং চ মূলেন তৎ।
উন্মীলত্যতি চঞ্চলঞ্চ শফরীদ্বন্দং ব্রজে ভ্রাজতে
সেয়ং শুদ্ধতরানুরাগ পয়সা পূর্ণা পুরোদীর্ঘিকা ॥

লোমাবলী শৈবালস্বরূপ; কুচযুগল চক্রবাকমিথুন; হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ, এই পাঁচটি পদ্ম, বাহুদুইটি মৃণালযুগলের সদৃশ; চক্ষুদুইটি চঞ্চল মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সম্মুখবর্ত্তী ঐ দীর্ঘিকা শুদ্ধতর অনুরাগবারিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া ব্রজপুরে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—সখি, আমার শরীর ঘুরিতেছে; আমাকে হাত দিয়া ধর।

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার রূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন,—সখি, আমায় রক্ষা কর। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে তাঁহার (শ্রীরাধার) অপাঙ্গের প্রভাব বলিতেছেন। শ্রীরাধা গদ্‌গদস্বরে কুন্দলতাকে বলিতেছেন,—কুন্দলতে, এই সুন্দরশেখরকে নিবারণ কর, আমি হতভাগিনী, আমাকে সর্ব্বদা গুরুজনের অধীনে থাকিতে হয়।

এমন সময়ে জটিলা আসিয়া উপস্থিত। জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া-বলিতেছেন—ওরে তুই মনমোহন, গোকুলের কুলবালাদের তুই ধর্ম্মপথ হইতে পতিত করিয়াছিস্। আমার পুত্রের পুণ্যবলে কেবল এই বধূটি বাকি আছে।

শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করিয়া ললিতা ও কুন্দলতা জটিলার সহিত প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আর কি করিবেন? প্রিয়তমা চলিয়া গেলেন, কাজেই তিনিও গো-সকলকে একত্র করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন।

৯। শঙ্খচূড়বধ

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। গোকুলের নারীগণ দধিমন্থন করিতেছে। তাহার শব্দ দেবগণকে সমুদ্রমন্থন স্মরণ করাইতেছে। পালী নামক গোপী অতিশয় দুঃখিতচিত্তে মাথা নত করিয়া, মুখ আবরণ করিয়া চকিতভাবে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে গমন করিতেছে। শ্যামলা শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর পরিধান করিয়াছে, তাহার গলায় শ্রীকৃষ্ণের গলার হার, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাহার গণ্ডদেশে যে পত্রাবলী আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই পত্রাবলী তাহার গণ্ডদেশে রহিয়াছে, এই অবস্থায় সে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকার ভাবে গোকুলে গমন করিতেছে। পদ্মার অবস্থা বড় মলিন; তাহার কবরী শিথিল হয় নাই, বিম্বাধরের রাগ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, তিলক যেমন তেমনই রহিয়াছে, মুখ অতিশয় মলিন, অঙ্গ অলস, পদ্মা বিপ্রলব্ধা হইয়া গৃহে গমন করিতেছে। পদ্মার সখীসকল শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছে। বৃন্দাদেবী এই সমুদয় দেখিতেছেন। ভগবতী পৌর্ণমাসী আসিতেছেন। আপন মনে বলিতে বলিতে আসিতেছেন—

অহমুল্মুখপুঞ্জধর্ম্মিণা হৃদি চিন্তানিচয়েন চর্চ্চিতা।
ভুবি হন্ত নিবিশ্য জাগ্রতী কথমপ্যক্ষয়ং ক্ষপামিমাং ॥

আমি হৃদয়ের মধ্যে অঙ্গারসমূহের ন্যায় দুশ্চিন্তারাশি ধারণ করিয়া ভূমিশয্যায় জাগ্রত অবস্থায় অতিশয় কষ্টে এই রাত্রি যাপন করিলাম!

বৃন্দাদেবী তাঁহার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার এই দুশ্চিন্তার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রিবর উদ্ধব মথুরা হইতে আসিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে এক ভয়াবহ সংবাদ দিয়া গিয়াছেন। ভোজবংশের কুলাঙ্গার দুষ্টভূপতি কংস পূতনাকে নন্দগোকুলে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এখন তাহার নিকট সংবাদ গিয়াছে, এক দিব্যবালক পূতনাকে সংহার করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া কংস, বৃষাসুর ও কেশীদানবকে বলিয়াছে, দেখ লোকপরম্পরায় শুনিলাম সেই বালক দুইটি গোকুলে বাস করিতেছে। গোকুলের এখন নাম হইয়াছে বৃন্দাবন। তোমরা সেখানে গিয়া সমুদয় তত্ত্ব জানিয়া আসিবে। কেশী আসিয়া সমুদয় দেখিয়া কংসকে গিয়া খবর দিয়াছে। শ্রীরাধাকে অপহরণ করিবার জন্য কংস গোকুল অবরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে বৃষাসুর গিয়া সংবাদ দিল, শ্রীরাধার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে কংস আর গোকুল অবরোধ করিল না। এখন কংস তাহার পরম সুহৃৎ শঙ্খচূড়কে কুমারী-হরণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছে।

বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কুন্দলতা আসিয়া উপস্থিত। কুন্দলতা ভীতিসহকারে পৌর্ণমাসীকে জানাইল বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে। গোবর্দ্ধন মল্লের বাড়ীর নিকটে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বৃন্দা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আর চিন্তা নাই, শ্রীরাধা ভক্তিসহকারে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই আরাধনায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব আসিয়াছেন। সূর্য্যদেব শ্রীরাধাকে রক্ষা করিবেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন—কুন্দলতা যাহা দেখিয়াছে, তাহা সূর্য্য নহে। কংসের মিত্র সেই যক্ষই আসিয়াছে। যক্ষের এই তেজঃ স্বাভাবিক নহে, সাংক্রমিক। শঙ্খচূড় কুবেরের কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে একটি মহামণি চুরি করিয়াছে। পৌর্ণমাসীর কথায় সকলেই চিন্তিত হইলেন। আজ শ্রীরাধার সূর্য্যপূজার দিন, তিনি অনেকক্ষণ মণ্ডপে গমন করিয়াছেন। বিপদের সম্ভাবনা, এখন

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সেই উপায় করিবার জন্য তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলেন।

ললিতমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ইহাই বিষ্কম্ভক অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের সূচনা।

এইবার প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইতেছে। জটিলা, ললিতা ও বিশাখা প্রভৃতির সহিত শ্রীরাধা আসিতেছেন। কুন্দলতার সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। শ্রীরাধার একই ভাব; তিনি মনে মনে বলিতেছেন, হৃদয়, তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না—প্রিয়দর্শন অতি দুর্ঘট। কুন্দলতা, শ্রীরাধাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া মৃদুস্বরে আশ্বাস দিলেন, বলিলেন, মিলনের সুসময় উপস্থিত, চিন্তা করিও না। জটিলা অতিশয় সাবধান, তাঁহার সর্ব্বদাই ভয়, কৃষ্ণ কখন আসিয়া পড়ে। কাজেই তিনি কুন্দলতাকে বলিলেন—রাধে, রাধে, বলিও না। ঐ নাম উচ্চারণ করিলে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। কুন্দলতা ঈষৎ হাস্য করিয়া জটিলার কথা স্বীকার করিলেন। জটিলা চলিয়া গেলেন। সূর্য্যের পূজা হইবে, পূজার মণ্ডপ লেপন করিবার জন্য জটিলা অগ্রে চলিয়া গেলেন। অবসর পাইয়া শ্রীরাধা কুন্দলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কুন্দলতে, তোমার দেবর দুর্ল্লভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় ক্রীড়া করিতেছেন? কুন্দলতা বলিলেন,—তুমি সকল সময়েই তাঁহার সহিত বিহার করিতেছ, তথাপি এত উৎকণ্ঠিত কেন?

শ্রীরাধা বলিলেন—সখি, কেন উপহাস করিতেছ? তোমরাই ধন্য; কারণ, সকল সময়েই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছ। আমার এমনই অবস্থা যে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করাও আমার পক্ষে সাতিশয় দুর্ল্লভ।

জটিলার মণ্ডপ-লেপন শেষ হইল। ললিতা শ্রীরাধাকে মণ্ডপে লইয়া গেলেন। উভয়ে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিলেন। পূজা করাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণের দরকার। জটিলা কুন্দলতার উপর ব্রাহ্মণ আনিবার ভার দিয়াছেন। মধুমঙ্গল ও কুন্দলতার সহিত বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিতেছেন—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।

উরোম্বরতটস্য চাভরণ চারু-তারাবলী
ময়োন্নত মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥

আমার মনোরূপ করীন্দ্রের বিহারের জন্য গঙ্গার ন্যায়, আমার লোচন-চকোর-যুগলের শরৎকালীন অমন্দ চন্দ্র-প্রভাস্বরূপ, আমার বক্ষঃরূপ গগন-তটের আভরণস্বরূপ মনোহর তারাবলী বা হারস্বরূপ, আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীরাধিকা ভাবিতেছেন, এই শ্যামবর্ণ নবীন যুবক কে, ইনি কোথা হইতে বৃন্দাবনে আসিলেন? ইঁহাকে দেখিয়া আমি অধীর হইলাম! ললিতে, ধিক্, ধিক্, কি প্রমাদ, ব্রহ্মচারিকে দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইতেছে, আমার যে পাপ হইতেছে! এই মহা-পাপের জন্য জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

আবার ভাল করিয়া দেখিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া ললিতাকে বলিতেছেন—সখি, ইনি স্বয়ং হরি। ব্রাহ্মণ-বেশ ধরিয়া আসিয়াছেন, নতুবা আমার অন্তরাত্মা বিগলিত হইত না। চন্দ্রের কিরণ ব্যতীত চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয় না।

কুন্দলতা, মধুমঙ্গল ও ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া জটিলার নিকট উপস্থিত করিলেন ও বলিলেন—এই দুইটি ব্রাহ্মণ আনিয়াছি, ইঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ। জটিলা মধুমঙ্গলকে বেশ ভাল করিয়াই জানেন, আর মধুমঙ্গলও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি জটিলাকে বলিলেন,—জটিলে, আমি সূর্য্যপূজায় সুপণ্ডিত। শীঘ্র খণ্ডলড্ডুক লইয়া আইস।

মধুমঙ্গলকে দেখিয়া জটিলার বিরক্তির সীমা নাই। জটিলা বলিলেন—তুই কে, চঞ্চল ব্রাহ্মণ। তুই যে কৃষ্ণের সহচর! দূর হ'। ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া জটিলা বলিলেন—এই ব্রাহ্মণবালকটি বেশ, সৌম্য মূর্ত্তি ও শ্যামবর্ণ; ইনিই বধূকে পূজা করাইবেন।

ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন—গোপরাজনন্দন বড়ই দুর্ল্লীল, আর এই ব্রাহ্মণবালক তাহার সখা, অতএব ইহাকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই উচিত। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ জটিলার নিকট শ্রীরাধার নাম জানিয়া লইয়া শ্রীরাধার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে পূজার মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া জটিলা খুব খুসী হইলেন। মধুমঙ্গল জটিলাকে

বলিলেন, এই মন্ত্র কোথাকার মন্ত্র জান?, ইহা, কৌসুমেযবী শাখার তৃতীয়বর্গের ললনা-শুভকারী মন্ত্র।

ইহার পর কুন্দলতার কথামত জটিলা মধুমঙ্গলকে ভোজন করাইবার জন্য লইয়া গেলেন। কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। কুন্দলতার কথায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। এদিকে মুখরা আসিয়া উপস্থিত। মুখরার ভিতরে একরূপ বাহিরে একরূপ। মুখরা শ্রীরাধামাধবকে একত্র দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে তর্জ্জন করিতেছে। মুখরার কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত হইলেন, আর মুখরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। শঙ্খচূড় গোপনে লুকাইয়াছিল, অবসর পাইয়া রত্নসিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে মাথায় করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। সকলে কাতরতার সহিত কাঁদিয়া উঠিল—হা কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? মুখরা কাঁদিতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও যক্ষকে বিনাশ করিলেন। সখাগণ-সঙ্গে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্খচূড়ের মাথার মণি কাড়িয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দিয়াছিলেন, বলরাম আবার মধুমঙ্গলের দ্বারা ঐ মণি শ্রীরাধিকাকে দিলেন।

১০। উন্মত্ত রাধিক

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃষাসুর ও কেশী নিহত হইয়াছে। এখন কংস গান্ধিনীনন্দন অক্রূরকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছে। রথ লইয়া অক্রূর আসিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত। কংসের আজ্ঞায় অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইবে।

পৌর্ণমাসী দেবী বড়ই ব্যথিত ও কাতরহৃদয়ে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন। বৃন্দার দুঃখের সীমা নাই। বৃন্দা বলিলেন—

বনভুবি নবকুঞ্জং কস্য হেতোর্বিধাস্যে
কৃত-রুচিরচয়িষ্যাম্যত্র বা পুষ্পতল্পং।
সুরভিসময়ে বা বল্লিমুৎফুল্লয়িষ্যে
যদি নয়তি মুকুন্দং গান্ধিনেয়ঃ পুরায় ॥

গান্ধিনী-নন্দন অক্রূর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরাপুরে লইয়া যায়, তাহা হইলে আর কাহার

জন্য বনভূমিতে নূতন কুঞ্জের ব্যবস্থা করিব ? কাহার জন্যই বা আর সেই কুঞ্জে মনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করিব। অসময়ে সুরভিময়ী লতাকে প্রফুল্লিত করিয়াই বা কি করিব ?

ব্রজাঙ্গনাগণ রোদন করিতেছে, অক্রূরের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। সারা-রাত্রি তাহাদের একেবারেই নিদ্রা হয় নাই। যশোদার বুদ্ধি একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, নিরন্তর রোদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, যাত্রার মঙ্গলাচরণ করিতে হইবে, সঙ্গে পাথেয় দিতে হইবে, কিন্তু যশোদার সেদিকে জ্ঞান নাই। শৈব্যা, শ্যামলা, ভদ্রা প্রভৃতি গোপীগণ জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময়ী উদ্‌ঘূর্ণা-দশা উপস্থিত ; তিনি অসম্বন্ধ প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি রথের উপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, আর তাঁহার দেহ স্খলিত হইতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, কদম্ববৃক্ষসকল নৃত্য করিতেছে। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, সখি রাধে বিষণ্ণা হইও না, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করার এই প্রারম্ভমাত্র, এখনও অনেক বাকি আছে। শ্রীরাধা একবার মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, আবার ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে রথের অগ্রে গিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, ক্ষণকাল পরে উঠিয়া বাষ্পাকুললোচনে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধা পূর্ব্বে প্রিয় সখীগণের সমক্ষে কখনও প্রকাশ্যভাবে ও স্বাধীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিতে পারিতেন না, সেই শ্রীরাধা আজ গুরুজনের অগ্রেও লজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন, বিস্ফারিতনেত্রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অশ্রুবিন্দু মোচন করিতেছেন। যেরূপ ব্যাপার, তাহাতে মনে হয় ব্রজগোপীগণ প্রাণত্যাগ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণকে আশ্বাস দিতেছেন, আবার ফিরিয়া আসিব, আবার মিলন হইবে। ভৃঙ্গগণ মকরন্দ পান করিতেছে না, ময়ূরসকল নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, চক্রবাকেরা স্বীয় রমণীগণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। ধীরপ্রকৃতি শ্রীরাধা অতিশয় অধীরা হইয়াছেন, একবার সম্মুখে দৌড়িয়া যাইতেছেন, একবার স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছেন, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন প্রলাপ আবার কখন বা মৌনাবলম্বন করিতেছেন।

শ্রীরাধার উক্তি—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।

ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব নু সখি মম জীবরক্ষৌষধি
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥

সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায় ? ময়ূরপুচ্ছভূষণ কোথায় ? সেই মধুর মুরলীরব কোথায় ? যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ, তিনি কোথায় ? সেই রাসরসের নাটুয়া কোথায় ? তিনি যে আমার জীবন রক্ষার ওষধিস্বরূপ, তিনি কোথায় ? তিনি আমার সুহৃত্তম, তিনি আমার অমূল্য রত্ন, তিনি কোথায় ? হায় বিধি, তোমাকেই ধিক্।

এই শ্লোকটির অতিমধুর ও গভীর আস্বাদন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কৈলা জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥
সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন। ক্ষণেক যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত করি দান। প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ কাহাঁ সে চূড়ার ঠাম, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু। পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥ একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা। নারীর মনে পৈশে যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসমকান্তি,
যেই কান্তি জগত মাতায়। শৃঙ্গাররস ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্র-গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার। উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥ মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি, তোর তেঁহো সুহৃত্তম। দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ সেই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক। বিধির করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥

পূর্ব্বোক্ত অংশ তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভক অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ কার্য্যের আংশিক সূচনা।

এইবার প্রকৃত বিষয় আরম্ভ হইতেছে। ললিতা ও বিশাখা সান্ত্বনা দিতেছেন, আর শ্রীরাধিকা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। শ্রীরাধার উক্তি—

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি-
র্ন দৃষ্টা নিঃশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।
হরের্বক্ষঃ-পীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্মম মনঃ॥

সুমুখি, আমি স্বাধীনভাবে প্রাণভরিয়া (স্বৈরং) কর্ণপুটের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য-সকল শ্রবণ করি নাই, নির্ভয়ে তাঁহার মুখকমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করি নাই, তাঁহার বিশাল বক্ষঃ আমা-কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আলিঙ্গিত হয় নাই, সখি, এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার মন ও অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বিশাখা শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছেন, সখি, শ্রীকৃষ্ণ আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন, কেন তুমি অধীর হইতেছ? কিন্তু একথা কে শোনে? তাহার পর শ্রীরাধার উন্মাদ। এই অবস্থা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় একবার চক্রবাকীকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বায়সকে বলিতেছেন, তুমি যাও, শ্রীকৃষ্ণকে আমার কথা নিবেদন কর, শারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কি শত্রুসংহারকার্য্য শেষ হইয়াছে, তিনি কি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন? হায়! এখন সে বংশীগানামৃত কোথায়? সে পরিহাসভঙ্গীই বা কোথায়? আমি কি করিয়া ধৈর্য্যধারণ করি? আমার প্রাণনাথই বা কোথায়? ললিতা সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছেন, সখি, এসব কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণ আমোদ করিবার জন্য এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি কখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে পারেন? অতএব চল অন্য কুঞ্জে আমরা তাঁহার অন্বেষণ করি। নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব।

হরিণীগণকে দেখিয়া শ্রীরাধা সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? ময়ূরিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কুটিলতা ত্যাগ করিয়া সত্য করিয়া বল, শিখিপিঞ্ছমৌলি কোন্ কুঞ্জে লুকাইয়া রহিয়াছেন? গুঞ্জামালা আঘ্রাণ করিয়া কাঁপিতেছেন, যেন চন্দ্রাবলীকে দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পর্ব্বতের গুহায় তাঁহার নিজের কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছে,

প্রতিধ্বনি শুনিয়া বলিতেছেন—একি চন্দ্রাবলী রোদন করিতে করিতে আমাকেই যে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। স্ফটিকশিলায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হইতেছে, বুঝি চন্দ্রাবলী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মোহের সহিত চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। বিদ্যুৎশোভিত-মেঘ পর্ব্বতগাত্রে শোভা পাইতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে—ঐ কৃষ্ণ। শ্রীরাধার পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইতেছে। পদ্মদলের দ্বারা বীজন করিয়া সখীরা চেতন করাইতেছেন। চেতন হইয়া শ্রীরাধা মনে করিতেছেন--তিনি ললিতা, আর নিকটে উপবিষ্টা ললিতাই শ্রীরাধা। তাই ললিতাকে বলিতেছেন—সখি রাধে, মিথ্যা মান পরিত্যাগ কর। ললিতা অবস্থা দেখিয়া মাথা নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। শ্রীরাধা পুনরায় ললিতাকে রাধা জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন—সখি রাধে, তোমার পদশব্দ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। তুমি কেন অকারণ মানময়ী হইয়া রহিয়াছ? এই বলিয়া ললিতার চরণে ধরিয়া বলিতেছেন—

মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বলপরিসরং কুঞ্জময়তে
লতালী চ স্মেরা-মধুপবিরুতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি।
তদুত্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং
দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদিরমতি বরীয়ানবসরঃ॥

সখি! মুকুন্দ, কুন্দকুঞ্জে গমন করিতেছেন, লতাসকল হাস্যবদনে মধুকর-ঝঙ্কার-ধ্বনি দ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত হইবার জন্য বলিতেছে। অতএব হে উন্মত্তে! গাত্রোত্থান কর, চরণে পতিতা সহচরীকে আর ব্যথিত করিও না, তোমার মুগ্ধতার জন্য দুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট অবসর ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে!

তাহার পর শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখার সহিত পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মল্লিকা-কলিকা-সকল স্খলিত হইতেছে, কদম্বমঞ্জরি-সকল চতুর্দ্দিকে ক্রটিত হইতেছে, জাতিপুষ্পসকল শ্যামকান্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রীহরির বৃন্দাবনে সকল দিকেই দুর্গতি উপস্থিত! মহাদাবানলের জ্বালায় বনস্থলী যেন দগ্ধ হইতেছে। আবার শ্রীরাধার মনে হইতেছে, দূরে যেন গোমণ্ডলী দেখা যাইতেছে, তবে গোপেন্দ্র-নন্দন আসিতেছেন—আর অধিক দূরে নহে। আবার দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ সম্মুখের তৃণ ভোজন করিতেছে না; বৎসগুলি নিকটে আসিতেছে, কিন্তু ধেনুগণ তাহাদের লেহন

করিতেছে না, কেবল হাম্বারবে কাঁদিতেছে। শ্রীরাধা যমুনা-পুলিনে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিতেছেন—এই সেই যমুনা-পুলিন, পদ্মবদন, তুমি কোথায়? আবার মূর্চ্ছা হইল। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য তাঁহার নাসিকাগ্রে ধারণ করিলেন, বহুক্ষণ পরে চৈতন্য হইল। চেতনা পাইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—"সখি স্বপ্নে দেখিলাম এক দুরাত্মা রাজদূত বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রথে তুলিয়া—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না। বলিলেন—'চল সখি, দুঃস্বপ্ন-জনিত পাপক্ষয়ের জন্য যমুনায় স্নান করিব, তাহার পর মুকুন্দকে দর্শন করিব।'

বিশাখা বলিলেন—সখি চল আমরা কালিয়হ্রদে খেলাতীর্থে যাই, মুকুন্দ সর্ব্বদাই সেখানে খেলা করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাঁহারা সকলেই প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর কি হইল তাহা মুখরা ও বৃন্দার কথোপকথন হইতে আমরা জানিতে পারিব। শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা, খেলাতীর্থে কালিন্দী-হ্রদে গমন করিলেন, তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ নীলপদ্মের বনে সাঁতার কাটিয়া খেলা করিতেছেন। বিশাখা ও শ্রীরাধা সেই জলে অবতরণ করিলেন, আর উঠিলেন না। ললিতা এই দৃশ্য দেখিয়া জলে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে মুখরা ও বৃন্দা গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ললিতা জলে নামিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখরা ও বৃন্দা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

আকাশে দৈববাণী হইল, শ্রীরাধার মহিমারাশি কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে, সেই নবতড়িদ্বিলাসিনী গোপসুন্দরী আজ সখীর সহিত মুনীন্দকুলদুর্ল্লভ সূর্য্যমণ্ডলকেও ভেদ করিলেন। তাহার পর আবার আকাশবাণী হইল, শ্রীরাধার জীবন-স্বরূপ দাড়িম্ব-দশনা ললিত পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইলেন। বৃন্দা যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, দেববাণী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—এ কাজ করিও না। আবার প্রমোদ-সুধাদ্বারা তোমার মহোৎসব পরিপূর্ণ হইবে, আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের দেখা পাইবে।

ভূয়স্তে ভবিতা প্রমোদসুধয়া পূর্ণো মহানুদ্ধবঃ॥

ললিতামাধব নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম তিন অঙ্কে ব্রজলীলা, তাহার পর পুরলীলা। চতুর্থ অঙ্কে পুরলীলা আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। ভক্ত উদ্ধব দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞদিগের গুরু হইয়াও অজ্ঞের

ন্যায় ব্যবহার করেন, প্রভুসকলের চূড়ামণি অর্থাৎ পরমপ্রভু হইয়া অনেক সময়ে নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় বিগ্রহ অথচ সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইতেছেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। উদ্ধব অনুমান করেন, মুকুন্দ প্রণয়িজনের প্রেমবশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

কংস বিনষ্ট হইয়াছে। উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন হইয়াছে। রোহিণী মথুরায় আসিয়াছেন, গার্গী তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গুরুগৃহে বাস করিয়াছেন, গুরুদেব সান্দীপনিকে দক্ষিণা দিবার জন্য যমালয় হইতে তাঁহার মৃতপুত্র মধুমঙ্গলকে আনিয়া দিয়াছেন। উদ্ধব বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। চন্দ্রাবলীকে লইয়া আসিবেন, এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। কারণ রুক্মী, তাহার সখা শিশুপালের মুখে সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলীকে তাহার পূর্ব্বেই কুণ্ডিলনগরে লইয়া গিয়াছিল। শিশুপাল শ্রুতশ্রবার নিকট গোকুলের রহস্যকথা শুনিয়াছিল, শ্রুতশ্রবা আবার মথুরানগরে গার্গীর নিকট এসকল কথা শুনিয়াছিলেন। ভীষ্মকতনয় রুক্মী যখন চন্দ্রাবলীকে গোকুল হইতে লইয়া আসিল, তখন কেহই বাধা দেয় নাই। কে বাধা দিবে? শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল সবান্ধবে মথুরায় অবস্থিতি করিতেছেন। গোবর্দ্ধনমল্লও হত হইয়াছে। পদ্মা নগ্নজিৎ রাজার কন্যা, ইঁহার নাম নাগ্নজিতী; শ্যামলা মদ্ররাজের কন্যা, ইঁহার নাম মাদ্রী; ভদ্রা কেকয়রাজের কন্যা, ইঁহার নাম লক্ষ্মণা; শৈব্যা, শৈব্যরাজের কন্যা, ইঁহার নাম মিত্রবৃন্দা। নগ্নজিৎ, মদ্রেশ্বর, কেকয় ও শৈব্য, ইঁহারা নারদের মুখে সমুদয় কথা জানিতে পারিয়া গোকুলে গিয়াছিলেন এবং গোপপতিগণকে প্রসন্ন করিয়া কন্যাদের লইয়া গিয়াছেন। কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা ষোলহাজার একশত গোপকন্যা কামাখ্যাদেবীর স্তব করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রচণ্ডস্বভাব নরকাসুর বলপূর্ব্বক ঐ সমুদয় কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ষোলহাজার একশত আট কুমারীর মধ্যে একজনও গোকুলে নাই।

এই গেল গোকুলের সংবাদ। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার দারুণ দশা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার একেবারেই সুখ নাই। ভগবতী পৌর্ণমাসী সঙ্গীত-বিদ্যার বিধাতা ভরতমুনিকে ধরিয়া এক নাটক রচনা করাইয়াছেন। তুম্বুরু গন্ধর্ব্বগণকে

ঐ বিদ্যা শিখাইয়াছেন। সেই গন্ধর্ব্বেরা ঐ নাটকের অভিনয় করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অভিনয় দর্শন করিতেছেন, মধুমঙ্গল তাঁহার নিকটে আছেন। নাটকের বিষয় "শ্রীরাধার অভিসার"। নট ও নটীরা এমন অভিনয় করিতেছে, যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতেছেন। গোপবেশধারী অভিনেতা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতেছেন, 'ইহাকে দেখিয়া আমার যে শ্রীরাধার সারূপ্য-লাভের ইচ্ছা হইতেছে।' শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভুলিয়া যাইতেছেন; তিনি যেন বুঝিতেই পারিতেছেন না তিনি কে, তিনি কি নট হইয়া অভিনয় করিতেছেন, না সভ্য হইয়া অভিনয় দেখিতেছেন? এদিকে অভিনয় চলিতেছে। শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইয়া ললিতাকে আহ্বান করিতেছেন। ললিতার সহিত শ্রীরাধা আসিতেছেন। অভিনেত্রী-শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমনই ব্যাকুল হইয়াছেন, যে আসন হইতে উঠিয়া উৎকণ্ঠার সহিত আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিলেন। মুখরাও অভিনয় দেখিতেছেন। অভিনেত্রী শ্রীরাধাকে দেখিয়া তিনিও আত্মহারা হইয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছেন; ভগবতী পৌর্ণমাসী মুখরাকে নিবারণ করিলেন। মুখরা বলিতেছেন—দৈববাণীতে শুনিয়াছি, শ্রীরাধা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমার বোধ হয় গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে সেই লোকান্তর হইতে লইয়া আসিয়াছে। অভিনয় চলিতেছে। শ্রীরাধা ললিতার সহিত বাহিরে আসিয়াছেন, ইহা জটিলা ও মুখরা উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা অনাবৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া কদম্ব-বৃক্ষাচ্ছন্ন যমুনাতীরের পথ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতেছেন। পদচিহ্ন দেখিয়া জটিলাও আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অভিসারিকা শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইয়াছেন, আর মিলনের বিলম্ব নাই, এমন সময়ে জটিলা আসিয়া উপস্থিত। জটিলা আসিয়া ললিতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন, গার্গী বলিয়া দিয়াছেন, আজ বড় শুভদিন, আজ যদি মাধবীপুষ্পের দ্বারা সূর্য্যের পূজা করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যদেব এককোটি গাভী দান করিবেন। আমি সেইজন্য শ্রীরাধাকে মাধবীমণ্ডপে লইয়া যাইতেছি। আজ যে অভিসারের অভিনয় হইল, তাহার বিষয়টি এই। জটিলা ফিরিয়া আসিতে আসিতে বৃন্দাদেবীর কৌশলে শারিকার মুখে শুনিয়া আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার পুত্র অভি-

মন্যুর বেশ ধারণ করিয়া জটিলার গৃহে যাইবেন। এই কথা শুনিয়া জটিলা অতিশয় সতর্ক হইয়া থাকিলেন। এদিকে সত্যই জটিলার পুত্র অভিমন্যু প্রয়োজনবশতঃ গৃহে আসিয়াছেন। জটিলা ভাবিলেন, এই ত শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যুর সাজে সাজিয়া আমাকে বঞ্চনা করিতে আসিয়াছে। তিনি তাহাকে ধরিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণের অশিষ্টতা দেখাইবার জন্য লোক ডাকিতে লাগিলেন। অভিমন্যু বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। শেষে জটিলা যখন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিলেন, তখন আর তাঁহার লজ্জার সীমা নাই। এদিকে কুন্দলতা আসিয়া অভিমন্যুকে বুঝাইয়া দিলেন—শ্রীরাধা অতিশয় পুণ্যবতী, সরলা, সত্যবাদিনী ও স্নিগ্ধা; আর, জটিলার উন্মাদরোগ হইয়াছে। অভিমন্যু তাহাই বুঝিলেন। তিনি গরু কিনিবার জন্য স্বর্ণ লইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কাজ সারিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর সাজে সাজিয়া জটিলার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। জটিলা আর কোন আপত্তিই করিলেন না, তাঁহার সহিত চৈত্যবৃক্ষের মূলে যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিরাপদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

১১। চন্দ্রাবলী-লাভ

তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এখন চন্দ্রাবলীর চরিত্র অর্থাৎ রুক্মিণীর বিবাহ বর্ণনা করিতেছেন।

আরও অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। কালযবন, মহাদেবের বরে মথুরাবাসিগণের অবধ্য ছিল। সে আসিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে ঐ যবনকে এক পর্ব্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। সেই গুহায় মুচুকুন্দ রাজা ছিলেন, তাঁহার নয়নাগ্নিতে কালযবন ভস্মীভূত হইল। তাহার পর কুটিলবুদ্ধি জরাসন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ। এখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রতটবর্ত্তী পর্ব্বত-শালিনী দ্বারকানগরে গমন করিয়াছেন।

ব্রজলীলায় যিনি চন্দ্রাবলী তিনিই পুরলীলায় রুক্মিণী, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভীষ্মক ইহা জানিতেন। রুক্মি একথা গোপন করিতে চাহেন, এইজন্য নাম বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য অঙ্কে দেবর্ষি নারদের একটি স্বগতঃ উক্তি স্মরণীয় "নন্বেতাঃ ব্রজপুররমণ্যঃ সমানতত্ত্বা অপি বিগ্রহাদিভিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিন্নাঃ কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমূর্চ্ছিতা বর্ত্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব, বিপ্রয়োগে-

হপি প্রিয়সঙ্গসুখসঙ্গমনায় তত্রৈবাচ্ছাত্ত পুররমণীষু স্বাভেদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্ন ইব। যাস্তূদ্ধবযান-কুরুক্ষেত্র-যাত্রয়োর্নিবৃত্তবৎ সমানচরিত্রাস্তাঃ খল্বষ্টোত্তরৈকশতষোড়শসহস্র-তস্তস্মা দন্যা এব, তদলং তদ্রহস্যোদঘাটনেন।"

একথা নিশ্চয় যে এই সমুদয় ব্রজরমণী ও পুররমণী একই তত্ত্ব, কেবল বিগ্রহ বা দেহ-প্রভৃতিতে ভিন্ন। মধ্যে কেবল মায়া বা যোগমায়া কর্ত্তৃক পরমভিন্না বা পৃথকীকৃতা হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রজমধ্যে সেই সকল ব্রজরমণী প্রেমে মূর্চ্ছিতা হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু যোগমায়া কর্ত্তৃক এই বিচ্ছেদের সময়েও প্রিয়সঙ্গসুখলাভ করাইবার জন্য সেইখানেই তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া পুররমণীসকলে অভেদাভিমানদ্বারা দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করান হইতেছে। উদ্ধব-আগমনে ও কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় যেসকল ব্রজরমণীগণের কথা বলা হইবে, সেই ষোল হাজার একশত আট গোপী, তাঁহারা পৃথক, যাহা হউক এই রহস্য উদঘাটনের প্রয়োজন নাই।

ভীষ্মকের ইচ্ছা, তাঁহার কন্যাকে যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করেন। ভীষ্মকের পুত্র রুক্মির ইচ্ছা চেদিরাজ শিশুপালের সহিত ভগ্নীর বিবাহ দেন। রুক্মি একটি শ্লোক লিখিয়া তাহার ভগ্নির নিকট পাঠাইয়াছে—

প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে।
নরদেববরে শ্রুতশ্রবো হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং॥

পৌর্ণমাসী দেবী এই শ্লোকের পাঁচটি অক্ষর বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন। শ্লোকটি হইয়াছে—

প্রণয়ো মমঘোষনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঞ্চিতে।
পরদেববরে দ্রুতশ্রবো হৃদয়ানন্দিগুণে বিজৃম্ভতাং॥

কাজেই শ্লোকের অর্থ একেবারেই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। প্রথমে অর্থ ছিল—দমঘোষের পুত্র শিশুপাল যৌবনান্বিত, রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুণের দ্বারা স্বকীয় জননী শ্রুতশ্রবার হৃদয়ে আনন্দবিধান করিয়া থাকেন, অতএব এই শিশুপালে তোমার প্রণয় বৃদ্ধিশীলা হউক।

পৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক শ্লোকের অক্ষর পাঁচটি পরিবর্ত্তিত হওয়ার পর অর্থ দাঁড়াইল—যিনি গোপালন-তৎপর, নবযৌবন-ভূষিত, পরদেবতোত্তম, যাঁহার গুণ শুনিলেই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই নন্দনন্দনে আমার প্রণয় বৃদ্ধিশীল হউক।

পৌর্ণমাসী-কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত শ্লোক রুক্মি দেখিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিবার জন্য রুক্মি ক্ষত্রিয় রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়া কুণ্ডিনে লইয়া আসিয়াছে। এদিকে রুক্মিণী এক পত্র লিখিয়া সুনন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এদিকে ক্রথ ও কৌশিক নামক দুইজন ভক্তরাজা শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গরুড়-সহ নটবেশে গোপনে দুর্গা-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুক্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ইনিই সেই চন্দ্রাবলী। ভীষ্মক গোপনে শ্রীকৃষ্ণের করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বলরাম আসিলেন, বাহিরে ভীষণ যুদ্ধ হইল, বিপক্ষ ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ পরাভূত ও বিতাড়িত হইলেন।

১২। ললিতা-প্রাপ্তি—ষষ্ঠ অঙ্ক

মণিহরণ শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি অপূর্ব্ব উপাখ্যান। এই মণির নাম স্যমন্তক। যক্ষ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে মণি বলরামকে দিয়াছিলেন এবং বলরাম যে মণি মধুমঙ্গলের দ্বারা শ্রীরাধাকে দিয়াছিলেন, ইহা সেই মণি। শ্রীরাধা যমুনা-জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যমুনা সূর্য্যের কন্যা। পিতার আদেশে যমুনা শ্রীরাধাকে সূর্য্যলোকে লইয়া যান। এই মণি শ্রীরাধার সঙ্গে ছিল, তিনি এই মণি দিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করেন।

সত্রাজিৎ রাজা অপুত্রক ছিলেন, তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন। সূর্য্যদেব এই স্যমন্তক মণি ও সত্যভামা-নামা কন্যা সত্রাজিৎকে দান করেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে আদেশ করেন, নারদের আদেশানুসারে এই কন্যার বিবাহ দিও, আর এই মণিটিকে গৃহে স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ইহার পূজা করিও, এই মণি প্রত্যহ অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইয়া সত্রাজিতের নিকট এই মণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ তাহা দেন নাই। তাহার পর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন এই মণি লইয়া চলিয়া যায়। এক সিংহ বনমধ্যে প্রসেনকে বধ করিয়া এই মণি হস্তগত করে। ভল্লুক জাম্ববান আবার এই সিংহকে বধ করে, সুতরাং এই মণি জাম্ববানের হস্তগত হয়। শ্রীকৃষ্ণের দুর্নাম হইল, শ্রীকৃষ্ণই মণিহরণ করিয়াছেন। সত্রাজিৎ-কর্ত্তৃক এই দুর্নাম প্রচারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ দুর্নাম-ক্ষালনের জন্য মণি-অন্বেষণে বনযাত্রা করেন।

শ্রীরাধা যখন যমুনায় প্রবেশ করেন, তখন বিশাখা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং বিশাখাও জলে প্রবেশ করেন। ধর্ম্মরাজের কনিষ্ঠা ভগিনীই গোকুলে বিশাখা নামে পরিচিতা ছিলেন। বিশাখা শ্রীরাধার সখী, সেই কারণে যমরাজের মাতা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাও শ্রীরাধাকে অতিশয় ভালবাসিতেছেন। সংজ্ঞার পিতা শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মা। সংজ্ঞার প্রার্থনায় বিশ্বকর্ম্মা দ্বারকায় নববৃন্দাবন রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধার জন্যই এই নববৃন্দাবন রচিত হয়। সূর্য্যদেবের অপর পত্নীর নাম ছায়া, তিনি শনির জননী। তিনি শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন,—নববৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়া কি হইবে? তোমার যিনি বল্লভ, তিনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, অতএব তুমি তাঁহার সহিত সূর্য্যমণ্ডলে বাস কর। এই কথা শুনিয়া বিশাখা হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—একদিন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন, তাহাতে গোপীদের অনুরাগ কমিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবন ও গোপেন্দ্রনন্দন-ব্যতীত গোপীদের উপায় নাই।

সত্রাজিৎ, না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক রটনা করিয়াছেন। নারদ তাহার নিকট গিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। মণিহরণের যথার্থ ব্যাপার নারদের মুখে শুনিয়া সত্রাজিৎ অনুতপ্ত। তিনি ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর উপায় নাই। নারদের আদেশে সত্রাজিতের মাতা সত্যভামা বা শ্রীরাধাকে লইয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সত্যভামাকে রুক্মিণীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে স্নেহসহকারে গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ভয় হইয়াছিল। শেষে রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলী, সত্যভামা বা শ্রীরাধাকে নববৃন্দার হস্তে অর্পণ করিলেন ও নববৃন্দাবনে রাখিতে বলিয়া দিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মণি-অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বতগুহায় জাম্ববানের নিকট উপস্থিত। প্রথমে ভীষণ যুদ্ধ, শেষে জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে চিনিলেন এবং তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। ললিতা যখন পর্ব্বতচূড়া হইতে লম্ফপ্রদান করেন, তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন। এখন ললিতার নাম জাম্ববতী। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিমা গড়িয়া দিবারাত্রি তাহার পূজা করেন। ললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইল। জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তকমণি দিলেন আর কন্যারত্ন উপহার দিলেন। ভীষ্মক রাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সর্ত্ত আছে, রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলীর অনুমতি-ব্যতীত তিনি অন্যপত্নী গ্রহণ

করিতে পারিবেন না। কাজেই রৈবতক পর্ব্বতের কন্দরে ললিতাকে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিলেন। তিনি শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, নববৃন্দাবন ব্যতীত তাঁহার শান্তি নাই।

১৩। নববৃন্দাবন-সঙ্গম—সপ্তম অঙ্ক

শ্রীমতী রাধিকা বা সত্যভামা সূর্য্যদেবের আদেশে দ্বারকাপুরে রাজেন্দ্র-ভবনে আসিয়াছেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—"সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বারকাপুরীর গর্ভে যে নববৃন্দাবন নির্ম্মিত হইয়াছে তুমি সেইখানে যাও, সেখানে তুমি তোমার প্রাণনাথের সহিত বিহার করিবে।" কিন্তু তিনি দ্বারকাপতির পরিচয় কিছুই জানেন না। এখানে যে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে তিনি পরাধীন। শ্রীরাধা জানেন, হরি মথুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন; কাজেই তিনি ভাবিতেছেন, আমি দ্বারকাপুরে অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি, কাজেই প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব।

বকুলা ও নববৃন্দা শ্রীরাধার সেবা করিতেছেন। একদা বকুলা বলিলেন—আমাদের রাজেন্দ্র ত্রিলোক শাসন করিতেছেন, যদি আপনি আদেশ করেন তাহা হইলে আপনার কথা তাঁহার নিকট দিবেদন করি।

শ্রীরাধা বলিলেন—তোমাদের দ্বারকানাথ সকল সৌন্দর্য্যের আধার, তিনি ত্রিজগৎ শাসন করিতেছেন, করুন। তাঁহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাকে আর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করিও না, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্ম হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী রুক্মিণীকে মাল্য ও বস্ত্রাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন। রুক্মিণীদেবী তাহা আবার সখীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। নববৃন্দা রুক্মিণীর নিকট গিয়াছিলেন শ্রীরাধা বা সত্যভামার জন্য ঐ মাল্য ও বস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন। ঐ উপহার দেখিয়া শ্রীরাধার দুঃখ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এসকল লইয়া আমি কি করিব? নববৃন্দা বলিলেন—এসকল দ্রব্যের দ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিতে পার। কথায় কথায় নববৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিয়া ফেলিলেন—ব্রজেন্দ্রই রাজেন্দ্র। নববৃন্দা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত ছিলেন, একথা শ্রীরাধাকে বা সত্যভামাকে বলিবেন না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া

গেলেন। শ্রীরাধা উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি সত্য? নববৃন্দা উত্তর দিলেন না। বকুলা সুযোগ পাইয়া শ্রীরাধাকে বলিল—সখি, এই জন্যই বলিতেছি, রাজেন্দ্রকে আনন্দিত কর।

শ্রীরাধা বলিলেন—

যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছ প্রণীতো
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূল-গুঞ্জাবলীভিঃ।
বেণুর্বক্ত্রে রচয়তি রুচিং হন্ত! চেতস্ততো মে
রূপং বিশ্বোত্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গী-করোতি॥

যাঁহার মাথার চুলে ময়ূরের পাখা শোভা পায়, গলায় মোটা মোটা গুঞ্জাফলের হার, আর মুখে বাঁশি, সেই রূপ ছাড়া হরির অন্য অলৌকিক রূপকে আমার মন অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করে না

বকুলা বলিল—সখি তোমার বুদ্ধি বড় সরল, সেইজন্য সেই কঠোরেই অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছ।

শ্রীরাধা বলিলেন—মুগ্ধে, এমন কথা আর বলিও না—

ঔদাসিন্য-ধুরাপরীতহৃদয়ঃ কাঠিন্যমালম্বতাং
কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি! স্বৈরী সহস্রং সমাঃ।
কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা-দাস্যং নমে হাস্যতি॥

শ্যামসুন্দর স্বেচ্ছাবিলাসী, তিনি যদি আমার প্রতি হাজার বৎসর উদাসীন ও কঠিন হইয়া থাকেন, থাকুন, তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আমার দেহ, প্রাণ ও জীবন অপেক্ষাও প্রিয়, আমি ভ্রান্তিক্রমে ক্ষণকালের জন্যও সেই শ্রীকৃষ্ণে প্রণয়-দাস্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না।

এইবার শ্রীরাধা, বকুলা ও নববৃন্দার সহিত নববৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতেছেন। ঠিক্ একরূপ! বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ, যেমন বৃন্দাবন, তেমনি নববৃন্দাবন। সেই নিকুঞ্জকানন, সেই যমুনার তটভূমি। কিন্তু গোকুল-নাথ কৈ? শ্রীরাধার দেহ সন্তপ্ত হইয়াছে—তাঁহাকে কালিন্দী কূলে, কদম্বমূলে, নলিনী-নবদলে শয়ন করান হইল। এই সময়ে

নববৃন্দা তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—ললিতা কোথায়? শ্রীরাধা ললিতার ভৃগুপতনের কথা স্বর্গারোহণের সময় খেচরগণের নিকট শুনিয়াছেন।

শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শ্রীরাধা তাহার পূজা করিতে গেলেন। ভ্রম হইতেছে, সত্যই শ্রীকৃষ্ণ। আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—সত্যই প্রতিমা। তাহার পর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাল্যের গন্ধ পাইলেন।

পূজা করিয়া শ্রীরাধা চলিয়া গিয়াছেন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনিও শ্রীরাধা-বিরহে আত্মহারা। তিনি নিজের প্রতিমা দেখিলেন, মালা ও চন্দন দিয়া শ্রীরাধা পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও দেখিলেন। তিনি মধুমঙ্গলের দ্বারা প্রতিমাকে অন্য কুঞ্জে সরাইয়া, নিজে ঠিক্ প্রতিমার মত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সখীদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধা আবার আসিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নববৃন্দাবনে আবার মিলন হইল। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন-কে—এ কল্পলতিকা? ইনি যে আমার চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন! ইনি কি আমার সেই প্রাণবল্লভা রাধা? ইহাও বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ?

শ্রীরাধা আসিয়া অশ্রু-সজল-নয়নে যুক্তকরে বলিতেছেন—প্রতিবিম্ব, তোমার স্বীয় বিম্ব সেই পদ্মলোচনের কুশল ত?

শ্রীকৃষ্ণ উল্লাসের সহিত বলিতেছেন—মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে! কৃষ্ণ উপস্থিত কুশলে আছেন, কারণ এখন তুমি সেই ঊর্দ্ধলোকগামিনী শ্রীরাধার অনুকরণ করিয়া ইঁহার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেছ!

শ্রীরাধা—নববৃন্দে! একি প্রতিমা বেশ মধুর কথা বলে? শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—বিশ্বকর্ম্মার নাট্যের কি চমৎকারিতা—এই নাট্যের শ্রীরাধা ঠিক্ শ্রীরাধারই মত।

শ্রীকৃষ্ণের নয়নে অশ্রুপাত হইতেছে। শ্রীরাধা মুছাইয়া দিলেন। শ্রীরাধার অঙ্গ-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ আরও আকুল হইলেন। 'প্রতিমা যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল' শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলেন। নববৃন্দার আদেশে বকুলা মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর পরিবারসহ চন্দ্রাবলী বা মাধবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাবলী

শেষে শ্রীকৃষ্ণের উপর কোপ প্রকাশ করিয়াই বলিয়া গেলেন—আপনি আপনার হৃদয়ঙ্গম প্রণয়িজনের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন, আমি অন্তঃপুরে যাইতেছি।

১৪। নববৃন্দাবন বিহার—অষ্টম অঙ্ক

সত্যভামাকে দেখিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম হইয়াছিল, 'ইহা সত্যভামার প্রতিমা', আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সত্যভামার ভ্রম হইয়াছিল, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা, এই যে ভ্রম, ইহা কি বিশ্বকর্ম্মার মায়া? বিশ্বকর্ম্মা বলিতেছেন, ইহা ভ্রম না হইতেও পারে—ইহা বিচ্ছেদরূপ অনুরাগামৃতের বিলাসস্বরূপ। "বৈশ্লেষিকানুরাগামৃতবিভ্রমোঽয়ং"

শ্রীরাধাসঙ্গমকামী পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলীর প্রসন্নতালাভের জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন। সুরসৌগন্ধিক নামক অদৃষ্টচর পদ্ম আনিয়া দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এমন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, যাহা ইন্দ্রালয়েও নির্ম্মিত হয় নাই। সত্যভামা, সূর্যদেবের সম্পর্কে বিশ্বকর্ম্মার নাতিনী; এই কারণে বিশ্বকর্ম্মা কেবল রুক্মিণীর জন্য নহে, রুক্মিণী ও সত্যভামা উভয়েরই জন্য দুই পেটিকা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রুক্মিণী বা চন্দ্রাবলীকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বন্যবেশে নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমভিক্ষা করিলেন, তখন শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বলিতেছেন—নববৃন্দে ইহা নিশ্চয়ই স্বপ্ন! নববৃন্দা শ্রীরাধাকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শোভা ও বৃন্দাবনে ষড়ঋতুর একত্র সমাগম দেখাইতেছেন। শ্রীরাধা বিষণ্ণহৃদয়ে নববৃন্দাকে বলিয়াছেন—হায় আমার প্রিয়সখী বিশাখা কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ বিশাখার কথা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—প্রিয়ে আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। আমি সুরসৌগন্ধিক নামক পুষ্প আনিবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত খাণ্ডববনে গিয়াছিলাম। গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন সেখানে মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ দুইটি বাজপাখী আসিয়া দুইটি পাখীকে আক্রমণ করিল। নিগৃহীত পাখী দুইটির ভিতর একটি অপরটিকে বলিল, 'বন্ধু শুক! প্রাণের আশা প্রাণেই থাকিয়া গেল; শ্রীরাধার কন্দযজ্ঞে, নূতন চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর ও মধুর মৃণাল-খণ্ড আর আমি খাইতে পাইলাম না।' এই কথা শুনিয়া শুক

বলিল—'সখে রাজহংস, আমারও তাই, শ্রীরাধার ফলযজ্ঞে লোহিতবর্ণ নাগরঙ্গফল আর খাইতে পাইলাম না।' পাখী দুইটির এই কথোপকথন শুনিয়া আমি বাজপাখীর আক্রমণ হইতে পাখী দুইটিকে রক্ষা করিলাম। তাহার পর বেড়াইতে বেড়াইতে এক বৃদ্ধার সহিত দেখা হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি কে?'

বৃদ্ধা উত্তর করিল—এই যে দীর্ঘিকা, ইহাতে সুরসৌগন্ধিক-পুষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আর এই বৃক্ষ-বাটিকায় অমৃতপূর্ণ মনোহর ফল পাখীরা আনন্দে ভোজন করিতেছে। এই সমুদয় তপস্যার দ্বারা উৎপাদিত। আমি এই দীর্ঘিকার ও বৃক্ষবাটিকার পালিকা পুলিন্দী। এই বৃক্ষবাটিকায় পক্ষিদিগের জন্য যজ্ঞ হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এই যজ্ঞ কে করিতেছে? বৃদ্ধা উত্তর করিল—'এক তপস্বিনী ব্রতধারণ করিয়া দীর্ঘকাল জলের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। সে ব্রত শেষ হইয়াছে—এখন তিনি শ্রীরাধার অভীষ্ট-সাধন-নামক এক বন্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।' আমি তপস্বিনীকে দেখিতে চাহিলাম। বৃদ্ধা আমাকে এক পর্ব্বতগুহা দেখাইয়া দিল। সেখানে গিয়া দেখিলাম, পরিধানে অতি মলিন বল্কল, সর্ব্বাঙ্গে ধূলিমাখা, মাথায় জটা, এক তপস্বিনী পদ্মরাগমণির এক মালা লইয়া জপ করিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র সেই তপস্বিনী কাতরস্বরে কাঁদিতে লাগিল—

হা গোকুলেন্দ্রনগরী-যুবরাজলীল
হা বল্লবীহৃদয়পঙ্কজ চঞ্চরীক!
হা রাধিকাকুচকুরঙ্গমদাঙ্গরাগ
ভূয়োঽপি হা মম দৃশোঃ পদবীং গতোঽসি॥

তুমি কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইলে?

আমি চিনিতে পারি নাই, ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? তিনি গদ্গদস্বরে বলিলেন,—আমি তোমার হতভাগিনী দাসী বিশাখা। বিশাখাকে আমি তাহার পূর্ব্ব দেহ দিয়াছি, আর তোমার কুশলবার্ত্তা বলিয়া তাহাকে সুসজ্জিতা করিয়া দ্বারকায় লইয়া আসিয়াছি।

শ্রীরাধিকা বিশাখাকে দেখিতে চাহিলেন। নববৃন্দা বলিলেন—বিশাখাকে তাঁহার পিতা সূর্য্যদেব বলিয়া দিয়াছেন, যতদিন স্যমন্তকমণির বিচ্ছেদ থাকিবে ততদিন তুমি তোমার

প্রিয়সখীর সহিত সাক্ষাৎ করিও না। নববৃন্দার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—একথা সত্য, মাতা সংজ্ঞা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন—স্যমন্তকমণি যখন তোমার হস্তগত হইবে, তখন তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবনের বনশোভা দেখিতেছেন ও শ্রীরাধাকে দেখাইতেছেন। নববৃন্দা সঙ্গে সঙ্গে আছেন। বৃন্দাবনের সেই বিহারের আনন্দ সম্পূর্ণরূপেই হইতেছে—কিন্তু শ্রীরাধা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহার পর চন্দ্রাবলী আসিলেন।

১৫। চিত্রদর্শন

নরকাসুর ব্রজপুর হইতে ষোলহাজার একশত রোরুদ্যমানা গোপকুমারী হরণ করিয়া আনিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়াছেন। এখন সেই গোপকন্যাগণের জন্য রৈবতক-পর্ব্বতে ষোলহাজার একশত গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। নরকাসুর প্রচার করিত যে এই কন্যাগুলি রাজপুত্রী। নরকাসুরের ব্যবহারে কামাখ্যাদেবীও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নরকাসুর বধের জন্য অনুরোধ করেন। পশুপালশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তবৃষকে বন্ধন করিয়া, নগ্নজিৎ-দুহিতা মিত্রবৃন্দাকে লইয়া আসিয়াছেন, ইনিই পদ্মা। শৈব্যা ও ভদ্রাকে আর মদ্রেশ্বর-নন্দিনী লক্ষ্মণা-নাম্নী শ্যামলাকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া আসিয়াছেন।

চন্দ্রাবলী বা রুক্মিণীর অনুমতি-ব্যতীত এখন শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করিতে পারেন না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি লইলেন। 'সত্যাখ্যলোক দর্শনের জন্য আত্মভূ (ব্রহ্মা বা কাম) কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছি—অতএব সেখানে যাইতে অনুমতি দাও।' এই প্রকারে অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নব-বৃন্দাবনের শোভা দেখাইতেছেন, এমন সময়ে একটি বাণী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিলেন ও শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে মলয়ানিল, শ্রীরাধা কোথায় বলিয়া দাও। হে কুরঙ্গি, তোমার নয়নযুগল শ্রীরাধার নিকটেই এই চঞ্চল নেত্রলীলা শিখিয়াছে। শ্রীরাধা কোথায় বলিয়া দাও। তাহার পর দাড়িম্বি বৃক্ষকে

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই সময়ে সুকণ্ঠি আসিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আলেখ্য দর্শনের জন্য একরূপ বাধ্য করিলেন। পর্ব্বত-গুহায় এই আলেখ্য আছে, একজন বিদ্যাধরী তাহা আনিয়াছেন। রাত্রিকাল, কৌস্তুভমণির আলোকে সেই চিত্রপট দেখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, মধুমঙ্গল ও নববৃন্দা আছেন। চিত্রপট দেখা হইতেছে। নন্দোৎসব, পূতনামোক্ষণ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্ত্তবধ, গোকুলেশ্বরীর দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, বৎসাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মার স্তব, ধেনুকাসুর বধ, বলদেব-কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুর বধ প্রভৃতি চিত্রপটে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীরাধার খেদ উৎপন্ন হইবে বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা কালিয়দমনলীলা প্রকাশ করেন নাই। তাহার পর দাবানলপান ও বস্ত্রহরণ। এই চিত্র দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপও হইতেছে। তাহার পর দ্বিজপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষালীলা, গোবর্দ্ধনধারণ। এই স্থানে পর্ব্বতগুহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে তাঁহাদের পণ রাখিয়া যে পাশা খেলা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহার পর রাস। 'রাস' এই কথাটি শ্রবণমাত্রেই শ্রীরাধা উদ্‌ঘূর্ণাগ্রস্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ উৎসুক্যের সহিত বলিলেন—

নিমজ্জতি নিমজ্জতি প্রণয়কেলিসিন্ধৌমনো বিঘূর্ণতি বিঘূর্ণতি প্রমদচক্রকীর্ণং শিরঃ।
অহো! কিমিদমাবয়োঃ সপদি রাস-নামাক্ষরদ্বয়ী-জনুষি নিস্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি॥

রাস, এই নামের অক্ষর দুইটি যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই শব্দ শুনিবামাত্রই আমাদের দুইজনের মন প্রণয়কেলিসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল, আনন্দচক্রে মস্তক পরিব্যাপ্ত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

তাহার পর অম্বিকাবন ও তথায় সর্পদেহ হইতে সুদর্শনের মুক্তিলাভ। তাহার পর শঙ্খচূড় বধ, বৃষাসুরবধ, ব্যোমাসুর বধ। এইবার অক্রূরাগমন। অক্রূরের নাম শুনিয়াই শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভ্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—কোমলে কাতর হইও না, ইহা চিত্র। তাহার পর মথুরাগমন, রজকবধ, কুব্জার লীলা, কংসবধ।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এস আমরা সকলে কালিন্দীতীরে যাই।

এইবার মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট অনুমতি

লইয়া সত্যলোকে গিয়াছেন—ইহাই চন্দ্রাবলী জানেন। চন্দ্রাবলী বিরহে কাতরা হইয়া নববৃন্দাবনে আসিয়াছেন। চন্দ্রাবলী জানেন নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রতিমা আছে। মাধবী চন্দ্রাবলীকে বলিতেছে,—শুনিয়াছি রাজেন্দ্র, এখনও ব্রহ্মলোকে যান নাই, এইখানেই আছেন। চন্দ্রাবলী বলিতেছেন, সত্য, আমি তাঁহার অঙ্গের সৌরভ পাইতেছি। চন্দ্রাবলী দেখিলেন এক কুঞ্জের দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—বিদর্ভ-নন্দিনী এখন দ্বারকায়, আমি নির্ব্বিঘ্নে এই উপবনে বিহার করিব। চন্দ্রাবলী কেবল 'বিদর্ভনন্দিনী' এই কথাটি শুনিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একরূপ বলিতেছেন, চন্দ্রাবলী অন্যরূপ বুঝিতেছেন। এইবার উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই, ইনি চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে দেখিলেন, কিন্তু ভাবিলেন, ইহা বোধ হয় মায়া-নির্ম্মিত। চন্দ্রাবলী বুঝিলেন ও শেষে বলিলেন,—দেব, আপনার সঙ্কোচ দেখিয়া আমি বিদীর্ণ হইতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন, আমি অন্তঃপুরে চলিলাম। এই বলিয়া চন্দ্রাবলী সঙ্গিনীগণসঙ্গে চলিয়া গেলেন।

১৬। দশম অঙ্ক—পূর্ণ-মনোরথ

চিত্রদর্শনের দিন দেবী রুক্মিণী প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া সত্যাকে বা শ্রীরাধাকে অন্তঃ-পুরে লইয়া গিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কামরূপ দেশের যে শুকপক্ষী মধুমঙ্গলের নিকট ছিল, দেবী রুক্মিণী তাহাও চাহিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীরাধাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, নববৃন্দা তাঁহাকে বলিলেন, উহা অসম্ভব। এই সময়ে সত্রাজিৎ রাজা পিঙ্গলানাম্নী এক দাসীর দ্বারা সত্যভামার নিকট স্যমন্তকমণি পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও নববৃন্দার সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। মধুমঙ্গল রুক্মিণীদেবীকে জানাইলেন যে সত্রাজিৎ রাজা স্যমন্তকমণিসহ দুইজন দাসী পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা অন্তঃপুরে সত্যভামার নিকট যাইবেন। রুক্মিণীদেবী অনুমতি দিলেন, কিন্তু শ্যামবর্ণা ও অবগুণ্ঠনবতী দাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। সত্যভামা বা শ্রীরাধা অবশ্য তাঁহাকে চিনিয়াছেন। নিভৃতে অন্তঃপুরে তাঁহাদের মিলন হইল। দেবী-রুক্মিণী হঠাৎ স্যমন্তকমণি দেখিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ ধরা পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি রুক্মিণীকে বা চন্দ্রাবলীকে বলিলেন—দেবি আজ আমাকে চিনিতে পারিবে কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্ত আমি এই নাট্য অঙ্গীকার করিয়াছি।

শ্রীরাধার মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইলেন, পৌর্ণমাসী ও যশোদার সহিত ব্রজ-বাসী বন্ধুগণ দ্বারকায় আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী তাঁহাদের নিকটে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলেশ্বরী যশোদার ক্রোড়ে বসিয়াছেন। যশোদা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিতেছেন—'পুত্র, তুমি আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ, বহুকাল দেখা দাও নাই।' শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মা কেন লজ্জা দিতেছ? আমি কি তোমাদের ভুলিতে পারি। তাঁহার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শুকপাখীর কথা, হরিণ-শিশুর কথা, ময়ূরের কথা ও রাখালসখাগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যশোদা বলিলেন, রাখালসখাগণ আসিয়াছে—বাহিরে সুধর্ম্মায় বসিয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। চন্দ্রাবলী আসিলেন। যশোদা তাঁহাকে কোলে লইলেন, আনন্দের সীমা নাই। মুখরা চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। রোহিণীও কাঁদিতেছেন, পৌর্ণমাসীও কাঁদিতেছেন। এদিকে ললিতা ও পদ্মা আসিলেন, আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল। দেখাশুনা ও পরিচয় হইল। চন্দ্রাবলী জানেন না যে সত্যভামাই শ্রীরাধা। শ্রীরাধার জন্য তাঁহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে সংবাদ আসিল সত্যভামা কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতেছে, আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধার করিতে ধাবিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উদ্ধার করিলেন। মহাদেব দ্বারকায় উপস্থিত। এইবার সকলে বুঝিলেন শ্রীরাধাই সত্যভামা। চন্দ্রাবলী তখন শ্রীরাধার কণ্ঠ জড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন অনুভব করিতেছেন তিনি গোকুলেই বাস করিতেছেন। বিশাখাও নির্ঝর হইতে উঠিয়া আসিলেন। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের করে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিলেন। চন্দ্রাবলী প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিলেন। রৈবতপর্ব্বতের সহিত পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য ও গোবর্দ্ধন আসিলেন, যদুবীরগণসহ বলরাম ও যদুকুলরমণীগণসহ রেবতী আসিলেন। নন্দ, শ্রীদাম, সুদাম সকলেই আসিয়াছেন। কেহই বাকি নাই। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, ইন্দ্রশচী, কুবের ঋদ্ধি, যম-ধূমোর্ণা, বরুণ-গৌরী, সূর্য্য-সংজ্ঞা, মরুৎ শিবা, অগ্নি-স্বাহা, চন্দ্র রোহিণী, সকলেই আসিলেন। সত্যভামার বিবাহ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গম মহোৎসব।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

[আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী 'বীরভূমি'তে অপ্রকাশিত পদাবলী প্রকাশিত করিতেছিলাম। এখন পুনরায়, যে সকল অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদাবলী সংগৃহীত হইতেছে, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব। 'পদকল্পতরু', 'পদকল্পলতিকা', 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'গৌরপদতরঙ্গিণী', 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' প্রভৃতি বহুলপ্রচারিত পদসংগ্রহগ্রন্থে যে সকল পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় নাই, আমরা সেই সকল পদ প্রকাশিত করিব।]

১। পদকর্ত্তা—ভাগবতানন্দ

'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে, এই পদকর্ত্তার কুঞ্জভঙ্গবিষয়ক একটি মাত্র পদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা একখানি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে (রতন-লাইব্রেরী পুথি, নম্বর - ২০৮৮), ভাগবতানন্দের আরও দুইটি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই পদ দুইটি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

(রসোদ্গার)

(১)

সহচরি সবহু মিলিল ধনী মন্দিরে শুনইতে কানুক লেহা।
রাই সুচন্দ্র বদন হেরি ভুলল পুলক করম্বিত দেহা॥
সো সব হেরি আকুল ভেল সুন্দরী গর-গর প্রেম ভরে।
পিয়ে কি পিরীত রভস রস মাধুরী শোঙরি নয়ন ঝুরে॥
কহইতে চাহ থেহ নাহি বান্ধই গদগদ ভাষ হি ভাস।
কত কত ভাব উঘাতই অঙ্গহি মধুর মধুর খেলে হাস॥
প্রেম পসার পসারল রঙ্গিনী বচন অমিয়া রসপুর।
ভাগবতানন্দ কহ ইহ সুন্দরী সুনিতে শ্রবণ সব ঝুর॥

(২)

কহব কি কানু চরিত বর মাধুরী এক বয়ান বিধি দেল।
দরশনে লোরে অথির ভেল নাগর আদরে আগুসারি নেল॥
কহইতে চাহ অধর যুগ ঝাপই অনক্ষণে আধভাস।
আগমন বাত পুছত পদ পুরত পুছত লেই নিজ বাস॥

কাহা হামে থোয়ব থেহ না লাগই থোই চাহসি নিটির।
বদন হি হেরি চুলাও কর পঙ্কজ নয়ান নিমিখ করু স্থির॥
দরশ প্রেম সাওরে ভেল আকুল তনু তনু পসারি না পারি।
চরণ সুভাতি মরম মিটাওই ভাগবতানন্দ বলিহারি॥

২। পদকর্ত্তা—যাদবেন্দু

এযাবৎ প্রকাশিত প্রধান প্রধান পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে যাদবেন্দুর পদ প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। আমরা (রতন-লাইব্রেরী—২০৮৮ সংখ্যক পুথি) এই পদকর্ত্তার ৪টি মাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই-স্থলে তিনটি পদ উদ্ধৃত হইল—একটি পদের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে।

(গোষ্ঠ-লীলা)

(১)

দিছে রাণী বাম করে শ্যাম। দক্ষিণ করে বলরাম॥
হের আয়রে বলরাম, হাত দে মোর মাথে।
প্রাণের অধিক শ্যাম সঁপে দি তোর হাতে॥
রামের হাতে শ্যাম দিয়া বলে নন্দরাণী।
লঞা যেছো আমার গোপাল, এনে দিও তুমি॥
যমুনার তীরে যখন গোপাল ধেঞা যায়।
আড়ুড় বিষম বড় সামালিও তায়॥
গোধনে গোধনে যখন লাগে হুলাহুলি।
সেখানে সামালো আমার পরাণ পুতলি॥
নবনব তৃণাঙ্কুর যেখানে দেখিবে।
সেইখানে গোপালে আমার কান্ধে করি লবে॥
রবির কিরণে যখন ঘামিবেক গা।
নূতন পল্লব নঞা দিও মন্দ বা॥
কাল যমুনার জল, কাল নীলমণি।
কালজলে কালরূপ মিশায় পাছে জানি॥
প্রাণধন তোরে দিঞা আমি ঘরে যাই।
যাদবিন্দু বলে রাণী, কিছু ভয় নাই॥

(২)

রৈয় রৈয় রৈয় রে।
নেহারি বয়ান, জুড়াক পরাণ, তবে মা'য়ে ছেড়ে জেও রে ॥
আগে ধেঞা রাণি, যশোদা রোহিণী, নেহারে চান্দ মুখ খানি।
অন্তরে কাতরে, আঁখে জল ঝরে, মুখে নাহি সরে বাণী ॥
শ্রীদাম সুদাম, শোন বলরাম, তোমা সভাদিকে কই।
মৃত তনু এই, ঘরে লঞা যাই, পরাণ পুতলি ঐ ॥
কল্যাণ কুশলে, গোসাঞী রাখুক তোরে, মায়ের সনে এই দেখা।
যাদবেন্দু সুখী, তবে প্রাণ রাখি, নন্দ ঘুচায় ধেনু-রাখা ॥

(৩)

গোঠ বিজই রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায়, লাখে লাখে ধেনু ॥
নপুরের ধ্বনি শুনি মুনির মন ভুলে।
ঢাকিল রবির রথ গোক্ষুরের ধূলে ॥
সুরঙ্গ চাহনি বিনোদ পাগুড়ি।
কারু নীল, কারু পীত, কারু রাঙ্গা ধড়ি ॥
কারু হাতে রাঙ্গা লাঠি, গলে গুঞ্জাহার।
কারু কারু কান্ধে শোভে ভোজনের ভার ॥
কেহ কেহ ধেঞা গিএ ধেনু বাহুড়ায়।
যাদবেন্দু এক পাশে দাঁড়াইয়া চায় ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

সতীশচন্দ্রের গান

বীরভূম জেলার অন্তর্গত চহটা-গ্রামে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই, ৩০।৩২ বৎসর হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে আমরা এইটুকু খবর পাইয়াছি। বীরভূম অঞ্চলে তাঁহার গান, লোকের মুখে মুখে ও ভিখারী বৈরাগীদিগের দ্বারা বিশেষভাবে সুপ্রচলিত এবং সমাদৃত হইয়াছে। 'বীরভূম-অঞ্চল' বলিতে কাটোয়ার পশ্চিমাংশ, যাহাকে 'মধ্য-রাঢ়' বলা যায়, সেই অঞ্চল বুঝিতে হইবে।

সতীশচন্দ্রের সঠিক্ পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। এইটুকু জানা গিয়াছে, তিনি সাধক-শ্রেণীর লোক ছিলেন, জপ ধ্যান পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান লইয়া থাকিতেন। তারাপুর, কঙ্কালীতলা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী পীঠস্থান ও তীর্থস্থানে যাতায়াত করিতেন, আর ধর্ম্মপ্রিয় লোকজনের সঙ্গ করিতেন, তাঁহাদের অনুরোধে অনেক সময়ে গান রচনা করিয়া তাঁহাদের শুনাইতেন। বাউল বৈরাগী কেহ কেহ তাঁহাকে গুরু বলিয়া দাবী করেন। এই গুরু, কি প্রকারের তাহা বলা যায় না; গানের গুরুও হইতে পারে।

বাঙ্গালার কবিতাকাননে সাধকের গান বলিয়া পরিচিত বহু সঙ্গীত আছে। সৌরভে, পবিত্রতায় এই গানগুলি অতুলনীয়, আর এই গানগুলির সমাদরও খুব বেশী। বিনা-চেষ্টায় অল্পদিনেই এই গানগুলি লোকের মুখে মুখে সমগ্র দেশে প্রচারিত হইয়া যায়। কিগুণে এই গানগুলির এত আদর ও প্রসার হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার।

সতীশচন্দ্রের গান ভিখারী বৈরাগীর মুখে অনেকগুলি শুনিয়াছি। এই গানে এমন একটা আন্তরিকতা, স্বাভাবিকতা, ও স্বচ্ছন্দতা আছে যে ঐগুলি সাধকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইবার উপযুক্ত। তাঁহার সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইতেছে, পরে আরও আলোচনা হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার শ্রীগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নিম্নের চারিটি সঙ্গীত আমরা পাইয়াছি।

(১)

কহরে মন তারা তারা, রহরে মন তারাপুরে।
কেন বৃথা এ দুঃখ ভোগরে, এ ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে ॥
দ্বারকা নাম ধারিণী, পাপ-হারিণী, প্রবাহিণী কূলে,
মহাশ্মশান মাঝারে তারা, বিহরে শাল্মলী মূলে,

উন্মিলিত করি নেত্র, দেখরে এই মহাতীর্থ,
যে ক্ষেত্রে পশিবামাত্র, কর্ম্মসূত্র যায় দূরে ॥
বশিষ্ঠারাধিতা তারা, যত্র তারা শিলাময়ী,
তত্র বসি বিহরসি, এক্ষেত্র বারাণসী জয়ী ;
তারা-চরণে তারা দিয়ে, রহরে শমনে তাড়া দিয়ে,
ডাকরে মায়ে, নিরুপায়ে, রাখিবে পায়ে কৃপা করে ॥
ধন্য রাজা রামকৃষ্ণ, ধন্য মহা পুণ্যবান,
যাঁর কীর্ত্তি অদ্যাপিও, তারাপুরে বিদ্যমান ;
সাধন করি স্বকীয়েষ্ট, সাধকজন মাঝে শ্রেষ্ঠ,
যাঁর কীর্ত্তি করি দৃষ্ট, শুভাদৃষ্ট বলে নরে ॥
বিরিঞ্চি বাসব ভব, যাঁর মহিমা না জানে,
অক্ষম অধম দ্বিজ, সতীশ তাঁর গুণ গানে ;
বিষয়-বিষ বিসর্জ্জিয়ে, তারানাম পীযূষ পিয়ে,
প্রেমে ঢলিয়ে, তারা গলিয়ে, তারা বলিয়ে নাচ নারে ॥

[বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপুর গ্রামে দ্বারকানদীর তীরে তারাপীঠে বসিয়া এই গানটি রচিত হয়]

(২)

আড়ম্বরী ঘটায়, কপাল-জোড়া ফোঁটায়,
মদের বোতল পাঁঠায়, ভুলবে নাক মা।
মা মা বলে যত, চেঁচাও, ডাক, মাথা ঠোক,
কারও কথায় সেত, কাড়বে নাক রা ॥
মর নেশার ঘোরে, চ-কার ব-কার ক'রে,
ম-কারে বিকার মলে, অহঙ্কারে এমন চক্র করে,
তাঁর চক্রে পড়ে শেষে, কুলাল চক্রে ঘুরে, প্রাণে বাঁচবে না
তাঁরে ধররে হয়ে বীরাচারী, কিম্বা হয়ে বামাচারী,
বামন ধরবে চাঁদ, বামুন হবে হাড়ী,
লম্বা কোচাধারী, কৌপীন আঁটা দাড়ী,
আসনজারী ভারী, কাজে ফুরুৎ-ধা ॥

সাধ মহামন্ত্র, চল তন্ত্রপথে, গুরু বই ভুলোনা কারো মন্ত্রণাতে,
তবে জয়ী হবি, সেই যম-যন্ত্রণাতে, সাধন দরিয়াতে, পেতে পারবি না ॥
দ্বিজ সতীশ কয় যেদিন ঘরে ঢুকবে জগৎ ভ্রমি,
সেদিন ভক্তি নিক্তি কাঁটায় মরবে বেশী কমি,
যেদিন প্রেম-সিন্ধু মথি, হতে পারবে প্রেমী,
সেদিন জানবে তুমি, কোথায় তোমার মা ॥

[কোনও গ্রামে কতকগুলি লোক তান্ত্রিক বীরাচারের নামে তাঁহাকে সুরাপান করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেন। তিনি তাহা অস্বীকার করেন এবং বীরাচারের ব্যাভিচারিগণ প্রকৃতিস্থ হইলে, তাঁহাদের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি রচনা করিয়া তাঁহাদের শুনাইয়াছিলেন।]

(৩)

জয় মা কঙ্কালী কালী, কাল-ভয়ে মা রাখ দাসে।
বড় ভীত হয়ে এসেছি তারা, দাঁড়াতে তব পদপাশে ॥
কোপাই-তটিনী-তট নিকটে পীঠমাঝে কি মহামেলা,
স্বহর কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডমাঝে কর খেলা,
(আমার) বয়ে গেল জীবন-বেলা, চরণ ভেলা পাবার আশে ॥
কাঞ্চিদেশে বিরাজ কর মা', করকাঞ্চিবিভূষিণী,
ঈশান সনে শ্মশান মাঝে, খেল সুখে মা ত্রিনয়নী,
ভৈরব নামেতে রুরু ভৈরব করিছে ধ্বনি,
শুনি সে ধ্বনি, সাধক যিনি, লভেন সিদ্ধি অনায়াসে ॥
তুষিতে জীবন দেহ কেহ কেহ তুষিছে শ্রুতিপাঠে,
কত সাধক দণ্ডী, পড়িছে চণ্ডী, বসি কুণ্ডের ঘাটে ঘাটে,
মহামায়া তোর মহামেলায়, কি আনন্দ মহাপীঠে,
নিরখি প্রেমে আঁখি ফোটে, কার ধারা না পড়ে ভেসে ॥
হে শিব-আদরিণী শিব-পুরাণেতে আছে জানা,
জীবে দাও শিবত্ব-পদ, করিলে পদ উপাসনা,
তোর নাম নিলে মা শবাসনা, কার না পুরে স্ব-বাসনা,
তাই বাসনা যেন রসনা, ভাসে গো কালী নাম-রসে ॥

নাশিতে মনবেদনা, নিবেদি জননী তব পায়,
চরম দিনে চরম ধ্যানে, যেন সতীশের জীবন যায়,
পাপী বলে ঠেল না পায়, অনুপায়ের নাহি উপায়,
স্থান দিতে ঐ রাঙ্গা পায়, বঞ্চিত করোনা শেষে ॥

[বীরভূম জেলার বোলপুর চৌকীমধ্যে কোপাই নদীর তীরে কঙ্কালীপীঠের মহামেলার সময় রচিত]

(৪)

হওরে প্রেমানন্দে চিত, রাধাগোবিন্দ চরণাশ্রিত।
অকারণ দহিছ কেন, চিন্তাচিতানলে চিত ॥
যাইবে দুঃখ, পাইবে সুখ, দেখ সে সুখময়ে ডেকে,
পড় বিপাকে, পাকে পাকে, সেই বাঁকা সখাকে ভুলে থেকে,
যাবে, পাবে আনন্দ, রাধাগোবিন্দ বল মুখে,
রসে ভাসায়ে রসনাকে, পান কর নাম-রসামৃত ॥
ত্যজ কনক, ত্যজ কামিনী, ত্যজ বিষয়, ত্যজ মায়া,
মজ মুরারির পদ-রাজীবে, জগতজীবে কর দয়া,
পাবে শ্রীগুরুকৃপাতে, চারুশান্তি-তরুতলে ছায়া,
(তোর) সন্তাপিত জীবনকায়া, জুড়াবে জনমের মত ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম, সমর্পণ করিতে তাঁকে,
বলে ডাক, হা গোবিন্দ, যেন কামগন্ধ নাহি থাকে,
দ্বিজ সতীশ ভাষে, হৃদয়ে এসে, কবে হেসে হেসে, দাঁড়াবে বেঁকে,
দেখে হৃদি-গোলকে, গোপবালকে, পুলকে হব পুলকিত ॥

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান সংখ্যা, ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বাদশ সংখ্যা। আশ্বিন মাসে দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইবে। ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে সপ্তম খণ্ড আরম্ভ হইবে ও মাসে মাসে একএকখণ্ড করিয়া বাহির হইবে। নূতন খণ্ডের প্রত্যেক সংখ্যায় শ্রীশ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে একটি করিয়া প্রবন্ধ, আর বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে একটি করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অর্থাৎ পূর্ণ একখণ্ডের মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ভি, পি, তে লইলে গ্রাহককে ৩।০ তিন টাকা চারি আনা লাগিবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

সিউড়ী, বীরভূম
শ্রাবণ, ১৩৩১

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে—"সুখ পাঠ্য", "প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৸০ ও কাপড় বাঁধা ৸৶০। ভি পি ১৲ ও ১৸৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষ্ণনগর—শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুককলব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান
(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা

২ শ্রীশ্রীরাসলীলা-প্রসঙ্গ

৩ বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

৪ শিরোমণি মহাশয়ের গান

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

২০৫/৭

দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীরাধা

১। উপাখ্যান

বসুদেব মধুপুরীতে থাকেন। তিনি যজ্ঞ করিবেন। কংসের অত্যাচার, কাজেই গোপনে যজ্ঞ করিতে হইবে। গর্গের জামাতা ভাগুরিকে বসুদেব প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ হইবে, নিজে আসিতে পারিবেন না। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে গোবিন্দকুণ্ডের তীরে যজ্ঞের স্থান।

শ্রীমতী রাধিকা গুরুগণের আদেশে সখীগণের সহিত সদ্যঃ-ঘৃত লইয়া সেই যজ্ঞ-স্থলে বিক্রয় করিতে যাইবেন। রাজকন্যা ঘৃত বেচিতে যাইবেন—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! মুনিরা বলিয়াছেন, যজ্ঞস্থলে যে নারী ঘৃত লইয়া যাইবে, তাহার অভীষ্ট লাভ হইবে, এইজন্যই শ্রীরাধা প্রেরিতা হইয়াছেন।

বসুদেব সাধুপুরুষ, তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান অভিচার নহে,—কাহারও অনিষ্টসাধনের জন্য নহে। তাঁহার মিত্রপুত্র শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার নিজপুত্র বলরামের শান্তিবিধানের জন্যই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধা ঘৃত লইয়া যাইবেন, পৌর্ণমাসীর উপদেশে নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে এ সংবাদ জানাইয়াছেন। সখা সুবল ইহা বৃন্দার নিকট শুনিলেন। সুবল ভাবিলেন, ভালই হইল; আজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণের নিকট দান লইবেন, সে বেশ সুন্দর খেলা হইবে। বৃন্দাও তাহাই ভাবিলেন। সুবল ও বৃন্দা, মানসগঙ্গার তীরে অবতরণ করিলেন।

মানসগঙ্গার দক্ষিণপার্শ্বে বনের ভিতর বেশ একটি মধুর শব্দ হইতেছে। সুবল তাহা শুনিয়া মনে করিতেছে হংসের কণ্ঠস্বর। বৃন্দা তাহাকে বলিলেন, উহা ব্রজবালাদের নূপুরের শব্দ। এইবার দেখা যাইতেছে, মাথায় ঘৃতপূর্ণ স্বর্ণঘট লইয়া সখীগণের সহিত শ্রীমতী রাধিকা আসিতেছেন। বৃন্দা ও সুবল দূর হইতে সেই রূপমাধুরী দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। বৃন্দা বলিলেন,—সুবল, তুমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর যে শ্যামল-মণ্ডপ আছে, সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাও। আমাকে ধীরে ধীরে যাইতে হইবে। ব্রজবালাদের বিলাস-কৌশল দেখাই আমার জীবনের আনন্দ। আমি তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিতে দেখিতে যাইব।

চারিজন সখার সহিত শ্রীরাধিকা আসিতেছেন। বনশ্রেণীর শোভা দেখিয়া শ্রীরাধার আনন্দের সীমা নাই, তিনি ললিতাকে সেই শোভা দেখাইতেছেন। সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম—চিহ্নগুলি কেমন উজ্জ্বল, কেমন সুন্দর। ললিতা বিশাখাকে বলিতেছেন—

সদা সুধাবন্ধুরবেণুমাধুরী—
বিস্মারিতাশেষশরীরকর্ম্মণাং।
চিরং তিরশ্চামপি যত্র কাননে
মনঃ সমাধের্নকদাপুদাস্যতে॥

বাঁশির ধ্বনির মধুরতা অমৃতময়। সে ধ্বনি শুনিলে বনের পশুপাখী দেহধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, তাহাদের মন বাঁশির স্বরে এমন সমাধিতে ডুবিয়া যায়, যে সে সমাধি আর ভঙ্গ হয় না, মন সকল সময়েই একাগ্র অবস্থায় থাকে।

শ্রীরাধিকার মনে হইতেছে, আজ একটা কিছু হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, আর আমাদের পথ রোধ করিবেন। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখি, তুমি হাসিতে হাসিতে বিশাখাকে কি বলিলে? ললিতা উত্তর করিলেন,—আমি বলিতেছি, আজ তোমাদের একটা কিছু বড়-রকমের লাভ হইবে।

শ্রীরাধা—সখি, কথায় কথায় আজ একবার দেবী পৌর্ণমাসীকে জিজ্ঞাসা করিও, নান্দীমুখী প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মে কি তপস্যা করিয়াছিল?

ললিতা শ্রীরাধার কথা যেন বুঝিতে পারিলেন না। এ প্রশ্নের কারণ? শ্রীরাধা

বলিলেন—মুগ্ধে, বুঝিতে পারিলে না! যে মুখের একটু গন্ধ পাওয়াও স্বপ্নযোগে তোমাদের দুর্ল্লভ, নান্দীমুখী প্রভৃতি সেই মুখপদ্মের মাধুরী-মকরন্দ নেত্ররূপ ভ্রমরসমূহ-দ্বারা সর্ব্বদাই পান করিতেছে।

ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—কোথায় নান্দীমুখী, আর কোথায় বা অন্য গোপনারী। ভাগ্যবতী তো তুমি।

শ্রীরাধা যেন ললিতার কথা বুঝিলেন না। তিনি যেন শুনিলেন, ললিতা মুরলীর ভাগ্যের কথা বলিতেছে। তাই বলিলেন,—সখি, ঠিক্ বলিয়াছ। মুরলীকেই প্রশংসা করিতে হয়; কারণ—

শ্লাঘ্যতে কলিলকেলিকাকলী—
ব্যাকুলীকৃতসমস্তগোকুলা।
শ্রীহরেরধরসীধুমাধুরী-
মাদিতা মুরলিরেব নেতরা॥

সে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতমাধুরী পানে বিহ্বল হইয়া মধুর ধ্বনিতে সমগ্র গোকুল ব্যাকুল করিয়া থাকে।

তাহার পর শ্রীরাধা নিজের অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া আক্ষেপ করিতেছেন, আর বলিতেছেন—আমি বহুভাগ্যে তোমাদের কৃপায় তাঁহার মুখমণ্ডল দুই তিনবার মাত্র দেখিয়াছি। কিন্তু সে মুখমাধুরীর কি মাদকতা! দেখিয়াছি, আর পাগল হইয়াছি। কাজেই সে মুখ যে দেখিয়াছি, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি। ধ্যানযোগেও দর্শন দুর্ল্লভ।

এই প্রকারে কথা কহিতে কহিতে চারিটি সখীর সহিত শ্রীরাধা চলিয়াছেন। এমন সময় বৃন্দা আসিয়া বলিলেন—তোমরা কথা কহিতে কহিতে পথ ভুলিয়া কোথায় চলিয়াছ? বৃন্দার কথায় তাঁহাদের জ্ঞান হইল, তাঁহারা বুঝিলেন তাঁহারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে আসিয়াছেন, এখন দক্ষিণদিকে যাইতে হইবে।

বৃন্দা, শ্রীরাধার রূপ মুগ্ধনয়নে ও বিহ্বল-হৃদয়ে দর্শন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিতেছেন, আর চম্পকলতার নিকট শ্রীরাধার রূপের প্রশংসা করিতেছেন। আর এদিকে শ্রীরাধা দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন,—আহা, মানসগঙ্গায় কেমন সুন্দর পদ্ম ফুটিয়াছে! অলিকুল কেমন শব্দ করিতে করিতে পদ্মের উপর পড়িতেছে!

শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বৃন্দা বলিলেন—

সরোজানাং পুঞ্জে মদকলমমুং পশ্যত পুরঃ
পরাগৈরাপিঙ্গৈঃ স্ফুরদধরকায়ং মধুকরং।
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমররমণীর্যঃ সরভসং
নিরুদ্ধানো ধ্বানোদ্ধতিবিধূতমূর্দ্ধা বিহরতি॥

ওগো, সুন্দরীগণ! সম্মুখে পদ্মগুলির ভিতর মত্ত মধুকরের খেলা দেখ। কি চমৎকার শোভা, পদ্মরেণুতে মধুকরের দেহের উত্তরভাগ পীতবর্ণ হইয়াছে। বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন কমলিনীর পথ রোধ করিতেছে, আর দেখ কেমন ধৃষ্টতা করিয়া মাথা কাঁপাইয়া খেলা করিতেছে।

[নাট্যের সাতটি অঙ্গ! প্রথমটির নাম উপন্যাস। নাট্যের যাহা কার্য্য বা ঘটনা, প্রসঙ্গক্রমে তাহার যে বর্ণনা, তাহাকে উপন্যাস বলে। এই শ্লোকে মধুকরকে লক্ষ্য করিয়া পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ রমণীগণের পথ রোধ করিবেন, বাক্যকলহে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবেন, ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়া দেওয়া হইল।]

শ্রীরাধিকা ভাবিলেন, বৃন্দা, নিশ্চয় কিছু মনে করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছে। তাহার পর বৃন্দাকে প্রকাশ্যভাবে বলিলেন,—সখি, ভ্রমরী ভাগ্যবতী, সে তাহার প্রিয় কান্তের সহিত বেশ অবাধে খেলা করে। আমরা সূর্য্যের উপাসনা করি, কিন্তু আমরা হতভাগিনী। আমরা দূর হইতে কান্তকে ভাল করিয়া দেখিতেও পাইলাম না। আমার কাণদুটির বধির হওয়াই ভাল, মাধবের গুণগাথা শোনে নাই। আমার চোখদুটি অন্ধ হওয়াই ভাল, মাধবের রূপরাশি দেখে নাই।

শেষের কথাগুলি সংস্কৃত শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ
শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম।
তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ
সখি বিলোচ-নয়োশ্চ কিলানয়োঃ॥

[এইটি নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্গ—বিন্যাস। যাহাতে নিজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহার নাম বিন্যাস।]

বৃন্দা বলিলেন—রাধে, তুমি সকল সময়েই তোমার প্রাণকান্তের সহিত দিব্যলীলা করিতেছ, তবে কেন নির্ব্বেদ প্রকাশ করিয়া খেদ করিতেছ?

শ্রীরাধা ভাল চলিতে পারিতেছেন না। মাথায় ভার, বোধ হয় সেই জন্য। ললিতা বলিলেন,—কলস আমাকে দাও। শ্রীরাধা বলিলেন,—কলসের জন্য নহে, অলঙ্কারের ভারে কাতর হইয়াছি! শ্রীরাধা কিছুক্ষণের জন্য ভার নামাইলেন, বিশাখা শ্রীরাধার অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইলেন।

আবার চলিতেছেন। সম্মুখে পর্ব্বতের শিখরদেশে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যাইতেছে। গোপীগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট নান্দীমুখী ছিলেন, তিনি লুকাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন, তোমরা শিঙ্গা বাজাইয়া ঘোষণা কর, এখানে ঘাটোয়াল আছে। আমি ততক্ষণ বাঁশি বাজাই। বাঁশি বাজিল। বাঁশির প্রভাব বৃন্দা দেখিতেছেন। গোপীদের মাথা ঘুরিতেছে, তাহারা গাছ চাপিয়া ধরিতেছে। আশ্চর্য্য বংশীধ্বনি। তরুলতার হর্ষোদয়, কোকিলকণ্ঠে কুহুরবের জাগরণ, গোপীগণের প্রেমানল উদ্দীপন, আর শ্রীরাধার ধৈর্য্য-গিরি বিদারণ! ধন্য বংশীরব।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে পর্ব্বতের চূড়া হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—দেখ একজন লোক তাড়াতাড়ি পাহাড় হইতে নামিতেছে, উহার কিছু আদায় করার মতলব আছে। চল, আমরা তাড়াতাড়ি এমনভাবে চলিয়া যাই, যেন আমরা উহাকে দেখিতেই পাই নাই। শ্রীরাধা একবার বলিলেন,—এখানে সব ভাঙ্গা পাথর, তাড়াতাড়ি চলা বড় কঠিন। যাহা হউক তাঁহারা ললিতার কথামত চলিলেন।

গোপিকাগণের ব্যবহার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীরস্বরে সুবলকে বলিলেন,—সখে, সুবল, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই রমণীগুলি পায়ের নূপুর বাজাইয়া সবিলাসে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে কহিতে চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই; আমাদিগকে যেন অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। যাও, অর্জ্জুনকে লইয়া শীঘ্র যাও, ইহাদের পথ রোধ করিয়া ফিরাইয়া লইয়া আইস।

সুবল অর্জ্জুনকে লইয়া অন্য পথে ঘুরিয়া গিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন ও

বলিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য তোমরা ঘি বেচিতে যাইতেছ, জাননা। ঘটচক্রের কর্ত্তাকে অনাদর করিয়া চলিয়া যাইতেছ! ব্যাপার কি?

গোপীরা যেন সুবলের কথা শুনিতে পায় নাই, এই ভাবে আপন মনে হাসিতে হাসিতে রহস্যালাপ করিতে করিতে আপন পথে চলিল।

সুবল দৌড়াইয়া তাহাদের নিকটে গেলেন ও বলিলেন,—আর নিজেদের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হইবে না, ফিরিয়া আইস।

গোপীরা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—ক্রূরভাষি, তুমি কে? আমাদের ফিরিতে বলিতেছ কেন?

সুবল—এই ঘাটের যিনি দানীন্দ্র, মাটিতে মাথা রাখিয়া আগে তাঁহাকে প্রণাম কর।

বিশাখা হাসিয়া বলিলেন,—তোমাদের দানীন্দ্র কে? গোপেন্দ্র-নন্দন। তাঁহাকে প্রণাম করা যায়, তিনি অবশ্য প্রণম্য। কিন্তু ভগবতী পৌর্ণমাসী নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা যে যজ্ঞের জন্য ঘৃত লইয়া যাইতেছ, সেই যজ্ঞ অলৌকিক। পথে ব্রাহ্মণ-ছাড়া আর কাহাকেও প্রণাম করিও না।

[এইটি নাট্যের চতুর্থ অঙ্গ। ইহার নাম সাধ্বস। মিথ্যা-কথনের নাম সাধ্বস।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—দেখ বিশাখে, আমরা যে মহাদানীন্দ্রকে প্রণাম করিতে বলিতেছি, তিনি বৃন্দাবনের ভূদেব। তিনিও এখন ব্রতধারী। আর তোমরা ব্রতধারিণী, কাজেই তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিলে কোন দোষ হইবে না।

ললিতা—তিনি আবার কি ব্রত করিতেছেন?

অর্জ্জুন—সে বড় কঠিন ব্রত! এক অর্ব্বুদ দরিদ্র ও বস্ত্রহীন ব্রাহ্মণকে তিনি বস্ত্র দান করিবেন।

অর্জ্জুন সংস্কৃত ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার দুই প্রকার অর্থ হয়। শ্রীরাধা অন্যরূপ অর্থ বুঝিলেন এবং তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ে বিকার উপস্থিত হইল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেখ, আমাদের যজ্ঞমণ্ডপে যাইতে হইবে, আর দেরী করিব না, কোন্ পথে গেলে শীঘ্র যাওয়া যাইবে বলিয়া দাও।

মধুমঙ্গল বলিলেন,—ললিতে তোমরা প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়াছ। তোমাদের কাছে শুল্ক লওয়া উচিত নয়। তবে কি জান, তোমরা ভার

লইয়া আর চলিতে পারিতেছ না, তোমাদের কোমর বাঁকিয়া গিয়াছে। কাজেই বলিতেছি, খট্টে আসিয়া একটু বিশ্রাম কর; আর যাইবার সময় দানীন্দ্রকে অবজ্ঞা করিয়া অপরাধ করিয়াছ, সে জন্য কিছু দিয়া যাও।

বিশাখা—গোবর্দ্ধনে দান ঘাট আছে, এ কথা তো কখন শুনি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ—শুনিবে কি? এখন যে দেখিয়াও দেখিতেছ না!

সখীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ইহাদের সঙ্গে ঝগড়া করা ঠিক্ নয়। প্রথমে মিষ্ট ব্যবহার করা যাউক। তদনুসারে ললিতা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া প্রণয়ের সহিত মিষ্টভাষায় বলিলেন,—গোকুলানন্দ, আমরা তোমার গ্রামের লোক। আমরা ভাল লোক, তুমিও সাধুশিরোমণি, আমাদের ছাড়িয়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণ করুণার সহিত উত্তর দিলেন,—কি করি, আমার তো কোন হাত নাই, আমি স্বাধীন নই, রাজার কাজ, রাজার হুকুম!

ললিতা—রাজা কে? কংস?

কৃষ্ণ—না, না।

ললিতা—তবে কে?

কৃষ্ণ—মহামন্মথ, জান তিনি কে? তাঁহার চোখেরদৃষ্টিতে হাজার কংস পরাজিত হয়।

ললিতা—মন্মথ চক্রবর্ত্তীর নাম তো কোন কালে শুনি নাই। ললিতার কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল এক বিকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন,—মহামন্মথের নাম শোন নাই? আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য! তাঁহার রাজধানী কোথায় জান না? মহাকটকে প্রমদমঞ্জরী-নামক তাঁহার রাজধানী। মধুমঙ্গল, সুবল, বিজয়, ইঁহারা তাঁহার বড় বড় অমাত্য। উত্তম রমণীগণ তাঁহার বিহার স্থান।

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের কথায় আর একটু যোজনা করিয়া বলিলেন,—কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, কোকিল, প্রভৃতি তাঁহার হুকুমে সর্ব্বদা দূতের কাজ করে।

চম্পকলতা বলিলেন,—ব্রজেন্দ্রনন্দন চোরের রাজা, তাহার দলের লোক সকলেই চোর। ঘৃত চুরি করিলেই বা কি করা যায়? বিরোধ করিয়া ফল নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়াছেন, ললিতাকে বলিতেছেন,—তোমার কিছু নীতিজ্ঞান আছে, কত শুল্ক লাগিবে, তুমি নির্দ্ধারণ কর।

চিত্রা বলিলেন,—আমরা যজ্ঞের ঘৃত লইয়া যাইতেছি। শুল্ক দিলেই ঘৃত অশুদ্ধ হইবে। তাহা না হইলে সামান্য কিছু শুল্ক আমরা অনায়াসেই দিতে পারিতাম।

ললিতা দেখিলেন, ব্যাপার কঠিন। শ্রীরাধাকে বলিলেন,—সখি, মাথায় ভার লইয়া আর কত দাঁড়াইয়া থাকিবে? ভার নামাইয়া বিশ্রাম কর।

ললিতার কথায় সকলেই ভার নামাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ খুব খুসি হইয়া সুবলকে বলিলেন,—সুবল, এই ললিতা বড় ভাললোক, আমাদের বন্ধু। ইনি আমাদের অতিথি। দাও, রত্নপাত্র হইতে উহাকে খুব ভাল পাঁচটি পাণ দাও।

বিশাখা সুবলকে বলিলেন,—ইঁহারা সকলে ব্রতধারিণী, পাণের প্রয়োজন নাই।

তাহার পর কৌতুক ও বাক্‌যুদ্ধ। রসতত্ত্বের আলোচনায় আমরা অন্য কোন সময়ে ইহার আস্বাদন করিব।

বিশাখা চম্পকলতাকে বলিতেছেন,—ইহারা পেটুক, মিছামিছি ঘাট পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছে, ইহাদের কুড়ি কড়া কড়ি দাও, ছোলা কিনিয়া খাইবে।

বহুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধের পর নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—আমার অনুরোধ, ইহারা সূর্যোপাসিকা, যজ্ঞস্থলে যাইতেছে। ইহাদের কিছু কম করিয়া শুল্ক গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হইলেন, মধুমঙ্গলকে বলিলেন,—কিছু কম করিয়া হিসাব কর। মধুমঙ্গলের হিসাবে ধার্য্য হইল, চতুরশীতি লক্ষ স্বর্ণ-টঙ্ক লাগিবে।

শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে তুষ্ট হইলেন না। তিনি মধুমঙ্গলকে বলিলেন,—সখে, তুমি রসলুব্ধ, তুমি ঘুঁস খাইয়া হিসাব কম করিয়াছ। যাহা হউক মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে কি বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহাতেই রাজি হইলেন। তাহার পর স্থির হইল শুল্কের জন্য যে কোন একটি রমণীকে লইতে হইবে। কারণ উহারা প্রত্যেকেই চতুরশীতিলক্ষ জীবজাতি অপেক্ষা বরিষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তবে ললিতাকেই লওয়া হউক। তাহার পর বলিলেন,—না শ্রীরাধাকেই লইতে হইবে।

শ্রীরাধা ভয় পাইয়া বিশাখাকে বলিলেন,—সখি, রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই বলিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধর উহার হীরার হার কাড়িয়া লইব। শ্রীরাধা বলিলেন—

গর্ব্ব করিতে হইবে না, আমি চলিলাম। শ্রীকৃষ্ণ—কি করিয়া যাইবে? তোমার চুলগুলি কি পাখা, যে উড়িয়া পলাইবে?

এইবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন! শ্রীরাধা একটু ফিরিয়া বলিলেন,—দূর হও, দূর হও, আমাকে ধরিও না।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখাগণ স্থির করিলেন, এই রমণীগণ বুকের মধ্যে আরও কলস লুকাইয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কথা লইয়া আবার তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বিশাখা স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—শুল্কের জন্য এই বৃন্দাকে গ্রহণ কর। সুবল বলিলেন,—পঞ্চবৃন্দ পাওনা, এক বৃন্দায় কি হইবে? ললিতা ক্রোধ করিয়া বিশাখাকে বলিলেন,—কতই বা শুল্ক যে বৃন্দাকে দিবে? বৃন্দার দাম কত জান?

মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন,—যাও যাও আর মিথ্যা কথা বলিতে হইবে না।

ললিতা বলিলেন,—দেখ তেত্রিশ কোটি দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্র প্রধান। ইন্দ্র শত-কোটি। তাঁহা অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ প্রধান, তিনি দ্বিপরার্দ্ধবৈভব। তাঁহা অপেক্ষা লক্ষ্মী প্রধান, তিনি সর্ব্বসম্পত্তির অধীশ্বরী। লক্ষ্মী অপেক্ষা বৃন্দা প্রধান। ভগবান্ বিষ্ণু বৃন্দার রূপে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মীকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। এ কথা আমরা ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট শুনিয়াছি।

এখন সমস্যা,—বৃন্দা কাহার? শ্রীকৃষ্ণের, না গোপীগণের। নান্দীমুখী বলেন, বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিলেন,—বৃন্দে, বল তুমি কাহার? শ্রীকৃষ্ণ চক্ষু টিপিয়া বৃন্দাকে নিজের দলে টানিতেছেন। কিন্তু বৃন্দা, তাহা মানিলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—নাগরেন্দ্র, চোখ টিপিয়া যাহাই বলুন, বৃন্দা বৃন্দাবনেশ্বরীর।

সখীরা আহ্লাদে খুব হাসিয়া উঠিলেন। তখন বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিলেন,—দেখ আমাকে যদি বিক্রয় কর, এখানে করিও না। কারণ, জুয়ার আড্ডা অপেক্ষাও ঘাটোয়ালের আড্ডা খারাপ। এখানে দাম হইবে না।

মীমাংসা হয় না। মধুমঙ্গল মধ্যস্থতা করার জন্য গোপীদের বলিলেন,—আমাকে কিছু দাও, সব মিটিয়া যাইবে। বিশাখা বলিলেন,—শর্করা দিব। শর্করা মানে চিনি,

আর শর্করা মানে খোলা। মধুমঙ্গল হাত পাতিলেন, বিশাখা দিলেন খোলা। কাজেই মীমাংসা হইল না।

এইবার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তোমরা যখন শুল্ক দিবে না, তখন আর উপায় কি, 'যুদ্ধ কর।'

বৃন্দা বলিলেন,—তুমি মহাযোদ্ধা, আর আমরা স্ত্রীলোক, আমরা তোমার সহিত কি করিয়া যুদ্ধ করিব ?

শ্রীরাধা বলিলেন,—নাগর, তোমার চাতুরী বুঝিয়াছি। আমরা যজ্ঞবেদিকায় চলিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ,—কি করিয়া যাইবে ? তোমরা যে শুল্কের জন্য অবরুদ্ধা। যদি জোর করিয়া যাও, টানিয়া ধরিয়া রাখিব।

ললিতা বলিলেন,—আমরা চলিলাম, কি করিবে কর।

শ্রীরাধা বলিলেন,—ললিতা যদি দাঁড়ায়, হরি কি করিতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পঙ্কজাক্ষি, শেষ কথা শোন।

বিদ্যোতসে কল্পলতেব কামদা
ভ্রূকার্ম্মুকং ভূরি ধুনোসি চায়তং।
ইত্যর্থপুঞ্জং মম দেহি পুষ্কলং
কিম্বা সখীভিঃ সহ সুষ্ঠু বিগ্রহং॥

তুমি কামদা, কামদায়িনী, তুমি কল্পলতার ন্যায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইতেছ। সুন্দরি, তুমি বারবার ভ্রূধনু কম্পিত করিতেছ কেন ? আমার প্রাপ্য শুল্ক দাও, নতুবা আমার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ কর।

ললিতা বলিলেন,—শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছাটা খুব বাড়িয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। শ্রীরাধা বলিলেন,—আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই, কলস তোল, চল আমরা সকলে চলিয়া যাই।

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে আদেশ করিলেন, উহাদের ঘৃতপূর্ণ কলসগুলি আটক কর।

সুবল ললিতাকে ভয় করেন, কাজেই বলিলেন,—আমি একা কি করিয়া পাঁচটি কলস আটক করিব ? শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়া বলিলেন,—তুমি সুবল, না দুর্ব্বল ?

সুবল বলিলেন,—সখে, তুমি কেবল মুখের কথায় দর্প করিতেছ ! কিন্তু, তোমার তো মনে আছে, সেদিন শ্রীরাধার সহিত পাশা খেলিতেছিলে, আর ললিতা মিছামিছি শ্রীরাধার জয় ঘোষণা করিয়া তোমার মুরলী কাড়িয়া লইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া দম্ভ প্রকাশ করিলেন, ললিতা উপহাস করিয়া বলিলেন,—শ্রীদামকে ডাক, একা পারিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ঈষৎ আবরণ করিয়া বলিলেন,—গৌরি ! যদি কাঞ্চন না দাও, গিরিগহ্বরে প্রবেশ কর।

ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—জান, উহার স্বামী উহাকে কত সম্ভ্রম করে ? চরণ-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে সাহস করে না।

ললিতার কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল খুব জোরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—ললিতে, তোমার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা কর, দুর্ব্বাসার নিকট তিনি শুনিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ আশৈশব ব্রহ্মচারী।

এইবার রীতিমত পাল্টা আরম্ভ হইল। বিশাখা বলিলেন,—এই সব গোপগণ বৃন্দাবনের বনে লক্ষকোটি গোচারণ করে। গরুগুলি বনের গাছপালা ভাঙ্গে, আর গোপগণ ফল পাড়িয়া খায়, পুষ্প ও পল্লবের দ্বারা বেশ রচনা করে। এই প্রকারে ইহারা বৃন্দাবন ধ্বংস করিয়া ফেলিল। গোকুলযুবতীকুলচক্রবর্ত্তিনী আমাদের প্রিয়সখী, যিনি বৃন্দাবনের একমাত্র কর্ত্রী, তাঁহার আদেশ, এই দুষ্ট গোপগণ, তাহাদের গরুর পাল লইয়া হয় এই বন ছাড়িয়া চলিয়া যাউক, না হয় উপযুক্ত কর প্রদান করুক।

মধুমঙ্গল ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। ললিতা বলিলেন,—এ ব্যক্তি অজ্ঞান, ইহার সহিত তর্ক করিয়া কি হইবে ? বিশাখার অনুরোধে নান্দীমুখী সকলকে শুনাইয়া শ্রীরাধার মহাভিষেকের মহামহোৎসব বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঁচজন দেবী আসিয়াছিলেন। দেবকীর কন্যা, যিনি কংসকে ভর্ৎসনা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সূর্য্যের স্ত্রী সংজ্ঞা ; সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া ; সূর্য্যের কন্যা যমুনা ; আর গঙ্গা বা মানস-গঙ্গা। ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রী পদ্মমালা, ইন্দ্রপত্নী শচী স্বর্ণ-সিংহাসন, বরুণপত্নী গৌরীছত্র, পবনপত্নী শিবা চামরদ্বয়, অগ্নিপত্নী স্বাহা বস্ত্রদ্বয়, যমের পত্নী ধূমোর্ণা মণিদর্পণ, এই অভিষেকের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গে বাদ্য বাজিয়াছিল, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা মেঘের অন্তরাল হইতে গান করিয়াছিল, সুরসুন্দরীগণ আসিয়া শ্রীরাধার অভিষেক করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, মণিকুম্ভে মহাভিষেক করিয়া বৃন্দাবন-রাজ্যের আধিপত্য শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়াছেন।

নান্দীমুখী দেখাইলেন, এই সৌগন্ধিক মালা সাবিত্রী পাঠাইয়াছিলেন। দেবকীপুত্রী বিন্ধ্যবাসিনী এই মালা শ্রীকৃষ্ণের গলায় দিয়াছিলেন। যমুনা আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে বিন্ধ্যবাসিনী শ্রীকৃষ্ণের গলা হইতে ঐ মালা ও হার লইয়া শ্রীরাধার গলায় দিয়াছিলেন। এ হার লওয়া হইবে না বলিয়া যমুনা আবার শ্রীরাধার হার খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের গলায় দিয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে মৃগমদ তুলিয়া শ্রীরাধার তিলক করিয়া দিলেন। এই প্রকারে শ্রীরাধার অভিষেক হইয়াছিল। অভিষেক হওয়ার পর পৌর্ণমাসী দেবী বৃক্ষগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ফুলে ফলে সুশোভিত হইয়া লতাবধূর সহিত বিহার কর; পাখীগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ভৃঙ্গের সহিত রঙ্গে ক্রীড়া কর; পশুদের বলিয়াছিলেন, তোমরা নির্ভয়ে নিজ নিজ পরাক্রম প্রকাশ কর। শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী হইয়াছেন, তাঁহার সখীরা সেনাপতির কাজ করিবেন, আর বৃন্দা অমাত্য হইয়াছেন। পৌর্ণমাসীর কথা শুনিয়া যাবতীয় তরুলতা ফলে ফুলে সুশোভিত হইল। এই প্রকারে শ্রীরাধার অভিষেক হইয়াছিল।

এই অভিষেকে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী তিলক দিয়াছিলেন, শনির জননী ছায়া মস্তকে চূড়া বন্ধন করিয়াছিলেন, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা মাথার চুল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, সখীরা অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন, সূর্য্যকন্যা যমুনা চামর দিয়া বীজন করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম-নন্দিনী সরস্বতী মাথায় মণিচ্ছত্র ধরিয়াছিলেন।

মধুমঙ্গল যেন এই অভিষেকের কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। যাহা হউক এই অভিষেক কথার আলোচনার পর শ্রীরাধা বলিলেন,—সখি বৃন্দে, আট বৎসর হইল অভিষেক হইয়াছে, এইবার হিসাব কর, আট বৎসরে কত কর হয়?

বৃন্দা বলিলেন,—সেই করের দ্বারা কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপকে কিনিয়া রাখা যায়।

ললিতা বিশাখাকে বলিলেন,—বিশাখে, বৃন্দাবনেশ্বরীর আদেশ,—আগে ঐ পেটুক ব্রাহ্মণ বালকটার মণিভূষণ কাড়িয়া লও। এই বলিয়া মধুমঙ্গলকে দেখাইয়া দিলেন। মধুমঙ্গল পলাইবার পথ দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয় দিলেন। আবার নূতন করিয়া বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—করের জন্য গোপীদের কিনিয়াছি।

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—গোপদের কিনিয়াছি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—তোমার আদি, অন্ত, মধ্য তিন স্থান বক্র, তুমি বক্রেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—তোমার বাক্য, কেশ, ভ্রূ, দৃষ্টি, হাস্য, গমন, অবগুণ্ঠন ও হৃদয়, এই আট স্থান বক্র, তুমি অষ্টাবক্র মুনি, তোমাকে প্রণাম।

কিছুক্ষণ পরে চিত্রা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—পুরুষোত্তম, আমরা ধর্ম্মপরায়ণ আমাদের মোচন কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এ রাজ্যের রীতি অন্যরূপ, এখানে ধর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না, কামের দ্বারা মোক্ষ হয়। নান্দীমুখী বলিলেন,—সত্য কথা। এই জন্যই কামের পর মোক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন,—তুমি এখন আমার নিকট শুল্ক-ক্রীতা, অতএব সেবার দ্বারা দানীন্দ্রকে তুষ্ট কর। নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমিই সেবা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তবে আমিই সেবা করি, এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকটে গেলেন। আবার ললিতার সহিত কলহ আরম্ভ হইল। ললিতা বলিলেন,—আমি থাকিতে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া ললিতাকে বলিলেন,—নমস্তভ্যং মহাচণ্ডি চামুণ্ডে নমস্তভ্যং নূনং মুণ্ডমালাখ্যমাত্মনো মণ্ডনং বিমুচ্য দুর্ব্বার মার-সংহারায় গোপিকারূপেণোপস্থিতাসি:—হে মহাচণ্ডি, হে চামুণ্ডে, তোমাকে নমস্কার, তোমার অলঙ্কার মুণ্ডমালা, ইহা সকলেই জানে। এখন মুণ্ডমালা ছাড়িয়া গোপিকারূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। দুর্ব্বার মদনকে বধ করাই বুঝি তোমার অভিপ্রায়।

ললিতা বিশাখাকে বলিলেন,—তুমি ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট গিয়া আমাদের সমুদয় কথা তাঁহাকে বল। নান্দীমুখী জানেন ভগবতী পৌর্ণমাসী নিকটেই আছেন, মাধবীমণ্ডপের অন্তরালে লুকাইয়া আছেন, কিন্তু সে কথা এখন বলা হইবে না। কাজেই ললিতাকে বলিলেন,—ভগবতী পৌর্ণমাসী এখন গোকুলেশ্বরীর নিকট থাকিতে পারেন।

এইবার শ্রীরাধা পরিহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে ললিতাকে বলিলেন,—সখি, তুমি নিজের অপেক্ষাও আমাদের বেশী ভালবাস। তুমি নিজে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের রক্ষা করিবে, এইরূপ অনুমান হইতেছে।

এইবার গোপীদের স্মরণ হইল, তাঁহারা পবিত্রভাবে যজ্ঞের ঘৃত লইয়া যাইতেছেন।

পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শনই তাহাদের পাপ হইয়াছে। কাজেই সকলে পাপক্ষালনের জন্য বিষ্ণুস্মরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে বলিলেন,—সত্যই দূষিতা হইয়াছ। আমার কাছে এস আমি দোষশূন্য করি। এই বলিয়া ললিতাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। ললিতা বলিলেন,—ছুঁইও না, আমি দূষিতা হইব। শ্রীরাধা বলিলেন,—তোমাকে ছুঁইয়াছে, তুমি দূষিতা হইয়াছ। ললিতা বলিলেন,—বেশ, পাঁচজনের সহিত একত্রে কিছু হইলে দুঃখ বা দোষ হয় না। অতএব কৃষ্ণ, তুমি উহাদেরও সকলকে স্পর্শ কর। ললিতার কথায় শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ধরিতে গেলেন। শ্রীরাধা ললিতাকে তিরস্কার করিলেন। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত। ললিতা চিত্রার আঙ্গুল হইতে মণিময় অঙ্গুরী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—তোমার পাওনা পঞ্চাশ গণ্ডা কড়ি। যাহা হউক, খুব বেশী দিলাম।

কৃষ্ণের আদেশে সুবল অঙ্গুরী লইয়া এইরূপ দেখাইলেন, যেন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ললিতা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কি করিবেন, দান দিতেই হইবে। শ্রীরাধার কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে হার দিয়া ললিতা বলিলেন,—ঘট্টনাথ, এই হারগাছটি গচ্ছিত রাখিলাম। সন্ধ্যাকালে সুবর্ণ দিয়া হার ফিরাইয়া লইব। শ্রীকৃষ্ণ হারগাছটি নিজের গলায় দিলেন।

এইবার মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন,—আমাকে খাইবার জন্য কিছু ঘি দাও। ললিতা বলিলেন,—ইহা যজ্ঞের ঘৃত। মধুমঙ্গল বলিলেন,—আঙ্গিরস যজ্ঞের যজ্ঞপত্নীরা নিজেদের বাড়ীর যজ্ঞ ছাড়িয়া আমাদের সকলকে মিষ্টান্ন খাওয়াইল, আর তুমি একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াইতে পার না!

শ্রীকৃষ্ণ হার পাইয়াছেন, গলায় পড়িয়াছেন, কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি এবার দাবী করিলেন, উত্থানরাজের অভিমত শুল্ক দিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা কর। ললিতা ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিলে নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তোমার অভিমত কি, আমাকে বল, আমি মধ্যস্থতা করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শ্রীরাধাকে গচ্ছিত রাখ। নান্দীমুখী বলিলেন,—তাহা হইবে না, চিত্রাকে গচ্ছিত রাখিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তাহা হইবে না। শ্রীরাধাকে চাই।

এইবার ভগবতী পৌর্ণমাসী আসিয়া প্রবেশ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তাহা হইবে না, শ্রীরাধাকে পাইবে না, কারণ শ্রীরাধা অমূল্য ধন।

ভগবতী পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ভগবতি, কেবল শুল্ক আদায়ের জন্যই এই আগ্রহ। গোপীর দাম পাঁচ কড়া কড়িও নহে। শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন ও বলিলেন,—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন আর আমাদের চিন্তা নাই। পৌর্ণমাসী প্রথমে বলিলেন,—দান না দিয়া কলহ করিয়া ভাল কর নাই। ললিতা বলিলেন,—আমরা হার দিয়াছি। পৌর্ণমাসী বলিলেন,—কলহের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকূল হইয়াছেন। প্রিয়ার উপহার চাই। শ্রীরাধাই তাহাতে সমর্থ। শ্রীরাধা কাঁদিতে লাগিলেন। পৌর্ণমাসী আশ্বস্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কান্তামণি লাভ করিলেন।

পৌর্ণমাসী প্রার্থনা করিলেন, তোমরা সর্ব্বদা এই লীলা কর, আর যাহারা তোমাদের সেবায় উৎকণ্ঠিত হইবে তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিও।

২। রসকথা

দানকেলি-কৌমুদী একখানি ভাণিকা, এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, গীতি-নাট্য। ইহার উপাখ্যানাংশ বৃহৎ নহে, সামান্য বলিলেও হয়। কিন্তু রসতত্ত্বের আলোচনায় ইহা অতুলনীয়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয় এই গ্রন্থে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিদগ্ধমাধব বা ললিতমাধবে সেরূপ সন্তুষ্ট হন নাই। এই গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিলে রসের উদ্ঘাটন হইতে পারে। আমরা সংক্ষেপে কেবল কয়েকটি কথার আলোচনা করিব। এই আলোচনা আমাদের নিজের খেয়াল-অনুসারে নহে, প্রাচীন টিকাকার যে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া তদনুসারেই আলোচনা করিব।

রসতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের আলোচনা দরকার। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী, এই গ্রন্থের প্রথমাংশে এই চারিটি বিষয় বিচারিত হইয়াছে। এই চারিটির সাহায্যে মধুর ভক্তিরসের আস্বাদন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-পরিকর প্রভৃতি আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-আলম্বন আর ভক্ত আশ্রয়-আলম্বন।

গুণ, রূপ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, ক্রীড়া, বেণুবাদন, গোদোহন, ভৃঙ্গ, কুঞ্জ, লতা প্রভৃতি এক শ্রেণীর উদ্দীপন। আবার চন্দ্রিকা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, বায়ু, পাখী, ইহারা আর এক শ্রেণীর উদ্দীপন। এগুলি বিশেষভাবে বিচারিত হইয়াছে। এই গেল বিভাব।

এইবার অনুভাব। অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক, এই তিন প্রকার অনুভাব। অলঙ্কার কুড়ি প্রকার। অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজভেদে ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ভাব, হাব, হেলা—অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য—অযত্নজ। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, বিকৃত—স্বভাবজ। আমরা শেষের এই স্বভাবজ অলঙ্কার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব বলিয়া ভূমিকা স্বরূপে এই টুকু বলিলাম।

ক। কিলকিঞ্চিত

গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটি বিভিন্নধর্ম্মী ভাবের সঙ্করীকরণ (মিশ্রণ, যুগবৎ প্রাকট্য) অর্থাৎ একই সঙ্গে উদয় হইয়া থাকে। হর্ষ-নিবন্ধন ইহা হইয়া থাকে, ইহার নাম কিলকিঞ্চিত। ইহা কেমন ভূষণ, ধ্যানযুক্ত হইয়া আস্বাদন করিতে হইবে। ইহাই সাধন।

দানকেলিকৌমুদী-গ্রন্থের যেটি প্রথম শ্লোক বা বন্দনা-শ্লোক, তাহাতে এই কিলকিঞ্চিত ভাব উদাহৃত হইয়াছে।

অন্তঃস্মেরতরোজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টি তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। সেই দৃষ্টি কেমন? অন্তঃস্মেরতরোজ্জ্বলা,—অন্তরে বা ভিতরে মৃদুহাস্য, তন্নিবন্ধন দৃষ্টি উজ্জ্বল।

জলকণ-ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা,—চক্ষুর পক্ষগুলি জলকণাব্যাপ্ত। কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা,—চক্ষুর অন্তভাগ সামান্য পাটল-বর্ণ। রসিকোৎসিক্তা,—রসিকতার দ্বারা চক্ষু উৎসিক্ত। পুরঃ কুঞ্চতী,—অগ্রভাগ সঙ্কুচিত। মধুর-ব্যাভুগ্ন-তারোত্তরা,—মধুরতাদ্বারা তারা কিঞ্চিৎ বক্র। কোন সময়ে ইহা হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যে-সময়ে শ্রীরাধা পথিমধ্যে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন।

শ্রীরাধা যে সময়ে ঘৃতকলস লইয়া যজ্ঞস্থলে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে ইহা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জাত হর্ষ। আমি কুলবধূ, পাছে কেহ দেখে, এই জন্য নয়নে অশ্রুকণা ও রোদন। শ্রীকৃষ্ণ পথ রোধ করিলেন, এজন্য ক্রোধ এবং চক্ষু আরক্ত। রসিকতা-দ্বারা চক্ষুঃ প্রসারিত,—ইহাতে অভিলাষ। কি জানি কি হয়, এই ভয়,—ইহাতে চক্ষুঃ সঙ্কুচিত। মধুরতা-দ্বারা দৃষ্টি ঈষৎ বক্র,—ইহাতে গর্ব্ব ও অসূয়া।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মধ্যলীলার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কিলকিঞ্চিতভাবের বর্ণনা আছে। কেবল বর্ণনা নহে, ইহার মূল কথাটিও আছে। বৈষ্ণব-ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা জানা দরকার। তাহা না জানিলে, এই রসতত্ত্বের আলোচনায় বা ধ্যান-ধারণা ও আস্বাদন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। স্বরূপ দামোদর বক্তা, আর আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রোতা,—জিজ্ঞাসু শ্রোতা।

দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। শুদ্ধপ্রেমরসগুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ। অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥
'বামা' এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ। নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো, স্বভাবেতে 'সমা'। গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা॥'
বাম্যস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর। তাঁর 'বাম্যে' উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর॥
'অধিরূঢ়মহাভাব' সদা রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে। নানাভাববিভূষণে হয় বিভূষিতে॥
অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর। সহজ প্রেম বিংশতি ভাব-অলঙ্কার॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত। বিব্বোক, মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত॥
এতভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ। দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ॥

কিলকিঞ্চিত ভাব-ভূষার শুন বিবরণ। যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুইতে করে মন। দানঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে। সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম। প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥
আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়। অষ্ট-ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত। ক্রোধ, অসূয়া সহ আর মন্দস্মিত ॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন। যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন ॥
দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর। এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥

ইহার পর দুইটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমটি দানকেলিকৌমুদীর প্রথম শ্লোক, যাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি; আর দ্বিতীয়টি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-গ্রন্থের। দ্বিতীয় শ্লোকটি প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহোদয়ের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। এই পদটিতে কিলকিঞ্চিত ভাব বিবরিত হইয়াছে।

গরবহি সুন্দরী, চললহ আনত, নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ বাত, দান দেহ মবু হাত, আন ছলে কাঁচলি তোড় ॥
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ।
দান-কেলি-রসকলিত মহোৎসব, বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ ॥
অলপ পাটল ভেল, অথির দৃগঞ্চল, তহিঁ জল-কণ পরকাশ।
ধুনাইত ভূরু-ধনু, পুলকে পূরল তনু, অলখিত আনন্দ হাস ॥
ঐছন হেরি, চকিত পুন তৈখনে, বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধামাধব, তুহুঁ কর পদতলে, রাধামোহন বলিহারি ॥

এই পদের সংস্কৃত ভাষায় টিকা আছে। তাহা শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর কৃত। ঐ টিকায় রসবিবৃতি আছে। যথা—

আনত, অন্যত্র। অত্র প্রথমচরণে গর্ব্বঃ স্পষ্টঃ। 'অল্পপাটল' ইত্যনেন ক্রোধঃ। 'তহিঁ জলকণ' ইত্যনেন রোদনং। 'ধুনাইত ভূরুধনু' ইত্যনেনাসূয়া। 'পুলকে পূরল' ইত্যনেনাভিলাষঃ। 'অলখিত আনন্দ হাস' ইত্যনেন স্মিতঃ। 'তৈখনে বাহুড়ল পদ দুই চারি' ইত্যনেন ভয়ং ইতি সপ্ত।

খ। কুট্টমিত

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ধরিতে যাইতেছেন, বলিতেছেন,—তোমায় যে কিনিয়াছি। শ্রীরাধা সভয়ে পলাইতেছেন, আর ললিতাকে বলিতেছেন,—তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ? নান্দীমুখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন,—সখি রাধে, কুট্টমিত ভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই, পলাইতেছ কেন?

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহিরে যে ক্রোধ-প্রকাশ, তাহাকে পণ্ডিতেরা কুট্টমিত বলেন।

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ। অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ, ভিতরে সুখ মন। কুট্টমিত নাম এই ভাব-বিভূষণ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণি রোধ। অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন। ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভর্ৎসন ॥
এই মত আর সব ভাব-বিভূষণ। যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

'দানকেলি-কৌমুদি' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি একটি শ্লোকে কুট্টমিত ভাব বিবরিত হইয়াছে।

পটোন্নমনলীলয়া পুলকবৃন্দমারুন্ধতী
স্মিতস্তবধরচাতুরী পরিচয়েন গান্ধর্ব্বিকা।
মৃষা ভ্রূকুটীবল্লরী কৃতমুখী মদুক্তিশ্রবা-
ন্নিরস্যতি দৃগঞ্চলভ্রমিভিরত্র রুষ্টেব মাং ॥

গান্ধর্ব্বিকা (শ্রীরাধা) লীলায় বস্ত্র তুলিয়া অঙ্গের পুলক গোপন করিতেছেন; অধরের চাতুরীর দ্বারা মৃদুহাস্য চাপা দিতেছেন; আমার কথায় মিছামিছি কোপ প্রকাশ করায় মুখ

বন্ধুর হইতেছে ; যেন রুষ্টা হইয়াছেন, এই প্রকারে দৃগঞ্চল ঘুরাইয়া আমাকে প্রত্যাখান করিতেছেন।

গ। বিব্বোক

ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ।

'ইষ্ট' কান্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বস্তু। গর্ব্ব ও মান-নিবন্ধন অনেক সময়েই সেই ইষ্টের প্রতি অনাদর হইয়া থাকে। ইহার নাম বিব্বোক। গর্ব্বের জন্যও বিব্বোক হয়, মানের জন্যও বিব্বোক হয়।

ললিতা বলিলেন,—শ্রীরাধিকা সতী-শিরোমণি, ব্রহ্মচারিণী। সুবল বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ইহা শ্রীরাধা জানেন, দুর্ব্বাসার নিকট শুনিয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—যাহারা সমানধর্ম্মী তাহাদের মিলনই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় শ্রীরাধিকা কুটিল নয়নাঞ্চল নিক্ষেপ করিয়া অবহেলার সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—নাগর, তোমার এই চপলতা ও চাতুরী নিতান্ত অসার। আর পিষ্টপেষণ করিও না,—অর্থাৎ একই কথা আর বারবার বলিও না।

শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে বলিলেন,—বৃন্দে, দেখ, দেখ,

নর্ম্মোক্তৌ মম নির্ম্মিতোনু-পরমানন্দোৎসবায়ামপি
শ্রোত্রস্যান্ততটীমপি স্ফুটমনাধায় স্থিতোঽন্যমুখী।
রাধা লাঘবমপ্যসাদর গিরাং ভঙ্গীভিরাতন্বতী
মৈত্রী গৌরবতোপ্যসৌ শতগুণং মৎপ্রীতিমেবাদধে॥

আমি পরিহাস করিয়া যাহা বলিলাম, তাহা পরমানন্দময়। কিন্তু শ্রীরাধা তাহাতে কাণই দিলেন না। গর্ব্বে গম্ভীর হইয়া থাকিলেন, কিন্তু ভিতরের হাসি লুকাইবে কিরূপে? মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্রীরাধা অনাদর করিয়া কথা বলিলেন, আমাকে উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু মৈত্রীগৌরব অপেক্ষা, অর্থাৎ মৈত্রী করিয়া গৌরবের কথা বলিলে তাহাতে যে আনন্দ হয়, ইহাতে তাহা অপেক্ষা আমার শতগুণে অধিক আনন্দ হইতেছে।

কুট্টমিত ও বিব্বোক, এই দুইটি ভাবের যাহা ভিতরের কথা, গোবিন্দদাসের দান-লীলার নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটিতে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়—

১

এই মনে বনে, দানী হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজ-কুমারী সনে, কিসের রভস রঙ্গ॥
এমন আচর, নাহি কর ডর, ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে, করিব গোচর, তখন জানিবা পাছে॥
ছুইয় না ছুইয় না, নিলাজ কানাই, আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের, পবন পরশে, সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ, পান কনক-ধূমে।
কাম-সাগরে, কামনা করহ, বেণী-বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য-উপরাগে, সহস্র সুন্দরী, ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তভু হয়ে নহে, তোমার শকতি, রাই-অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরি, ওরসে আগরি, করহ তাকর সঙ্গ॥

২

পরবর্ত্তী পদটি ইহার প্রত্যুত্তর। পদটি সুবিখ্যাত ও সুন্দর বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

তোহারি হৃদয়, বেণী-বদরিকাশ্রম, উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন-ছবি, কনক-ধূম পিবি, ততহিঁ তপত জিউ মোর॥
সুন্দরি, তোহারি চরণযুগ ছোড়ি।
গোরি আরাধনে, কাহাঁ চলি যাওব, তুহুঁ সে তিরিথময়ি গোরি॥
সিন্দুর সুন্দর, মৃগমদ পরশল, এহি সুরজ এহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ-রাজহি সোঁপলুঁ, সুন্দরি সহস্র পরাণি॥
কাম-সাগরে হাম, সহজই নিমগন, কাম পুরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলবি, গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

['কনক-ধূমপান' এক প্রকারের অতি কঠোর তপস্যা। নীচের দিকে মাথা করিয়া কনকবর্ণ ধূমপান করিয়া এই তপস্যা করিতে হয়।]

৩। নাট্যের সপ্তাঙ্গ

এই নাট্যখানি ভাণিকা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য বা ঘাত-প্রতিঘাত নাই। নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র্য-সাধনের জন্য নাটকে পাঁচটি সন্ধি থাকে, ইহাদের নাম—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ব্ব, বিমর্ষ ও নির্ব্বহণ। এই নাট্যে সন্ধি-বাহুল্য নাই, কিন্তু সপ্ত অঙ্গ আছে। এই সপ্তাঙ্গ—উপন্যাস, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বস, সমর্পণ, নিবৃত্তি ও সংহার। ১৪১৬ সম্বতে নন্দীশ্বরে বাস করিবার সময় শ্রীল রূপগোস্বামী মহোদয় এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

৪। পদাবলী-সাহিত্যে দানলীলা

কীর্ত্তনের গানে দানলীলা আমাদের দেশে খুবই সুপরিচিত হইয়াছে, যাঁহারা ভক্ত, এই লীলাগানের অমৃতরস পান করিয়া তাঁহারা কৃত-কৃতার্থ। দানকেলিকৌমুদী-নাটকের আলোচনার পর এই লীলা-বিষয়ক পদাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা লাভজনক হইবে।

কীর্ত্তনের গানে প্রত্যেক লীলারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ বা পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক গায়কই যে একই পদ গান করেন, তাহা নহে। দানলীলার যে প্রকরণগুলি প্রচলিত আছে, তাহাতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রীরাধা রাজনন্দিনী, তিনি কলস মাথায় করিয়া সখীসঙ্গে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে ঘাটিয়ালের হাতে পড়িবেন কেন? ইহাই অতিশয় স্বাভাবিক প্রথম প্রশ্ন। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার নাটকে ইহার যে হেতু দিয়াছেন, তাহা বেশ সঙ্গত হেতু। যজ্ঞ হইতেছে, যজ্ঞস্থলে যিনি ঘৃত লইয়া যাইবেন, তাঁহার অভীষ্ট লাভ হইবে, ইহাতে আর রাজনন্দিনীই বা কি, আর গরিবের মেয়েই বা কি? ধর্ম্মের কাছে সকলেই সামান। (জগন্নাথের রথের সম্মুখে যেমন পুরীর রাজাকে ঝাঁটা হাতে করিয়া রাস্তা ঝাঁট দিতে হয়।) এই হেতু বেশ।

দানলীলা-গানের যে প্রকরণগুলি প্রচলিত আছে, তাহার একটিমাত্র প্রকরণে এই কথার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই প্রকরণটি শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের মত-সম্মত। এই প্রকরণের সেই বিশেষ পদটি এই ঃ—

সুন্দরি, শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল, সব ভাল হৈল, ইহা উপজিল যথা॥
অরুণ-উদয়ে, ব্রাহ্মণ-নিচয়ে, আইল গোকুল-মাঝ।
জরতীর স্থানে, করি নিবেদনে, আপন মনের কাজ॥
গোবর্দ্ধন পাশে, মনের হরিষে, করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ যুবতি, ঘৃত দিবে তথি, ইষ্টবর পাবে দান॥
জটিলা শুনিয়া, আমারে ডাকিয়া, যতন করিয়া বৈল।
বধূরে সাজাঞা, গাবীঘৃত লৈয়া, তুরিতে তাহাঁই চৈল॥
এ সব বচনে, সব সখীগণে, বাইয়ের আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর, দরশ হইবে মোয়॥
এত মনে করি, অতি রসে ভরি, অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসার, সাজাঞা সত্বর, সংঙ মেলি চলি গেল॥
এ কথা জানিয়া, সে যে বিনোদিয়া, বান্ধিয়া ও চূড়াচান্দে।
সুবলাদি লইয়া, আধ পথে যাইয়া, রহল দানীর ছান্দে॥
বেণুর নিসান, করয়ে সঘন, বাজায় ও জয়তুরী।
এ যদুনন্দন, করে দরশন, নিবিড় আনন্দে ভরি॥

এই পদটি বৃন্দার উক্তি। বৃন্দা শ্রীরাধাকে এই আনন্দ-সংবাদ দিবেন। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের তলে, হয়ত পাহাড়ের উপর ঝরণার ধারে, যেখানে কোন বাধা নাই, সেখানে ফোটাফুল ও পাখীর গানের ভিতর শ্যামের দরশন মিলিবে ইহার অপেক্ষা আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে। কারণ আমরা জানি, শ্রীরাধা,

বয়সে কিশোরী, রাজার ঝিয়ারী, তাহে কুলবতী বালা।

পূর্ব্বে যে পদটি উদ্ধৃত হইল, সেই পদটিকে অভিসারানুবন্ধ বলে। শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য যাইবেন বা অভিসার করিবেন, পূর্ব্বের পদটিতে তাহার হেতু বিবৃত হইয়াছে।

দানলীলা-গানের এই এক প্রকরণ। ইহা ছাড়া অন্য প্রকরণও আছে। এক প্রকরণ আছে, তাহার অনুবন্ধ সঙ্কেত-মুরলী। শ্রীদামের সহিত খেলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে মনে পড়িয়া গেল। তিনি আপনার গরুগুলির ভার সঙ্গীগণকে

দিয়া রাধা বলিয়া বাঁশি বাজাইলেন। শ্রীরাধা সঙ্কেত-মুরলী শুনিয়া অস্থির হইলেন। তখন তাঁহারা—

চল চল বড়ি মাই,মথুরার বিকে যাই, দানছলে ভেটিব কানাই ॥

মথুরায় বিক্রয় করিতে যাই। পথে দানছলে কৃষ্ণের সহিত দেখা হইবে।

আর একটি প্রকরণ আছে, তাহাও দ্বিতীয় প্রকরণের অনুরূপ।

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরার বিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে ॥
পথে যাইতে কহে কথা কানু-পরসঙ্গ।
প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন দীগ নেহারে ॥
হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নবজলধরে ॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্রধনু।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু ॥
মথুরার বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী ॥

আর এক প্রকরণ আছে, তাহাতেও ঐ কথা। শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, কি প্রকারে শ্যামের সহিত মিলন হইবে। তখন মুখরা আসিয়া বলিলেন, চল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ লইয়া আমরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটে যাইব এবং সেখানে বিক্রয় করিব। তখন

দধি ঘৃত গোরসে সাজায়া পসার ॥
চীরহি ঝাপন দেওল তার ॥

কিঙ্করিগণ সব শির পর নেল। মুখরা সঙ্গে ধনি তহিঁ চলি গেল ॥

এই সব প্রকরণের মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমন পদও সংগৃহীত হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া পসরা লইয়া বাহির হইলেন। যেখানে শ্যাম আছেন, সেইখানে চলিলেন। এই প্রকারের অতি সাধারণ পদের রচয়িতার নাম—গোবিন্দদাস। অবশ্য, এই গোবিন্দদাস যে বিখ্যাত গোবিন্দদাস নহেন, তাহা রচনা হইতেই বুঝা যাইবে

দান-লীলা ভক্তগণের অতিশয় প্রিয়। ইহাতে অভিসার আছে, কোন কোন প্রকরণে সঙ্কেত মুরলী আছে। তাহা ছাড়া রূপোল্লাস আছে। আর অনুভাব-অলঙ্কার যাহা আছে,—কিলকিঞ্চিত প্রভৃতি,—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের একটি পদ, দানলীলার প্রসিদ্ধ প্রকরণে গীত হইয়া থাকে—

মুদির মরকত, মধুর মূরতি, মৃগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি-মালতি, মালে মধুকর, মত্ত মনমথ-ফান্দ ॥
শ্যাম সুন্দর, সুঘর শেখর, শরদ শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স, সুবেশ সমরস, সতত সুখময় ভাষ ॥
চিকণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত, চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত, চকিত চাহনি, চীত-চোরক ভাতি ॥
গিরিক গৈরিক, গোরজ গোরচন, গন্ধ গরভিত বাস।
গোপ গোপন, গরিম গুণগণ, গাওত গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা-প্রসঙ্গ

প্রথমে তত্ত্ব, তাহার পর লীলা। ভিতরের সাহায্যে বাহিরকে বুঝিতে হইবে, আয়ত্ত করিতে হইবে ও আস্বাদন করিতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ। তত্ত্ব না জানিয়া যদি লীলার আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে কেবল সংশয় জাগিয়া উঠিবে—আস্বাদন হইবে না। লীলা নিত্য; প্রকট-লীলা আস্বাদন করিতে করিতে নিত্য-লীলা স্ফুরণ হইবে। কিন্তু রাস-লীলার ন্যায় প্রকট-লীলা, তত্ত্বের আলোক ব্যতীত বুঝিতে পারা যাইবে না, সুতরাং আস্বাদনও হইবে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য, (অলৌকিক ও অপ্রাকৃত); এই জন্ম ও কর্ম্ম যিনি 'তত্ত্বতঃ' জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন।" এই তত্ত্বতঃ জানাই, লীলা আস্বাদনের পথ; সুতরাং আমরা শ্রীরাসলীলার তত্ত্ব সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করিয়া লইতেছি।

তত্ত্বের সাহায্য ব্যতীত লীলা যে বুঝিতে পারা যাইবে না, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেখাইতেছি। ইহাকে লীলার বাহ্য রহস্য বলে।

প্রথম প্রমাণ :—'রাস' কাহাকে বলে এবং শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারেই বা এই রাসলীলা করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই জ্ঞাতব্য। 'রাস' এক প্রকার নৃত্য। অনেকগুলি নর্ত্তকী, হাত ধরাধরি করিয়া একটি মণ্ডলী করিয়াছে, আর একজন নট, সেই মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, এই যে নৃত্য, ইহার নাম হল্লীশ। তালের বৈচিত্র্য ও গতিভেদের বৈচিত্র্যের দ্বারা এই হল্লীশ-নৃত্য যখন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় বা তাহার আদর্শ পরিপূর্ণতায় উপস্থিত হয়, সেই সময় এই নৃত্যকে 'রাস-নৃত্য' বলে। প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ, এই রাস-নৃত্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গলোকেও এই নৃত্য কখনও হয় নাই, সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে যে হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। নাট্যশাস্ত্রবিদ্গণ এই আদর্শ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নৃত্য, ধ্যানযোগে বা কল্পনায় দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তব জগতে তাহার কখনও অভিনয় হয় নাই। ইহাই রাসের লক্ষণ। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাঁহার 'বৃহৎ ক্রম-সন্দর্ভ' নামক টীকায় ইহার প্রমাণ-বচন উদ্ধার করিয়াছেন :—

"নর্ত্তকীভিরনেকাভির্ম্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥
তদেবেদং তাল বন্ধ গতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥"

ত্রিশতকোটি ব্রজগোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ এই রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে এই সংখ্যা পাওয়া যায়। যেমন আদিপুরাণে আছে—

"তিস্রঃ কোট্যো বল্লভীনাং সমাজ স্তত্তন্মধ্যে বল্লভস্ত্বেক রূপঃ।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাস নৃত্য বর্ণনাকালে, এই ত্রিশত কোটি সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন—"গোপীমণ্ডল মধ্যকর্ণিকাভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথা গতিলাঘবং প্রকটয়ামাস যথা মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতিস্ম ইত্যেকপরমাণুমাত্রকালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটি গোপীঃ স-নৃত্যং পরিরভ্য পুনর্ম্মধ্যপ্রদেশগত এব বভুবেত লাতচক্রাদপি তস্য গতিলাঘব মধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। যতোমণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থা প্রত্যেকগোপী মধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্ব্বৈ দৃষ্টম্।" (৩৩শ অধ্যায়ের ৩।৪ শ্লোকের টীকা)। অর্থাৎ, ব্রজগোপীগণের মণ্ডলীর ঠিক কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন গতিলাঘব প্রকটিত করিলেন যে, মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর মধ্যে তিনি প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নৃত্য করিতেছেন, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাণু মাত্র সময়ে মণ্ডলের মধ্য হইতে আসিয়া, মণ্ডলস্থ ত্রিশত কোটি গোপীকে নৃত্য সহকারে আলিঙ্গন করিয়া, পুনরায় মধ্য প্রদেশে উপস্থিত হইতে লালিলেন। ইহা দ্বারা অলাতচক্র হইতেও শ্রীকৃষ্ণের গতির দ্রুততা যে অধিক, ইহাই সূচিত হইল। প্রত্যেক গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলের মধ্যে এবং মণ্ডলের প্রত্যেকের পার্শ্বে যুগপৎ দর্শন করিয়াছিলেন। কেবল সেই সময়ে ব্রজগোপীগণ যে কেবল এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীবিল্বমঙ্গলের লীলা স্ফুরণ হইয়াছিল এবং তিনিও এইরূপ দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে মাধবঃ মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥"

'রমণীগণের মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে রমণী; এইরূপে রাসমণ্ডল প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গান করিতে লাগিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত যেস্থানে এই প্রকারের নৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন, সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে 'যোগেশ্বর' এই বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন। যাহা হউক, এ কথার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে, এখন কেবল ইহাই বক্তব্য যে, ত্রিশত কোটি ব্রজগোপীর সঙ্গে, হয় ত্রিশত কোটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অথবা গতির অত্যন্ত দ্রুততা বিধানের দ্বারা, যুগপৎ ত্রিশত কোটি স্থানে প্রকটিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ এই নৃত্য: করিয়াছিলেন। ইহা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মত এবং ভক্ত সাধুগণ চিরদিন এই মত পোষণ করিতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে, 'দেশ' সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা রহিয়াছে, সেই ধারণাকে একান্ত সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়া যাঁহারা তাহার সাহায্যে সমুদয় ব্যাপার বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা গোপীগণের

এই সংখ্যা শ্রবণ করিয়াই 'অসম্ভব' বলিয়া নিরস্ত হইবেন। এই কারণে এই সংখ্যা-রহস্য, প্রথম রহস্য।

দ্বিতীয় প্রমাণ—শরৎকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে রাস হইয়াছিল। সেই চারি প্রহর পরিমিত সময়ের মধ্যে ব্রহ্মার একরাত্রি, অর্থাৎ এক সহস্র মহাযুগ পরিমিত সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কি প্রকারে ইহা হইয়াছিল, তাহা পরে আলোচ্য। প্রকৃত কথা এই যে, 'কাল' সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা রহিয়াছে সেই ধারণাকে একান্ত সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়া যাঁহারা তাহার সাহায্যে সমুদয় ব্যাপার, এমন কি আধ্যাত্মিক জগতের যাবতীয় গূঢ় ব্যাপারও বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা এই লীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন ঃ—

"প্রেমবশ্যত্বাদেকস্যামেব রজন্যামব্যবধানেন যদা তদা সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতয়া যোগমায়য়া দুর্ঘটঘটনপটীয়স্যা শক্ত্যা প্রহর চতুষ্টয়বত্যাস্তস্যা এব রাত্রের্ম্মধ্যে তাবদ্বিলাসসমাপয়িত্র্যাঃ পরঃশতকোটি-রাত্র্যা আনীয় দর্শিতাঃ অতএব তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি বহুবচনং, "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত" ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে।"

শ্রীভগবান্ ব্রজগোপীগণের প্রেমের দ্বারা বশীভূত হইয়া তাঁহার সত্য-সঙ্কল্পতা শক্তির দ্বারা যোগমায়াকে প্রেরণ করিলেন। এই যোগমায়া দুর্ঘটঘটনপটীয়সী। তাঁহার শক্তিতে চারি প্রহর রাত্রির মধ্যে পরঃশতকোটি রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, কারণ এই প্রকারের দীর্ঘকাল ব্যতীত বিলাস সমাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসলীলার প্রথমশ্লোকে 'রাত্রি' এই কথাটি, এই কারণেই বহুবচনান্ত করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার শ্রীরাসলীলার শেষাংশে "ব্রহ্মরাত্র" এই পদটিরও প্রয়োগ আছে।

তৃতীয় প্রমাণ—শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে রাসলীলা করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কত? এই প্রশ্ন অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। হরিবংশ ও বিষ্ণু পুরাণে কৈশোর বয়সের উল্লেখ আছে।

"যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌসঙ্কাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্ম্মুমোদ হ॥" হরিবংশ।

কালবিৎ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সের সমাদর করিয়া রাত্রিতে যুবতী গোপকন্যাগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

"সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥"
বিষ্ণুপুরাণ।

ক্ষপিতাহিত অর্থাৎ যাবতীয় অহিত-বিনাশকারী অমেয়াত্মা ভগবান্ মধুসূদন কৈশোর বয়সের সমাদর করিয়া ব্রজগোপীগণের সহিত বহুরাত্রি ধরিয়া বিহার করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বয়স তিন প্রকার—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। শ্রীমদ্ভাগবতে কৌমার ও পৌগণ্ডলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, ইহা কৌমার-লীলা বা ইহা পৌগণ্ড-লীলা। কিন্তু কৈশোর-লীলার প্রারম্ভে, শ্রীশুকদেব এ প্রকারের কোন কথা বলেন নাই। এই কারণে, শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে রাসলীলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃক্রম কত, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। অবশ্য, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের মত সর্ব্বথা গ্রহণীয় এবং তদনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, কৈশোর বয়সেই রাসলীলা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ, দশম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর বয়স; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর ঠিক্ কোন বয়সে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন, অষ্টমবর্ষে রাসলীলা হয়। টীকাকার ধনপতি সূরি মীমাংসা করিয়াছেন, নবম বর্ষে রাসলীলা হয়। আবার কেহ বলেন দশম, কেহ বলেন একাদশ। রাসবিহারী কৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ ও শ্রীরাধারমণ; সাধক ভক্তগণের মতে তিনি নায়ক-শিরোমণি। এখন, অষ্টম হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে এই নায়কশিরোমণিত্ব সম্ভব কিনা, এ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ জ্ঞান লইয়া যদ্যপি কেহ বিচার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে গোলযোগ উপস্থিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যে নায়ক-শিরোমণি, তাহা যশোদা জানিতেন না। সুতরাং, শ্রীবৃন্দাবনে ভাবভেদে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ভেদ হইত। লীলার এই রহস্য না জানিয়া, বয়স লইয়া বিচার আরম্ভ করিলে, লীলার মধ্যে প্রবেশ করা যাইবেনা।

বাহির হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে আরও দুএকটি অসম্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইবে। রাত্রি-কাল অথচ পদ্মফুল বিকশিত হইয়াছে, ইহাও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাবর্ণনার মধ্যে দেখিতে পাই। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যের রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, তাঁহার বৈষ্ণবানন্দিনী টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরাসলীলার প্রথমেই আছে—শরৎকাল অথচ মল্লিকা পুষ্প বিকশিত হইয়াছে—ইহারই উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ—

"শারদা হেতুনা শরদি অপ্যুৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ 'কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহবাতি গন্ধ' ইতি তস্যাং কুন্দানি চ; 'রেমে তত্তরলানন্দি কমলামোদবায়ুনে'তি রাত্রাবপি পদ্মবিকাশ ইতি বৃন্দারণ্যাস্যোৎকর্ষঃ, রাত্রীরিতি বহুবচনেনৈকস্যামেব রাত্রৌ ব্রহ্মরাত্রেঃ সমাবেশো ব্যজ্যতে; অন্যথা ত্রিযামায়া তয়া তাসাং স্বপ্রেয়সীনাং অসঙ্খ্যেয়ানাং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য সৌরভ্য-তৌর্য্যত্রিকাণি স্বস্য চ নায়কমৌলেঃ গুণমাণিক্য খনেস্তানি মিথোঽনুভাব্যানি ন স্যুঃ, বক্ষ্যতে চৈবং "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে" ইতি ইহ রাসমহোৎসবস্য সাঙ্গতায়ৈ ত্রিযামায়ামেকস্যাং তস্যাঃ সমাবেশো রহো বিহারায় যবনিকাবিতানাদি বিধানং চ অন্যচ্চ কথং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—যোগেতি, দুর্ঘটঘটনপটীয়সীং পরাখ্যাং শক্তিং উপাশ্রিত ইতি তত্তৎ সর্ব্বসমাধানায় তামাদিশন্নিত্যর্থঃ।" শরৎকালেও মল্লিকাপুষ্প ফুটিয়াছে, শুধু তাহাই নহে,

কৃষ্ণের গলদেশে যখন কুন্দফুলের মালা, তখন কুন্দফুলও ফুটিয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, বিকশিত পদ্মফুলের গন্ধে বায়ু পরিপূর্ণ, সুতরাং রাত্রিকালেও পদ্মফুল ফুটিয়াছে। ইহার দ্বারা বৃন্দাবনের উৎকর্ষ প্রমাণিত হইল। "রাত্রি" এই কথাটি বহুবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, একরাত্রিতে ব্রহ্মরাত্রির সমাবেশ হইয়াছে। নতুবা, ত্রিযামা রাত্রিতে অসংখ্য স্বপ্রেয়সীর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, লাবণ্য, সৌরভ্য, বিদগ্ধতা, এবং নায়কশ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণময় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণরূপে প্রকটিত ও আস্বাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। এই কারণে, এক রহস্যের যবনিকা যেন বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সমুদয় ব্যাপার যোগমায়ার দ্বারা সাধিত হইয়াছে।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টীকা এ বিষয়ে আমাদের পথ প্রদর্শন করিবে। তাঁহার টীকার প্রথমশ্লোক এইঃ—

"রসং যমাহুঃ শ্রুতয়ঃ পরেশং গুণার্ণবং চিদ্ঘনমম্বুদাভং।
পীতাম্বরং বেণুধরং কিশোরং স নন্দসূনুস্তনুতাং মুদং নঃ॥"

বেদসমূহ যে পরমেশ্বরকে 'রস' বলিয়াছেন, তিনি গুণার্ণব অর্থাৎ নিখিল কল্যাণগুণের একমাত্র আধার, চিদ্ঘন, অম্বুদাভ, পীতাম্বর, বেণুধর ও কিশোর! তিনিই নন্দের নন্দন। সেই নন্দনন্দন আমাদের আনন্দ বিস্তার করুন।

এই যে প্রার্থনা-শ্লোক, ইহা অত্যন্ত গভীরার্থ-পূর্ণ। ইহার প্রত্যেক কথার সার্থকতা আলোচনা করিয়া, রাসলীলা বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। "নন্দের নন্দন আমাদের আনন্দ বিস্তার করুন"—নতুবা রাসলীলা বুঝিতে পারা যাইবে না। আনন্দে জাগরিত হৃদয় যাহা বুঝিতে পারে ও ধরিতে পারে, নিরানন্দময় বিষণ্ণ হৃদয় তাহা বুঝিতে ও আস্বাদন করিতে পারেনা। পৃথিবীতে আমরা দুই প্রকারের মানুষ দেখিতে পাই। একদল লোকের চরিত্রে আনন্দের জাগরণ বা মত্ততা বলিয়া একটা জিনিসই নাই, তাহারা কেবল গম্ভীরভাবে হিসাব নিকাশ করিতেছে, তাহাদিগের নিকট রাসলীলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা নিতান্ত অন্যায়। তাহারা রাসলীলার ব্যাপার শুনিলে ভয়ানক রুষ্ট হইবে। তাহাদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথাতেই আপত্তি হইবে। প্রথমেই বলিয়া বসিবে—ভগবান্ পাগল নহেন, ভগবান্ বালক নহেন যে তিনি নাচিবেন। আপনি যদি বলেন—'ভগবান্, তাহা হইলে কি করিবেন?' উত্তরে তিনি বলিবেন—"যখন তিনি ভগবান্ হইয়াছেন, তখন মন্দিরে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিবেন, নিতান্তই যদি না পারেন, তাহা হইলে অতি প্রাচীন ঋষিদের নিকট বসিয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন।"

শুধু নাচা নয়, স্ত্রীলোক লইয়া নাচা, ইহার ন্যায় একটা বিসদৃশ ব্যাপার কি আর হইতে পারে? কিন্তু বৃন্দাবনে ভগবান্ এখন কিশোর বালক, তিনি নটবর, তিনি কেবল নাচেন।

"ভুবন-বিমোহন, মঞ্জুল-নর্ত্তন, গতিবল্লিত-মণিহার।
নিজ-বল্লভজন-সুহৃৎ-সনাতন চিত্তবিহরদবতার।"

নাচ জিনিষটা কি, এবং ভগবান্ যে কেন নাচেন, সে কথা পরে আলোচনা হইবে। এখন বক্তব্য এই যে রাসলীলা যদি শুনিতে চাহেন, তাহা হইলে হৃদয়কে একটু আনন্দে সজাগ করুন। নন্দের নন্দন আসিয়াছেন, যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজিতেছে—

"যার বেণুধ্বনিশুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার।"

সকলেই যখন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে, তখন আমাদের বিষাদময়ী দুশ্চিন্তার গুরুভার মস্তক হইতে নামাইয়া আসুন, একবার এই মহামহোৎসবে যোগদান করি। সর্ব্বত্রই আনন্দময়ের লীলা হইতেছে। আকাশে মধু ধরে না, বাতাসে মধু বহিয়া যাইতেছে। এই প্রকারের আনন্দের জাগরণের অবস্থাকে, শ্রীরূপগোস্বামী "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা" বলিয়াছেন। ভূমিকাস্বরূপ এইটুকু বলিয়া, আমরা তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি।

"রসো বৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ। এই যে শ্রুতিমন্ত্র, ইহাই রাসলীলার বীজ। আর "আনন্দং ব্রহ্মেতি" এই যে মন্ত্র, ইহাও একটি বীজ, ইহার বিকশিত অবস্থা—"বৃন্দাবনে শ্রীনন্দ নন্দন।" আনন্দ ও রস, এই দুইটি কথার প্রভেদ কি, তাহাই প্রথমে বিবেচ্য। "রস্যতে আস্বাদ্যতে" আনন্দ যখন আস্বাদিত হয়, তখন তাহার নাম রস। ভগবান্ আনন্দ, কেবল তাহাই নহে "আস্বাদিত আনন্দ"। তিনি সর্ব্বদা আস্বাদিত হইতেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, তাঁহাকে আস্বাদন করে কে? "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তবে তাঁহার মধ্যে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও, স্বগত ভেদ আছে বা থাকিতে পারে, এইটুকু স্বীকার করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"তাঁহাকে আস্বাদন করে কে?" তাহা হইলে উত্তরে বলিব,—তিনি নিজেকেই নিজে আস্বাদন করিতেছেন।

শ্রীরাসলীলার নৃত্য বর্ণনার সময় শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোকের অর্দ্ধাংশে এই গূঢ় সত্যের আভাস দিয়াছেন ঃ—

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥

একটি শিশু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে যেন অনেকগুলি দর্পণ রহিয়াছে। ঐ শিশু দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজের প্রতিবিম্বটিকে ধরিতে যাইতেছে। আবার নিজের সেই উৎফুল্ল মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া আরও উৎফুল্ল হইতেছে, সেই 'আরও' উৎফুল্ল মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া 'আরও' 'আরও' উৎফুল্ল হইতেছে। এই প্রকারে আপনার প্রতিবিম্ব যতই

দেখিতেছে, তাহার আনন্দও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। এই যে আনন্দের বৃদ্ধি, ইহার সীমা নাই ও শেষ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন :—

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আলিঙ্গিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদিগুণধাম, এইরূপ তার নিত্যধাম।"

রাসলীলার ইহাই মূল তত্ত্ব। অনন্ত আনন্দময় পরম পুরুষ যিনি, তিনি আপনার রূপ দেখিয়া আপনিই আপনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সর্ব্বদা ধাবমান; এই যে প্রয়াস এবং পদ্ধতি, ইহারই নাম রাসলীলা। এই রাসলীলা নিত্য। শ্রীবৃন্দাবনে এই নিত্যরাস প্রকট হইয়াছে এবং প্রকট-লীলার নাম মহারাস। কেমন করিয়া নিত্যলীলা প্রকট হইয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ একটি কথা জানিয়া রাখা দরকার, তিনি নিজেকে নিজে আলিঙ্গন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই চেষ্টা এখনও সফল হয় নাই এবং কখনও সফল হইবে না। এই কারণে শ্রীরাসলীলার শেষে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ ঋণবদ্ধ হইলেন। এই যে শ্রীরাসলীলা, ইহা শ্রীভগবানেরও 'চমৎকৃতিকর', ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন।

"পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতে স্তথা ভুবননন্দিনি স্তদবতার বৃন্দস্য চ।
হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকরবর্দ্ধনঃ কিন্তু মে বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ॥"

লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বরাহ নৃসিংহাদি অবতারবৃন্দের অত্যাশ্চর্য্য লীলাসকল এই জগতে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু যাহা স্বয়ং ভগবানের চিত্তবিস্ময়কর, সেই রাসলীলারস আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় জন্মাইতেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী অন্যত্র শ্রীরাসলীলার যে বন্দনাগীতি গাহিয়াছেন, তাহাই আস্বাদন করিয়া আমরা অদ্যকার আলোচনা শেষ করিতেছি :—

"কোমলশশিকর রম্যবনান্তর নির্ম্মিতগীতবিলাস।
তূর্ণসমাগত বল্লবযৌবত বীক্ষণকৃতপরিহাস॥
জয় জয় ভানুসুতাতট রঙ্গমহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত দিব্যরসাবৃত মঙ্গলরাসবিহার॥
গোপীচুম্বিত রাগকরম্বিত মানবিলোকনলীন।
গুণবর্গোন্নত রাধাসঙ্গত সৌহৃদসম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত পানমদাহৃত বলয়ীকৃতপরিবার।
সুরতরুণীগণ মতিবিক্ষোভণ খেলনবল্লিতহার॥

অম্বুবিগাহননন্দিতনিজজনমণ্ডিতযমুনাতীর।
সুখসম্বিদ্ঘন পূর্ণসনাতন নির্ম্মলনীলশরীর॥"

হে নন্দ-কুমার! তুমি জয়যুক্ত হও। কোমল চন্দ্রকরে বনভূমি রমণীয়, আর তুমি সেই বনভূমিতে গীতবিলাস নির্ম্মাণ করিতেছ। অতিবেগে সমাগত গোপযুবতীগণের হৃদয়ভাব দর্শনের জন্য তুমি পরিহাস করিতেছ।

হে নন্দকুমার! তুমি জয়যুক্ত হও। ভানুসুতা যমুনার তটে রঙ্গক্ষেত্রে তুমি মহানৃত্য আরম্ভ করিয়াছ এবং শরৎকালে দিব্যরসাবৃত মঙ্গলময় রাসবিহার করিতেছ। হে গোপীচুম্বনাস্পদ! হে রাগবর্দ্ধন! তুমি কটাক্ষে গোপীগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছ। সদ্গুণসমূহের দ্বারা উন্নতা যে শ্রীরাধিকা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তুমি তাঁহার অধীন হইয়াছ।

তুমি গোপীগণের বচনামৃত পান করিয়া মত্ত হইয়া তাহাদিগের মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ। রাগসম্পন্ন গীতরসে দেবাঙ্গনাগণেরও মতি বিক্ষোভিত করিতেছ। নৃত্য-ক্রীড়ায় তোমার মণিময় হার চঞ্চল হইতেছে।

তুমি জলে অবগাহন করিয়া তোমার নিজ জনগণকে আনন্দিত করতঃ যমুনার তীরশোভ বর্দ্ধন করিতেছ, তুমি সুখ ও জ্ঞানের ঘন মূর্ত্তি, তুমি পূর্ণ ও সনাতন, তোমার শরীর নির্ম্মল ও নীল, তুমি জয়যুক্ত হও।

বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা

(শ্রীবনবিহারী দাস এম্, এ, বি, টি লিখিত)

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে দুইটী বিভিন্ন প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথম—টোলের দেশীয় প্রণালী, দ্বিতীয়—স্কুলও কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতি। প্রথমতঃ টোলের প্রণালী আলোচনা করা যাউক। চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার উদ্দেশ্য,—গভীরতা, কোন বিশেষ বিষয়ে গভীর জ্ঞানলাভ। সাধারণতঃ ছাত্রগণ ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, অথবা দর্শন, এক এক বিষয় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিষয়ে কৃতী হইবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকল রকমের টীকা, টিপ্পনি এবং সমালোচনা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। এই প্রকারে পাঠ্য পুস্তকের সকলপ্রশ্নই তাহারা আয়ত্ত করে। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাহার পাঠ্য পুস্তকই সার পুস্তক এবং অবিসম্বাদিত সত্যে পূর্ণ,—এই

ধারণা ছাত্রগণের বদ্ধমূল হইয়া যায়। টীকা পাঠেও তাহারা কম মানাযোগ প্রদান করে না। সুতরাং পাঠ্য-পুস্তক এবং সমালোচনা-পুস্তক তাহাদের নিকট একই আসন প্রাপ্ত হয়। অবশ্য, এই প্রণালীর কতকগুলি ভাল গুণ আছে। ইহাতে পাঠ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ আনয়ন করে এবং সুচারু জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রণালীর শিক্ষায় শিক্ষিত বহু পণ্ডিত এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া যায় না। তাহারই নাম প্রকৃত শিক্ষা যাহা অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ এবং ঈশ্বরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান দেয়, যাহা মানবকে সত্যসত্যই জ্ঞানপিপাসু করে, যাহা মানবের জ্ঞানের সসীমতা উপলব্ধি করাইয়া দেয়। তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত যিনি নিরপেক্ষভাবে গভীর গবেষণা দ্বারা সত্যের অনুসন্ধান করেন; সহানুভূতি, দয়া প্রভৃতি উচ্চবৃত্তির উন্মেষ সাধন করেন, এবং মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। অনেকেই পণ্ডিত হইতে পারেন এবং বহু পুস্তক চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত শিক্ষা নয়। অবশ্য ইহা দ্বারা এমন বুঝা উচিত নয় যে প্রাচীন সংস্কৃতবহুল বঙ্গে প্রকৃত পণ্ডিতের অভাব ছিল। অনেকেই প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু এই চতুষ্পাঠীর প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া তাঁহারা বড় হন নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব তাঁহাদিগকে প্রণালীর অনেক উর্দ্ধে লইয়া গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা বাস্তবিকই জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত অবলম্বিত হইত। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুগিরি, পৌরহিত্য, এবং কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ ছিল না। ইহার ব্যবহারিক উপকারিতার দিকেই সকলের লক্ষ্য ছিল। সংস্কৃত-শিক্ষার্থী মাত্রেই স্ব স্ব ধর্ম্মমত, বিধি-ব্যবস্থা, এবং ক্রিয়াকলাপাদি অবগত হইত। এই প্রকারের শিক্ষা দ্বারা জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইত। শিক্ষার্থীমাত্রেই কোন্‌দিন কোন্ ফল নিষিদ্ধ, পূর্ব্বপুরুষগণকে জলদানে কোন্ অঙ্গুলি কিরূপভাবে সঞ্চালন করিতে হয়, আধুনিক বঙ্গীয় হিন্দুগণের কার্য্যকলাপ কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হয় এ সব জানিতে উৎসুক হইলে স্মৃতি এবং রঘুনন্দনের সার-সংগ্রহ পাঠ করিলেই জানিতে পারিত। গুরুগিরি করিবার ইচ্ছা হইলে তন্ত্র পাঠ করিতে হইত। চিকিৎসক হইতে হইলে কবিরাজী পুস্তক পাঠ করিত। পুরাণসমূহ যথারীতি পঠিত হইত না। পুরাণপাঠক এবং সমালোচকগণ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেন এবং তাহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

সকলেই ব্যাকরণ পাঠ করিত। কাব্য এবং কল্পনামূলক সাহিত্যের তত আদর ছিল না। অবশ্য কেহ কেহ গভীর শাস্ত্রচর্চ্চার পূর্ব্বে ঐ বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিতেন। "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং" অর্থাৎ শাস্ত্রচর্চ্চার পক্ষে কাব্যপাঠ অনুকূল নয়—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পণ্ডিত মণ্ডলীর মত এই প্রবাদ বাক্যে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কাব্যপাঠের সময়ও তাঁহারা রঘুবংশের স্বাভাবিকতা অপেক্ষা

নৈষধচরিতের কৃত্রিমতা পছন্দ করিতেন। "রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যং" অর্থাৎ তাহাদের মতে রঘু আবার কাব্য এবং পাঠোপযোগী! অভিধান প্রণয়ন বিদ্যায় তাঁহারা বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সমব্যবসায়ী আগ্রহ সহকারে সমগ্র অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ কণ্ঠস্থ করিতে যত্নবান হইত! দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অবলম্বিত হইত না। কিন্তু বঙ্গদেশে ইহাও নব্য ন্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালধর্ম্মে রঘুনাথ এবং গদাধরের মত অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই দুই নৈয়ায়িকের যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ পঠিত হইত। উদ্দেশ্য, সত্যে উপনীত হওয়া নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে তর্কে পরাজিত করা। বড় বড় নৈয়ায়িক হইয়া নাম ধাম প্রচার করা এবং জীবিকানির্ব্বাহ করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কারণ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিতগণকে মূল্যবান উপহার প্রদান করা সাধারণে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের এ বিষয়ে লক্ষ্য ছিল। জ্ঞান বা সত্যের আদর তাঁহারা বড় করিতেন না। জীবিকার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রও পঠিত হইত। অতএব দেখা যাইতেছে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা উদারভাবে অনুপ্রাণিত ছিল না। সরকারী সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। এখন চতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালীর যথাযথ সংশোধন কিম্বা শেষ হওয়ার সময় আসিয়াছে।

চতুষ্পাঠীতে একজন শিক্ষার্থী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণপাঠের সহিত সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ করে। তাহার পুস্তকের ভাষা এবং ভাবের সহিত কোন পরিচয়ই থাকে না। বাস্তবিকই অধিকাংশ সংস্কৃত ব্যাকরণ কোন ভাষাতেই লিখিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীজগণিতের নিয়মানুসারে সাঙ্কেতিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আর কোন কোন ব্যাকরণের উদাহরণসমূহ সুশিক্ষকগণই অবধারণ করিতে পারেন। সাধারণ শিক্ষকের নিকট উহা অবিদিত থাকে। এইরূপে শিক্ষার্থীগণ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং কেবল মুখস্থ করিতে থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বার তাহাদের নিকট কোন কালই উন্মুক্ত হয় না; প্রকৃত তথ্য তাহাদের নিকট চিরকালই জটিল থাকিয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে প্রকৃত জ্ঞানের পিপাসা তাহাদের হৃদয়ে জাগরূক হয় না।

অবশ্য ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই প্রণালীর শিক্ষার একটী বিশেষ সুবিধা আছে। অনেক অনুপযুক্ত ছাত্রই এই প্রাথমিক জটিলতা দেখিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ব্যাকরণপাঠের এক বৎসরের মধ্যেই ছাত্রগণ বিশেষ করিয়া তাহাদের শিক্ষকগণ বুঝিতে পারেন কোন্ ছাত্রের এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। যে ছাত্র সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ অধ্যয়নে অপারগ্ তাহাকে জোর করিয়া এ কার্য্যে প্রয়াসী করা শিক্ষকের এবং সমাজের দুর্ভাগ্য একথা বলা বাহুল্য!

আজকাল বাঙ্গলায় বহু পণ্ডিত দেখা দিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর সংস্কৃত শিক্ষার

অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। এই তথাকথিত পণ্ডিতমণ্ডলী যতই সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতেছেন ততই প্রকৃত পাণ্ডিত্যের অভাব হইতেছে। ইহার মূল কারণ, এই প্রথম অনুপযুক্ততা নির্দ্ধারণের ত্রুটি। আজকালকার ধুয়াই হইতেছে পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেওয়া এবং উপাধি সংগ্রহ করা। এ বিষয়ের যুক্তিও অতি দূরে নয়। এখনও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যজমানের দানের এবং বৃত্তির প্রত্যাশা হইয়া থাকেন। এই অন্নকষ্ট এবং ঐহিক সুখস্পৃহার দিনে তাঁহাদের অন্ন-চিন্তা চমৎকার। এই সব কারণে স্বভাবতঃই তাঁহারা জীবন সমস্যার যে কোন উপায়ে সমাধান করিতে চেষ্টা করেন। ন্যায়রত্ন, স্মৃতিভূষণ কিম্বা যে কোন একটা উপাধি তাঁহাদের বড় কম উপকার করে না। সেইজন্য তাঁহারা উপাধি চান প্রকৃত শিক্ষা চান না। প্রাচীনকালে জীবনসমস্যা এত জটিল ছিল না এবং ব্রাহ্মণগণ অনায়াসেই জীবিকা সংস্থান করিতে পারিতেন। তাঁহারা উপাধির জন্য পাগল হইতেন না। আজকালকার উপাধিধারী পণ্ডিত অপেক্ষা অনেক উপাধিহীন ব্যক্তির সংস্কৃত জ্ঞান বড় কম নয়। সকল গ্রামেই যেখানে ব্রাহ্মণ আছেন সেখানেই সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন যদিও তাঁহারা উপাধিধারী ছিলেন না। আজকাল সকলেই উপাধির জন্য লালায়িত। সুতরাং রুচি বা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছে এবং দেশের মধ্যে শিক্ষার আদর্শ অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছে। সেই কারণে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রাচীন দেশীয় প্রণালীর একটা বিশেষ সুবিধা অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহারা অনুপযুক্ত তাহাদিগকে আর বাদ দেওয়া হইতেছে না।

দেশীয় প্রণালীর ত্রুটি কাহারও অবিদিত নহে। ইহা মুখস্থ বিদ্যা মাত্র। এই প্রণালীর শিক্ষায় বুদ্ধিশক্তির অবসাদ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। সংস্কৃত প্রাথমিক শিক্ষাতেই অনেক সময় অযথা অতিবাহিত হয় এবং আজকালকার উচ্চ বিষয়সমূহের চর্চ্চা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার জীবনের ৩০।৪০ বৎসর শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন। তাঁহাদের পরমায়ুও বহুদিনব্যাপী ছিল। কিন্তু আজকাল ২৫ বৎসরও বহুদিন বলিয়া বোধ হয়, কারণ লোকের পরমায়ু ৬০ ষাট বৎসরে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আবার ব্যাকরণ পুস্তকসমূহের বিষয়, নীতির হিসাবে ধরিতে গেলে দেখা যায় যে উহাদের অনেক উদাহরণ (কাতন্ত্র, কাশিকা প্রভৃতি) নৈতিকতাবর্জ্জিত। (অবশ্য নীতিবিগর্হিত নয়)। অতীতকালে ইহা বড় দোষাবহ ছিল না। জনসাধারণের আদর্শ শাস্ত্রীয় আদর্শে স্থাপিত ছিল। তাহারা তাহাদের গুরু, পুরোহিত, স্মার্ত্ত অথবা নৈয়ায়িকগণের জীবনে এই আদর্শ অনুসৃত হইতে দেখিতেন। নৈতিক বিধির অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বেশী কার্য্যকরী। হিন্দুসমাজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই ইহার আদর্শ শিক্ষা দিত। ভাষা-পুস্তিকার নৈতিক বিধি দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। এখন সমস্তই

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সমাজ, বিরুদ্ধ আদর্শের দ্বারা বিক্ষুব্ধ। অধুনা মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যগুলি প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তকে স্থান পাওয়া একান্ত আবশ্যক। "সদা সত্যকথা কহিবে, লোক-হিতৈষণা ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ" প্রভৃতি বিধিসমূহ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া ব্যাকরণমমূহে লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় আসিয়াছে। ব্যাকরণের দৃষ্টান্তসমূহ এইরূপ হওয়া উচিত:—যথা "সদা সত্যং ব্রূয়াৎ', 'নোপকারাৎ পরং পুণ্যং', 'প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং'।

এখন দেখা যায় এক ব্যক্তির পাঁচ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া এবং ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়াও মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যগুলির সহিত পরিচয় হয় না। এরূপ প্রণালীতে প্রকৃত মানবতার শিক্ষা কতদূর হয়, ভাবিবার বিষয়। আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের নীতিপাঠও করিতে হইবে। ১২ বৎসর হইল আমার একজন কাব্যপাঠে নিযুক্ত বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন হয়। তিনি কলিকাতার একজন সুপরিচিত পণ্ডিতের নিকট কাব্য পাঠ করিতেছিলেন। তিনি সাহিত্য-দর্পণ এবং কাব্যতীর্থ পরীক্ষার যাবতীয় পুস্তকই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য একজন সংস্কৃত ভাষায় এবং ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। আজকালকার পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি একজন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা দশকুমার চরিত, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংগৃহীত। তাঁর মতে স্ত্রীজাতি পুরুষের ভোগ্যবস্তু। অবশ্য মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করায় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল না। আজকালকার চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতের ইংরাজী এবং বাঙ্গলা প্রণালী-অনুযায়ী শিক্ষা না হইলে সার্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। কাশীর পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্নের ন্যায় পণ্ডিত আজকাল বিরল। তাঁহাদের শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার অনুযায়ী। তাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল, এখন তাহা আশা করা বাতুলতা। আমাদের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থীগণকে নীতিশিক্ষা এবং ধর্ম্মমূলক শিক্ষা প্রথম জীবনেই দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজের চতুষ্পাঠীতে আধুনিক আদর্শ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চতুষ্পাঠীর শিক্ষার বিশেষ গুণ এই যে, এই প্রণালীর শিক্ষায় বহু পণ্ডিত গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছে। ব্যাকরণে অনেক টোল-পণ্ডিতের জ্ঞান সংস্কৃত এম-এ, উপাধিধারীদের অনেক উচ্চে। স্মৃতি এবং দর্শনেও একথা খাটে। কিন্তু এরূপ পণ্ডিত আজকাল কোথায়? নব্যন্যায়ে প্রকৃত ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত বিরল। ধ্বংসোন্মুখ জাতির মাত্র দুই একজন অবশিষ্ট রহিয়াছে। নব্যন্যায় দুরূহ এবং সুকঠিন। ইহা দ্বারা যুক্তিতর্কের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, এবং মানব-মনকে সংযত এবং যথাযথভাবে চালিত করে। গণিতে অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইহা না পড়িলেও পারে, কিন্তু চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের ইহা শিক্ষা করা একান্ত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। গণিত (জ্যোতিষ) উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ

আলোচনায় বিরত ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই ইহা লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। সূর্য্য, চন্দ্র, এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোচনায় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোন মনোযোগই দিতেন না, তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইহা দারিদ্র্য আনয়ন করে; সেইজন্যই প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-যুবকগণ জ্যোতিষ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। দরিদ্র গণকগণ কোন প্রকারে এই বিজ্ঞানকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজ এখনও জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়।*

শিরোমণি মহাশয়ের গান

পূর্ব্ববঙ্গে এক সম্প্রদায় লোকের মধ্যে এই গান খুব প্রিয় ও সুপ্রচলিত। শিরোমণি মহাশয়ের নাম কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি বা কৃষ্ণকান্ত পাঠক। তিনি পুরাণপাঠক ছিলেন ও গুরুগিরি করিতেন। ফরিদপুর জেলা, মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঁসাভোগ গ্রামে ইঁহার বাড়ী ছিল। নবদ্বীপে 'পাঠক-বাড়ী' নামে পরিচিত বাড়ীও ইঁহারই। 'বঙ্গবাসী' প্রচারিত 'বাঙ্গালীর গান' পুস্তকে ইঁহার অতি সামান্য পরিচয় আছে, আর পাঁচটি গান আছে। গত বৎসর কাঁসাভোগ নিবাসী পাঠক শ্রীরাধাবল্লভ গোস্বামী মহাশয়ের খাতা হইতে কতকগুলি গান লিখিয়া লইয়াছি, সেগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল। শুনিয়াছি শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী হইতে তাঁহার পুত্রকর্ত্তৃক শিরোমণি মহাশয়ের যাবতীয় গান একত্র করিয়া ছাপা হইবে। বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী অধ্যায়, সেই অধ্যায়ের কিছু উপকরণ, আর সেই অধ্যায়ে প্রযোজ্য কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রমাণ শিরোমণি মহাশয়ের গানে পাওয়া যাইবে। এই কারণে গানগুলি সংগৃহীত হইলে ভাল হয়।

১

রাগিণী—খট্।

সুরধুনি মুনি কন্যে। (মা)
পতিত পাবনী, ত্রিলোক তারিণী, ধরাগমন জীব উদ্ধারণ জন্যে।
তব ধারা ধরে' ধন্যা এ ধরণী, ভগীরথ রথ পথানুগামিনী,
মুকুন্দচরণ রজঃ-বিহারিণী, কলুষনাশিনী জননীগো ধন্যে॥

---

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম, এ, মহাশয়ের ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

তব তীর তরুকোটরান্তর্গত, পতঙ্গ বিহঙ্গ আছে কত শত,
অন্যত্র অখণ্ড ভূমিপতি যত, না হয় তাদের মত শতক্রতু পুণ্যে॥
অভয়ে ভয়ে সদা কাঁপে প্রাণ, দিবে কি না দিবে চরণ দুখান।
ওমা, অনন্তরূপিণী কর পরিত্রাণ, কৃষ্ণকান্তকে ঘিরেছে কৃতান্তেরি সৈন্যে॥

২

রাগিণী—খট্।

অপার সংসার, ঘোর পারাবার, কি গভীর নীর, বহে শতধার।
অতি ভয়ঙ্কর এ মায়া সমীর, দুস্তর তরঙ্গ, উঠে অনিবার॥
তাহে অবিরত কি তরঙ্গমালা, উপায় কি করি জীর্ণদেহ ভেলা,
মিছে আশায় বসে' কাটাইলাম বেলা, এ সময় পলাইল কর্ণধার॥
অনুমান এই পাপাঙ্গ বাতাসে, কাণ্ডারি লুকায়ে র'ল অন্য দেশে।
পলাইয়ে যে যায় সে কি আসে শেষে, আপন কর্ম্মদোষে ডুবিলাম এবার॥
কে করিবে দয়া এমন পামরে, যদি কেউ আসে আমায় দেখে যায় ফিরে,
স্পর্শ থাক্ দূরে দেখে না পাপীরে, তবে বা কিরূপে পাইব নিস্তার॥
কুবিষয় পথে হয় অনাসক্তি, তোমার শ্রীচরণে যে করে আসক্তি,
সেই তোমায় পায় করে' শুদ্ধাভক্তি, কান্ত বলে পেতে কি শক্তি আমার॥

৩

রাগিণী—খট্ ভৈরবী।

যা ইচ্ছা তাই দিবে, কেবা নিষেধিবে, এই ভবে তুমি করুণানিধান!
দুঃখ-পাষাণের সারাংশ উঠায়ে করেছ আমার এ হৃদয় নির্ম্মাণ॥
শিলাসম যদি এ হৃদয় না হত, তবে দিলে যত এতই কি নাথ স'ত,
তবে কি শতধা বিদীর্ণ না হত, তবে কি যেতনা যাতনায় এ প্রাণ॥
শুনেছি তোমার নাই শত্রু মিত্র, তুমি সবার মিত্র, সবাই তোমার মিত্র,
কেবল একা আমি হয়েছি অমিত্র, পাত্র বুঝে মাত্র করেছ এ দান॥

এখন দশ দিক্ হেরি অন্ধকার, আমার বলি কার, কে আছে আমার,
তুমি ফেলে গেলে দেখে দুরাচার, তবে ভবকূপে কে করিবে ত্রাণ ॥
কান্ত বলে নিবেদি হে কমলআঁখি, এ বাকি জনমে আর হবে নাকি,
যখন যে ভাবে রেখে হও সুখি, ভুলি যেন না নাথ চরণ দুখানি ॥

৪

রাগিণী—মল্লার।

ভব-ভয়হারী হরিকে না ভেবে কি ভাবে কি ভেবে দিন গেল হে এবার।
তারে যে ভাবে যে ভাবে সে ভাবে সে পাবে, সে বিনে কে পাবে চরণ তাহার ॥
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি তারে যে জন ভাবে, স্বজন বলে সে জনারে সেই ভাবে,
সে ভাবনায় এ ভাবনা দূরে যাবে, নিত্যধামে যাবে সঙ্গী হয়ে তার ॥
ভক্তিভাবে তারে সতত যে ভাবে, সে বিনে কে তার প্রিয় ভক্ত হবে।
ও মন রলি না সে ভাবে, রলি কার ভাবে, এ ভাবে কি যাবে মায়ার বিকার ॥
ও মন কি কথা বলিয়ে আলিরে এ ভবে, ভুলে গেলি সে সব রলি গৌরবে,
ভব জলনিধি জলে রলি ডুবে, সে বিনে কে কর্ব্বে তোমারে নিস্তার ॥
মানব জনম যদি গেলরে এ ভাবে, নীল চিন্তামনির চরণ কিসে পাবে,
কান্ত বলে মন দেখ নাকি ভেবে, সে বিনে কে হবে ভব-কর্ণধার ॥

৫

রাগিণী—মল্লার।

আমার কথায় আমায় করিবে করুণা, এমন কথা কিবা আছেহে আমার।
তোমার কথায় যদি করহে করুণা, করুণা-নিদান মহিম তোমার ॥
যে কথা বলিলে হইবে সদয়, এমন কথা আমার না হয় উদয়।
বৃথা কথা গাথা সাধু কথা নয়, সে কথা উদয় হয়েছে আমার ॥
তোমার নামগুণে কখন না হয় রুচি, আপামর আর কোথায় আছেহে অশুচি,
আমা দরশনে শুচি হয় অশুচি, শুচি কর যদি রুচি হয় তোমার ॥

তোমার স্তব মহিমা স্বরূপ বর্ণিতে, যে পারে বর্ণিতে, সে পারে বর্ণিতে।
আমি কি বর্ণিব পারি কি বর্ণিতে, কলুষ বহ্নিতে দহে অনিবার ॥
পতিতপাবন দীন-দৈন্যহারী, সুযশঃ প্রকাশ ত্রিভুবন ভরি,
কৃষ্ণকান্ত নহে তোমার কৃপার অধিকারী, ডোবে ভবে তরি বিনে কর্ণধার ॥

৬

রাগিণী—মল্লার।

হরি, আমার মানস-সন্তাপ নাশিতে, যদি তোমার অতি দুঃখ হয়।
যা হয় আমার হবে, তুমি কেন দুখ পাবে, সুখে থাক তুমি সুখময় ॥
অন্তরে অনন্ত সন্তাপ-সন্ততি, অনন্ত-সমাজে হইল বসতি।
আমার আর নাইক গতি, ব্রজ-জনপতি, তুমি কি দিবে শ্রীপদাশ্রয় ॥
ফেলে আমায় একা বন্ধু-বিহীন দেশে, দীনবন্ধু তুমি কোথায় আছ বসে,
আমি তোমারি উদ্দেশে, যাব কোন্ দেশে, কে বলিবে পথের পরিচয় ॥
পড়েছি বিপাকে, আপন কর্ম্মপাকে, তুমি বিনে অন্যে কে খণ্ডিবে তাকে।
আমার মরণ বেদনা নিবেদি তোমাকে, তুষানলে জ্বলে এ হৃদয় ॥
হরি তুমি হে অপার, করুণা-পারাবার, আমি ভক্তি-বিহীন জঘন্য দুরাচার,
কৃষ্ণকান্ত বলে গতি, কি হবে আমার, আমি ভবে অতি নিরাশ্রয় ॥

৭

রাগিণী—মল্লার।

হায়রে আমার মন, দেখনারে কেন, আর কি মানব-জনম হবেরে।
কভু নহে স্থির অনিত্য শরীর, দেখিতে দেখিতে যাবেরে ॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ অন্তে, মানব জনম পালিরে ভ্রান্তে।
দারাসুতসঙ্গ, পেয়ে কর রঙ্গ, সুখসঙ্গ কোথায় রবেরে ॥
আলি কোথা হতে যাবি বা কোথায়, সাধের দিন তোর গেল মিছে কথায় কথায়।
কার আশায় বসে রলিরে হেথায়, কৃষ্ণকান্তের হয়ে এল অন্ত কৃতান্ত-শাসনে পড়িলিরে ॥

৮

রাগিণী—মল্লার।

হরি, আমি দীনহীন, করি নিবেদন, স্মরণ হয় যেন, মরণে।
আমার মনে এই ভয়, কখন কি হয়, কৃতান্ত যাতনা যখনে॥
সদা প্রকোপিত, তিমিরারিসুত, চাহে আঘূর্ণিত নয়নে।
অবিরত দূত, করে যাতায়াত, নিয়ত বন্ধন কারণে॥
সদা দারা ধন, করিতে পালন, ধন উপার্জ্জন কারণে।
বল না এমন, করেছি ভ্রমণ, তোমারি যুগল চরণে॥
নাহি কিছু বল, চরম সম্বল, বিষয় প্রবল এখানে।
ধরণী-শয়ন, হইবে যখন, হের সকরুণ নয়নে॥
কৃপা পারাবার, তুমি বিনে আর, কে আমার এই ভুবনে।
দীন কৃষ্ণকান্তের ভার, কে নিবেহে আর, যা কর তোমার স্বগুণে॥

৯

রাগিণী—খাম্বাজ পিলু।

কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যদি হ'ত দুনয়ন।
ঐরূপ হৃদয় মন্দিরে রেখে করতেম দরশন॥
কৃষ্ণ প্রেম সাগর মাঝে, রসিক হংস তাই বিরাজে।
নিবারি ক্ষীর তাইতে বেছে, করতেম আস্বাদন॥
হেন কৃষ্ণ নামামৃতে, না হইল মোর নির্ম্মল চিতে।
কাণা কড়ি ছিদ্র মাত্রে স্ফুরে শ্রবণ॥
দীন কৃষ্ণকান্ত বলে, কাজ কি অহো ছাড় কূলে।
মৃতদেহের অলঙ্কারে কাজ কি প্রয়োজন॥

১০

রাগিণী—ভীমপলশ্রী।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম কেন বল না রসনা কর কি।
হরি নামামৃত পান, করে' জুড়াও প্রাণ, মানব দেহে আর হবে কি॥

চারিদণ্ড পথ গমন করিতে, পাথেয় পৃথক্ নিয়ে যাও খেতে।
ষড়শী সহস্র যোজন যাইতে, পথে খেতে সম্বল আছে কি॥
ষষ্টি দণ্ড দিবারাত্রি পরিমাণ, ক্ষণকাল কেন নেওয়া হরিনাম;
ভব-দাবানলে জ্বলে এই প্রাণ, নাম বিনে শীতল হবে কি॥
সাধু সঙ্গে সদা কর হরিনাম, জেন ভাল হবে তবে পরিণাম,
করুণাধাম নাম এখন না নিলে, অন্তে তারি স্মরণ হবে কি॥
চঞ্চল কমলদল-জল যথা, পরমায়ু পরিমিতি যেন তথা।
কৃষ্ণকান্ত বলে কেন বল বৃথা কথা, কালের অবকাশ আর আছে কি॥

১১

রাগিণী—মল্লার।

যদি বল না ডাকিলে হয় করুণা, এমন করুণা কে করেছে কোথায়।
যে করে স্মরণ, মরণ-বারণ, তারি আকিঞ্চনে, সে পাবে তোমায়॥
যে তোমাকে বলে, সে তোমাকে বলে, নিজ-ভক্তিবলে সে তোমাকে বলে।
সে বল্‌বার মত বলে, সদা আপন বলে, অবহেলে অন্তে চরণতরী পায়॥
করুণা নিধান, ভক্তে যে করুণা, কিন্তু সে নয় প্রভুর ফলত করুণা।
তবে যে করুণা, তার গুণেরই করুণা, তারি প্রেমঋণে বিকায়েছ কায়॥
যদিহে না কর সদসদ্ বিচার, এই ভবে মাত্র আমি দুরাচার।
তোমার মহিমা তবে হয় প্রচার, পার কর ভবে তরী ডুবে যায়॥
চিন্তামণি তোমার কৃপাসিন্ধু জলে, নিখিল ভুবন সব ভাসাইলে।
কত দুঃখী তাপী নিলে কত খেলে, কান্ত বলে তার কান্‌তে জীবন যায়॥

১২

রাগিণী—মল্লার।

আমি যদি ডুবে মরি হরি ভবে—ইথেই কিবা ক্ষতি আছে হে তোমার।
যে তোমাকে ভাবে, সেই যদি ডোবে, ইথে হবে তোমার কুযশঃ প্রচার॥
হয়েছি হে আমি কলুষভাজন, আমা পরে দণ্ড স্বরূপ প্রয়োজন।
আমাকে দণ্ডিতে কর আয়োজন, পাষণ্ড দণ্ডিতে তব অবতার॥

তোমার নামাভাসে পাপরাশি খণ্ডে, গ্রহণ করি নাই এই ছার তুণ্ডে।
ওহে দণ্ডধর দণ্ড ধর এই মুণ্ডে, ইথে খণ্ডে যদি কলুষ আমার॥
করি ওহে কত কদর্য্য আকার, রাখি নাই নামের মর্য্যাদা তোমার।
ভুবন-পাবন, নাম গুণগান, করি নাই কখন, না গণিয়ে সার॥
নাম চিন্তামণি অসীম মহিমা, অনন্ত অন্তরে দিতে নারে সীমা।
কৃষ্ণকান্ত বলে, তার দেহের এই সীমা, বিফলে জনম গেলহে এবার॥

১৩

রাগিণী—ভৈরবী খট্।

আপনে ডুবিলি, আমাকে ডুবালি, (এ ঘোর ভবসিন্ধু-নীরে)
বহু জন্ম পরে, মানব দেহ ধরে, পেয়েও আরবার তারে হারালি॥
ভাব্‌ছ বসে বসে বাঁচবে কত কাল, কাল পেতে আছে বিষম মায়াজাল,
হরিনাম মন্ত্রে না কেটে সে জাল, ভবে কি জঞ্জাল ঘটালি ঘটালি॥
যে দেহেরি কর মার্জ্জন ভূষণ, দিনেক দুদিন পরে নিবে হুতাশন।
দুরন্ত কৃতান্তে করিবে শাসন, সে পীতবসন কেনে না ভাঙ্গিলি॥
দেহ-তরী তাতে গুরু কর্ণধার, তবু না চিন্তিলি উপায় তরিবার।
কিসে হবে পার, ভব পারাবার, দিনান্তে একবার হরি না বলিলি॥
আমি কিরে তোর খাতক ছিলাম এত, যাই ছিল মনে করিলি মনের মত।
কৃষ্ণকান্ত বলে আর বল্‌ব তোকে কত, অবিরত বিষয় পথে রত হলি॥

১৪

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী।

হরি এই কর চরমে আমায়।
দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে ডাকিহে তোমায়॥
করুণা-নিকরাকর, যদি, কৃপা অঙ্গীকার কর,
যা ইচ্ছা তা' কর্‌তে পার, নব জলধর কায়॥
পাপে ভারি তনুর তরি, ভবসিন্ধু গভীর বারি,
ওহে ওনাথ ডুবে মরি, আমায় রেখ রাঙ্গা পায়॥

দীন কৃষ্ণকান্ত ভণে, ঐ দুঃখ আমার মনে।
ভাবি জীবনান্ত দিনে, আমার কি হবে উপায়॥

১৫

রাগিণী—ভীমপলশ্রী।

আমি যদি তার হতাম, তবে সে কি আমার হত না।
তবে কি সে মনে আমার এ মন মিশে যেত না॥
যদি দণ্ড নিশি দিনে, (তারে) কখনও করি না মনে।
তবে সে আমার হবে কেনে, আমি জেনেও তাই জানি না॥
যে হবে তার সে হবে তার, আছে ত এ প্রতিজ্ঞা তার।
তার হলাম না গেলাম এবার, এমন দিন আর হবে না॥
সে যদি আমার হ'ত, তবে কি লুকায়ে র'ত।
আমার হৃদয়মাঝে উদয় হত, এ যাতনা কি যেত না॥
কান্ত কয় এ দিন গেল, প্রাণান্ত সময় হ'ল।
এ বড় খেদ মনে র'ল এবার কিছুই হল না॥

১৬

রাগিণী—ভীমপলশ্রী।

হরি, কোন যুগে আমি তোমারি হলাম না, তবে কৃপা হবে কি গুণে।
ভ্রান্ত হয়ে বলি, শোন বনমালি, ইথেই অপরাধী চরণে॥
যে করেছে তোমায় আত্ম সমর্পণ, হরি তারি তুমি তোমারি সেজন।
(তার) ভজন-পূজন তোমার শ্রীচরণ, তোমাকে কে পাবে, সে বিনে॥
দীনহীনের কথা বাতুলের প্রায়, (কেবল) কথা বলে যদি তোমায় পাওয়া যায়।
বিনে মনাসক্তি ঐ রাঙ্গা পায়, কে পেয়েছে তোমায় ভুবনে॥
বামন যেমন করে চাঁদ ধরিতে আশা, বাতুলেরি প্রায় তেমনি তোমায় পেতে আশা।
একি আশার মত আশা, কেবলি দুরাশা পেতেছি ভরসা মরণে॥
যারা পায় তোমার চরণারবিন্দ, মকরন্দ-গন্ধে সতত আনন্দ।
(যার) নাই সে সম্বন্ধ, তারি কপাল মন্দ, থাকিবে সে কর্ম্ম-বন্ধনে॥

অনন্ত করুণাকর চিন্তামণি. শুক নারদাদি বলে এই শুনি।
কৃষ্ণকান্ত বলে সরে না আর বাণী, জানাইলাম মাত্র সন্ধানে॥

১৭

রাগিণী—আলাইয়া।

প্রেমভক্তি দেবী, সুবিশুদ্ধ ভক্ত বিমল হৃদয়-কমল-বাসিনী।
নিত্যসুখদাত্রী, সুপবিত্রকর্ত্রী, তুমি ভক্তজনের জীবন-রূপিণী॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, পঞ্চবর্ণ ফুলে, মানস অঞ্জলি করিয়ে সকলে।
দিয়ে তোমার ঐ চরণকমলে, নত-শির কত শত ভক্তশ্রেণী॥
চিদানন্দময়ী তুমি পরাৎপরা, যুগল কিশোর রসে তনু ভোরা।
কৃপাবতী সতী, জন্মমৃত্যুহরা, নিত্যরসামৃতধারা সুবর্ষিণী॥
কামগন্ধশূন্যা, মাধুর্য্যরসিকা, ত্রিজগতে কেবা আছে তবাধিকা।
রাধিকা গোবিন্দ চরণারবিন্দ, নিত্য চিন্ময় মকরন্দ প্রদর্শণী॥
ব্রজজন ভাবে, যে তোমারে ভাবে, তার প্রতি তোমার পূর্ণ কৃপা হবে।
নতুবা এ ভবে, কেবা তোমায় পাবে, কান্ত বলে চিন্তামণি স্বরূপিণী॥

১৮

রাগিণী—খট্ ভৈরবী।

যখন যে ভাবে রাখ প্রভু যারে, তখন সে ভাবে কালাতিপাত করে।
সুখ-দুঃখদাতা, তুমি জগৎ পিতা, মাতা ধাতা তোমায় কে জানিতে পারে॥
কখন কেউকে করাও প্রাসাদ আরোহণ, দিয়ে অসংখ্যাত রজত কাঞ্চন।
অকিঞ্চন-নাথ তার আকিঞ্চন, সুখের অবকাশ আর না রাখ অন্তরে॥
আবার কেউকে কর দীনের অধীন, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি চিরদিন।
মনে মনে গণে সেই সুখের দিন, ঝর ঝর নয়ন বারিধারা পড়ে॥
ভিক্ষায় যদি না হয় উদর পোষণ, চিন্তাগুণে করে শরীর-শোষণ।
কখন আসন মিলে, কখন ধরাসন, তুমি উপেক্ষিলে, কে রাখিবে তারে॥
নীল চিন্তামণি অনন্তস্বরূপে, বিহর কে তোমায় জানিবে কিরূপে।
এককালে ডুবাইলে ভবকূপে, কান্ত কয় বেদনা কত দিবে আর॥

১৯

নদীয়ায় ভাব কল্পতরু 'পরে ফুটেছে একটি ফুল।
কিবা ভুবনদুর্ল্লভ, সুজনবল্লভ, ব্রজধামে আছে সে তরুর মূল॥
ফুলের মধ্যদলে নব নীলঘন, বাহিরে গলিত কাঞ্চন-কিরণ।
কিবা সুদর্শন, যে করে দর্শন, মন প্রাণ কার না করে আকুল॥
সে হ'তে নদীয়ার ঘোচে নিরানন্দ, সতত বিরত পরম আনন্দ।
ফুল হতে পড়ে প্রেম মকরন্দ, গন্ধে উড়ে পড়ে ভক্ত অলিকুল॥
ফুলের সৌরভে করুণা-পবনে, এই দশদিক্ ব্যাপিল ভুবনে।
আকর্ষিল জগজ্জন-মনগণে, বিষয় স্নেহলতা করিল নির্ম্মূল॥
কান্ত বলে এ ফুলে রায় রামানন্দ, স্বরূপ দর্শনে বাড়িল আনন্দ।
তার বিনে আর কার ছিল এ নির্ব্বন্ধ, প্রেমময় হল গোদাবরী কূল॥

২০

রাগিণী—খট্।

আমার মত যদি কোন জনকে, কখন করুণা করেছ, শুনিতাম শ্রবণে।
যা' হউক, তা হ'লে কিঞ্চিৎ কৃপালেশ পাওয়ার ভরসা হইত সেই নিদর্শনে॥
কোন যুগে আমার মত কোন জন, ভবপাশ হ'তে কর নাই মোচন।
কি বলিব হে পদ্মপলাশলোচন, আমার বন্ধন ছেদন করিবে কেনে॥
এ বিষয় একেকালে তিলাঞ্জলি, দিয়ে আছি তবু লজ্জা খেয়ে বলি।
তোমাকে না বলে আর কাকে বলি চিরদোষী তোমার যুগল চরণে॥
হয় নাই হবে না আর তোমাতে সম্বন্ধ, কখনও যাবে না এ ভব নির্ব্বন্ধ।
যেরূপ কারাগারে রেখেছ গোবিন্দ, এমন ভাগ্যবান্ আর কে আছে ভুবনে॥
নিরুপম তুমি ভুবন-বিদিত, আমিও একাংশ তুলনা-রহিত।
তাই বুঝে যা' হয় কর হিতাহিত, কৃষ্ণকান্ত কয় স্মরণ কি হইবে মরণে॥

২১

রাগিণী—ভৈরবী।

কাদ্‌চে যারা, যাও সে পাড়া, গেলে জান্‌তে পাবে।
এ পাড়ায় থাকিলে কি ফল হবে॥

এ পাড়ায় যাদের বাস, তারা হয়েছে মায়ার দাস,
জাতি কুলমান বিদ্যামদে করে অহঙ্কার-প্রকাশ ;
বলে আমার মতগুলি মানি ধনী আর কে হবে ভবে ॥
অন্যের স্বতন্ত্র লক্ষণ, করে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
স্তম্ভ কম্প রোমাঞ্চাদি সাত্বিক-ভূষণ ।
পড়ে হরি বলে নয়নবারি, কৃষ্ণপ্রেম-অনুভবে ॥
সুখদুঃখে সমভাব, অতি নির্ম্মল স্বভাব,
সেই পাড়াতে গেলে হবে প্রেমরত্ন-লাভ।
সেই পাড়ায় যেয়ে রসিকজনার অনুগত হতে হবে ॥

[এই গানটিতে কবির ভণিতা নাই। অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, গানটি শিরোমণি-মহাশয়েরই রচনা]

রাজকুমার পাঠক মহাশয়েরও কাঁসাভোগে বাড়ী। ইনি শিরোমণি-মহাশয়ের শিষ্য ইঁহার একটি গান পাইয়াছি।

নিরন্তর অন্তরে চিন্ত তারে।
যারে ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে ॥
এ যে তব চিত্ত-ক্ষেত্র, করিয়ে অতি পবিত্র, গুরুদত্ত তত্ত্ববীজ বপন করবে।
দেখ প্রাণপণ করে, ভক্তিবারি সিঞ্চন করে, স্নেহ-সেচনী লয়ে' করে ॥
অঙ্কুর হইলে পরে, ছয় রিপুতে নষ্ট করে, বিবেক বৈরাগ্য দুই প্রহরী রাখবে।
হরিনামের দিয়ে বেড়া, হয়ে থাক জিতে মরা, তবে রিপু প্রবেশিতে নারে ॥
হবে বৃক্ষ মোক্ষময়, নিত্যজ্ঞান ফলোদয়,
ভাগ্যক্রমে সে ফল যদি পরিপক্ক হয়,
সে ফলে অনন্ত রস, কৃষ্ণসদা যাতে বশ,
পান করে রেখ যশে বাড়ে,
দ্বিজ রাজকুমার ভণে, এই দিন অবসানে,
জীবন কুসুম তাই বৃথাই গেলরে।
প্রেমময়ীর কৃপা হলে, সে কুসুম সদাই তুলে,
মনে প্রাণে দিতেক একই বারে ॥

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান সংখ্যা, সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা। ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসে দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অর্থাৎ পূর্ণ একখণ্ডের মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ভি, পি, তে লইলে ৩।০ তিন টাকা চারি আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ (complete in itself); এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। সুতরাং যে কোন একখণ্ড কিনিয়া পড়িলে তাহা বুঝিবার জন্য, অন্য কোন খণ্ডের বিশেষ আবশ্যক নাই।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

"অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে—"সুখ পাঠ্য","প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৮০ ও কাপড় বাঁধা ৸৵০। ভি পি ১৲ ও ১৵০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান – কৃষ্ণনগর—শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুকক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান

(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

BL 839. 3 Aug 1925

Birbhum 19.9.25

6.10.25

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—২

১৩৩২

শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীরাধা

২ হ্লাদিনী শক্তি ও তাহার বিলাস

৩ সতীশচন্দ্রের গান

৪ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

শান্তিনিকেতন প্রেস

এই প্রেসে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে পুস্তক, পত্রিকা, চেক, দাখিলা, চিঠি, রসিদ জমিদারী ও মিউনিসিপালিটীর নানাবিধ ফরম, ব্যবসায়ীদিগের ক্যাশ-মেমো ও মূল্য-তালিকা, বিবাহের প্রীতি-উপহার ও নিমন্ত্রণ-পত্র এবং ভিজিটিং কার্ড প্রভৃতি সকল রকম ছাপার কার্য্যই সত্বর ও সুন্দররূপে হইয়া থাকে। লাল, নীল, সোনালী ও রূপালী প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের ছাপাও হয়।

সর্ব্বসাধারণের কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রুফ দেখিবার ভার লওয়া এবং যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দর অন্যান্য প্রেস অপেক্ষা বেশি নহে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পোষ্ট—শান্তিনিকেতন,
ষ্টেশন—বোলপুর।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল
প্রেস-ম্যানেজার।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত

ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র

মূল্য আট আনা।

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন……"ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র" গ্রন্থখানি পড়িয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। লেখক ব্রহ্মদেশের যেটুকু দেখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সহজে, সরলভাবে লিখিতে পারিয়াছেন। পড়িলেই বুঝা যায়, এ গ্রন্থের সব কথাই বিশ্বাসযোগ্য—ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য বা অত্যুক্তি নাই।

প্রবাসী বলেন……ইহা বর্ণনায় বিচিত্র অথচ গ্রন্থকারের স্বকীয় ভাবব্যঞ্জনাতে সরস। ভাষা বিশুদ্ধ, আড়ম্বরশূন্য স্বচ্ছ ঝরঝরে। এই পুস্তকে বিবিধ বিষয়ের তেরখানি হাফটোন ছবি ইহার উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, নর-সমাজের বিচিত্রতা ও কৌতুক-জনক পার্থক্য জানা যায়। এই জাতীয় পুস্তক উপন্যাস অপেক্ষা অধিক প্রীতিকর…।

মর্ম্মবাণী

মূল্য চারি আনা।

ভারতবর্ষ বলেন……এই কবিতার বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি কারণ ইহাতে মামুলী ধরণের চাঁদের আলো, ফুলের বাসের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নাই। কবিতাগুলি উঁচু সুরে বাঁধা, ভগবদ্‌চরণে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি। ইহাই এ মর্ম্মবাণীর পরিচয়।

বীরভূমি বলেন……এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, ভাবও তেমনি পবিত্র। প্রত্যেক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদার ভাবের উদ্দীপক। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হওয়ার উপযুক্ত, পারিতোষিক পুস্তকরূপে বালক-বালিকাগণকে দিলে তাহারা আনন্দিত ও উপকৃত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীরাধা

ভূমিকা

রসিক-চূড়ামণি কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামী মহোদয়, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দ, প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এবং এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে কোটি কোটি নরনারী-কর্ত্তৃক গীত ও আস্বাদিত হইতেছে। প্রাকৃত বা লৌকিক কাব্য ও কবিতা, যে-প্রকারের হৃদয়ভাব লইয়া মানব আলোচনা ও উপভোগ করে, শ্রীজয়দেব কবির শ্রীগীতগোবিন্দ সে-প্রকারের হৃদয়ভাব লইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ আস্বাদন করেন না। তাঁহারা শ্রীগীতগোবিন্দের পূজা করেন, শ্রীভগবানের আরাধনা করিবার সময়, গঙ্গাস্নান করিয়া দেবমন্দিরে, পুণ্যতীর্থে, পুণ্যদিনে, শান্ত ও সমাহিত-হৃদয়ে শ্রীগীতগোবিন্দের পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রবণ ও মনন করিয়া থাকেন। শ্রীগীতগোবিন্দ পুণ্যগ্রন্থ, শাস্ত্রগ্রন্থ। বর্ত্তমান কালের অল্পসংখ্যক লোক ইহার বিপক্ষে নানারূপ আলোচনা করিলেও শ্রীগীতগোবিন্দের সমাদর হ্রাস হয় নাই এবং হ্রাস হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা বা আশঙ্কাও নাই।

দিল্লীর শেষ হিন্দু-নৃপতি পৃথ্বীরাজের সভাসদ্ চাঁদকবি তাঁহার 'চৌহানরাসৌ' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে, কবিবর শ্রীজয়দেব ও তাঁহার কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। সুতরাং শ্রীজয়দেব কবি, তাঁহার জীবিতকালেই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ, রচিত হইবামাত্রই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিবারের অধিপতি রাণা কুম্ভ, শ্রীগীতগোবিন্দের এক টীকা রচনা

করেন। সুতরাং সে সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীগীতগোবিন্দ ভক্তি-সহকারে আস্বাদিত হইত। মিথিলাপ্রদেশে ভগবতী-ভবেশতনয় কৃষ্ণদত্ত নামক একজন পণ্ডিত শ্রীগঙ্গা-নামক শ্রীগীতগোবিন্দের এক টীকা রচনা করেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারের কাল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অতীন্দ্রিয় ও শাশ্বত ভগবৎ-প্রেমানন্দরস স্বয়ং অস্বাদন করিয়া ভারতবাসী নর-নারীকে এক অনির্ব্বচনীয় ও অভিনব ভাবুকতায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি স্বয়ং যে সমুদয় গ্রন্থ আস্বাদন করিতেন, শ্রীগীতগোবিন্দ তাঁহার মধ্যে একখানি প্রধানগ্রন্থ। সুতরাং এই গ্রন্থের আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, এই গ্রন্থের অনেক শব্দ ও অনেক চিত্র, এই প্রাকৃত জগতের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার ভাব ও রস প্রাকৃত নহে, তাহা চিন্ময় ও পরমহংসগণের সেব্য।

'হৃদয়ের জাগরণ' বলিয়া একটা পদার্থ বা অবস্থা আছে। এই অবস্থা নানারূপ। আমরা সকলেই কখন না কখন এই প্রকারের অবস্থা অনুভব করি। সাত্বিক জাগরণ বলিয়া একটা অবস্থা যে আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সাধু-সঙ্গের দ্বারা, শাস্ত্রপাঠের দ্বারা, সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা, ধ্যান-ধারণা ও জপ-তপের দ্বারা মানুষ তাহার হৃদয়ের এই সাত্বিক জাগরণ অন্বেষণ করিতেছে। যাঁহারা এই সাত্বিক জাগরণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধু। এই জাগরণের পর এমন একটি অবস্থা হয়, যাহা গুণময় হইয়াও গুণাতীত। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যাহা কিছু আছে, সমুদয়েরই অনুভব হয়। সেখানে সকলই সুন্দর, সকলই মধুর, কিন্তু নিজের কোনরূপ ভোগবাসনা জাগে না। সকলই পবিত্র, আর সকলেরই মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয়। এক ভগবান্, তিনিই সকল রসের আস্বাদক, সকল সৌন্দর্য্যের ভোক্তা, একমাত্র তাঁহা-রই কামনা সত্য, তিনি সত্যকাম, তিনি সর্ব্বকাম; তিনি আপ্তকাম বা পূর্ণকাম হইয়াও ভোগরত; ইহারই নাম আত্মারামের রমণ। মানবাত্মার এই প্রকারের জাগরিত অবস্থাকে বেদে উভয়তঃ-প্রাজ্ঞ অবস্থা বলে। এই অবস্থা অনুমান নহে,—কল্পনা নহে। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যেই এই প্রকারের অবস্থা-প্রাপ্ত বিশুদ্ধাত্মা নরনারীর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীগীতগোবিন্দের পদাবলী পরমানন্দে আস্বাদন করিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে যাঁহার সন্দেহ আছে, তাঁহার আপাততঃ কোন আশা নাই। শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু যখন আস্বাদন করিয়াছেন, তখন আমাদের উচিত, আমরা পবিত্র হৃদয়ে এই শ্রীগ্রন্থের আস্বাদন করিব, তাড়াতাড়ি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিব না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থায় বা তাহার অল্পদিন পরে শ্রীজয়দেব-সম্বন্ধে নিম্নের পদটি রচিত হয়। এই পদটি ভক্ত-সমাজে সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত।

জয় জয়, জয়দেব দয়াময়, পিরিতি-রতন-খনি।
পরম পণ্ডিত, পূজ্য, গুণগণ মণ্ডিত, চতুরমণি॥
মধুর মূরতি, অতি অনুপম, বিচিত্র-চরিত-রীতি।
রসিক শেখর, সুখময় পদ্মাবতীর পরাণ-পতি॥
বিপ্রবংশ অবতংস, কবিভূপ ভুবনে কে সম তার।
প্রেমরসে মহামত্ত সদা কেন্দুবিল্বেতে বসতি যার॥
শ্রীরাধামাধব-সেবা সুবিগ্রহ কেবা না হেরিয়া ভুলে।
সেরূপ অমিয়া, পিয়া দিবানিশি, ভাসয়ে আনন্দ জলে॥
পদ্মাবতীসহ, গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষ ঝুরে, শুনিয়া গন্ধর্ব্ব কিন্নর মরয়ে লাজে॥
যার বিরচিত, শ্রীগীতগোবিন্দ, গ্রন্থ সুকৌশল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে, "দেহিপদপল্লব" আদি বর্ণিলেন যাতে॥
প্রেমে মাখি রাখিলেন, যেন সব বর্ণ সুঅদ্ভুত ভাতি।
নীলাচল চন্দ্র, জগন্নাথ যাহা, শুনয়ে আনন্দে মাতি॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন, গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে অবতরি রঙ্গে।
যার কাব্যরস আস্বাদে স্বরূপ রায় রামানন্দ সঙ্গে॥
পরদুখে দুখী, পদ্মাবতী নাথ-পদে যে করয়ে আশ।
যুগল-পিরিতি, রসে সে ভাসয়ে, ভণে নরহরি দাস॥

এই সুপরিচিত সঙ্গীতে উল্লিখিত কয়েকটি কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে ও স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রীজয়দেব শ্রীরাধামাধব-বিগ্রহের সেবা করি-তেন, আর শ্রীরাধামাধবের রূপামৃত পান করিয়া সকল সময়েই বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। তিনি গান করিতেন, কিন্তু একাকী নহে,—সস্ত্রীক। প্রেয়সী পদ্মাবতীর সহিত একত্রে বসিয়া গান করা, তাঁহার শ্রীরাধামাধবের আরাধনার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। তিনি কেবল যে কবি, পণ্ডিত, দয়ালু ও সদ্‌গুণমণ্ডিত ছিলেন, তাহাই নহে, তিনি চতুর ছিলেন,

'চতুর-মণি' ছিলেন। এই চতুরতা কি? বলা বাহুল্য, ইহা সাংসারিক চতুরতা নহে। 'চতুর' এই কথাটি অন্যান্য স্থানেও ব্যবহৃত হইয়াছে, কাজেই ইহার অর্থ-নির্দ্ধারণে কোন-রূপ কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন নাই।

এই মানবজীবন রহস্যময়। ইহা একটি ভীষণ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইবে। আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, সেগুলি স্বাভাবিক ও অতিশয় প্রবল। সেগুলিকে ধ্বংশ করিয়া যিনি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া আত্মলাভ করিতে চাহেন, তিনি সাধু হইতে পারেন, কিন্তু তিনি চতুর নহেন। স্বাভাবিকী বৃত্তি-গুলিরই সাহায্যে মানুষ তাহাদের বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া জয়লাভ করিতে পারে। যিনি এই পথের পথিক, এই সাধনার সাধক, তিনি বীর, তিনিই চতুর। শ্রীজয়দেব 'চতুর-মণি'। শ্রীজয়দেবের সাধন-প্রণালী কিঞ্চিৎ জানা দরকার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে পূজারী গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত পণ্ডিত গীতগোবি-ন্দের টীকা রচনা করেন। এই টীকাখানিই শেষ টীকা। পূজারী গোস্বামী পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাগুলি আলোচনা করিয়া তাঁহার টীকা রচনা করিয়াছেন। আমরা পূজনীয় পূজারী গোস্বামী মহোদয়ের টীকা অবলম্বন করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমি বা আমরা শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করিলে আমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত, পূর্ব্ব হইতে এই গ্রন্থ কিভাবে ব্যাখ্যাত ও আস্বাদিত হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই গ্রন্থ কিভাবে বুঝিতেন। অতীতের প্রতি এই প্রকারের একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই শ্রদ্ধার অভাব অনেক বিষয়ে আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। ইহার অর্থ এমন নহে যে, আমাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার থাকিবে না; বা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিব তাহা বলিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না। সে অধিকার অক্ষুণ্ণভাবে সকল বিষয়েই বজায় থাকা চাই। কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইলে সাধনা চাই, সংযম চাই, সহিষ্ণুতা চাই ও পরিশ্রম চাই।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক বা মঙ্গলাচরণ

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

মেঘসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত ও স্নিগ্ধ আকাশতল। বনদেশসমূহ গাঢ় নীলবর্ণ, যেন নিবিড় অন্ধকারময় তমাল-বৃক্ষসমূহের দ্বারা। পূর্ব্ব রাত্রিতে তোমায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে ছিলেন বলিয়া ভীত হইয়াছেন, এই শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই তাঁহার নিকট যাও। এই প্রকারের আনন্দকর সখী-বচনানুসারে পথসমীপবর্ত্তী কুঞ্জের অভিমুখে প্রচলিত রাধামাধবের যমুনাতটে নির্জ্জন বিহারসমূহ জয়যুক্ত হউক।

ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ। এই অর্থই ভক্তগণের সম্মত অর্থ। এই অর্থে বিশেষ প্রকারের কোনরূপ অস্বাভাবিকতাও নাই। এই অর্থ ছাড়া অন্যরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এক উপাখ্যান আছে। একদিন মহারাজ নন্দ, শিশু শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। তাহার পর প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রগর্জ্জন। শিশু কৃষ্ণ ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মায়া। নন্দ মহারাজ চিন্তাকুল ও বিব্রত। এমন সময়ে শ্রীরাধিকা তথায় উপস্থিত। শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া নন্দ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এ সময়ে এস্থানে শ্রীরাধার আগমন একেবারেই অসম্ভব। মহারাজ নন্দ ইহার পূর্ব্বে গর্গাচার্য্যের নিকট শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব শুনিয়াছিলেন। তিনি এই সঙ্কটের সময় শ্রীরাধাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ও নতমস্তকে শ্রীরাধাকে বলিলেন,—"দেবি, গর্গমুনির নিকট আপনার মহিমা জানিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী অপেক্ষাও হরির প্রিয়পাত্রী। গোকুলবিহারী এই কৃষ্ণই হরি। আপনি আপনার প্রাণনাথ হরিকে গ্রহণ করুন।" গোপরাজ নন্দ রোদনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মণিময় রাসমণ্ডল নির্ম্মিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ, এখন আর শিশু নহেন। তিনি কিশোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া স্তবপাঠ করিলেন। তাহার পর হোমানল প্রজ্বলিত হইল। ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদবিধিমতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রাধাকে

কৃষ্ণের বামে বসাইলেন, এবং পিতা যেমন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, ঠিক্ সেই প্রকারে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যথাবিধি বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার শিশু হইলেন, শ্রীরাধিকা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়া যশোদাকে দিলেন। ইহার পর হইতে শ্রীরাধা নিজের ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসমণ্ডলে বিহার করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই উপাখ্যান অনুসারে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অনেকে সেই প্রকারেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনেকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপাখ্যানের সহিত গীতগোবিন্দের এই শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উপাখ্যানে রসাভাসদোষ আছে। অলৌকিকের সাহায্যে এই দোষকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। পৌরাণিকের দোষ নাই, কারণ পৌরাণিক কল্পভেদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথা ভারতবর্ষেরই নানা প্রদেশে নানা সম্প্রদায়ে নানা আকারে প্রচলিত ছিল। এই উপাখ্যান-সমূহের মর্ম্মকথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ ও শ্রীরাধা পরমাপ্রকৃতি, তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়া লীলা করিয়াছেন। এই লীলা কিরূপ, কি প্রকারের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া এই নিত্য ও মধুর প্রেমলীলা প্রকট হইয়াছে, তাহাই বা কে জানে? ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, আর সেই লীলা নানা আকারে বর্ণনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে কত প্রকারের কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারে না। যাঁহারা ভক্ত ও উপাসক, তাঁহারাও নানাভাবে বা নানাপ্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন। কেহ স্মৃতিশাস্ত্রের সুনির্দ্ধারিত বিধি-ব্যবস্থানুসারে বাহ্যপূজা করিয়াছেন, কেহ বা অনুরাগের পথে বিশুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, আবার কেহ স্বাধিষ্ঠান চক্রে বা সহস্রারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্নামার্গে উত্তোলিত করিয়া প্রাণায়ামাদির দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার যে নানাপথ ও নানাপথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। এই সমুদয় মতের ভিতর এমন মতও আছে, যাহাকে আমরা ঠিক্ সাধু মত বলিতে পারিব না। আমরা সেই মতকে সাধু মত বলি বা না বলি, সেই মত যে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর সেই মত যখন এক সময়ে

সম্প্রদায়-বিশেষে প্রচলিত ছিল, তখন তাহার একটা মূল্য আছে এবং তাহার আলোচনায় লাভ আছে। এই প্রকারের বহু কথা, বহু বহু পুরাণের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় গাম্ভীর্য্যের সহিত সেই কথা বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ উপাসনার নানারূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের আরধানার এমন একটি পন্থা নির্দ্ধারিত করিলেন, যাহা সকলেই বুঝিলেন ও সানন্দে স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত, তাঁহার অনুবর্ত্তী গোস্বামী-গণ বিবিধ গ্রন্থে প্রচারিত করিলেন। অবশ্য তাহার পর গোস্বামীদের শিক্ষা লইয়া মতভেদ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই, ইহাই স্বাভাবিক। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা কাহাকেও উপেক্ষা করিবেন না। ইহা শ্রীভগবানের লীলার বৈচিত্র্য।

এইবার আলোচ্য বিষয়ে আসা যাউক। শ্রীজয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে শ্লোক লিখিয়াছেন কি না? উত্তর,—কেমন করিয়া বলিব? তবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি কবি, গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ উপলক্ষে তিনি এমন একটি শ্লোক লিখিলেন, যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। যাহারা বাহিরের প্রচলিত উপাখ্যান লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা মনে করিল, কবি আমাদের কথাই বলিলেন; আর যাহারা রসভাবনাচতুর, তাঁহারা বুঝিলেন ভিতরে রহস্য থাকিল; কাব্যশিল্পীর পক্ষে এ প্রকারের চেষ্টা অসম্ভব নহে। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি এই ভাবেই গ্রহণ করা আবশ্যক। একালের বাজার-চলতি পেশাদার সমালোচনা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

এই প্রথম শ্লোকটি সম্বন্ধে আরও কিছু চিন্তা করিবার আছে। "যমুনাকূলে শ্রীরাধা-মাধবের নির্জ্জন ক্রীড়াসমূহ জয়যুক্ত হউন"—এই প্রকার মঙ্গলাচরণে কবি আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশ এই তিন প্রকারের মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। 'জয়' এই কথায় নমস্কার করিতেছেন। শ্রীরাধামাধবের নিভৃত প্রেমলীলা জয়যুক্ত হইলেই জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, অতএব উহা আশীর্ব্বাদ, আর 'শ্রীরাধামাধব' এই কথার দ্বারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সেই চরম ও পরম বস্তুদ্বয়, সেই যুগলকিশোর নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।

কবি জয়দেব শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, এই তত্ত্ব বা বস্তুদ্বয়কে যে চরম ও পরমতত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মঙ্গলাচরণ শ্লোকই

তাহার প্রমাণ। অন্যান্য শ্লোকের দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ; শ্রীরাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী এবং শ্রীভগবানের প্রেয়সীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌতমীয় তন্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া টীকাকার ইহা দেখাইয়াছেন। শ্রীভগবানের এই লীলাবিলাস বা কেলি মায়িক নহে, ইহা শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং শ্রীরাধামাধবের এই কেলিসমূহ সর্ব্বোত্তম। ঋক্-পরিশিষ্টে আছে—

রাধয়া মাধবো দোবো মাধবেনৈব রাধিকা।

পূজারী গোস্বামী মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও তাঁহাদের প্রেম-লীলা-সম্বন্ধে এই ধারণা লইয়া শ্রীগীতগোবিন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালের সমালোচক বলিবেন, শ্রীজয়দেবেরও কি এইরূপ ধারণা ছিল, শ্রীজয়দেবের যে এইরূপ ধারণা ছিল না, তাহার যখন কোন প্রমাণ নাই, আর শ্রীগীতগোবিন্দের ব্যাখ্যার দ্বারা যখন এই ধারণাই সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে, তখন তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল, এইরূপ মনে করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌতমীয়তন্ত্র শ্রীজয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ কি না, এ প্রকারের প্রশ্নও উঠিয়াছে। এই দুই গ্রন্থ বা এই দুই গ্রন্থের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত যে শ্রীজয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, তাহারও যখন কোন প্রমাণ নাই, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে শ্রীরাধামাধবের উপাসক শ্রীজয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌতমীয়-তন্ত্রের মতই পোষণ করিতেন। পূজারী গোস্বামীর টীকায় ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে ঋক্-পরিশিষ্টের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ মত,—বেদে বা বৈদিক সাহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম গন্ধও নাই। ইহার উত্তর,—সমগ্র বৈদিক সাহিত্য যখন পাওয়া যায় না, তখন এ প্রকারের কথা দৃঢ়তার সহিত বলা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নহে।

১। প্রাথমিক দুইটি স্তব

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথমেই দুইটি স্তব আছে। প্রথমটি দশাবতার স্তোত্র আর দ্বিতীয়টির প্রথম কথা 'শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল'। এই স্তব দুইটি অনেকেই জানেন। পূজারী গোস্বামী এই স্তব দুইটির ভিতরের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথম মৎস্যাবতার। নৌকা যেমন জলে পতিত কোন বস্তুকে রক্ষা করে, সেইরূপ

স্বেচ্ছায় মৎস্যশরীর ধারণ করিয়া প্রলয়কালীন একীভূত সমুদ্রজলে মগ্ন বেদকে অখেদে উদ্ধার করিলেন। হে কেশিদৈত্যনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ, তুমি জয়যুক্ত হও, তুমি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত হও। হে জগদীশ, হে হরি, ভক্তজনের অশেষপ্রকার ক্লেশ-হরণকারি, তুমি জয়যুক্ত হও। ইহা শ্রীভগবানের মৎস্যাবতার। পূজারী গোস্বামী মহোদয় বলিলেন—অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং জ্ঞাপিতং—মীন অবতার বীভৎস রসের অধিষ্ঠাতা। কূর্ম্ম অবতার অদ্ভুত রসের, বরাহ ভয়ানক রসের, শ্রীনৃসিংহ বৎসল রসের, বামন সখ্য রসের, পরশুরাম রৌদ্র রসের, শ্রীরাম করুণ রসের, শ্রীহলধর হাস্য রসের, বুদ্ধদেব শান্ত রসের, আর কল্কি বীর রসের অধিষ্ঠাতা। এই প্রকারে এক এক অবতারকে এক এক রসের অধিষ্ঠাতা-রূপে বর্ণনা করিয়া, সর্ব্বশেষে এই সমুদয় অবতারের যিনি অবতারী, সেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বরসত্ব বর্ণনা করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবটিতে প্রথমে বলিলেন—হে দেব, হে হরে, হে কমলার কুচমণ্ডলবিহারী, কুণ্ডল-ভূষণধারী, ললিত বনমালাধর, আপনি জয়যুক্ত হউন। এই শ্লোকে ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বর্ণিত হইল।

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন—হে দেব, হে হরে, হে সূর্য্যমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপ, হে ভববন্ধন-খণ্ডনকারি, হে মুনিজনের মানস-সরোবরবিহারী হংস, আপনি জয়যুক্ত হউন। এই শ্লোকে ধীরশান্ত নায়কের গুণ কথিত হইল।

সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদি গুণোপেতঃ ধীরশান্ত উদাহৃতঃ॥

তৃতীয় শ্লোক। হে দেব, হে হরে, হে জনগণের রঞ্জনকারি কালিয় বিষধরের দর্পভঞ্জন, হে যদুকুলকমলের সূর্য্য, জয়যুক্ত হউন। এইগুলি ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ।

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥

চতুর্থ শ্লোক। হে দেব, হে হরে, হে মধুসূদন, মুরারি, গরুড়বাহন, নরকান্তকারি, দেবগণের ক্রীড়াবিহারের নিদান, জয়যুক্ত হউন। ইহা ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ।

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥

পঞ্চম শ্লোক। হে দেব, হে হরে, আপনার সুবিশাল নেত্র, কমলপত্রের ন্যায় মনোহর, হে ভবদুঃখমোচন, আপনি ভিভুবনের উৎপত্তিস্থান, জয়যুক্ত হউন। ইহাও ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ।

ষষ্ঠ শ্লোক। হে দেব, হে হরে, শ্রীরামচন্দ্র অবতারে আপনার নীলতনু জনক-সূতার স্বর্ণাঙ্গের দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। হে দূষণান্তকারি, দশানন-দমন জয়যুক্ত হউন। ইহাও ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ।

সপ্তম শ্লোক। হে দেব, হে হরে, হে মন্দরপর্ব্বতধারি, হে নবজলধর সুন্দরকান্তি, কমলার বদনচন্দ্রের চকোর, জয়যুক্ত হউন। এই শ্লোকে ধীরললিত নায়কের গুণ পুনর্ব্বার বর্ণিত হইল। ইহার কারণ ধীরললিত নায়কই মুখ্য। এই সাতটি শ্লোকে দেখাইলেন—নায়কের সমুদয় গুণগুলি অন্যান্য অবতারে আংশিকরূপে বিদ্যমান, শ্রীকৃষ্ণে সেগুলি পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান।

অষ্টম শ্লোকে বলিলেন, আমরা আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি; অবধান করুন, আমরা প্রণত, আমাদের কুশল করুন। আপনার লীলা অনুভব করিবার সামর্থ্য দান করুন। আপনার প্রসাদ-ব্যতীত কেহই আপনার লীলা অনুভব করিতে পারে না। সমগ্র স্তবটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রিত কমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিত ললিত বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥১
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন, ভবখণ্ডন, মুনিজনমানসহংস।২
কালিয়-বিষধরগঞ্জন, জনরঞ্জন, যদুকুলনলিন দিনেশ॥৩
মধুমুর নরকবিনাশন, গরুড়াসন, সুরকুলকেলিনিদান॥৪
অমলকমলদললোচন, ভবমোচন, ত্রিভুবনভবননিধান॥৫
জনকসুতাকৃতভূষণ, জিতদূষণ, সমরশমিতদশকণ্ঠ॥৬
অভিনবজলধরসুন্দর, ধৃতমন্দর, শ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥৭
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু॥৮
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জল গীতি।
জয় জয় দেব হরে॥৯

শ্রীগীতগোবিন্দ নামক এই প্রবন্ধ শ্রীরাধামাধবের বিজনকেলি-বর্ণনময়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ, আর পরিপূর্ণ নায়ক ও একমাত্র নায়ক। শ্রীরাধিকা পরিপূর্ণ সর্ব্বগুণময়ী নায়িকার শিরোমণি ও একমাত্র নায়িকা। তাঁহাদের কেলি, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, অতএব মায়িক নহে, চিন্ময়;—ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে উহার অভিনয় হইলেও উহা স্বরূপতঃ অতীন্দ্রিয়। প্রারম্ভে টীকাকার এই কথাগুলি বুঝাইয়াছেন। এইবার আমরা শ্রীরাধাকথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

২। সামোদ দামোদর।

শ্রীগীতগোবিন্দ মহাবাক্য। প্রথম সর্গের নাম—সামোদ দামোদর। এই সর্গ চারিটি সন্দর্ভে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্দর্ভের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম সন্দর্ভ দশাবতার স্তোত্র, আর দ্বিতীয় সন্দর্ভ 'শ্রিতকমলাকুচ' স্তোত্র। তৃতীয় সন্দর্ভে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, সে ঘটনা কখন ঘটিয়াছিল, প্রথমেই তাহা আলোচ্য। পূজারি গোস্বামী মহাশয় দুইটি মত ব্যক্ত করিয়াছেন। শারদীয় মহারাস হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধিকার রূপের ও গুণের তুলনা নাই। তাহার সমান নাই, তাহা অপেক্ষা অধিকও নাই। শ্রীরাধার রূপ ও গুণ অসমানোর্দ্ধ। শারদীয় পূর্ণিমারজনীতে প্রথম রাসমহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুভব করিয়াছেন। এখন, আর কাহারও অনুরাগ শ্রীরাধার অনুরাগের ন্যায় হইতে পারে কিনা, তাহাই বুঝিবার জন্য কয়েকদিন পরে অন্যরূপ লীলা করিলেন। শ্রীজয়দেব প্রারম্ভে সেই লীলা বর্ণনা করিতেছেন। আর একমত। কংসের আদেশে অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে লইয়া গিয়াছেন। ইহা যোগমায়ারই ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, কিন্তু সেখানে ব্রজগোপীদের প্রেম নাই, সে রূপ নাই, সে গুণ নাই। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজকন্যা বিবাহ করিলেন, নরকাসুর বধ করিয়া গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ ও নরকন্যা ষোলহাজার একশত বিবাহ করিলেন, কিন্তু ব্রজগোপীর তুল্য আর কিছুই পাইলেন না। তাহার পর, শ্রীকৃষ্ণ আবার ব্রজে আসিলেন। দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিলেন, একথা পাদ্মোত্তর-খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজে ফিরিয়া আসার পর যে লীলা হয়, শ্রীজয়দেব তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। লীলা যখন নিত্য, তখন এই দুই প্রকারের মতের মধ্যে যে কোন মত

বা উভয় মতই লওয়া যাইতে পারে। আমরা লীলারস আস্বাদনের সময় ভাবুক হইব, অর্থাৎ ভাবের দ্বারা আমাদের হৃদয় জাগরিত করিতে চেষ্টা করিব। হৃদয় যাহাদের ভাবের দ্বারা জাগরিত হয় না, ভাবোন্মত্ততা যাহাদের প্রকৃতিতে নাই, জয়দেবের আলোচনা তাহাদের পক্ষে না করাই ভাল।

শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে দর্শন করেন কে? তত্ত্ববিৎ বলিবেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে দর্শন করেন। ভক্ত ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু ভক্তের ভাষা অন্যরূপ। তিনি বলেন—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দরত্ব সফল হয়, নতুবা শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিষ্ফল। আর—

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

শ্রীরাধার দর্শন ও আস্বাদন বিরহের সময়েই পরমোৎকর্ষ লাভ করে। বাহিরের সৌন্দর্য্য, বসন্ত, মলয়, কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি উদ্দীপন। আজ বসন্ত, বিশ্বসৌন্দর্য্য তাহার পরিপূর্ণতায় আসিয়াছে। বাহিরে বসন্তশোভা, শ্রীরাধা বিরহে কাতরা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁহার অতিশয় উৎকণ্ঠা হইয়াছে। শ্রীরাধার দেহ বসন্তের ফুলের ন্যায়, তিনি কাতর-চিত্তে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন। দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে এক সখী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন।

বসন্ত আসিয়াছে। কোমল মলয়-পবন ললিত লবঙ্গলতাকে আদর করিয়া বার বার আলিঙ্গন করিতেছে। ভ্রমরের গুন্ গুন্ ধ্বনিতে আর কোকিলের কুহুস্বরে কুঞ্জকুটির পরিপূর্ণ। হরি কোন ভাগ্যবতীর সহিত বিহার করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন।

এইরূপ বর্ণনায় শ্রীরাধার ভাব উদ্দীপিত হইল। তাহার পর শ্রীরাধাকে স্থানান্তরে আনাইয়া ঐ সখী ও শ্রীরাধা অনতিদূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। তাঁহারা উভয়ে অন্তরালে দাঁড়াইয়া আছেন, সখী শ্রীরাধাকে দেখাইতেছেন, আর বলিতেছেন—

এই বৃন্দাবনবিপিনে শ্রীকৃষ্ণ বহুতর গোপাঙ্গনার আলিঙ্গন-জাত আবেগে সাতিশয় স্ফূর্ত্তিশালী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নীলতনু চন্দনে চর্চ্চিত, পীতবসনে ও বনমালায় ভূষিত। মণিময় কুণ্ডলযুগল কেলিভরে বিচলিত, মুখে হাসি, গণ্ডযুগলের শোভার সীমা নাই। বিলাসিনি, দেখ, কেলিপরায়ণা ও মুগ্ধা বধূসমূহের সহিত হরি ক্রীড়া

করিতেছেন। এই চন্দন ও বনমালা তুমিই তাঁহাকে দিয়াছ, আর তাঁহার বস্ত্রের বর্ণ, তোমারই বর্ণ।

বিলাস-রসোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ যেন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস। তাঁহার অঙ্গসমূহ ইন্দীবর-শ্রেণী অপেক্ষাও শ্যামল ও কোমল; কন্দর্পের মহোৎসব। শ্রীরাধা দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌রূপ আনন্দে পরিপূর্ণ ও বিলাসরত।

৩। অক্লেশ কেশব

শ্রীরাধা যে কেবল সখীর কথা শুনিলেন, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের এই সাধারণ বিহার, বেশ ভাল করিয়া দর্শন করিলেন। ঈর্ষার উদয় হইল, ভাবিলেন আমি কি সকলের সঙ্গে সমান? আর দেখিতে পারিলেন না, অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধা দীনা। লতাকুঞ্জে নির্জ্জনে সখীকে বলিতেছেন—

সখি, শ্রীকৃষ্ণ আমায় উপেক্ষা করিয়া আমারই সম্মুখে বিহার করিতেছেন। তাঁহার অধরের অমৃতরাশি উথলিয়া উঠিয়া বাঁশির মোহন ধ্বনিতে চারিদিকে উৎসারিত হইতেছে। তাঁহার কুটিল কটাক্ষ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত, শিরোভূষণ চঞ্চল, বিলোল কুণ্ডল-যুগলে গণ্ডস্থল শোভিত। কিন্তু, একি, আমি ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেছি না। আমার সেই শারদীয় রাস মনে পড়িতেছে, আর মনে পড়িতেছে, সেই বিলাসপরায়ণ, পরিহাসরত হরি।

শ্রীরাধা এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বানুভূত রূপ ও গুণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অন্যের সহিত বিহার করিতেছেন, কিন্তু তুমি কেবল তাঁহাকেই স্মরণ করিতেছ! সখীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, সখি সত্য কথাই বলিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অন্যান্য যুবতীর সহিত পরম অনুরাগে বিহার করিতেছেন। আমার অনুরাগ বিফল, জানি। কিন্তু কি করি আমার আসক্তি প্রবল, ইহা নিবারণ করা যায় না। তাঁহার গুণ সর্ব্বদাই ধ্যান করিতেছি, তাঁহার প্রতি কখনও ক্রোধ করি নাই, তাঁহার প্রতি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট আছি। তাঁহার অণুমাত্র দোষও আমার মনে স্থান পায় না। আমি নিরুপায়।

এই কথা বলার পর শ্রীরাধা নিজের অন্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—সখি, সেই কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণ। আমি নির্জ্জন নিকুঞ্জগৃহে তাঁহার বিরহে ছট্‌ফট্ করিতেছি, আর তিনি গোপনে লুকাইয়া আমার চিত্তবৃত্তির বিকলতা দর্শন করিতেছেন! আমি তাঁহাকে না দেখিয়া চকিতভাবে দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, আর তিনি মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন, সেই উদার কেশিমথনকে আমার সহিত মিলিত করাও। যিনি প্রথম মিলন-সময়ে আমাকে একান্ত লজ্জিতা দেখিয়া আমার লজ্জা দূর করিবার জন্য নানারূপ অনুনয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া আমি অল্পে অল্পে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই কেশিমথনের সহিত আমাকে মিলিত করাও। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আমার মন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এই ঈষন্মঞ্জুরিত নবীন অশোকলতিকার প্রফুল্ল শোভা দুঃখের হেতু হইয়াছে, সরোবরের নিকটবর্ত্তী উপবন-সমূহ হইতে প্রবাহিত মন্দ সমীরণ সন্তাপকর হইয়াছে, রসালতরুর সুন্দর অগ্রভাগে মুকুলাবলী, আর সেই মুকুল ভৃঙ্গীরবে নিনাদিত, উহা আমাকে কোনরূপ সুখদান করিতেছে না।

৪। মুগ্ধ মধুসূদন

প্রথম দুই সর্গে, শ্রীরাধামাধবের উৎকর্ষ বর্ণনার পর শ্রীরাধিকার উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে, এখন তৃতীয় সর্গে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িয়াছে, তিনি অন্যান্য ব্রজনারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেনই বা শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিলাম, কি করিয়াই বা মিলন হইবে, এই সমুদয় চিন্তায় অনুতপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনাতীরসমীপবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে বিষণ্ণমনে বসিয়া খেদ করিতে লাগিলেন—

আমি ব্রজাঙ্গনাগণে পরিবৃত ছিলাম। শ্রীরাধা অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার প্রেমের ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু আমি অপরাধী, তাই ভয় পাইলাম, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না, শ্রীমতী ভাবিলেন আমি অনাদর করিলাম, এই ভাবিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বিরহ-বিধুরা রাধা কি করিবেন, মিলনের কি উপায় করিবেন। প্রিয়সখীর নিকটে আমাকে নির্দ্দয় বলিবেন। শ্রীরাধার বিরহে আমার ধন, জন, জীবন, নিকেতন সকলি অসার বলিয়া মনে হইতেছে। হে সুন্দরি, আমায়

ক্ষমা কর, এমন অপরাধ আর করিব না, আমাকে দর্শন দাও। তাহার পর মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি হর নহি, কেন বাণ বর্ষণ করিতেছ, নিবৃত্ত হও। আমি দারুণ বিরহে প্রিয়াকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার সুবিমল স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছি। তাঁহার বদনকমলের মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ করিতেছি।

৫। স্নিগ্ধ মধুসূদন

শ্রীরাধার বিরহে আকুল শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে অশোককুঞ্জে বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধার প্রিয়সখী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন;—

হে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা তোমার বিরহে কাতর হইয়া তোমারই ধ্যানে মগ্না হইয়াছেন। চন্দন ও চন্দ্রকিরণে তাঁহার অঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি তাহাদের নিন্দা করিতেছেন, মলয় বাতাসকে গরল বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। কুসুমশয্যা শরশয্যা হইয়াছে। পল্লবশয্যাকে প্রদীপ্ত হুতাশন মনে করিতেছেন। তিনি তোমার বিরহে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন, তুমি আসিয়া তাঁহাকে ঔষধ-রসামৃত প্রদান কর।

৬। সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আর্ত্তি শুনিলেন, শুনিয়া নিতান্তই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু তিনি যে স্বয়ং অপরাধী, কাজেই অতিশয় ভয় হইতেছে, ভাবিতেছেন নিজে কি করিয়া যাই! কাজেই সখীর নিকট নিজের দুঃখ নিবেদন করিলেন, অনেক অনুনয় করিলেন, ভাবিলেন ইহাতে শ্রীরাধার কোপ প্রশমিত হইবে। সখী শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া শ্রীরাধার নিকট গেলেন ও শ্রীরাধাকে বলিতে লাগিলেন—

সখি, বসন্তকাল মলয় সমীর বহিয়া যাইতেছে, আর চিত্তমধ্যে নব নব কামনা জাগিয়া উঠিতেছে। কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইতেছে, আর বিরহীজনের হৃদয় দলিত হইতেছে। রাধে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিরহে খেদ করিতেছেন। তিনি চাঁদের আলোতে পুড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন, গাছ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার হৃদয় যেন মদনশরে বিদ্ধ হইতেছে। মধুকর ঝঙ্কার শুনিয়া হাত দিয়া কাণ রুদ্ধ করিতেছেন। প্রতি নিশিতেই আশা করিতেছেন, তোমার সহিত মিলন হইবে, কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হইতেছে

না। শয়ন-ভবন ছাড়িয়াছেন, অরণ্যে বাস করিতেছেন, ভূমিতে বিলুণ্ঠিত, তোমার নাম বারবার উচ্চারণ করিয়া তোমাকে নির্দ্দয় বলিয়া বহুতর বিলাপ করিতেছেন। তোমার সহিত পূর্ব্বে যেখানে মিলন হইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া তিনি তোমাকে ধ্যান করিতেছেন, আর তুমি পূর্ব্বে যে সকল মধুর কথা বলিয়াছিলে, সেই সব কথা মন্ত্রের ন্যায় জপ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ এখন সুমন্দ মলয় মারুতসেবিত যমুনাতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তুমি সেই হৃদয়বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চল, আর বিলম্ব করিও না, তুমি শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারিবে না, এইজন্য বলিতেছি, সত্বর হও। তোমারই নাম ধরিয়া বাঁশি বাজাইতেছেন, তোমার অঙ্গস্পৃষ্ট ধূলিকণা বাতাসে বাহিত হইয়া অঙ্গে লাগিলে নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। গাছের পাতা কাঁপিলে ভাবিতেছেন, তুমি আসিতেছ, উল্লসিত হৃদয়ে শশব্যস্তে শয্যা নির্ম্মাণ করিতেছেন, চকিত নয়নে তোমার পথের প্রতি চাহিতেছেন। নূপুর পরিহার করিয়া, নীলবসন পরিধান করিয়া নিকুঞ্জগৃহে অগ্রসর হও। শ্রীকৃষ্ণ অনন্যমনা হইয়া তোমাকেই চিন্তা করিতেছেন, রাত্রি অবসান হইতেছে, আর বিলম্ব করিও না, শ্রীকৃষ্ণের কামনা পূর্ণ কর। এই সর্গে শ্রীরাধার 'অভিসারিকা' অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

৭। ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বিকল অবস্থা সখীর মুখে শুনিয়া কৃষ্ণানুরাগিণী শ্রীরাধার এমন বিরহবেদনা উপস্থিত হইল যে তাহা প্রায়ই দশমী দশা। দশমী দশা মৃত্যু। পূর্ব্বরাগে দশ প্রকার দশা হইয়া থাকে। লালসা, উদ্বেগ, জাগর্যা (অনিদ্রা), তানব (ক্ষীণতা), জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

শ্রীরাধার এইরূপ অবস্থা, কাজেই যদিও তাঁহার অনুরাগ প্রবল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে বা অভিসার করিতে অক্ষম, দেহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এখন তিনি বাসক-সজ্জা। প্রিয়তম আসিবেন বলিয়া দেহ ও গেহ সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আর প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া এই অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—

শ্রীরাধা যেদিকেই চাহিতেছেন, দেখিতেছেন, তুমি তাঁহার অধর-মধু পান করিতেছ।

তিনি অতিশয় ক্ষীণা, তথাপি তোমার নিকট আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না, মাটিতে পড়িয়া যাইতেছেন। শুভ্র মৃণাল ও নবীন পল্লবের বলয় ধারণ করিয়াছেন, বাঁচিয়া যে আছেন, সে কেবল তোমার সহিত মিলন হইবার আশায়। শ্রীরাধা একেবারে তোমাময় (কৃষ্ণময়) হইয়াছেন। তোমারই মত ময়ূরের পুচ্ছ ও গুঞ্জাফলের বেশভূষা ধারণ করিয়া ভাবিতেছেন, আমিই মধুরিপু। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হারাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিতেছেন, আবার জ্ঞান হইলে লজ্জাশূন্যা হইয়া তোমার জন্য বিলাপ ও রোদন করিতেছেন। কখনও অঙ্গে অলঙ্কার পরিতেছেন, আবার কখনও ফেলিয়া দিতেছেন।

৮। নাগর নারায়ণ

শ্রীরাধার উৎকণ্ঠিত অবস্থাই চলিতেছে। চন্দ্র উঠিয়াছে। এখনও শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। শ্রীরাধা পরিতাপ করিতেছেন। চাঁদ উঠিবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের আসিবার কথা ছিল। কুঞ্জে আসা দূরে থাকুক, বনেও আসিলেন না। আমার রূপযৌবন বিফল হইল, সখীগণ সান্ত্বনা-বাক্যের দ্বারা আমাকে কেবল বঞ্চনা করিয়াছে, আমি এখন কি করিব, কাহার শরণাগত হইব? মিলনের আশায় গৃহ ছাড়িয়া গহন কাননে আসিয়াছি, কি করিব, কাহার শরণাগত হইব? আমার মরণই ভাল। বসন্ত-নিশা আমায় ব্যাকুল করিতেছে, মণিময়-ভূষণ ক্লেশকর হইয়াছে, ফুলহার নিপীড়ন করিতেছে। মধুসূদন ভুলিয়া গেলেন। প্রিয়তম কি অন্য কাহারও অভিসারে গিয়াছেন? তিনি কি বন্ধুগণের সহিত গীতবাদ্যে বা ক্রীড়া-কৌশলে বদ্ধ হইয়াছেন? তিনি কি অন্ধকারে পথ হারাইলেন? তবে কি আমার বিরহে ক্লান্ত হইয়া চলিতে অক্ষম হইয়াছেন?

এইবার শ্রীরাধার 'বিপ্রলব্ধা' অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। সখী ফিরিয়া আসিল, সে বিষাদে মৌন। শ্রীরাধা যেন দেখিতে পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এদিকে চন্দ্র অস্তমিত প্রায়। যে রমণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন, শ্রীরাধা এখন সেই রমণীর স্বাধীন-ভর্তৃকাভাব বর্ণনা করিতেছেন। অনেক বিলাপের পর শ্রীরাধা বিষণ্ণবদনা সখীকে নির্ব্বেদসহকারে বলিতেছেন, সখি, সেই নির্দ্দয় শঠ আসিল না বলিয়া কেন ব্যথা পাইতেছ? তাঁহার অনেক প্রেয়সী

আছে, তাহাদের সহিত তিনি বিহার করিতেছেন। উৎকণ্ঠায় ও মনোবেদনায় আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে, এই চিত্ত প্রিয়তমের গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়া আপনিই তাঁহার নিকট গমন করিবে। এই বলিয়া শ্রীরাধা নির্ব্বেদ প্রকাশ করিতেছেন। সখি, যে রমণী, বনমালীর সহিত বিহার করিতেছে, কিশলয়-শয্যায় তাহার সন্তাপ হয় না। কিন্তু যে বঞ্চিতা, কিশলয়-শয়নে তাহার কেবল সন্তাপ হইয়াই থাকে। মলয়পবন, চন্দ্র-কিরণ সকলই তাহার পক্ষে আনন্দকর। হে মলয়ানিল, তুমি আমাকে পীড়া দাও; হে পঞ্চবাণ, তুমি আমার প্রাণ হরণ কর; যমুনে, তুমি যমের ভগিনী, কেন আমাকে ক্ষমা করিতেছ? তোমার তরঙ্গের মধ্যে আমায় গ্রহণ কর, আমার জ্বালা জুড়াইয়া দাও। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়া আমি আর গৃহে গমন করিব না।

৯। বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি

এইবার 'খণ্ডিতা' অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীরাধা কোন প্রকারে অতিশয় কষ্টে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়া শ্রীরাধার ক্রোধ নিবারণের জন্য কতই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—

পুণ্ডরীকাক্ষ, সারানিশি একেবারে জাগিয়া কাটাইয়াছ। চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, আলস্যে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, হরি, হরি, যাও, যাও; কেশব, যাও, যাও; আর কপটতা করিও না। যে তোমার মনের বিষাদ হরণ করে, পদ্মলোচন, তাহার নিকট যাও। কৃষ্ণ, তোমার শরীর যেমন কৃষ্ণবর্ণ, তোমার মনও ঠিক্ তেমনই কৃষ্ণবর্ণ, নতুবা আমি তোমার একান্ত অনুগত, তুমি কি প্রকারে আমায় বঞ্চনা করিতেছ? অবলাবধই তোমার কার্য্য, বাল্যকালেই পূতনাকে বধ করিয়াছ! যৌবনে তোমার সেই নিষ্ঠুরতা যে বাড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব হরি, হরি, যাও, যাও; কেশব, যাও, যাও; আর কপটতা করিও না। যে তোমার মনের বিষাদ হরণ করে, পদ্মলোচন, তাহার নকট যাও।

১০। মুগ্ধ মুকুন্দ

প্রণত হইলেন, নানাবিধ বিনয়-বচন বলিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার মান অপগত হইল

না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরাধার অন্তর উৎসুক, কিন্তু বাহিরে মান। শ্রীরাধার এই অবস্থা, কলহান্তরিতা, মদনসন্তপ্তা, খণ্ডিতা, বিষণ্ণা। শ্রীরাধা এখন মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের চাটুবাদ, প্রণতি প্রভৃতি ব্যবহার স্মরণ করিতেছেন। এই সময়ে প্রিয়সখী আসিয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

মানিনি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকারণ মান করিও না! মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অভিসারে আসিয়াছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া গৃহে কি সুখ পাইবে? সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। কেন কাঁদিতেছ, কেন শোক করিতেছ? তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রতিপক্ষ যুবতীগণ হাস্য করিতেছে। সজলনলিনীদল-বিরচিত শয্যায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তোমার নয়নযুগল সফল কর। কেন ক্ষুব্ধ হইতেছ? তোমর বিরহ-বেদনা দূর হইবে। শ্রীকৃষ্ণ কত অনুনয় বিনয় করিলেন, তুমি কেবল নিষ্ঠুর কথা বলিলে! শ্রীকৃষ্ণ প্রণত হইলেন, তুমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলে! তিনি অনুরাগ প্রকাশ করিলেন, তুমি বিরাগ প্রকাশ করিলে! তিনি উন্মুখ হইলেন, তুমি বিমুখ হইলে। তুমি তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিলে, তাহা নিতান্তই বিসদৃশ। তোমার সবই এখন বিপরীত। তোমার নিকট চন্দন-বিলেপন বিষবৎ; চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ সূর্য্যকরসম প্রখর; সুশীতল হিমকণা অগ্নিতুল্য।

১১। মুগ্ধ মাধব

সারাদিন এই প্রকারে চলিল। প্রদোষ সময়ে শ্রীরাধার কোপ কিছু প্রশমিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—প্রিয়ে, চারুশীলে, আমার প্রতি তোমার এই মান অকারণ। মান ত্যাগ কর। আমার মন পুড়িয়া যাইতেছে। আমায় মুখকমলের মধুপান করাও। যদি একটিও কথা কও, তোমার দশনকান্তি-জ্যোৎস্নায় আমার হৃদয়ের গভীর আধার দূরীভূত হইবে। তোমার বদন-চন্দ্রমা আমার নয়ন-চকোরকে লুব্ধ করিতেছে। তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার সংসার-সমুদ্রের রত্ন। আমার অভিলাষ, তুমি সর্ব্বদা অনুরাগবতী হইয়া থাক। তোমার চক্ষু দুইটি নীলপদ্মের ন্যায়, এখন অভিমানে ও রোষে উহা কোকনদ-সম রক্তবর্ণ হইয়াছে। তোমার পরমসুন্দর পদপল্লব আমার মস্তকে প্রদান কর, উহা আমার মাথার ভূষণ হউক।

বৃথা সন্দেহ করিও না আমি অন্য কাহাতেও আসক্ত। তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়া আছ। আমায় হৃদয়ে অন্য কাহারও স্থান নাই। তোমার মৌনভাব আমায় ক্লিষ্ট করিতেছে। একবার পঞ্চমস্বরে সম্ভাষণ কর, মধুরালাপে হৃদয়জ্বালা শান্ত কর, বিমুখতা ছাড়িয়া প্রেমনয়নে দৃষ্টিপাত কর। বিনা-আহ্বানে আসিয়াছি, পরিত্যাগ করিওনা, আমি একান্ত অনুরক্ত।

১২। সানন্দ গোবিন্দ

শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জশয্যায় গমন করিয়া শ্রীরাধার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার লইয়া সন্ধ্যা আসিলেন। শ্রীরাধা বেশভূষাদিযুক্তা। প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

রাধে, অনুগতের অনুগমনে তোমার শিথিলতা দেখিয়া বলিতেছি, তুমি মুগ্ধা। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ তোমায় প্রসন্না করিয়া এখন অশোককুঞ্জে বিহার-শয্যায় অপেক্ষা করিতেছেন। তুমি সেই শরণাগত মধুসূদনের অনুসরণ কর। তুমি মন্দ মন্দ পাদ-বিক্ষেপে মণিময় নূপুরের মধুর শব্দ করিতে করিতে প্রিয়তমসমীপে গমন কর, তোমার মৃদুমন্থর গমনে রাজহংস পরাভূত হউক। অচেতন লতাসমূহ মন্দ পবনে আন্দোলিত হইয়া নবপত্ররূপ করসঙ্কেতে তোমাকে অভিসারের জন্য অনুরোধ করিতেছে। গমনে বিলম্ব করিত না। তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অন্ধকারময় নিকুঞ্জকাননে ভাবিতেছেন, আমার সেই প্রিয়তমা আসিয়া আমাকে দেখিবেন, মনোহর আলাপ করিবেন। এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া তিনি যেন তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতেছেন।

শ্রীরাধা নিকুঞ্জভবনের দ্বারদেশে গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখী। প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, রাধে, মনোহর কুঞ্জতল কেলিভবনে প্রবেশ কর, প্রবেশ কর।

শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডল দর্শন করিয়া সমুদ্র যেমন চঞ্চল ও উচ্ছ্বসিত হয়, সেইরূপ শ্রীরাধার মুখচন্দ্রদর্শনে রসসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের রোমাঞ্চাদি নানারূপ বিকারের তরঙ্গলীলা প্রকটিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে সুনির্ম্মল মুক্তামালা, যেন যমুনার বুকে শুভ্র ফেন-নিকর। শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল

শ্যামল দেহ, আর পরিধান পীতবসন যেন নীলপদ্মের মূলে পরাগ-সমূহ শোভা পাইতেছে। শরৎকালে সুনির্ম্মল তড়াগে প্রস্ফুটিত পদ্মে যেমন খঞ্জনযুগল ক্রীড়া করে, শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল কটাক্ষ সেইরূপ। কুণ্ডল দুইটি যেন দুইটি সূর্য্য, বদন কমল, ঐ সূর্য্য বদন-কমলকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। মাথায় কেশের মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণ ফুলের মালা, যেন চাঁদের আলো মেঘ ভেদ করিয়া চ্ছুরিত হইতেছে। ললাটে সুন্দর চন্দনতিলক, যেন আঁধারের মধ্যে চাঁদ উঠিয়াছে। শ্রীরাধা এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন।

১৩। সুপ্রীত পীতাম্বর

সখীগণ স্থানান্তরে গমন করিলেন। শ্রীরাধা নবীনপল্লবশয্যার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিলেন ও বলিলেন, রাধে, নারায়ণ তোমার শরণাপন্ন। কিছুকালের জন্য তাহাকে ভজনা কর, কিসলয়শয্যা তোমার পাদস্পর্শে মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। তোমার পদপল্লবস্পর্শে আমি দুঃখ দূর করি। তুমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছ, অনুমতি কর, তোমার পদকমলের সেবা করি। নূপুরের মত তোমার চরণতলে মিলিত হইয়া থাকিতে চাই, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর।

পূর্ব্বে যে 'নারায়ণ' বলা হইল, ইহার অর্থ 'নারীগণের বা স্ত্রীসমূহের আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি বহুবল্লভ হইলেও তদেকনিষ্ঠ।

অতঃপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। নির্ম্মলচিত্ত ভক্তগণ আস্বাদন করুন।

শ্রীগীতগোবিন্দ-সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা সময়ান্তরে করা হইবে।

যদ্ গান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্ বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বামপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ গীতগোবিন্দতঃ॥

যাঁহারা সুধী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসে উল্লসিতচিত্ত তাঁহারা, পণ্ডিত ও শ্রীকৃষ্ণে একতানচিত্ত শ্রীজয়দেব কবির এই শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে, গান্ধর্ব্বকলাসমূহে অর্থাৎ সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত গীতরাগতান প্রভৃতিতে যে নৈপুণ্য; সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর, সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ অচিন্ত্যা-নন্ত-শক্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান, শৃঙ্গাররসের দুরূহ-গতি সাম্যক্‌রূপে অবগত হউন।

পরিশিষ্ট

মহাকবি জয়দেব বাঙ্গালা দেশের লোক,—খাঁটি বাঙ্গালী। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান খুবই উচ্চ এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার রচনা বিশেষরূপে সমাদৃত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃতের চর্চ্চা খুব উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় কবি, যাঁহাদিগকে Classical Sanskrit Poets বলা যায়, তাঁহারা এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস এই সময়ের লোক, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল। তাঁহার পর ভারবি, হর্ষদেব, দণ্ডী, বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভর্ত্তৃহরির আবির্ভাব। ইঁহারা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর। তাহার পর ভবভূতি। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত গৌরবের যুগ, এইখানেই শেষ বলিলে দোষ হইবে না। তাহার পর শিশুপালবধের কবি মাঘ (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী), তাহার পর মুদ্রারাক্ষস নাটকের কবি বিশাখদত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না। আদিশূরের সময়ে কনৌজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ একজন, আর এই ভট্টনারায়ণ 'বেণী-সংহার' নাটকের রচয়িতা। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীহর্ষ 'নৈষধ' কাব্য রচনা করেন। কথিত আছে শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী। কিন্তু রাজশেখরের মতে শ্রীহর্ষের জন্মস্থান কাশী।

জয়দেবই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সংস্কৃত কবি। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও মহারাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন। জয়দেবের প্রভাব-সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জয়দেব-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, আমরা তাহারই কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। ডাক্তার বুলার কাশ্মীরপ্রদেশে কবি জয়দেবের একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করেন, তাহাতে যে সময় লিখিত আছে, তাহা হইতে আর কোন সন্দেহই করিতে পারা যায় না যে জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ গীতগোবিন্দের ইংরাজী করিয়াছেন। জয়দেবের সৌন্দর্য্য ও কোমলতা অনুবাদে রক্ষিত হইতে পারে না। আমরা দু একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

That God whose cheek is beautified by the nectar of his smiles, whose pipe drops in his ecstacy, I saw in the groves encircled by the damsels of Vraja who gazed on him askance from the corners of his eyes. I saw him in the grove with happier damsels, yet the sight of him delighted me. Soft is the gale which breathes over yon clear pool, and expands clustering blossoms of the voluble Asoka—soft yet grievous to me in the absence of the foe of Madhu. Delightful are the flowers of Amra trees on the mountain tops while the murmuring bees pursue thier voluptuous toil,—deligtful yet affecting to me O! friend, in the absence of the youthful Kesava.

গীত-গোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গে এই অংশটি আছে। যথা—

হস্ত স্রস্ত-বিলাস-বংশমনৃজু-ভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী
বৃন্দোৎসারি-দৃগন্ত-বীক্ষিত-মতিস্বেদার্দ্র-গণ্ডস্থলম্।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলজ্জিত-স্মিত-সুধা-মুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥
দুরালোকঃ স্তোক-স্তবক-নবকাশোক-লতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবন-পবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্ভৃঙ্গী-রণিত রমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥

মূলের সহিত অনুবাদের সামান্য পার্থক্য আছে। সম্ভবতঃ অনুবাদক যে গ্রন্থ অবলম্বনে অনুবাদ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির পাঠ, কিছু অন্যরূপ ছিল।

সপ্তম সর্গে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি আছে—

মনোভবানন্দন চন্দনানিল, প্রসীদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং, পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥
রিপুরিব সখী-সংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানলো
বিষমিব সুধা-রশ্মির্বস্মিন্ দ্রুনোতি মনোগতে।

হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্ব্বলতে বলাৎ
কুবলয়-দৃশাং বামঃ কামো নিকাম-নিরঙ্কুশঃ ॥
বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে ।
কিং তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥

ইংরাজী অনুবাদ—

O, gale scented with sandal, who breathest love from the regions of the south, be propitious but for a moment ; when thou hast brought my beloved before my eyes thou mayst freely waft away my soul ! Love, with eyes like blue water-lilies, again assails me and triumphs, and while the perfidy of my beloved rends my heart, my female friend is my foe, the cool breeze scorches me like a flame, and the nectar-dropping moon is my poison. Bring disease and death, O ! gale of Malaya ! Seize my spirit, O ! God with five arrows. I ask not mercy from thee ; no more will I dwell in the cottage of my father. Receive me into thy azure waves, O ! sister yamuna, that the ardour of my heart may be allayed.

গীত-গোবিন্দের দশম সর্গের নিম্নোদ্ধৃত পদটি সকলেরই জানা আছে, আমরা মূল পদ ও ইংরাজী অনুবাদ দিলাম।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্ ।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং ॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং

দেহি মুখকমলমধুপানং ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতং ।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ ॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধি-রত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥
নীল নলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপম্ ।
কুসুম-শর-বাণ ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ ॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণি মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘন জঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগং ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগং ॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারং ॥

Speak but one mild word, and the rays of thy sparkling teeth will dispel the gloom of my fears. My trembling lips like thirsty *chatakas* long to drink the moon-beams of thy cheek. O ! my

darling, who art naturally so tender-hearted, abandon thy causeless indignation. At this moment the flame of desire consumes my heart, O ! grant me a draft of honey from the lotus of thy mouth. Or if thou be-est inexhorable, grant me death from the arrows of thy keen eyes ; make thy arms my chains, and punish me according to thy pleasure. Thou art my life, thou art my ornament, thou art a pearl in the ocean of my mortal birth ; O ! be favourable now, and my heart shall eternally be grateful. Thine eyes, which nature formed like blue water-lilies, are become through thy resentment like petals of the crimson lotus ; O ! tinge with their effulgence these my dark limbs that they may glow like the shafts of love tipped with flowers. Place on my head that foot like a fresh leaf, and shade me from the sun of thy passion whose beams I am unable to bear. Spread a string of gems on those two soft globes ; let the golden bells of thy zone tinkle, and proclaim the mild edict of love ! Say, O ! damsel, with delicate speech, shall I dye red with the juice of ***alaktaka*** those beautiful feet which will make the full-blown land-lotus blush with shame ?

একাদশ সর্গের আর একটি পদ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

মঞ্জুতর কুঞ্জতল কেলিসদনে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
বিলস রতিরভসহসিত বদনে ॥
নব ভবদশোকদলশয়নসারে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
বিলস কুচকলসতরল হারে ॥
কুসুমচয়রচিতশুচিবাস গেহে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
বিলস কুসুম সুকুমার দেহে ॥

মৃদুচল মলয় পবন সুরভিশীতে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
বিলস রসবলিত ললিত গীতে ॥
বিতত বহুবল্লী নব পল্লবঘনে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
বিলস চিরমিলিত পীন জঘনে ॥
মধুমুদিতমধুপ কুলকলিত রাবে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
বিলস মদনরসসরস ভাবে ॥
মধুতর পিকনিকরনিনদ মুখরে, প্রবিশ রাধে মাধব সমীপমিহ।
দশনরুচিরুচির শিখরে ॥

Enter, sweet Radha, the bower of Hari ; seek delight, O ! thou whose bosom laughs with foretaste of happiness.

Enter, sweet Radha, the bower graced with a bed of Asoka leaves ; seek delight, O ! thou whose garland leaps with joy on thy breast.

Enter, sweet Radha, the bower illumined with sweet blossoms ; seek delight, O ! thou, whose limbs far excel them in softness.

Enter, O ! Radha, the bower spread with leaves of twining creepers ; seek delight, O ! thou whose arms have been so long inflexible.

Enter O ! Radha, the bower which resounds with the murmur of honey-making bees ; seek delight, O ! thou whose embrace yields more exquisite sweetness.

Enter, O ! Radha, the bower attuned by the melodious hand of kokilas ; seek delight, O ! thou whose lips, which outshine the grains of the pomogranate, are embellished when thou speakest by the brightness of thy teeth.

সার্ এড্উইন্ আর্নল্ড্ ইংরাজী কবিতায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন।

তাঁহার অনুবাদ ভাবানুবাদ। তাঁহার ধারণা পাঁচজন গোপী পঞ্চ ইন্দ্রিয়। নিম্নে তাঁহার কবিতা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

One with star blossomed champac wreathed woos him
to rest the head,
On the dark pillow of her breast so tenderly outspread ;
And o'er his brow with roses blown she fans a fragrance rare,
That falls on the enchanted sense like rain in thirsty air ;
While the company of damsels wave many an odorous spray,
And Krishna, laughing, toying, sighs the soft spring away.

Another gazing in his face, sits wistfully apart,
Searching it with those looks of love that leap from
heart to heart ;
Her eyes—afire with shy desire, veiled by their lashes black—
Speak so that Krishna cannot choose but send the
message back ;
In the company of damsels whose bright eyes in the ring,
Shine round him with soft meanings in the merry light
of spring.

The third one of that dazzling band of dwellers in the wood—
Body and bosom panting with the pulse of youthful blood—
Leans over him, as in his ear a lightsome thing to speak,
And then with leaf soft lip imprints a kiss below his cheek ;
A kiss that thrills, and Krishna turns at the silken touch,
To give it back,—Ah Radha ! forgetting the too much.

And one with arch smile beckons him away from Jumna's
banks,
Where the tall bamboos bristle like spears in battle ranks,
And plucks his cloth to make him come into the mango shade,
Where the fruit is ripe and golden, and the milk and cakes
are laid ;
Oh ! golden red the mangoes, and glad the feasts of spring,
And fair the flowers to lie upon and sweet the dancers sing.

Sweetest of all that Temptress who dances for him now,
With subtle feet which part and meet in the Ras measure slow,
To the chime of silver bangles, and the beat of rose-leaf hands,
And pipe and lute and cymbol played by the woodland bands ;
So that wholly passion-laden—eye, ear, sense, soul o'ercome,
Krishna is theirs in the forest ; his heart forgets its home.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অনুবাদ অবিকল অনুবাদ নহে। ভাবানুবাদ বলিলেও ঠিক্ হইবে না, তবে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজকবি যে গীতগোবিন্দ অবলম্বন করিয়া এই অতি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজী অনুবাদ বহুলপরিমাণে উদ্ধৃত করার বিশেষ কারণ আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী কবিতা আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের প্রাচীন কবি ও ভাবুকদের কল্পনা ও বর্ণনাপ্রণালীর দ্বারা আধুনিক ইংরাজী কবিতা বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত ও রঞ্জিত হইতেছে। তাহার কারণ এই সব অনুবাদ-গ্রন্থ পাশ্চাত্যদেশের ভাবুক ও কবিগণ বিশেষ যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া পূর্ব্বদেশের যাহা কিছু মহৎ, উদার ও সুন্দর, তাহা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া নিজেদের ভাব-জীবনের পুষ্টি-বিধান করিতেছেন এবং এই প্রকারে ভবিষ্যতের বিশ্বমানবীয় বা মহামানবীয় জীবনের অভিমুখে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন।

গীতগোবিন্দের যে অংশ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরাজী কবিতা রচিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পীন-পয়োধর-ভার-ভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত পঞ্চম রাগম্—
হরিরিহমুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।
কাপি বিলাস-বিলোল-বিলোচন-খেলন জনিত-মনোজং।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন-বদন সরোজং॥
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥
কেলি-কলা কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা বন-কূলে।
মঞ্জুল বঞ্জুল-কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥
করতল-তাল তরল-বলয়াবলি কলিত-কলস্বন-বংশে।
রসে রসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কথা, কিছুই জানা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে বাঙ্গালাদেশের অনেক কবিই বাঙ্গালাভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি, কবি কর্ণপূরের পুত্র কবিচন্দ্র গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের একখানি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সিউড়ি, রতন লাইব্রেরীতে আছে (পুঁথি নং ১৩২৮)। তাঁহার গ্রন্থ হইতে নিম্নের অংশটুকু উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই—আমরা সমগ্র গ্রন্থ এখনও পাই নাই।

চন্দনে চর্চ্চিত যার নীল কলেবর।
পীতবস্ত্র বনমালা অতি মনোহর॥
কেলিতে চঞ্চল মণি-কুণ্ডল মণ্ডিত।
এইরূপ গণ্ড যার স্মিত-সমন্বিত॥
হরি এই বিদগধ রমণীর সনে।
বিলাসিনি বিলাসএ কেলিতে নির্জ্জনে॥

পীন পয়োধর যুগলের ভার ভরে।
আলিঙ্গন করি রাগ সহিত হরিরে॥
তাহার পশ্চাতে কোন গোপবধূ গায়।
তাহাতে পঞ্চম রাগ পরকাশ পায়॥

হ্লাদিনী শক্তি ও তাহার বিলাস

(ক)

হ্লাদতে

"সুখরূপী কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।"

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে শ্রীরাসলীলা-আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা প্রথমেই একটি রহস্যের পরিচয় পাইব, তাহা শ্রীভগবানের "রিরংসা"। শ্রীভগবান্ রমণের জন্য ইচ্ছা করিলেন—"রন্তুং মনশ্চক্রে।" 'রমণের ইচ্ছা' বা 'রিরংসা' এই কথাটি শুনিয়া অনেকেই হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন এবং ভগবৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই প্রকারের একটি নিতান্ত পার্থিব কথার উল্লেখ দেখিয়া অনেকেই এই আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হইবেন। এই প্রকার যাঁহারা 'কথা'র দ্বারা শাসিত, তাঁহাদের জন্য উচ্চতম বিষয়ের আলোচনার দ্বার চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ। আসুন, আমরা শব্দের মোহপাশ ছেদন করিয়া অর্থের বা ভাবের মুক্তরাজ্যে প্রবেশ করি। ভগবানের "রিরংসা" কি? বৈষ্ণব গোস্বামিগণ ইহার উত্তর দিয়াছেন। "হ্লাদিনীশক্তিবিলাস লক্ষণ তৎ প্রেমবিশেষময়ী এ বৈষা রিরংসা নতু প্রাকৃতকামময়ী।" ইহাতে "রিরংসা"র অর্থ বলা হইল—"হ্লাদিনী শক্তির বিলাস।"

প্রথমে শক্তির বিলাস কি, তাহাই আলোচনা করা যাউক। আমরা সকলেই জানি, শক্তির দুই প্রকার অবস্থা, একটি সুপ্ত বা অব্যক্তঅবস্থা, আর একটি ক্রিয়ান্বিত বা ব্যক্তঅবস্থা। এখানে একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে, লোকটি খুব ভাল গান করিতে পারে; কিন্তু এখন লোকটি গান করিতেছে না। এখন সে ব্যক্তি নানারূপ সাংসারিক দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া বিষণ্ণ মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এখন, তাহার সেই 'গায়কত্ব'-শক্তি কোথায়? সে শক্তি যে নাই, এমন কথা বলিতে পারেন না। সে শক্তি

সেই ব্যক্তির মধ্যে আছে, তবে এখন সেই শক্তি সুপ্ত বা অব্যক্ত। তাহার পর মনে করুন, তাহার সাংসারিক কার্য্য হইয়া গেল, সে ব্যক্তি তানপুরা যন্ত্রটি লইয়া একাগ্রমনে সেই যন্ত্রের সুর বাঁধিতে লাগিল; সুর বাঁধা হইল, গুন্ গুন্ করিয়া রাগিনী আলাপ করিতে লাগিল, ক্রমে সহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হইল; প্রথমে শক্তির উদ্দীপন তাহার পর বিলাস। এখন লোকটি গান করিতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরের অমৃত লহরী জাগ্রত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকারে গান করিয়া ঐ গায়ক নিজেকে গায়ক বলিয়া অনুভব করিতেছে এবং আস্বাদন করিতেছে। ইহারই নাম "শক্তির বিলাস।" একজন লোক খুব বড় পালোয়ান, খুব ভাল কুস্তি করিতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কুস্তি করিতে পারে এ প্রকারের লোক আসে না, কাজেই সে ব্যক্তি মনের দুঃখেই থাকে, সে যে একজন পালোয়ান একথা যেন সে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে, সে যেন পালোয়ান হইয়াও পালোয়ান নহে। তাহার পালোয়ান হওয়া যেন একটা কথার কথা, একটা সত্য কিছু নহে। জগতের অন্যান্য লোকের তো কথাই নাই, সেই পালোয়ান নিজেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, শুধু স্মৃতি লইয়া শুধু নাম লইয়া আর কতদিন চলে। এই ভাবে কিছুদিন চলিতে চলিতে উপযুক্ত পালোয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া সেই পালোয়ান কুস্তি আরম্ভ করিল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল, নিজে দুইবার আছাড় খাইল, প্রতিপক্ষকে দুইবার আছাড় মারিল, এই প্রকারে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে নিজেকে পালোয়ান বলিয়া অনুভব করিল,—ইহারই নাম শক্তির বিলাস।

পূর্ব্বোক্ত গায়কটি যখন আত্মহারা ও তন্ময় হইয়া গান করিতেছিলেন, তখন আমরা খুব মনোযোগের সহিত তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া একটি কথা মনে হইয়াছে, যে গান করিবার পূর্ব্বে যে লোকটি মলিন মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, গান করিবার সময় যেন সে লোকটি নাই—এ যেন একটি নূতন লোক। এই লোকটির ভিতরে কে যেন একজন ঘুমাইয়াছিল, এখন সে যেন বাহির হইয়াছে, সেই নূতন লোকটি এখন এই গায়কের চোখে মুখে মস্তক সঞ্চালনে দেহের প্রত্যেক স্পন্দনে বিহার করিতেছে। এই যে নূতন জিনিষটী, এইটিই তাহার গায়কত্ব-শক্তি। বেশ মনোযোগ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, উদ্বোধিত আত্মশক্তির সহিত বিহার করিবার সুযোগ পাইয়া ঐ মানুষটি বা গায়কটি যেন তাহার স্বরূপে বা নিজের প্রকৃত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই শক্তি যখন অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, তখন এই মানুষটি তাহার স্বরূপে ছিল না। নিজের স্বরূপ-শক্তির সহিত এই যে বিলাস বা বিহার, ইহাই এই লোকটির প্রকৃত আনন্দ। পালোয়ানের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য।

প্রকৃত যে গায়ক, সে কি চাহে? কিসে তাহার আনন্দ হয়? যদি মনে করেন যে সে টাকা

পুরস্কার অথবা প্রশংসা পাইয়া সুখী, তাহা হইলে আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আর আপনার কথা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ সত্যই যদি এই লোকটি পুরস্কার বা প্রশংসা পাইয়া সুখী হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, সে ব্যক্তি প্রকৃত গায়ক নহে। প্রকৃত যে গায়ক সে গান করিতে পারিলেই সুখী হয়। সে পৃথিবীর রাজত্বকেও তুচ্ছ বোধ করে। নিজের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির যে বিলাস, তাহাই প্রকৃত আনন্দাস্বাদন। বিকশিত মানবের তত্ত্বালোচনা করিয়া ইহা আমরা বেশ বুঝতে পারি। এই কথা শ্রীভগবানের স্বরূপ-বিচারেও প্রয়োগ করিতে হইবে।

শ্রীভগবানের শক্তি প্রথমতঃ ত্রিবিধ। বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি, অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি আর তটস্থা জীবশক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তির কথা এখন ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। অবশ্য এই শক্তিত্রয়েরই জ্ঞান প্রয়োজন, নতুবা শক্তিমান্ যে ভগবান্ তাঁহাকে জানা যাইবে না। তবে আপাততঃ মনে করুন যে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি, কোনরূপ শেষ মীমাংসা হয় নাই, তটস্থ জীবশক্তির বিষয়ও আলোচনা করা গিয়াছে; তাহাতেও কোন শেষ কথা পাওয়া যায় নাই। এখন আসুন, আমরা অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির আলোচনা করি। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের আলোচনার পর আসুন, আমরা স্বয়ং ভগবানের আলোচনায় মনোনিবেশ করি। শ্রীরাসলীলা এই স্বয়ং ভগবানেরই লীলা।

সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিন ভাবে ভগবানের প্রকাশ, অর্থাৎ তাঁহার এই ত্রিবিধ পরিচয় আমরা পাইতে পারি। তিনি সচ্চিদানন্দ। (শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন সদ্‌ভাব ব্রহ্মভাব, চিদ্ভাব পরমাত্মাভাব, আর আনন্দভাব ভগবদ্ভাব)। ভগবান্ সম্বন্ধে প্রথম কথা তিনি আছেন, এই কথা শুনিয়া একজন বলিতে পারেন, বেশ ত, এ কথা আর জানাইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই, কেবল 'তিনি আছেন' নহে, 'তিনিই' আছেন। 'থাকা' বলিয়া যে একটা ব্যাপার, তাহা কেবলমাত্র তাঁহারই। তবে কি আমরা নাই? আমরা আছি, তবে আমাদের এই যে 'থাকা', ইহা স্বতন্ত্র নহে; আমরা আছি, তবে তাঁহারই হইয়া আছি। যেমন সূর্য্যমণ্ডলে আলোক বলিয়া যে জিনিস তাহা একমাত্র সূর্য্যেরই, অন্য যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান্, তাহা সূর্য্যেরই আলোক লইয়া। সেইরূপ সত্তা একমাত্র তাঁহারই, আমরা সকলে তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্।

এইবার দেখুন সত্তা জিনিষটি স্বতন্ত্র নহে। প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও ক্রমে বুঝিতে পারা যায় যে, সত্তা চৈতন্যের উপর বা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দোয়াতটি রহিয়াছে, কি করিয়া জানিলাম যে উহা রহিয়াছে? উত্তর, জ্ঞানের সাহায্যে। তাহা হইলে সত্তা হইতে চৈতন্যে আসিলাম। অবশ্য সত্তাকে ছাড়িবেন না। জ্ঞান ছাড়া যেমন সত্তা নাই, তেমনি সত্তা ছাড়া জ্ঞান নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই যে চৈতন্য, ইহা একমাত্র শ্রীভগবানের। আমি জ্ঞানী, আপনি জ্ঞানী, কিন্তু এই যে আমার আপনার

জ্ঞান বা চৈতন্য, ইহা স্বতন্ত্র নহে, অমরা তাঁহারই চৈতন্যে চৈতন্যময়। সত্তা হইল ইংরাজীতে Existence, আর চৈতন্য হইল Consciousness। এইবার চলুন, আমরা আনন্দের দিকে যাত্রা করি।

'সত্তা' বাহিরে, আর 'চৈতন্য' ভিতরে। সত্তা ও চৈতন্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দ্বন্দ্ব যখন চলিতেছে, তখন ইহাদের একটা মিলনের ভূমি আছে; সেখান হইতে যাহারা নির্ব্বাসিত হয়, তাহারাই ঐ মিলনের ভূমি আবার ভাল করিয়া পাইবার জন্য দ্বন্দ্ব করে, অতএব দ্বন্দ্ব দেখিয়া ভয় পাইবেন না। এই মিলনের ভূমিই আনন্দ। ভিতর বাহিরে দ্বন্দ্ব যেখানে মিটিয়া যায়, সত্তা ও চৈতন্যের যেখানে মিলন হয়, সেইখানেই আনন্দ।

কথাটা তেমন কঠিন নয়, কথাটি একটু ভাল করিয়া অলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, 'বিষয়ানন্দের সাহায্যেই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে হইবে'। সত্যইত, তাহা না হইলে আমরা বুঝিব কিরূপে? As above so below। তবে আসুন, বিষয়ানন্দে সত্তা ও চৈতন্যের দ্বন্দ্ব কি প্রকারে মিটিয়া যায়, তাহার একটা পরিচয় লওয়া যাউক। বাহিরে এক থালা রসগোল্লা রহিয়াছে, আর ভিতরে আমাদের ন্যায় একজন পেটুক ব্রাহ্মণের চৈতন্য রহিয়াছে। রসগোল্লাকে দেখিয়া আমার চৈতন্য ক্ষুভিত হইতেছে। আচ্ছা, বলুন দেখি ইট, কাঠ, পাথর দেখিয়া আমার চৈতন্য তেমন ক্ষুভিত হয় না, ঐ রসগোল্লাকে দেখিয়াই বা ক্ষুভিত হইতেছে কেন? ইহার উত্তর কিছু কঠিন নহে, ঐ রসগোল্লা আমার বাহিরের জিনিষ নহে, উহা আমার ভিতরেরই জিনিষ; উহা যখন আমার ভিতরে ছিল তখন আমি বেশ ছিলাম। তবে এখন উহা আমার বাহিরে গেল কেন? কথাটা কেন বলিলাম জানেন? যখন দ্বন্দ্ব হয় তখন তাহার ভিতরে একটা মিলন থাকে, ভিতরে মিলন না থাকিলে বাহিরে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব হয় না, ইহাই দেখাইবার জন্য। এখন আমার চৈতন্য ক্ষুভিত হইতেছে। ভাই রসগোল্লা, তুমি রহিয়াছ, কিন্তু আমার বাহিরে অনাত্মীয় হইয়া রহিয়াছ কেন? ভাইরে, তোমার বিরহ যে আর সহ্য হয় না—ভাইরে, তুমি বাহিরে রহিয়াছ কেন? তুমি যে আমার অন্তরের জিনিষ, তুমি বাহিরে বসিয়া থাকায় আমি নিজেকে অপূর্ণ ও অধম বলিয়া মনে করিতেছি। এই প্রকারে চৈতন্য ক্ষুভিত হইয়া লোভের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কোমল জিহ্বার উপর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। লোভের নৃত্যে জিহ্বা ব্যথিত হওয়ায় লালাস্রাব হইতে লাগিল। ভিতরে একটা পরামর্শ চলিতে লাগিল। এই গোলযোগের নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। মন, তিনি রাজা। তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়-গণকে আহ্বান করিলেন। হস্ত, তিনি সেনাপতি। হস্তের উপর আদেশ হইল। হস্ত বিজয়-যাত্রায় বাহির হইলেন। থালার উপরে আসামী বসিয়াছিল, হস্ত তাহাকে অঙ্গুলিবন্ধনে বন্দী করিয়া লইয়া আসিল। এদিকে বিরহকাতর চৈতন্য লোভের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ওষ্ঠাধরের দ্বারদেশে অপেক্ষা

করিতেছিল, দ্বার অতিক্রম করিতেই ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল, আর সেই সময়ে ভিতর হইতে একটী শব্দ উঠিল "আঃ"। এই "আঃ" শব্দটিই আনন্দের বাচক। এই প্রকারে দেখিবেন যে ভিতর বাহিরে দ্বন্দ্ব যে সময়ে মিটে, সেই সময়েই আনন্দ প্রকট হয়। ভিতর বাহিরের মিলন ছাড়া, আনন্দের কোনরূপ প্রকাশ আমরা ধারণাই করিতে পারি না। সকল প্রকারের আনন্দের ইহাই সাধারণ লক্ষণ। 'টাকা' আছে, কিন্তু আমার হইয়া নাই। ইহাই আমাদের দুঃখ। ইহারই নাম বিত্তৈষণা। যেমন টাকা পাইলাম, অমনি আনন্দ হইল, কারণ ভিতর বাহিরের বা চৈতন্য সত্তার যে বিরোধ, তাহা আপাততঃ মিটিয়া গেল। অবশ্য এই যে সব আনন্দের কথা বলা হইল, ইহা ঠিক আনন্দ নহে, ইহা বিষয়ানন্দ, ইহা সংস্পর্শজ, ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখপ্রদ। তবে এই আনন্দের বা এই আনন্দচ্ছায়ার কথা বলা হইল, আনন্দের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য। ইহাকে ভাব ও রসের মিলনও বলা যায়।

তাহা হইলে আমরা মোটামুটি সচ্চিদানন্দতত্ত্ব বুঝিলাম। সত্তা বাহিরে, চৈতন্য ভিতরে, আর এই দুইয়ের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই দুইয়ের চিরন্তন বিরোধের মধ্যে চিরন্তন অবিরোধরূপে আনন্দ রহিয়াছেন। এই প্রকারে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে আনন্দই প্রধান এবং আনন্দই মূল। আনন্দমীমাংসাই চরম মীমাংসা।

এইবার তিন শক্তি। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ, আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। শক্তি-তত্ত্বের প্রধান কথা এই যে, শক্তি ব্যতীত আমরা শক্তিমান্‌কে জানিতে পারি না। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। সুতরাং এইবার এই তিন শক্তির তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। ভগবান্‌কে সত্তারূপে ধারণা করিতে গেলে তাঁহার যে শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, অথবা তাঁহার যে শক্তি ক্রিয়ান্বিত হইলে তিনি সত্তাবান্ হয়েন ও পরকে সত্তাবান্ করেন, তাহার নাম সন্ধিনী শক্তি। ভগবান্‌কে চৈতন্যরূপে ধারণা করিতে গেলে তাঁহাতে যে শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, অথবা তাঁহার যে শক্তি ক্রিয়ান্বিত হইলে তিনি চৈতন্যবান্ হয়েন বা অপরকে চৈতন্যবান্ করেন তাহার নাম সম্বিৎ শক্তি। ভগবান্‌কে আনন্দরূপে ধারণা করিতে গেলে তাঁহাতে যে শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, অথবা তাঁহার যে শক্তি ক্রিয়ান্বিত হইলে তিনি আনন্দবান্ হয়েন বা অপরকে আনন্দবান্ করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। ইহাই বৈষ্ণবদর্শনের কথা। "হ্লাদস্বরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।"

"সুখরূপী কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।"

চৈতন্য চরিতামৃতে অন্যত্র আছে—

"হ্লাদিনী দ্বারায় করে স্বভক্তপোষণ।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত বচন হইতে আমরা হ্লাদিনী শক্তি'র দুই প্রকারেরই লক্ষণ পাইলাম। ইহার স্বরূপ লক্ষণ

এই যে, শ্রীভগবান্ এই শক্তির সাহায্যে নিজে সুখরূপী হইয়াও সুখ আস্বাদন করিতেছেন। ইহার তটস্থ লক্ষণ এই যে, এই হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তগণ সুখ পাইতেছেন এবং ভক্তগণের পোষণ হইতেছে।

'ভগবানের সুখাস্বাদন'—এই কথাটি অনেকেরই নিকট কিছু নূতন রকমের কথা বলিয়া মনে হইবে। আমরা অপূর্ণ এবং অসুখী আমরা সুখের জন্য নানারূপ কার্য্য করি, ভগবান্ চিরদিন আমাদের সকলের সুখবিধান করিতেছেন, ইহাই আমরা জানি। আবার, ভগবানের সুখাস্বাদন! তিনি যে পূর্ণ, তিনি আবার সুখাস্বাদন করিবেন কি? সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্নই জাগিয়া উঠিবে।

আমাদের চিন্তা করিবার একটি বড় কৌতুকজনক পদ্ধতি আছে। ভগবানের কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই; আমাদের চারিদিকে অসংখ্য তরুলতা, নূতন পত্রে ও বিকশিত পুষ্পে সাজিয়া মৃদুল পবনে দুলিতেছে। ইহাদের দেখিয়া আমাদের অনেক সময়েই সুখ হয় ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু ইহাদের যে একটা স্বতন্ত্র জীবন আছে, এবং ইহাদেরও একটা সুখ দুঃখের বোধ আছে, ইহারা কেবল আমাদের সুখ সুবিধার জন্যই জন্মগ্রহণ করে নাই, আমাদের সুখ সুবিধা সাধন করা ব্যতীত ইহাদের নিজেদের জীবনের একটা অভিপ্রায় ও ভোগ আছে, ইহা আমরা অনেক সময়েই কল্পনা করিতে পারি না। পেয়াদা যে মানুষ, পেয়াদাগিরি ছাড়াও তাহার জীবনে যে একটা কিছু আছে বা থাকিতে পারে, ইহা সাহেবের কল্পনাতীত, কাজেই পেয়াদার শ্বশুর বাড়ীর কথা শুনিয়া সাহেব একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। সেই প্রকার আমাদের মধ্যে এমন অনেক ধার্ম্মিক লোক আছেন, যাঁহারা ভগবানের সুখাস্বাদন শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া যাইবেন।

সুতরাং, এই একটি নূতন চিন্তা। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে 'ভগবান্ নাচিতেছেন'—একথা শুনিয়া অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিবে, তাহারা বলিয়া বসিবে, ভগবান্ আবার নাচিবেন কি? এখন এই কথাটি একটু চিন্তা করা যাউক, কারণ রাসলীলার ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাথমিক কথা।

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিকৃত 'বৃহদ্ বৈষ্ণব-তোষণী' টীকায় যাহা বলা হইয়াছে, প্রথমে তাহাই শ্রোতব্য। "রাসক্রীড়ায়াং নিজাশেষ-ভগবত্তাসার প্রকটনাভিপ্রায়ণ নন্দাদয়ঃ পরমানন্দনির্বৃতা বভূবুঃ, ভগবানপি স্বয়ং পরমানন্দ-নির্বৃতো ভবিতুং রন্তুং ক্রীড়াবিশেষং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে ঐচ্ছদিতি অপি শব্দার্থঃ।"

ইহার অর্থ এই। শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোকের প্রথম কথা 'ভগবানপি' অর্থাৎ ভগবানও। এখন এই 'অপি' পদটির অর্থ কি? শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী বলিতেছেন, ঊনত্রিংশৎ অধ্যায়ে রাসলীলা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের শেষে কি বলা হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে, তবেই এই

'অপি' পদটির অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসীগণকে ব্রহ্মলোক দেখাইলেন, ব্রহ্মলোক দেখিয়া—

"নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।"

অর্থাৎ—নন্দ প্রভৃতি সকলে সেই ব্রহ্মলোক দর্শন করিয়া পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্য সকলকে আনন্দদান করিলেন, এখন প্রশ্ন এই—তাঁহার কি কোন আনন্দ নাই? ইহারই উত্তরে শ্রীরাসলীলার কথা বলা হইতেছে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর টীকার অর্থ এই—শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেই বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিয়া পরমানন্দে নির্বৃত হইলেন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণও নিজের অশেষ ভগবত্তা-সার প্রকট করিয়া স্বয়ং পরমানন্দে নির্বৃত হইবার জন্য রমণের জন্য অর্থাৎ বিশেষ প্রকারের একটি ক্রীড়া করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ।

শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোকে "রন্তুং মনশ্চক্রে" আছে। এখানে "চক্রে" এই ক্রিয়াপদ আত্মনেপদী। শ্রীমজ্জীবগোস্বামী এই আত্মনেপদী ক্রিয়ার তাৎপর্য্য বিনির্ণয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত মত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীভগবানের নিজের সুখাস্বাদনের কথাই বলিয়াছেন। অন্যান্য অনেক টীকাকারও এই কথা বলিয়াছেন। টীকাকারগণ বলিয়াছেন বলিয়াই যে এই কথা আলোচনা করিতে হইবে তাহা নহে, বৈষ্ণব-সাধনার এই তত্ত্বই প্রধান তত্ত্ব। কিন্তু ইহা একটি নূতন তত্ত্ব বলিয়াই আমরা বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা করিতে চাই।

তাহা হইলে আসুন, আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া লই। আমরা এতদিন শ্রীভগবানের বিষয় চিন্তা করি নাই, কেবল নিজের বিষয়ই চিন্তা করিয়াছি। "ভগবান্ ভগবান্" বলিয়া যখন চীৎকার করিয়াছি, অথবা সমারোহ করিয়া যখন পূজা করিয়াছি, তখন আমরা তাঁহাকে কি বলিয়াছি? "ঠাকুর তুমি সুখী হও" এ কথাত বলি নাই। দৈত্য ভয়ে ভীত হইয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিয়াছি, ঠাকুর তুমি আসিয়া দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাজিত কর, আমাদের রক্ষা কর। তিনি আসিয়া যুদ্ধ করিয়া আমাদের স্বর্গলোকে বসাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা যখন অতি ভয়ানক পাপপঙ্কে ডুবিয়াছি, এমন সে পাপপঙ্ক যে ঘৃণা করিয়া সংসারের কোন লোক তাহার ত্রিসীমানায় আসে না, তখন আমরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিয়াছি, ঠাকুর এই পাপ হইতে আমায় উদ্ধার কর। ডাক শুনিয়া দীনবন্ধু পতিতপাবন আসিয়াছেন, এবং করুণ কোমল হস্ত প্রসারিত করিয়া আমায় উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রকারের ঠাকুরকে ডাকিয়া জন্ম জন্ম কেবল দাও দাও বলিয়াছি। "টাকা দাও, আয়ু দাও, আরোগ্য দাও, পুত্র দাও, বিজয় দাও" কেবল 'দাও' আর 'দাও'! আহা, বাঞ্ছাকল্পতরু ঠাকুর চিরদিন আমাদের জন্য খাটিতেছেন, চিরদিন আমাদের বাসনা পূর্ণ

করিতেছেন। তাঁহাকে খাটাইয়া লইয়া আমরা সুখী হইতেছি। এখন প্রশ্ন এই যে মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ কি চিরদিনই এইরূপ থাকিবে? মানুষ যখন খুব বেশী উন্নত বা ধার্ম্মিক হইয়াছে, তখনও সে বলিয়াছে "ঠাকুর আমায় মুক্তি দাও।" এ সমুদয় কি স্বার্থ সাধনের অভিসন্ধি নহে? মানুষ কি এই কৈতব ধর্ম্মের উর্দ্ধে কখনই উঠিতে পারিবে না? ইহাই প্রশ্ন।

কথাটা আর একদিক হইতে ভাবিয়া দেখা যাউক। আমরা বিপদের সময় ভগবান্‌কে ডাকি, কিন্তু সম্পদের সময় তাঁহার কথা মনে করি না। শৈশবে সংসার সুখময়, আত্মীয় স্বজনে আদর করিয়া কোলে করে, হাতে তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়। সে সময়ে আমি সংসারের কৈশোরে বন্ধুসঙ্গ মুক্তহৃদয়ে হাসিয়া নাচিয়া বেড়াই, চারিদিকে প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, নবীন কল্পনার মাধুরীতে হৃদয় মন পরিপূর্ণ, সে সময়েও আমি সংসারী। যৌবনে প্রেয়সী সঙ্গে বিষয় ভোগে মাতোয়ারা, চারিদিকে গৌরব ও প্রশংসা, তখনও আমি সংসারী। যৌবন চলিয়া গেল, প্রৌঢ় কালও চলিয়া গেল। এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত সংসারের বাজারে আর আমার খরিদদার নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অচল হইয়াছি, কিন্তু সংসারের জীবনস্রোত চির নূতন। সংসারে বসন্তও আছে যৌবনও আছে, হাসি, গান, প্রেম, ভালবাসা সবই আছে। চিরনূতন আকাশ বাতাস, চিরনূতন চন্দ্রতারা, চিরনূতন পাখীর গানে বসুন্ধরা উৎসবময়, কিন্তু আজ আর আমায় কেহ চাহে না। সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় গলাধাক্কা দিয়া আমার সারা জীবনের প্রিয় সুখের সংসার হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়। আজ আমি সঙ্গিহীন, আজ আমি নিরুপায়। মরণের কাল ছায়া সম্মুখে, নীরস দেহ শুষ্ক ও শীর্ণ, আজ আমি সংসারে একেবারে অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। আর উপায় নাই, অতএব কি করি, যোড়হাত করিয়া বলিতেছি—"গোবিন্দ হে এইবার আমায় গ্রহণ কর।" আচ্ছা, বলুন দেখি, এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ কি বলিবেন? গোবিন্দ কি বলিতে পারেন না "বাপু সেদিন কোথায় ছিলে, যে দিন বাল্যের কোমল দেহ স্নিগ্ধ লাবণ্যে ভূষিত ছিল? বাপু, সেদিন কোথায় ছিলে, যে দিন কৈশোরের মধুর কল্পনায় হৃদয় মন আমোদিত ছিল?" তাহা হইলে দেখুন, আমরা ভগবানের সঙ্গে যে সম্বন্ধ পাতাইয়াছি তাহা নেওয়ার সম্বন্ধ, দেওয়ার সম্বন্ধ নয়। এ ধর্ম্ম কি ভদ্রলোকের ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম কি মানবের ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম কপটাচারী ও স্বার্থপর ক্রীতদাসের ধর্ম্ম! মানুষ—আজ তুমি মানবতার গৌরবে জাগিয়া উঠ, 'নিতে চাই না' 'দিতে চাই' —ইহাই তোমার মূলমন্ত্র হউক। ব্রজগোপী কাঁদিতেছেন, যৌবন চলিয়া যাইতেছে প্রাণবঁধু আসিলেন না।

নারীর যৌবন ধন যারে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি।

ইহারই নাম প্রেম। ইহাই স্বাধীনতার ধর্ম্ম। গোপী বলিতেছেন—"বঁধু হে, আজ আমার কুঞ্জবনে বসন্ত আসিয়াছে। লতায় লতায়, তরুর শাখায় শাখায়, কত রঙ বেরঙ্গের ফুল ফুটিয়াছে।

চাঁদের কিরণে ভরা বনভূমি, ফুলবাস ভরে মৃদু মলয় পবন ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কেবল বাহিরে বসন্ত নয়, আমার জীবন-নিকুঞ্জবনেও আজ নব প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল উঠিয়াছে। বঁধু আজ তুমি এস। এই মুহূর্ত্তেই তুমি এস। আজ যদি না আসিলে, তবে আর আসিতে বলিতে পারিব না। কাল বসন্ত চলিয়া যাইবে, ফুল ঝরিয়া যাইবে, নূতন পাতা খসিয়া পড়িবে। শুষ্কপাতা ও নীরস ধূলি উড়াইয়া লইয়া সন্তপ্ত নিদাঘ বায়ু হাহাকার করিয়া হতভাগ্য উন্মাদের মত কাঁদিয়া বেড়াইবে। আমার যৌবনশ্রী বুঝি সেই সঙ্গে অবসান হইয়া যাইবে। ঘর্ম্মশিক্ত ক্লান্ত দেহে ভূমি শয়নে ছট্‌ফট্ করিব। বঁধু সেদিন যেন আসিও না।" ইহাই ব্রজগোপীর সাধনা। আসুন, আমরা যৌবন দিয়া, সৌন্দর্য্য দিয়া, জীবনের যাহা কিছু প্রিয় সর্ব্বস্ব দিয়া, সেই রসিকেন্দ্র শিরোমণির পূজা করি। ইহাই কৃষ্ণের সুখের জন্য কৃষ্ণসেবা। শ্রীরাসলীলা আলোচনা কালে এই চিন্তাটী সর্ব্বদাই হৃদয়-মধ্যে জাগাইয়া রাখিতে হইবে—ইহারই নাম 'প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ততা'।

এইবার রাসলীলার অবস্থা চিন্তা করুন। মনে করুন একটি অতি বৃহৎপরিবার; পরিবারে বহুলোক। বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তিনি প্রাতঃকালে উঠিলেন, এক একজন করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেছে, সামাজিক নিয়মের শাসনে প্রণাম করিতেছে, পায়ের ধূলা লইতেছে। কেহ বলিতেছে "বাবা, আমার কাপড় নাই, টাকা দাও, কাপড় কিনিতে হইবে।" কেহ বলিতেছে "কাকা, ক্ষুধা পাইয়াছে, খাবার কিনিয়া দাও।" কেহ বলিতেছে "মামা, একখানা চিঠি দাও, চাকুরী করিতে যাইব" ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্ত্তা সকালে উঠিয়াছেন, আর এখন রাত্রি বারটা বাজিল। এই আঠার ঘণ্টার মধ্যে অনেকেই তাঁহার কাছে আসিয়াছে, অনেকে স্তব, স্তুতি, অনুনয়, বিনয় ও অনেক প্রকারের তোষামদ করিয়াছে, কিন্তু সকলেই নিজের স্বার্থসাধনের জন্য আসিয়াছে। কর্ত্তার নিজের একটা জীবন আছে, তাহারও কিছু সুখভোগ আছে বা থাকিতে পারে, এ প্রকারের কথা কাহারও মনে এ পর্য্যন্ত জাগে নাই। মনে করুন, কর্ত্তার একটী বাঁশী আছে, এবং দুএকটী অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, তাঁহার ইচ্ছা হয় বন্ধুগণের সঙ্গে বাঁশী বাজাইয়া একটু আনন্দ ভোগ করা। কিন্তু সারাদিন বিষম ঝঞ্ঝাট। নিজের যাহা ভাল লাগে তাহা করিবার সময়ই নাই। বাহিরের বাধ্যতা এতই ভয়ঙ্কর! নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহা করিবার অর্থাৎ স্বপ্রকৃতির সহিত বিহার করিবার বা নিজের স্বরূপের হ্লাদিনী শক্তি বিলসিত করিবার সময় এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, বাহিরের ঝঞ্ঝাট মিটিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে তাঁহার নিজের ভিতরে চাহিবার সময় পাইলেন। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে যদ্যপি এই ভাবটী প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভগবানের সুখাস্বাদনকেই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসলীলায় 'আত্মারামের' রমণ বলে। একমাত্র

ভোক্তাই শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র নায়ক, নায়কের শিরোরত্ন। He is the one Lover. ক্রমশঃ আমরা জানিতে পারিব, শ্রীমতী রাধিকা একমাত্র নায়িকা।

"সর্ব্বগুণখনি সর্ব্বকান্তাশিরোমণি।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই একমাত্র সত্য। আমাদিগকে কৃষ্ণসুখ অন্বেষণ করিতে হইবে। আত্ম-সুখের বাঞ্ছা ত্যাগই প্রকৃত সুখলাভ, এটুকু বুঝিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা বলিতে হইবে :—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হয় মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখ বর্য্য।"

সতীশচন্দ্রের গান

৬ষ্ঠ খণ্ডের ১২শ সংখ্যায় এই কবির চারিটি গান প্রকাশিত হইয়াছে। কবির নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'চহটা' গ্রামে তাঁহার জন্ম। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য যেটুকু সংবাদ পাইয়াছি, তাহা ষষ্ঠ খণ্ডের ১২শ সংখ্যায় দেওয়া গিয়াছে। আর কিছু খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। এবারে তাঁহার রচিত আরও কতকগুলি গান প্রকাশিত হইল।

এই গানগুলি যাঁহার নিকট পাইয়াছি, তাঁহার পরিচয় আবশ্যক। সিউড়ির নিকটেই 'ইক্‌রা বাঁশড়া' গ্রাম। সেই গ্রামে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসের জন্ম। এখন তাঁহার নাম স্বরূপ দাস, শাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমানে সিউড়িতেই থাকেন, তাঁহার নিকট এই গানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

১

খাম্বাজ—একতালা

কেন চোরেরি মতন, ও নীলরতন, কেনহে কুঞ্জেরি দ্বারে।
কেন এলে শুধু, এতে নাই মধু, যাও যাও বঁধু ফিরে॥
আর জ্বালা কালা, দিও না হে, অবলা সরলা প্রাণ,
সরল বাঁশীতে, বাজাও না আর, গরল মিশান গান,

কালা কথা কানে শুনব না, কালরূপ চক্ষে হেরব না,
ফিরে যাওহে কালসোণা, ভালবাস গিয়ে তারে॥
গোপী-ভাব বুঝে সতীশে কয়, পিরীতি করা সখী এ রীতি নয়,
যার সনে যার, মন বাঁধা রয়, জীবন মরণ তারে॥

২

বেহাগ—ঝাঁপতাল

মনচোরা, মোহন চূড়া, পাই না কেন হেরিবারে।
হয়েছ হরি, দিগম্বরী, কেন হে পীতাম্বর ছেড়ে॥
মুছে অলকা তিলকজাল, ভালে ধরেছ আধশশী,
কুটীল কাল কেশ লুকায়ে, সেজেছ বঁধু এলকেশী,
মুখে নাইহে মৃদুহাসি, রুধিরে যায় বুক ভাসি,
বংশী করাম্বুজে অসি, দেখে পরাণ কাঁপে ডরে॥
সদ্য মাংস শিরোরক্ত, মদ্যপানে মাতোয়ারা,
ব্রজে মায়ের দেওয়া ক্ষীর ননী, খেতে তখন হে ননীচোরা,
বনমালা কৈ হে বনমালী, হয়েছ নৃমুণ্ডমালী,
ভক্তিপ্রিয় হয়েছ কালী, শক্তি-উপাসকের তরে॥
চাই হে যাকে পেলাম তাকে, আর কি থাকে দ্বেষাদ্বেষি,
দ্বিজ সতীশের মনের আশা, মিটল দেখি ভাব-সাগরে মিশামিশি,
যাইরে ভাবের বলিহারি, ভাব নিরখি আঁখি ভরি,
ভাবসাগরে ডুবে মরি, ভাবগ্রাহীর ভাব হেরে॥

৩

বেহাগ—ঝাঁপতাল

দেখে এলাম সে কে বটে, দাঁড়ায়ে জাহ্নবীর ঘাটে
গিয়ে নিকটে হিয়া ফাটে, বসেছে রূপ ঘাটে ঘাটে।
তপত হেমবর্ণ সুনা (?), বর্ণরূপে আলো করে
পূর্ণশশী রাশি রাশি প্রকাশি পদ নখ করে,
মরি মরি সে রূপ হেরি, ধরে কি ধৈরয ধরে,
হইগা দাসী, মন উদাসী, যদি দাসী রাখে নিকটে॥

নয়ন বদন বাঁকা, ভালে তিলক ঝলমল,
তিলক হেরি ত্রিলোক ভুলে, জাহ্নবী করেছে আলো,
আকুল করে নারীকুল, রাখ্‌তে নারি নারীকুল,
কি ছার রমণীকুল, ব্যাকুল সুরধনী বটে ॥
বাউলে পারা, অধরে ধরা, দণ্ড কমণ্ডলু করে,
কৌপীন পরা নবীন গোরা, যেন হারা হয়েছে কারে,
ক্ষণে হাসে সে ঢলে পড়ে, ক্ষণে সে বাঁকা আঁখি ঝরে,
কি ভাব তার মনে পড়ে, রাধা বলে সে কেন্দে উঠে ॥
চিহ্ন রেখা যায় না ঢাকা, চরণেতে চেনা যায়,
কলি ঘুচে গৌর হলেন, এসে বাঁকা নদীয়ায়,
নাচে গায় আর পড়ে ধারা, ফণী ধরা অধরে ধরা,
সতীশ বলে ঐ অধরা, ঐ রূপ অমনি বটে ॥

৪

ইমন্—একতালা

কি দোলা দোলালি, যশোদা-দুলালে, কিসে মন ভুলালে, সাধের চন্দ্রাবলী।
দিলে দিলে ভাল, কাটা ঘায়ে নুন, বল বল দুটো গুণবতীর গুণ,
কইতে কথা কেন, মুখটি কর চূণ, জোটে নাই কি চূণ নিতে চূণকালী।
হয়েছিল তোমার, পিপাসা প্রবল, বিচার নাই কি বন্ধু ভাল মন্দ জল,
অকাল বলে তাইতে, খেলে মাকাল ফল, আচ্ছা প্রতিফল দিলে বনমালি ॥
আস্‌তে মানা করি, হুকুম জারী আগে, মানমঞ্চে মোদের রাই বসেছেন রাগে,
আসতে যদি হবে, বুঝ্‌তে হতো আগে, সতীশ কয় কি হবে করলে কৃতাঞ্জলী ॥

৫

বেহাগ—ঝাঁপতাল

মন, তুমি কি চিরজীবি, দিন কি তোমার এমনি যাবে।
দেহ পিঞ্জর করে ভঙ্গ, প্রাণ-বিহঙ্গ পলাইবে।
দশাননের দশা স্মরণ, ভেবে দেখ মন ত্রেতাকালে,
দেবেন্দ্র যার গাঁথিতেন হার, যম বাঁধা যার অশ্বশালে,

ব্রহ্মা যারে ছিলেন সদয়, অভয়া মা দিতেন অভয়,
করেছিল ত্রিলোক বিজয়, মরেছিল সবান্ধবে ॥
ভীমার্জ্জুন দুর্য্যোধন, শতপঞ্চ ভ্রাতা যার,
কোথা রৈল অভিমন্যু, মাতুল শ্রীগোবিন্দ যার,
কোথা বা সে রাজা কংস, কোথা বা সে যদুবংশ,
রবে না মন কোন অংশ, কালে ধ্বংস সবান্ধবে ॥
মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা, পুত্র মিত্র পরিবার,
সুখের দিনে সুখের ভাগী, সে দুর্দ্দিনে কেবা কার,
পড়বে যেদিন ঘোর বিপদে, ঘুরবে সেদিন ঘূর্ণীপাকে,
সেদিন তুমি বা কে, কেবা তোমার, কেবা কারে তরাইবে ॥
করলি না মন শেষের চিন্তা, বিষয় চিন্তা অবিরত,
মিছে, ধনের জন্য দেশ বিদেশে, ভ্রমিয়ে কাল হলো গত,
করিলি না মন সাধু সঙ্গ, কৃপাময়ের নাম প্রসঙ্গ,
সুখের স্বপ্ন হবে ভঙ্গ, চতুরঙ্গ পড়ে রবে ॥
দ্বিজ সতীশ ভণে, পাপ আগুনে, দগ্ধ হও মন দিবানিশি,
এমন হরিসাধন রত্নাকরে, ডুবলি না মন রইলি ভাসি,
পড়বে যেদিন কুশাসনে, কান্দবে জনের কুশাসনে, (?)
সেদিনে দীনবন্ধু বিনে, এ দীনের ভার আর কে লবে ॥

৬

খাম্বাজ—কাওয়ালি

ভগবান, ভক্তপ্রাণ মুরারে।
তুমি বহুরূপে প্রকাশিত হতেছ হে শ্যামবরণ,
যুগে যুগে যুগাবতার করতে ধরার ভার হরণ,
বরাহ কূর্ম্মাদি মীন নিদর্শন, দেহ দরশন, সুদর্শনধারী আমারে ॥
তুমি রোপিলে মথুরায় লীলারতি লতিকার মূল,
আসি গোপনেতে গোপকুল গোকুলে চরালে গোকুল,
নিস্তারকারী হরি, তুমি, অকূলে দাওহে কূল
দিও কূল অকূল ভব সাগরে ॥

সীতা উদ্ধার হেতু, বাধলে সেতু, নীরে ভাসাইয়ে পাষাণ
পাষাণ প্রাণে, দিয়ে বনে শুণে ফেটে যায় পাষাণ
মুক্ত পদরজে অহল্যারে তার,
নিশান তায় গুণগান সেই করে প্রাণ ভরে ॥
শ্রীচরণবলে সতীশ বলে, কুতূহলে শ্রীনিবাস পরমহংসরূপে
জীবের সহস্রারে কর বাস, দিয়ে পূরাও আশ, চিরদাস যাবে কাতরে ॥

৭

ইমন্—একতালা

একি বিষম দায়, বিপদ পায় পায়, এমন ঘরে যায়, কেমনে বাস করা।
ঘরের, হাল কার্ণিষ সাঙ্গা, মূল খুঁটি সব ভাঙ্গা, ঘর ভেঙ্গে মা ডাঙ্গা, হবে ভবদারা ॥
প্রবেশ হয় না ঘরে জ্ঞান সূর্য্যের বাতী, অবিদ্যা আঁধারে পোহায় না মা রাতি,
জ্বালতে দেয় না ঘরে, আনন্দের বাতী, কুপ্রবৃত্তি অতি মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা ॥
কালঝড়ে ঝ'রে পড়েছে আয়ুধূলা, করছে কেবল ঘরে পাঁচটা ভূতে খেলা,
ভূতের ছয়টা চোখ নয়টা দুয়ার খোলা, দিবানিশি জ্বালা জ্বলে হলাম সারা ॥
বাকী নাই কারো হ'তে অম্বল যকৃৎ, দুরন্ত তাড়না মশার কামড় ভারি,
শক্তি নাই যে তাড়ি, ভক্তি চাপড় মারি, অনুরাগ মশারি, তাও হয়েছে ছেড়া ॥
কেন্দে সতীশ বলে প'ড়ে কর্ম্ম ফেরে, আর এলেনা মা এমন দুঃখের ঘরে,
নাও মা চরণতলে বাঁচি আলিস ছেড়ে, জন্মের মতন স্মরণ লইলাম মা তারা ॥

৮

খাম্বাজ—কাওয়ালি

সুখের পিয়াস, বৃথায় কর আশা, জীবনের আশা, বল ক'দিনের তরে।
পদ্মপত্রের জল, করছে টল্‌মল্, তেমতি জীবন কেবল হৃদয় মাঝারে ॥
কামনা কান্তারে হৃদয়ে ধরেছ, রঙ্গরসে সদা কাল কাটিয়েছ,
দিন কি এম্‌নি যাবে, মনে কি তাই ভেবেছ,
দিনকর নন্দনে লয়ে যাবে তোমারে ॥
কোথায় রবে তোমার আমার আমার বুলি,
সঙ্গে দিবে তোমার ছেঁড়া কন্থাগুলি,
ছড়াইয়ে দিবে গোবর ছড়া গুলি', হরি হরি বলি লয়ে যাবে তোমারে ॥

মহানিদ্রায় যেদিন হইবে অচেতন, কোথায় রবে তোমার দারা পুত্রগণ,
প্রাণের বাছাগুলি করিবে রোদন, হরি হরি বলি শ্মশান প্রান্তরে ॥
দ্বিজ সতীশ বলে হলিরে বিস্মরণ, কোথা হতে তোমার হলোহে আগমন,
আবার কোন্ দেশেতে করিবে গমন, কর্ম্মফলে জন্ম হবে কোথাকারে ॥

৯

বেহাগ—একতালা

তারাগো, তারাগো, শমনে তাড়াগো, তারাগো তরাগো, অকূল তুফানে।
তোমায় নাই অছাপিগা, ভয়ে কাল যাপিগো, আমি যে পাপী গা, কাঁপিগে সঘনে ॥
জন্মাবধি পাপ করেছি যতগো, করেছি বিষপান হইয়ে রতগো,
পেয়েছি যতগো, পিয়েছি ততগো, জ্বালা যে এতগো, জানিনা স্বপনে ॥
না ভেবে করেছি বৃথা কালাতীত, পাতকী বলে তাই হয়েছি পতিত,
এখন করুণা ব্যতীত, নাই মা গতি ত, হলো এ পতিত, পাতিত চরণে ॥
পাতকী বলিয়ে সতীশে ঠেলোনা, পতিতপাবনী নাম আর কেউ লবে না,
ওনাম রবে না, প্রাণেও তা সবে না, স্বগুণে করুণ কর মা অধীনে ॥

১০

খাম্বাজ—কাওয়ালি

কোথায় শ্রীমধুসূদন। অনাথের বন্ধু হরি, বিপদবারণ ॥
বারে বারে হরি ডাকিছে তোমারে, করুণাধার পদ দাওহে আমারে,
এ ভব তরঙ্গে মরি হে আতঙ্কে, পার করহে ভবতারণ ॥
তোমা বিনে হরি, কে বল তারিবে, তোমা বিনে দাসে কে ভালবাসিবে,
জ্ঞানহীন সতীশে, করুণা প্রকাশি, দেখা দাও অসি কাল-বরণ ॥

১১

খাম্বাজ—একতালা

গোটে মাঠে পথে, খেতে শুতে যেতে, সাঁজে দিনে রেতে, বল গৌর হরি।
শুচি কি অশুচিতে, ভজ শচীসুতে, দ্বিজ কি মুচিতে, সমান দয়া হেরি ॥
উদ্ধারিতে জীবে অভ্যাগত গুরু, শ্রীগৌরাঙ্গরূপ রসকল্পতরু,
শচী গর্ভমাঝে মাঝে ইন্দ্র চারু, যাঁর কৃপায় মরুমাঝে বহে বারি ॥

অযাচকে যেচে বলে নিসে আয়, ঘরে ঘরে হরির নাম বিলায়ে যায় ;
হরি বলার তারি বলিহারি যাই, তার দৃষ্টান্ত জগাই মাধাই আদি করি ॥
অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে ভাবে ঢলে পড়ে, কভু হাসে কভু ঢলে পড়ে,
দীন সেজে ব্রজের ঋণ শুধিবারে, অধরে রেখেছে গদাধরে ধরি ॥
গৌরভাবের ভাবী হবি কত দিনে, হবিরে কৃতার্থ মধুর রস আস্বাদনে,
দ্বিজ সতীশ কয়, আমি বিকাব চরণে, জনমে জনমে এই আশা করি ॥

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৩। পদকর্ত্তা—রাধামুকুন্দ দাস

রাধামুকুন্দ বা রাধিকামুকুন্দ দাস রচিত কোন পদাবলী আজ পর্য্যন্ত মুদ্রিত বা প্রচারিত হয় নাই। ইনি, একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির নাম—'মুকুন্দানন্দ গ্রন্থ'। আকার– ৩১৪ পৃষ্ঠা। প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ২৬ পংক্তি করিয়া লিখিত। বন্দনা ও অনুক্রমণিকা অংশ ব্যতীত সংগৃহীত পদসংখ্যা—৬৫৯। ইহার মধ্যে গ্রন্থ-সংগ্রহকারের নিজকৃত পদ ১৪টি মাত্র। 'বন্দনা'-প্রসঙ্গে সঙ্কলয়িতা, এইরূপ যৎসামান্য আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

১

জয় জয় চক্রবর্ত্তী গোবিন্দচরণ।
শ্রীআচার্য্য প্রভু কৃপাপাত্র সর্ব্বোত্তম।
জয় জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শক্ত্যবতার।
জগত অতীত নহি দীনহীন ক্ষীণ।
শ্রীমণিমঞ্জরী দেবী প্রেম মণিদাতা।
ছয় চক্রবর্ত্তী মধ্যে মুখ্যেতে গণন॥
তার বংশে জন্ম প্রভু মুই নরাধম॥
তব পাদপদ্ম বিনা অন্য নাহি আশ॥
প্রেম শাস্ত্র কৃপাময় জগত নিস্তার॥
মোরে কৃপা কর প্রভু স্বাধীন প্রবীণ॥
তোমা ভিন্ন কেহ নাহি যুগল পদ দাতা॥

তব শাখা-বংশে জন্ম এইত সাহস।
জয় রাধামোহন প্রভু আচার্য্য প্রভু বংশ।
অসংখ্য গৌরাঙ্গগণ নাম লব কত।
জয় জয় গৌর ভক্ত চরণারবিন্দ।
কৃপাময় কৃপা কর ভক্ত অবতংশ॥ * * ॥
'পদামৃত সমুদ্র' কৈল ভক্ত অবতংশ॥
এককালে বন্দিলাম প্রভুগণ যত॥
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বাঞ্ছে দীন মুকুন্দ॥

২

জয় জয় ব্রজবাসীগণের চরণ।
তুয়া সব পদরেণু মস্তক ভূষণ।
পদামৃত-সমুদ্র শ্রীসঙ্কীর্ত্তনানন্দ।
শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ মুকুন্দ বর্ণন।
প্রকরণ বংশ এক পদ দুইবার।
চৈতন্য চরণাশ্রয় পতিত পতিতপাবনসুত।
তব দাস অনুদাস তদ্দাসানুদাস।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ ভক্ত সর্ব্বজন॥
ইহলোকে পরলোকে হইয়া সকরুণ॥
পদকল্পতরু মত পদ ভক্তানন্দ॥
মহাকৃপা প্রকাশে সুধিবেন মহাজন॥
লিখিব তাহাতে দোষ না লবে আমার॥
পতিত উদ্ধার প্রভু অতি কৃপাযুত॥
রাধাকৃষ্ণ প্রেম বাঞ্ছে শ্রীমুকুন্দ দাস॥

গ্রন্থ-শেষে অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে সংগ্রহকার, বিষয় সন্নিবেশ ও পদসংখ্যার এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অনুক্রমণিকা।
পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয় গ্রন্থের বর্ণন।
শ্রীমুকুন্দানন্দ রাধামুকুন্দ পদ দাতা।
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতা পুষ্পচয়।
সুভক্ত কোকিল ভক্তিরস আস্বাদয়।
ভক্তিরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা॥
কৃপা করি সুধিবেন রাধাকৃষ্ণ জন॥
পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয় ভক্তি-কল্পলতা॥
ষট্‌শত নব পঞ্চাশৎ পদ ফল প্রেমময়॥
অভক্ত কুকাক বিষ-বিষয় ভুঞ্জয়॥

পূর্ব্ব বিভাগ—প্রথম স্তবক

প্রথম স্তবকে গুর্ব্বাদি বন্দন।
রাগমালা একপদ আচার্য্য বন্দন।
সপ্ত পদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিল যে রূপ।
একপদে শ্রীযুগল পদের বর্ণন।
ততঃ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ স্বগণ চরণ॥
ষট্‌পদে গৌরাঙ্গের গুণের কথন॥
চতুর্থ পদেতে রাধা রূপ রস-কূপ॥
এই ত ত্রয়োবিংশতি পদের গণন॥

দ্বিতীয় স্তবক

দ্বিতীয় স্তবকে যুগ্ম-বিলাশ কামদ।
পূর্ণযুগ্ম বিলাসেতে নিবেদন পদ।
অষ্টচত্বারিংশৎ পদ দ্বিতীয় স্তবকে।
তৃতীয় প্রকারে অষ্টাবিংশতি সৎপদ॥
দ্বিতীয় প্রকারে রত্ন বিংশতি সুপদ॥
ভক্তগণ মনোবঞ্ছা সর্ব্বত পূরকে॥

তৃতীয় স্তবক

রাধা পূর্ব্ব অনুরাগ কৃষ্ণরূপ অনুরাগ। রাধা অভিসার কৃষ্ণ মিলন সুযোগ ॥
একাদশ পদে হৈল এইত বর্ণন। পরে চতুর্দ্দশ পদ শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ রাধা পূর্ব্ব অনুরাগ। দূতী গমনান্তে রাধা অভিসার যোগ ॥
এই হৈল দ্বাত্রিংশৎ পদের গণন। তৃতীয় স্তবকে ভক্ত অভীষ্ট পূরণ ॥

চতুর্থ স্তবক

চতুর্থ স্তবকে রাধা সুপ্রেম বৈচিত্ত্য। নবম পদেতে লীলা বিস্তার মহত্ত্ব ॥
যুগ্ম যুগ্ম পদে যুগ্ম কৃষ্ণপ্রেম বৈচিত্ত্য। ত্রয়োদশ পদ ভক্তগণ মনঃ কৃত্য ॥

পঞ্চম স্তবক

পঞ্চম স্তবকে পূর্ণ যুগল বিলাস। নবম দ্বাদশ পদে সুপ্রেম উল্লাস ॥

ষষ্ঠ স্তবক

চতুর্দ্দশ দ্বাবিংশতি পদে নিত্য রাস। ষষ্ঠ স্তবকে শুদ্ধ হইল প্রকাশ ॥
পূর্ব্বভাগে একশত পঞ্চ সপ্ততি পদ। রাধাকৃষ্ণ পদপ্রদ সুসিদ্ধ সম্পদ ॥
এইত হইল পূর্ব্ব বিভাগ সমাপ্ত। উত্তর-বিভাগ লীলা শুনহ বৃত্তান্ত ॥

উত্তর বিভাগ—প্রথম স্তবক

কৃষ্ণ জন্মোৎসব পুনঃ রাধা জন্মোৎসব। প্রথম স্তবকে ত্রিংশৎ পদ অনুভব ॥
বাৎসল্য শ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা গোষ্ঠাষ্টমী। বৎসচারণাদি লীলা ভক্ত শিরোমণি ॥

দ্বিতীয় স্তবক

দ্বিতীয় স্তবকে ত্রিপঞ্চাশৎ পদ। যাহার শ্রবণে ভক্তি সুসিদ্ধ সম্পাদ ॥

তৃতীয় স্তবক

তৃতীয় স্তবকে দান নৌকার বিলাস। অষ্টাবিংশতি দশম পদেতে প্রকাশ ॥

চতুর্থ স্তবক

অতঃপর নিত্যলীলা চতুর্থ স্তবকে। চতুশ্চত্তারিংশৎ পদ সুপ্রেম পূরকে ॥
পূর্ণ নিত্যলীলা বিস্তারিত শত পদে। শ্রবণে দুর্লভা ভক্তি হয় প্রভু পদে ॥

পঞ্চম স্তবক

পঞ্চমে শ্রীশারদীয় মহারাসলীলা। সপ্তবিংশতি দ্বাবিংশতি পদে প্রকাশিলা ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ভৈষজ্য ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস্

কৃষ্ণনগর, বেঙ্গল।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত—সের ১০৲, বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত—সের ২০৲, ব্রাহ্মীঘৃত—সের ৮৲।

কৃষ্ণনগরে ভৈষজ্য উদ্যানসহ সুবৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানায় অকৃত্রিমভাবে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিমিত্ত এবং ভেল হইবার আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত আমরা কোনস্থানে ব্রাঞ্চ খুলি নাই।

কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এম, এ, এবং ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি, এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, জমিদার এবং উকীল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঔষধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এখানে পুরাতন প্লীহা লিভারযুক্ত ম্যালেরিয়া, পুরাতন প্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, যক্ষ্মা, এবং ডিস্‌পেপসিয়া এই কয়েকটী পীড়ার যত্নসহকারে চিকিৎসা করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্রাদি গোপনে সংরক্ষিত হয়।

বঙ্গের সুপরিচিত ধর্ম্ম প্রচারক এবং 'বীরভূমি'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় এই কারখানা পরিদর্শন এবং ঔষধাদি ব্যবহার করতঃ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল।

............"আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, যাঁহারা এই ঔষধালয়ের ঔষধ একবার ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারাই বিশেষ উপকার পাইতেছেন। ....আমি এই কারখানার চ্যবনপ্রাশ, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহাসুগন্ধি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী "পরাগপ্রসূন" নামক কেশতৈল এবং বৃহৎ দশনসংস্কার চূর্ণ নামক দাঁতের মাজন ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে যেরূপ ফল পাইয়াছি তাহা অন্যত্র পাই নাই। .... আমি ইচ্ছা করি এই ঔষধালয়ের নাম, ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। আর আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই ঔষধালয়ের ঔষধ ব্যবহার করুন। আমি বেশ জোরে বলিতে পারি এই ঔষধালয়ের বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় ঔষধ সেবনে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।" চ্যবনপ্রাশ সের ৪৲, শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ৮৲, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ তোলা ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার

শ্রীকালীব্রহ্ম সান্যাল

আয়ুর্ব্বেদিক কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট,

ভৈষজ্য ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস্,

কৃষ্ণনগর, বেঙ্গল।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান সংখ্যা, সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা। ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসে দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না, চৈত্র মাসে পূর্ণ হইবে।

দ্বাদশ সংখ্যার অর্থাৎ পূর্ণ একখণ্ডের মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ভি, পি, তে লইলে ৩।॰ তিন টাকা চারি আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।॰ চারি আনা মাত্র।

প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ (complete in itself), এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। সুতরাং যে কোন একখণ্ড কিনিয়া পড়িলে তাহা বুঝিবার জন্য, অন্য কোন খণ্ডের বিশেষ আবশ্যক নাই।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে—"সুখ পাঠ্য","প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৸৹ ও কাপড় বাঁধা ৸৵৹। ভি পি ১৲ ও ১৶৹ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান – কৃষ্ণনগর – শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুকক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান

(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PL 832
3 Sep 1925.

বীরভূমি] মাসিক পত্রিকা [৭—৩
১৩৩২

Birbhum 18.9.25

শ্রীবৃন্দাবন ও তাহার অন্তরায়

২ সতীশচন্দ্র ও তাঁহার গান

৩ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

6/10/25

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

শান্তিনিকেতন প্রেস

এই প্রেসে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে পুস্তক, পত্রিকা, চেক, দাখিলা, চিঠি, রসিদ জমিদারী ও মিউনিসিপালিটীর নানাবিধ ফরম, ব্যবসায়ীদিগের ক্যাশ-মেমো ও মূল্য-তালিকা, বিবাহের প্রীতি-উপহার ও নিমন্ত্রণ-পত্র এবং ভিজিটিং কার্ড প্রভৃতি সকল রকম ছাপার কার্য্যই সত্বর ও সুন্দররূপে হইয়া থাকে। লাল, নীল, সোনালী ও রূপালী প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের ছাপাও হয়।

সর্ব্বসাধারণের কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রুফ দেখিবার ভার লওয়া এবং যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দর অন্যান্য প্রেস অপেক্ষা বেশি নহে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পোষ্ট—শান্তিনিকেতন,
ষ্টেশন—বোলপুর।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল
প্রেস-ম্যানেজার।

শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত

ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র

মূল্য আট আনা।

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন……"ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্র" গ্রন্থখানি পড়িয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। লেখক ব্রহ্মদেশের যেটুকু দেখিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সহজে, সরলভাবে লিখিতে পারিয়াছেন। পড়িলেই বুঝা যায়, এ গ্রন্থের সব কথাই বিশ্বাসযোগ্য—ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য বা অত্যুক্তি নাই।

প্রবাসী বলেন……ইহা বর্ণনায় বিচিত্র অথচ গ্রন্থকারের স্বকীয় ভাবব্যঞ্জনাতে সরস। ভাষা বিশুদ্ধ, আড়ম্বরশূন্য স্বচ্ছ ঝরঝরে। এই পুস্তকে বিবিধ বিষয়ের তেরখানি হাফটোন ছবি ইহার উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, নর-সমাজের বিচিত্রতা ও কৌতুক-জনক পার্থক্য জানা যায়। এই জাতীয় পুস্তক উপন্যাস অপেক্ষা অধিক প্রীতিকর…।

মর্ম্মবাণী

মূল্য চারি আনা।

ভারতবর্ষ বলেন……এই কবিতার বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি কারণ ইহাতে মামুলী ধরণের চাঁদের আলো, ফুলের বাসের চর্ব্বিত চর্ব্বণ নাই। কবিতাগুলি উঁচু সুরে বাঁধা, ভগবদ্‌চরণে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি। ইহাই এ মর্ম্মবাণীর পরিচয়।

বীরভূমি বলেন……এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, ভাবও তেমনি পবিত্র। প্রত্যেক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদার ভাবের উদ্দীপক। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হওয়ার উপযুক্ত, পারিতোষিক পুস্তকরূপে বালক-বালিকাগণকে দিলে তাহারা আনন্দিত ও উপকৃত হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বীরভূমি, ৭—৩।

শ্রীবৃন্দাবন ও তাহার অন্তরায়

১। লীলা

'ভারতবর্ষীয়-লীলাবাদ' বলিয়া একটি মতবাদ বা দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতি, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ও বিদেশে কিছু কিছু আলোচিত ও প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু এখন যাহা প্রচারিত হইতেছে, তাহা ঠিক ভারতবর্ষেরই অকৃত্রিম জিনিষ কিনা, তাহা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলায় "ভারতবর্ষীয়-লীলাবাদ" তাহার পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ। এই উপদেশের দ্বারা আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের এবং উৎকলের অধিকাংশ লীলাবাদী সাধকের আধ্যাত্মিক জীবন গত চারিশত বর্ষকাল পরিচালিত হইতেছে। কাজেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী সাধক ও ভক্তগণের উপলব্ধি ও আস্বাদনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে "ভারতবর্ষীয়-লীলাবাদ" এর মর্ম্ম আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়ে বুঝিতে পারিব।

লীলাবাদের সূত্র স্থাপন করিবার জন্য আমরা বলিয়াছি যে বৃন্দাবন বলিতে একই সঙ্গে দুইটি জিনিষ বুঝিতে হইবে; একটি স্থান ও চৈতন্যের একটি অবস্থা*—এবং এই চৈতন্যের অবস্থাটি প্রথম বুঝিয়া তাহার সাহায্যে স্থানটিকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে বাহিরে যে স্থানটি রহিয়াছে তাহা অনুভূতির ঘনীভূত মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রকারের দর্শনের নাম অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া দর্শন বা চৈতন্যের ভূমি হইতে দর্শন। আর এই প্রকারের যে আস্বাদন তাহার নাম ভাবুক হইয়া আস্বাদন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আলোচনার ইহাই পদ্ধতি। বৈষ্ণব কবি বলিলেন, আগে মন, তাহার পর বন এবং মন ও বনকে এক করিয়া জানিলেই সম্যক্ দর্শন বা লীলাদর্শন হইবে।

---

* A place and a state of consciousness combined in one.

২। বৃন্দাবন

'বৃন্দাবন' এই কথাটির অর্থ নানা স্থানে নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে। "বৃন্দাবন" মানবীয় সাধনার একটি সাধ্য বিষয়। অনেকে বলেন ইহাই "সাধ্যের সীমা।" প্রত্যেক সাধকের অধিকার ও রুচি এক নহে, সুতরাং অধিষ্ঠান-ভূমির প্রভেদ-নিবন্ধন "বৃন্দাবন" এর অর্থ যে নানারূপে কথিত হইবে, তাহাতে বিস্মিত বা বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। পরিশেষে দেখা যাইবে যে এই সমুদয় অর্থ বা ধারণা বিরোধী নহে,—একই অসীম তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন বিভাব বা প্রতীতি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বৃন্দাবন-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

"কেহ কোনমতে কহে যেমন যাহার মতি" যাঁহার অধিকার ও রুচি যেমন, তিনি তেমনই বলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের উক্তি বা মত পরস্পর বিরোধী নহে,—

"মিথ্যা নহে সত্য হয় বচন সবার।"

গৌতমীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে, বৃন্দাবন একটি পঞ্চ-যোজন বন, এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ। পরমামৃত বাহিনী কালিন্দী সুষুম্নাখ্যা নাড়ী। তন্ত্রের এই উক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ নানাস্থানে আদরপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং এই মত একটি সমাদৃত মত।

শ্রীজীবগোস্বামী গোপালচম্পূ-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন বৃন্দার যেখানে অবন হয় তাহার নাম বৃন্দাবন। 'অবন' কথাটির অর্থ রক্ষণ, আর 'বৃন্দা' কথার অর্থ হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীসনাতন গোস্বামী 'হ্লাদিনী'র অর্থ বলিয়াছেন, "হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই কথাই বাঙ্গালা পয়ারে বলিলেন—

"সুখরূপী কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥"

হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ এই দুই চরণে কথিত হইয়াছে। প্রথম চরণ স্বরূপ লক্ষণ, আর দ্বিতীয় চরণ তটস্থ লক্ষণ।

"সুখ-রূপ কৃষ্ণের সুখ-আস্বাদন" যে স্থানে ও যে অবস্থায় নিত্য ও বাধাহীন, সেই

স্থান বা সেই অবস্থার নাম বৃন্দাবন। অথবা আনন্দরূপে শ্রীভগবানের নিত্য প্রকাশ যে চিন্ময় ভূমিতে হইয়া থাকে, তাহারই নাম বৃন্দাবন। "হ্লাদিনীর সার প্রেম" সুতরাং প্রেমের বিজয় যেখানে বাধাহীন, আনন্দ যেখানে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং-প্রকাশ, সেইখানে বৃন্দা-বন। ব্রহ্মসংহিতা নামক গ্রন্থ, যাহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দক্ষিণাপথে সংগ্রহ করিয়া আমা-দের দেশে আনিয়াছিলেন, এবং যে শ্রীগ্রন্থ তিনি স্বয়ং আদরপূর্ব্বক আস্বাদন করিতেন, সেই গ্রন্থে নিত্য বৃন্দাবনের কথা আছে, আর শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহার প্রাকট্যের কথা আছে। লীলার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনও প্রকটাপ্রকট।

সহজ কথায় বৃন্দাবন বলিতে প্রেমের বিজয় বা হ্লাদিনী শক্তির স্থায়িত্ব-লাভ বুঝায়। আমাদের চৈতন্যের অবস্থা আলোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে এখানেও শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিলাস হয়। আমাদের চৈতন্যেও প্রেমের বা আনন্দের স্পর্শ আছে। চিন্তা করুন সে স্পর্শ কেমন? তাহা স্থায়ী নহে, তাহা ক্ষণিক। কেবল তাহাই নহে, তাহা বিদ্যুৎ-বিকাশের মত—তাহা "'ক্ষণ-প্রভা' প্রভা-সম বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে।"

আনন্দ আর প্রেম একই জিনিষ। "আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।" আমা-দের চেতনায় আনন্দের ক্রিয়া আছে, তাহা বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টভাবেই বিচারিত হইয়াছে। পঞ্চদশী গ্রন্থের শেষ অর্থাৎ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের নাম "ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ।" সেখানে বলা হইয়াছে, অখণ্ড-রস-স্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিই এই বিষয়ানন্দের পরম আনন্দ রূপী এবং বিষয়ানন্দ এই পরমানন্দের কলামাত্র; ইহাই জীবসকল উপভোগ করিয়া থাকে।

এই হ্লাদিনী শক্তিকে প্রাচীন গ্রন্থে বিদ্যুতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এইবার ভাবুকের ভাষা ব্যবহার করা যাইতেছে। আমাদের ভাগ্যাকাশে বিদ্যুল্লতা যে আসেন না, তাহা নহে। তিনি আসেন কিন্তু চলিয়া যান, 'আঁধারে ও মরু-মাঝারে' ফেলিয়া যান। আমরা পাই কেবল বজ্রের গর্জ্জন, বা বজ্রাঘাত, দারুণ দাহ এবং পর-মুহূর্ত্তে ঘনীভূত বর্দ্ধিত অন্ধকার। সংস্পর্শজ ভোগ দুঃখ-যোনি, ইহাই গীতার মত।

কিন্তু নৈরাশ্যের কারণ নাই। বৃন্দাবনের লোকেরা বলিতেছেন, এক নবজলধর আছেন, সেই নবজলধরের গায়ে এই চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা স্থিরা, আর এই নবজলধরের কার্য্য "লীলামৃত-ধারা-বর্ষণ।" অমৃতের পুত্ররূপী মানব। কিন্তু এখন আমরা গ্রীষ্মকালের

শুষ্ক ও দাহময় ধূলি ও বালুকার মধ্যে নিপতিত বীজের ন্যায় যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, সে অমৃতের স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ যাহাকে অষ্টধা অপরা প্রকৃতি বলিয়াছেন, তাহারই মধ্যে নিপতিত অমৃতের বীজ, তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এখন বীজের উপায় কি? এখন মেঘের উদয় প্রয়োজন, আর প্রয়োজন বৃষ্টির। কৃষ্ণই সেই নবীন মেঘ, আর লীলা সেই অমৃতবর্ষণ! তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিয়াছেন—

"মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনুপিঞ্ছ তথি, পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য-উপর বরিষয়ে লীলামৃত ধার।"

৩। তিনটি অন্তরায়

প্রাচীন ভক্তগণের চিন্তা-প্রণালীর আভাস দেওয়া হইল। আমরা মোটামুটি বুঝিলাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রেমের বিজয়। এই লীলার তিনটি অন্তরায় আছে। এই অন্তরায় তিনটির কথা খুব ভাল করিয়া ভাবিতে হইবে। অন্তরায় তিনটিও নিত্য, অন্ততঃপক্ষে প্রকট-লীলায় তাহারা অবশ্যম্ভাবী। এ অন্তরায় তিনটির নাম—১। কংস ২। বেদবাদ বা বেদবাদী ব্রাহ্মণ ৩। দেবতা। এই তিনটি তত্ত্ব আলোচ্য।

৪। কংস

প্রথমেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কংসের কথা বলিতেছি। প্রারম্ভে যে সূত্র স্থাপন করা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিবেন। নিত্যকংস একটি তত্ত্ব বা চৈতন্যের একটি অবস্থা, আমাদের প্রত্যেককেই একদিন না একদিন এই অবস্থা অতিক্রম করিতে হইবে। সকলের বয়ঃক্রম সমান নহে, কেহ হয়ত অতিক্রম করিয়াছেন—তাঁহার চরণে প্রণাম! কেহ হয়ত এখন কংস-রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন, আবার অনেকে এখনও এতদূর আসেন নাই, এখনও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে, তাহার পর এই কংসের নিকট আসিবেন। এই নিত্যকংস। যিনি প্রকট বা ঐতিহাসিক কংস, তিনি এই নিত্যকংসের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা স্থূল প্রকাশ। শ্রীমদ্ভাগবত বা ভারতবর্ষীয় লীলাবাদ আলোচনা করিতে

হইলে এই সূত্রটি সর্ব্বদাই ধরিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা পদস্খলন বা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য পুনর্ব্বার ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে কংসের কথা বলিতেছি।

কংস রাজপুত্র। প্রথম যখন তাহার সহিত দেখা হইল, তখন সে নিতান্ত মন্দ লোক নহে। বরং সাধারণ সাংসারিক হিসাবে সে ভাল লোক। দেবকী তাহার ভগিনী, সহোদরা নহে, তবে সম্পর্ক নিকট। বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ হইয়াছে, সমারোহের বিবাহ। আজ বিবাহের পর দিন, খুব ঘটা করিয়া বসুদেব নববধূকে লইয়া বাড়ী যাইতেছেন। সঙ্গে বহু লোকজন। স্বর্ণমালায় অলঙ্কৃত চারিশত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুই শত দাসী, তদ্ব্যতীত বিবিধ বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতেছে। বিশাল সমারোহ-পূর্ণ শোভাযাত্রা। সকলেই আনন্দিত। অন্যান্য সকলের ন্যায় কংসেরও হৃদয় আনন্দ-পূর্ণ। দেবকী ও বসুদেব, যে সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়াছেন, কংস সেই রথের সারথী হইয়া অশ্বের লাগাম-হস্তে রথ-চালনা করিতেছে। পরমানন্দে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল। দৈববাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিল "অরে, মূর্খ, আজ তুই তোর যে ভগ্নিকে আদর করিয়া রথে তুলিয়া নিজে রথ চালাইয়া লইয়া যাইতেছিস্, তোর এই ভগ্নির অষ্টমগর্ভে যে জন্মগ্রহণ করিবে সে তোর "হত্যাকারী"। ক্রম-সন্দর্ভটীকায় বলা হইয়াছে—"শত্রুজনয়িত্রী-বহনাৎ স্বমরণাজ্ঞানাচ্চ মূর্খঃ" নিজের শত্রুর জনয়িত্রীকে বহন করিতেছিস্ এবং নিজের মরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, অতএব তুই মূর্খ।

কংস এই দৈববাণী শুনিল। কংস যাহা করিল তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু সেকথা এখন থাকুক। প্রথমে আমাদের চিন্তা করা যাউক, কংস যখন একজন মানব, তখন তাহার কি করা উচিত? কংস এই দৈববাণীর ব্যাপারটিকে যত ভয়ানক বলিয়া মনে করিল, বাস্তবিক তাহা তত ভয়ানক নহে। এ কথা বসুদেব কিছুক্ষণ পরে কংসকে বুঝাইয়া দিবেন। এই দৈববাণী শুনিয়া কংস যদি ভাবিতে পারিত যে "দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান আমাকে হত্যা করিবে! সে অনেক দিনের কথা। আমি যখন দেহধারী, আমার যখন জন্ম হইয়াছে, তখন আমাকে মরিতে হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে প্রকারেই হউক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র

আমাকে হত্যা করিবে, সেজন্য দেবকী কি করিবে ? তাহার অপরাধ কি ? সে বালিকা, বিবাহের পর পতিগৃহে যাইতেছে, আজ এই আনন্দের উৎসব। দৈববাণী যাহা বলিলেন তাহা যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও এখন সে সম্বন্ধে কিছুই করিবার নাই। তাহার পর দৈববাণী ! ভবিষ্যতের কথা ! সত্য কি মিথ্যা কে বলিতে পারে ?" এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস ধীরচিত্তে এই দৈববাণীকে আপাততঃ অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারিত। কংস যদি তাহা করিতে পারিত, তাহা হইলে কংসের জয় হইত। কিন্তু তাহা হইল না।

কংস অন্য প্রকারে চিন্তা করিল। আর কংসের যে চিন্তা, তাহাকে চিন্তা না বলাই সঙ্গত। দৈববাণী শুনিয়া কংস উত্তেজিত, আত্মহারা ও অধীর হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই প্রকারের একটা চিন্তা উঠিল—"আমি !" "আমি মরিব !" "হায় হায় সে কি নিরানন্দ ! সে কি দুঃখ ! আমি মরিতে চাই না !" "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। * * আমি বাঁচিবারে চাই।" "দেবকী !" "দেবকীর পুত্র আমায় মারিবে ? "আমার হত্যাকারীর জন্ম হইবে দেবকীর গর্ভে" "দাঁড়াও দেবকীকে মারিয়া ফেলিতেছি, দেখি আমার মরণ কি প্রকারে কোথায় জন্মগ্রহণ করে !" ইহাই কংসের চিন্তা। শেষ সময়ে কংস চিন্তা করিল দেবকী যেন বৃক্ষ, আর আমার মৃত্যু,—সে যেন এই বৃক্ষের একটি ফল। আজ যদি আমি এই বৃক্ষকে নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে হে আমার মরণ ! জন্মাইবে কি করিয়া ? তুমি জন্মাইবার গাছ না পাইয়া নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া যাইবে—আর তাহার ফলে আমি অমর হইব ! এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস এক সুশাণিত খড়্গ হস্তে লইয়া দেবকীর চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল। নিকটে ও চতুর্দ্দিকে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই। আর অসহায়া দেবকী থর থর কাঁপিতেছে। বসুদেবও বীর, কিন্তু তিনি দৈহিক শক্তির বীরত্ব প্রকাশ করিলেন না, তিনি নিমেষমধ্যে কংসের হাত ধরিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন ও অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

বসুদেব যাহা বলিলেন তাহা অত্যন্ত গভীরার্থপূর্ণ। তাহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে কংস কি তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি প্রথমে কংসের প্রশংসা করিলেন। তাহাকে বলিলেন "তুমি বীর, তোমার গুণ প্রশংসনীয়, তুমি ভোজ-

বংশের যশস্কর।" বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন নাই, বসুদেব চাটুবাক্য বলেন নাই। বসুদেবের দেখিবার প্রণালী সাধারণ মানুষের দেখিবার প্রণালী হইতে পৃথক্। আসুন আমরা বসুদেবের চক্ষু ও হৃদয় লইয়া বসুদেবের কথাগুলি আলোচনা করি। কংস বেচারা বাঁচিতে চায়, মৃত্যুর যাহা নিদান সে তাহার মূলচ্ছেদ করিতে চাহে। ইহাতে তাহার অপরাধ নাই। তবে বেচারা অজ্ঞান, সে কিছুই জানে না। কি করিলে সত্য সত্য অমরতা লাভ করা যায়, তাহা সে জানে না—তাহার অমৃত-পিপাসা প্রশংসনীয়, তবে অজ্ঞান বলিয়া অমৃত লাভের প্রকৃত উপায় কি, তাহা সে জানে না। ইহাই তাহার অপরাধ, অজ্ঞানতাই এই অপরাধের হেতু, সুতরাং তাহার উপর রাগ করিয়া কি হইবে ? বরং তাহাকে ভালবাসিয়া বা তাহার অন্তরের অন্তরে যে ভাল জিনিষটুকু আছে সেটুকু দেখিয়া তাহাকে তাহার অধিকারানুযায়ী সুপথ প্রদর্শন করাই উচিত। বসুদেব তাহাই করিলেন।

তাহার পর বসুদেব কংসকে বুঝাইলেন যে এই সংসারে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব। দেহের জন্মের সহিত মৃত্যুরও জন্ম হয়—সুতরাং ভাই কংস, আজ যদি তুমি দেবকীকে মারিয়াই ফেলিতে পার, তাহা হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ত্রিংশৎ শ্লোকে বসুদেবের উপদেশের যাহা প্রধান কথা তাহা বলা হইয়াছে, সেই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই,—দেখ ভাই কংস, আমাদের সকলেরই চিরদিন বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা। তোমারও সেই ইচ্ছা আছে, ইহা দোষের নয়, ইহা প্রশংসার। কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কে চিরদিন বাঁচিতে চায় ? সে কি এই দেহ ? না তাহা নহে। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। নিম্নে একটি সরোবর, তাহার জল বাতাসে কাঁপিতেছে। চাঁদের প্রতিবিম্ব সেই সরোবরে পড়িয়াছে, কিন্তু জল কাঁপিতেছে বলিয়া প্রতিবিম্বটি বড়ই অস্থির, কেবল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একজন লোক সরোবরের জলে চাঁদের যে ছবি পড়িয়াছে, তাহাই দেখিতেছে। সে লোকটি ঐ প্রতিবিম্ব দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছে, তাহার মনের ইচ্ছা স্থির পূর্ণচন্দ্র দেখি। কিন্তু সরোবরের বুকে প্রতিবিম্বিত ছবিটি কিছুতেই স্থির হইতেছে না, কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হইতেছে না, কেবল ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সেই লোকটি একবার চাঁদের ছবিকে, একবার সরোবরকে,

একবার সেই তরঙ্গগুলিকে কাতর স্বরে অনুনয় করিয়া বলিতেছে, 'ও সরোবর, ও তরঙ্গ, ও চাঁদ, স্থির হও, তোমাদের পায়ে ধরি স্থির হও। আমি পূর্ণ অচঞ্চল চাঁদ চাই।" অনেক অনুনয় করিয়া কিছুই হইল না, তখন করুণ রসের অভিনয় ছাড়িয়া ঐ লোকটি বীররসের অভিনয় আরম্ভ করিল, অর্থাৎ একগাছি লাঠি লইয়া, বা তরবারি লইয়া ঐ তরঙ্গকে বা সরোবরকে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে ফল বিপরীত হইল অর্থাৎ প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য না কমিয়া আরও বাড়িয়া গেল। এখন উপায় কি? এই লোকটির মনে চাঁদকে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় দেখিবার বা পাইবার ইচ্ছা, জাগ্রত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই চাঁদ আকাশে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে। এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে চাঁদ আকাশে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে বলিয়াই ঐ লোকটির মনে অচঞ্চল ও পূর্ণাঙ্গ চন্দ্র দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, নতুবা তাহার মনে ঐ প্রকারের ইচ্ছারই উদ্গম হইত না। এখন লোকটি কি করিবে? সে নীচের দিকে চায় কেন? সে সরোবরের দিকে চায় কেন? সে ছায়াকে কায়া মনে করে কেন? এ যে ছায়া, এ যে সংসার! ইহা তো স্থির হইতে পারে না। আগুনকে যদি কেহ বলে, "ভাই আগুন, তুমি শীতল হও।" তাহা হইলে আগুন বলিবে "ভাই, আমি যদি শীতল হই, তাহা হইলে আমি যে আগুনই থাকিব না।" তেমনই সংসারকে যদি কেহ স্থির হইতে বলে তাহা হইলে সংসার বলিবে "স্থির হইলে আমি যে সংসারই থাকিব না।" তেমনি "ভাই কংস, তুমি বাঁচিতে চাও খুব ভাল কিন্তু শরীর লইয়া তো বাঁচিবে না। শরীরের স্বভাবই শীর্ণ হওয়া, ধ্বংস হওয়া।"

বসুদেব কংসকে নানা প্রকারে বুঝাইলেন। কংস অবশ্য বসুদেবের সমুদয় কথা বুঝিল না। বসুদেবের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলে কংস আর কংসই থাকিবে না। সাধারণ অভিধানে 'কম' ধাতু হইতে 'কংস' পদটি নিষ্পন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে, 'কসি' ধাতু হইতে 'কংস' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কসি ধাতোঃ 'শাতনার্থত্বাৎ" 'শাতন' শব্দের অর্থ বিনাশন। নিজে বাঁচিবার জন্য যে জগৎকে বিনাশ করিতে চায়, সেই কংস। সুতরাং বসুদেবের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা কংসের পক্ষে অসম্ভব।

বসুদেব সর্ব্বশেষে বলিলেন "দেখ, ভাই কংস, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। দেবকীর

পুত্র জন্মাইলে আমি সেই পুত্র তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। তাহাকে লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও।"

বসুদেবের কথায় কংস দেবকীকে হত্যা করিল না। এইবার কংসের অবশিষ্ট কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। মাতা দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া, অকথ্য প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করার পর সেই সন্তানটিকে প্রসব করিয়াছেন। সুন্দর সুকুমার শিশু, যেন নন্দনের বিকশিত পারিজাত ফুল, দেবতার আশীর্ব্বাদ,—অতীত শতজন্মের তপস্যার ফল, যেন মূর্ত্তিমান হইয়া কোল আলো করিয়া আসিয়া উপস্থিত। ভাবস্তিমিত নেত্রে নবীনা জননী শিশুর মুখের পানে চাহিয়া আছেন—শিশুর নয়নে বৈকুণ্ঠের অম্লান জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া জননী পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছেন! এমন সময়ে নিষ্ঠুর কংস আসিয়া মায়ের কোল হইতে সেই শিশুটিকে বজ্রমুষ্টিতে কাড়িয়া লইয়া শাণিত তরবারির আঘাতে তাহার শিরচ্ছেদ করিতেছে! নির্ম্মল সুন্দর শিশুর শোণিতে পৃথিবীর বুক ভাসিয়া গেল। আর জননী—"হা পুত্র! হা বিধাতঃ" এই বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। "হায় কংস! কি করিতেছ? ঐ শিশু তোমার কি করিয়াছে?" কংস বলে "ঐ শিশু যে নির্দ্দোষ তাহা তো আমি জানি,—কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে।" আচ্ছা, পার যদি বাঁচো। দেবকী ও বসুদেবের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ আর কেহ নাই। তাঁহারা স্বপ্নেও কখন শত্রুরও অনিষ্ট চিন্তা করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিহ্বল, বিশ্বকল্যাণ ব্যতীত তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাঁহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া, কংস তাঁহাদের দুই জনকে অন্ধকারময় কারাগারের কক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। "হায় কংস! কি করিতেছ, উঁহারা পরম সাধু, ইহা কি তুমি জান না?" কংস বলে—"উহারা সাধু এবং নিরপরাধ, তাহা তো বেশ ভাল করিয়াই জানি, কিন্তু আমাকে তো বাঁচিতে হইবে!" আচ্ছা বাপু, পার যদি বাঁচো।

এই কংস। সে এই দেহ লইয়া বাঁচিতে চায়। কেবল দেবকী বসুদেবের সন্তান নয়। রাজ্যের যত ছেলে, কাহারও নিস্তার নাই। পিতা কাঁদিতেছে, মাতা কাঁদিতেছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে! নিরপরাধ শিশুগণকে ছলে বলে কৌশলে বিনাশ করিতেছে। কত পিতামাতার নয়নের তারা, কত বংশের একমাত্র প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কেন? কংসকে বাঁচিতে হইবে। ইহারই নাম কংস।

রাজ্যের নিরপরাধ শিশুগণকেই হত্যা করিয়া কংস প্রতিনিবৃত্ত হইল না। যাহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, গো, তপস্যা, যজ্ঞ সকলেরই উপর সন্দেহ। দয়ালু, পরোপকারী, সত্যবাদী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ মনুষ্যের নিস্তার নাই। এই কংসের স্বভাব।

কংস বাঁচিতে চায়। তাহাতে আপত্তি নাই, সকলেরই বাঁচিতে চাওয়া উচিত। কিন্তু দেহাত্মবাদী, ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব কংস, এই দেহ লইয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য বাঁচিতে চায়। এই ইচ্ছা পূরণের জন্য সে একদিকে, আর সমগ্র জগৎ একদিকে। কিন্তু তাহাতে তাহার দৃক্‌পাত নাই। ইহাই কংসের তত্ত্ব।

মরণকে স্বীকার করিয়া বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিবে যে, সেই অমৃতত্ব লাভ করিবে; সেই লীলা দর্শন করিবে; কিন্তু কংস বৈরাগ্য বোঝে না। আজ যদি কংসের কোন অনুচর আমাদের এই ভারতবর্ষে লোক-শিক্ষকের আসনে বসিতে পারিত, তাহা হইলে সে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত যে বৈরাগ্যের সাধনা করিয়াই ভারতের এই দুর্দ্দশা। অতএব বৈরাগ্য-সাধন দেশ হইতে উঠাইয়া দাও। দেশের লোককে ভোগপরায়ণতায় দীক্ষিত কর। আজ যদি কংসের কোন অনুচর আমাদের দেশে দার্শনিক পণ্ডিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে যজ্ঞ, তপস্যা আদি অনুষ্ঠানগুলি লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে নিষেধ করিত। আজ যদি কোন কংসের অনুচর আমাদের দেশে মাসিক কাগজের কর্ত্তা হইয়া আসিত, তাহা হইলে অবতারবাদ যে মিথ্যা—অসাধারণ মানুষ বলিয়া যে কোন জিনিষ নাই, আমাদের মত সাধারণ মানুষেই সমস্ত ব্যাপার চালাইতেছে, ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিত। প্রকৃত কথা এই—কংস তিনটি জিনিষ বুঝিত না। প্রথমতঃ সে বুঝিত না যে আমার যাহা ভাল লাগে, তাহারই অনুবর্ত্তন করিলে চলিবে না। বিবেক ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মন জয় করা আবশ্যক, নতুবা সত্যের সহিত পরিচয় হইবে না। কংসকে কেহ মূর্খ বিবেচনা করিবেন না। কংস, দেবকী ও বসুদেবের সন্তানগুলি একে একে বিনাশ করিয়া শেষে তাঁহাদের বেশ দার্শনিক পণ্ডিতের মত একটা বক্তৃতা শুনাইয়াছেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ও দেহের ভোগের জন্য উন্মত্ত কংস—কিন্তু সে কথা বলে দার্শনিক পণ্ডিতের মত। দ্বিতীয়তঃ কংস বোঝে না যে এই জগৎ কেবল আমাদের মত মানুষের খেয়ালের দ্বারাই চলে না। দেবতা সত্য, ঋষি সত্য, পিতৃলোক

সত্য। তাহাদের একটা শাসন আছে। যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, কর্ম্ম, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি এই দেবশাসনের আনুকূল্য করিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেবশাসনের বিরুদ্ধে যাইবার কাহারও শক্তি নাই, কারণ এই দেবশাসন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ এই শাসনের অনুবর্ত্তনের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। প্রত্যক্ষবাদী বা জড়বাদী মানুষ অহঙ্কারের দ্বারা চালিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহে কিন্তু দাঁড়াইতে পারে না। তৃতীয় কথা, ভগবৎ-শক্তির বিশেষ আবির্ভাব, ইহাও কংস বোঝে না। কংসের চরিত্রে এই তিনটির অভাব—১। বৈরাগ্য, ২। অবতারে বা ভগবদাবির্ভাবে বিশ্বাস, ৩। দেবশাসন বা যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতির উপযোগীতা। কংস বাঁচিতে চায়, দেহ ও ইন্দ্রিয় লইয়া—কংস জয়ী হইতে চায় বিশ্বব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ বৃন্দাবনের অন্তরায়। তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয় লক্ষণটি আছে, কিন্তু প্রথম দুইটি নাই। আর দেবতাদের মধ্যে কেবল বৈরাগ্য নাই, অপর দুইটি আছে। একথা আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

কংসের একটা পরীক্ষা হইয়াছিল। দৈববাণীই সেই পরীক্ষা। আমরা বলিয়াছি, কংস সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই পরীক্ষাটি কি, একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যাউক। আমি আর আনন্দ, এই দুইটি জিনিষ আছে। প্রত্যেক মানুষের বা প্রত্যেক সাধকের নিকট পুনঃ পুনঃ একটি প্রশ্ন আসিয়া উদিত হয়। প্রশ্নটি এই,—আনন্দে আমি না আমাতে আনন্দ? কাহার জন্য কে? আমার জন্য আনন্দ, না আনন্দের জন্য আমি? যে বলিবে—আমাতে আনন্দ বা আমার জন্যই আনন্দ, সে যাইবে অহঙ্কারে বা কংসপুরে; আর যে বলিবে - আনন্দের জন্য আমি বা আনন্দে আমি, সে যাইবে প্রেমে বা বৃন্দাবনে। কংসকে যখন দৈববাণী বলিল যে "কংস তুই মরিবি।" কংস তখন বিবাহের শোভাযাত্রায় অন্য সকলের সঙ্গে মিশিয়া অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু দৈববাণী শুনিবামাত্র কংস ভাবিল—'আমি মরিব! তবে আনন্দ থাকিবে কোথায়?' এই চিন্তাতেই কংস পরাস্ত হইল। যদি সেদিন বলিতে পারিত—"আমি তো মরিতেই আসিয়াছি! একথা বলিয়া ভয় দেখাইতেছ কেন? আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, আনন্দ জয়যুক্ত হউক"—তাহা হইলে কংস জয়ী হইত।

এইবার কংস বেচারার অদৃষ্টের কথা ভাবুন। আনন্দ আসিলেন—তিনি বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন। চেতন, অচেতন, পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গম কেহই বাদ যায় নাই, সকলেই অমৃত লাভ করিল, কিন্তু কংসের অদৃষ্টে লাভ হইল কি? মৃত্যু। আমরা যেন কংসের হস্তে পরিত্রাণ পাই, আমরা যে আনন্দের জন্য—ইহা যেন বুঝিতে পারি। আনন্দ আমাদের নয়, আমরা আনন্দের—এইটুকু যেন বুঝিতে পারি।

৫। উগ্রসেন ও যদুবংশ ধ্বংস

বৃন্দাবনের প্রথম অন্তরায় কংস যে কেমন, তাহা আমরা মোটামুটি দেখিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রারম্ভেই এই কংসের কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্ব-রূপী কংস, বা নিত্য কংসকে ধরিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অংশ ধীরভাবে আলোচনা করিলে পৌরাণিক ঋষির যাহা অভিপ্রায়, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথমে কংসের কথা, আর একাদশ স্কন্ধের প্রথমে যদুবংশের ধ্বংসের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। কংসের ভিতরে যাহা ছিল, তাহা যে কেবল কংসের মধ্যেই ছিল তাহা নহে। অল্পবিস্তর পরিমাণে অনেকের মধ্যেই ছিল। কেবল 'ছিল' বলিতেছি কেন, আছে ও থাকিবে। কংসবধ হইয়া গেল, কিন্তু কংসের বিষ গেল না। ক্রমে ক্রমে জরাসন্ধ গেলেন, শিশুপাল, দন্তবক্র গেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন গেলেন, কিন্তু বিষ গেল না। শেষে যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণও লীলা সংবরণ করিলেন, পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিলেন, স্বর্গারোহণ হইয়া গেল, দ্বাপর গেল, কলি আসিল, কলিরও পাঁচ হাজার বৎসর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কে বলিবে, কংস নাই? কে বলিবে কংস ধ্বংস হইয়াছে? পুরাণের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, নিত্যলীলার এই রহস্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদুবংশ কি প্রকারে ধ্বংস হইল, তাহার আলোচনা করিলে আমরা ঐ কংসকেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে কংসের কথা শুনিয়াও যদি কেহ ঠিকমত কংসকে না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে একাদশ স্কন্ধের এই যদুবংশ ধ্বংসের কথা শুনিবেন, কংসকে বুঝিতে অনেকটা সুবিধা হইবে।

মহাভারতের মৌসল-পর্ব্ব আছে, সেখানে আটটি অধ্যায়ে এই করুণ ও ভীষণ

ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই একই কথা, কিন্তু বর্ণনার একটু প্রভেদ আছে। মহাভারত ইতিহাস, আর শ্রীমদ্ভাগবত কেবল পুরাণ নহে, মহাপুরাণ, এ কথাটিও মনে রাখা দরকার। মহাভারতের মৌসল-পর্ব্বে উগ্রসেনের কথা নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় উগ্রসেনের কথা আছে। উগ্রসেন কংসের পিতা। কংসের যাহা ধর্ম্ম, তাহা উগ্রসেনের মধ্যেও ছিল; তবে পিতার মধ্যে তাহা বেশ ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই, পুত্রের মধ্যে তাহা সুপরিস্ফুট। কাজেই কংসকে বেশ ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, এই যদুবংশ ধ্বংসের বেদনাময়ী কথা একবার স্মরণ করায় লাভ আছে।

ব্যাপার এই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজবংশ অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও অবস্থা মলিন, সে শৌর্য্য বীর্য্য আর নাই। এখন যদুবংশের সম্মান খুব অধিক। রাজসূয় যজ্ঞের দিন ভীষ্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিতে, কারণ দেবব্রতই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণই ভারত-বর্ষের আত্মা। শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষ তাঁহার সে দিনের যুগবাণী ঘোষণা করিতেছিলেন। দেবব্রত ভীষ্ম তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার ফলে বুঝিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণই কালাত্মা। কিন্তু তখনও শিশুপাল প্রবল, ভীষ্মের চেষ্টা সফল হয় নাই। বাঁচিয়া থাকিতে ভীষ্ম যাহা করিতে পারেন নাই, স্বেচ্ছায় শরশয্যা আশ্রয় করিয়া, মৃত্যুকে বরণ করিয়া, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে করিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন ভারতবর্ষে, অবশ্য মৃতপ্রায় দুর্ব্বল ভারতবর্ষে, স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের দ্বারা যদুবংশ এখন ভারতবর্ষে একরূপ সর্ব্বোচ্চ সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। বংশের সম্মান খুব বাড়িয়াছে, কিন্তু বংশের ছেলেগুলি সেই সম্মানের উপযুক্ত হয় নাই; কেবল তাহাই নহে, যাঁহার জন্য এই সম্মান, তাঁহাকেও ভাল করিয়া চিনিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে নাই।

ভিতরের এই অব্যবস্থা শীঘ্রই বাহির হইয়া পড়িল। বিশ্বামিত্র, নারদ প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ একদিন দ্বারকানগরের পথে যাইতেছেন। যদুবংশীয় বালকগণ পথে খেলা করিতেছে। মহর্ষিদের দেখিয়া তাহাদের মনে হইল, এই সব প্রাচীন মহর্ষি, ইঁহাদের সহিত যদি কৌতুক করা না যায়, তাহা হইলে জীবনই বিফল? কি প্রকারের কৌতুক করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইল না, মস্তিষ্ক খুব উর্ব্বর! জাম্ব-

বতীর পুত্রের নাম সাম্ব। সাম্ব বালক, দেখিতে স্ত্রীলোকের মত। একজন সাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সাজাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষিগণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল—"দেখুন, আপনারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই জানেন। এই বালিকাটি গর্ভবতী, ইহার কি সন্তান হইবে তাহা জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা, লজ্জায় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না ; আপনারা দয়া করিয়া যদি বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা বড়ই অনুগৃহীত হই।"

প্রাচীন মহর্ষিগণ বালকদের ব্যবহার বুঝিলেন, তাঁহারা যে রুষ্ট হইলেন, তাহা নহে। তাঁহারা যেন ধ্যানযোগে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অনুভব করিয়া বলিলেন—"ইহার গর্ভে, একটি কুলনাশন মুসলের জন্ম হইবে।" এই বলিয়া মহর্ষিগণ চলিয়া গেলেন।

সাম্বের উদর কিসের দ্বারা স্ফীত করা হইয়াছিল, তাহা সকলে জানিত না। মহর্ষিদের কথা শুনিয়া তাহারা উপরের আবরণ-বস্ত্র সরাইয়া দেখিল, সত্যই একটি মুসল রহিয়াছে। একটু চিন্তা হইল। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—"একটি মুসলের জন্ম হইবে। সেই মুসল তোমাদের কুলনাশন হইবে।" ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক অংশ ফলিয়াছে। সাম্বের উদরে কাপড়ের নীচে যে মুসল আছে, ইহা মহর্ষিগণ কেমন করিয়া বুঝিলেন? প্রথম অর্দ্ধাংশ যখন মিলিয়াছে, তখন শেষ অর্দ্ধাংশও ফলিতে পারে। বালকগণের মনে এই প্রকারের একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা ঐ মুসলটি লইয়া উগ্রসেনের নিকটে গেল। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যায় নাই, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। মহাভারতের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের এই স্থানে একটু প্রভেদ আছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিতেছি। উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বালকেরা যখন সকল কথা বলিল, তখন উগ্রসেন বালকদের তিরস্কার করিলেন না, বা তাহাদিগকে বলিলেন না যে, মহর্ষিগণের চরণে ধরিয়া অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা কর।

উগ্রসেন চিন্তা করিতেছেন। কংস দৈববাণীতে শুনিয়াছিল,—"দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র তোর হন্তা হইবে।" এই কথা শুনিয়া কংস যে পদ্ধতিতে চিন্তা করিয়াছিল, মহর্ষিগণের অভিশাপ বা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া উগ্রসেনও ঠিক্ সেই পদ্ধতিতে চিন্তা করিলেন। কংস ভাবিয়াছিল, "দেবকী আধার, আর আমার মৃত্যু এই আধারকে আশ্রয়

করিয়া আসিবে, সুতরাং আজ যদি এই আধার নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর মরণ কি প্রকারে আসিবে?" উগ্রসেন চিন্তা করিল,—"এই মুসলটি করণ, এই মুসলের সাহায্যে যদুবংশের যে বিনাশ, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং বিনাশের যন্ত্ররূপী এই মুসলটি যদি এখনই নষ্ট করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে কুলনাশ আর কি প্রকারে আসিবে?"

বসুদেবের জন্য কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে পারে নাই। বিনাশ করিলে, কি প্রকারে কংসের মৃত্যু আসিত, তাহা আমরা জানি না, তবে মৃত্যু যে আসিত, যাহা অবশ্যাম্ভাবী, তাহা যে অবশ্যই ঘটিত, ইহাতে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নাই। উগ্রসেন ব্যবস্থা করিলেন—"এই মুসলের দ্বারা কুলনাশন হইবে, আচ্ছা এই মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও, কেমন করিয়া মরণ আসে দেখা যাউক।"

উগ্রসেনের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যে পরিণত হইল। মুসলটিকে চূর্ণ করা হইল। সমগ্র মুসল চূর্ণ হইল না, তাহার ভিতরের সামান্য একটু অংশ যেমন তেমনই থাকিয়া গেল। সমস্তটা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই লোহার গুঁড়ার সহিত সমুদ্রের জলের যোগ হইলে কি যে রাসায়ণিক ক্রিয়া হইল, তাহা ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। লৌহচূর্ণগুলি সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া প্রভাসের সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হইল। তাহা হইতে এরকা নামক এক প্রকার তৃণের জন্ম হইল। সে তৃণ কেমন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু একদিন এই তৃণ মুসলের কাজ করিল এবং ইহারই আঘাতে যদুবংশীয়গণ পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিল।

এদিকে যে লৌহখণ্ড চূর্ণ হয় নাই, তাহা ফেলিয়া দিবামাত্র একটি সমুদ্রের মৎস্য আসিয়া গ্রাস করিল। এক ধীবর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে দৈবক্রমে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল। মাছটিকে ছেদন করিতে গিয়া ধীবর লৌহখণ্ড প্রাপ্ত হইল। ঐ ধীবরের সহিত এক ব্যাধের বড় বন্ধুতা ছিল। ব্যাধের নাম জরা। তাহার তীরের একটি লৌহফলক হারাইয়া গিয়াছিল। সে যখন খবর পাইল তাহার ধীবর বন্ধু এক সামুদ্রিক মাছের পেট হইতে একখণ্ড ইস্পাত পাইয়াছে, তখন সে অনায়াসেই ঐ ইস্পাত খণ্ড বন্ধুর নিকট সংগ্রহ করিয়া তীরের ফলক করিয়া লইল। উগ্রসেন ও তাঁহার বন্ধুগণের অজ্ঞাতসারে কালচক্রের স্বাভাবিক ঘূর্ণনে মুসল তাহার কুলনাশন কার্য্যের আয়ো-

জন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিল—জরা ব্যাধের তীরস্পর্শে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়া যদুর শের ধ্বংসাভিনয় সম্পূর্ণ করিলেন। এই গেল উগ্রসেনের ব্যাপার! এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে—কংস কি এবং উগ্রসেনই বা কি? ইহারা বাঁচিতে চায়, কিন্তু অমরতার উপায় অন্বেষণ করে বাহিরে।

কেবল কংস আর উগ্রসেনের কথা বলিলেই ইহাদের ইতিহাস শেষ হইবে না। হিরণ্যকশিপুও ঠিক্ এই পথে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু দৈব সহস্রবৎসর কাল মন্দর পর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যার জোরে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কেবল উপস্থিত হওয়া নহে, সৃষ্টিরক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়া তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইলেন।

হিরণ্যকশিপুও অমরতা চাহে। ব্রহ্মাকে বলিল—"আমায় অমর বর দিন।" ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি নিজেই অমর নহি, আমি তোমায় অমর বর কেমন করিয়া দিব?" হিরণ্যকশিপু বলিল,—"তবে আমার বর লওয়ার প্রয়োজন নাই।" সে আবার সুতীব্র তপস্যা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা আসিয়া বর লইবার জন্য সাধাসাধি আরম্ভ করিলেন। হিরণ্যকশিপু চাতুরী করিয়া এমন বর লইল, যাহাতে দুই দিক্ আগলাইয়া রাখিতে পারে। "দিবসে মরিব না, রাত্রিতে মরিব না। আকাশে মরিব না, পৃথিবীতে মরিব না। মানুষে মারিবে না, পশুতে মারিবে না।" ইহাই ছিল হিরণ্যকশিপুর প্রার্থনা, আর সৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিল, প্রকারান্তরে অমর হইলাম। কিন্তু দিন নয়,—রাত্রি নয়, এমন সময় আছে; আকাশ নয়, পৃথিবী নয়—এমন স্থান আছে; মানুষ নয় পশু নয়,—এমন প্রাণী আছে; হিরণ্যকশিপু তাহা বুঝিতে পারে নাই। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু তাহারই প্রমোদভবনের স্ফটিক স্তম্ভের ভিতর লুকাইয়া ছিল, আর তাহারই আত্মজ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সেই মৃত্যুকে প্রকট করিয়া দিল!

এই প্রকারে আমরা নিজের কাজেই প্রতিনিয়ত পরাজিত হই। ব্রহ্মা বহির্ম্মুখ করিয়া আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য আমরা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু তাঁহাকে যে না দেখিতে পাইবে, সে মরণ হইতে মরণের দিকেই ছুটিয়া চলিবে। কত বড় বড় মানুষ, কত বড় বড় জাতি এই প্রকারে মরিয়াছে। অমৃতের দেবতা যিনি,

প্রেমরূপে, রসরূপে, আপনাকে বিলাইয়া দিতে আসিলেন যিনি, তিনি আমাদের নিকট মৃত্যুরূপে উপস্থিত হইতেছেন। বাঁচিবার ভুল রাস্তা ধরিয়া আমরা মরিয়া যাইতেছি, এখন মরিবার ঠিক্ রাস্তা পাইলে চিরজীবনে বাঁচিয়া উঠিতে পারি। মরিবার ঠিক্ রাস্তাই বৃন্দাবনের পথ। এই গেল কংসের কথা।

কংসের বিপরীত ছবি, শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক আছে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজগোপীগণ পর্য্যন্ত, এই চিত্রের ক্রমবিকাশ। আমরা এই বিপরীত চিত্র একখানি দেখিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটি বর্ণিত হইয়াছে।

অবন্তীনগরে এক ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কদর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করিয়া বিপুল ধন-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আদৌ কোনরূপ সদ্ব্যয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত কলহ করিতেন, সকলের অপ্রিয় আচরণ করিতেন। তাঁহার ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে, পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

অকস্মাৎ ব্রাহ্মণের ধননাশ আরম্ভ হইল। গৃহদাহ, দস্যুতস্করের উপদ্রব, রাজ-পীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। এই আকস্মিক দারিদ্র্যে ব্রাহ্মণের উপকার হইল, কারণ দারিদ্র্যের সহিত বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ অতীত জীবনের দুষ্কর্ম্মের জন্য সরলভাবে অনুতাপ করিতে করিতে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলেন। দুষ্ট লোকে ব্রাহ্মণের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল। সে অত্যাচার অনির্ব্বচনীয়। ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইলেন না, এই সমুদয় অত্যাচারই তাঁহার পরীক্ষা। তিনি ভাবিতেন, এই দুঃখ সমুদয় আমার ভোক্তব্য।

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্নদেবতাত্মাগ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যঃ॥"

এই সকল দুষ্টলোক বা দেবতাগণ, গ্রহ, কর্ম্ম ও কাল, ইহারা কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে। যে মন সর্ব্বদা সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, সেই মনই ইহার হেতু। অতএব মনকেই নিগ্রহ করা প্রয়োজন। নতুবা সমস্তই ব্যর্থ।

"দানং স্বধর্ম্মো নিয়মোদমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥"

দান, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম ও ব্রতাচরণ, এ সমুদয় মনের নিগ্রহের উপায়মাত্র, কিন্তু মনের যে সমাধি, তাহাই পরমযোগ।

"সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চদপরং কিমেভিঃ॥

যাঁহার মন প্রশান্তভাবে সমাহিত হইয়াছে, দানাদিদ্বারা তাহার আর কি কার্য্য হইবে, আর যাহার আলস্যাদি দ্বারা মন অসংযত হয়, তাহার দানাদি দ্বারাই বা অপর কি কার্য্য হইবে? এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের মন যখন সমাহিত হইল, যখন সংসারের তরঙ্গাঘাত হইতে তিনি আপনাকে নির্মুক্ত করিলেন, তখন তিনি পরাত্মনিষ্ঠার যে সনাতন পথ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিলেন যে, মুকুন্দ-চরণ-পদ্ম সেবা দ্বারা আমি এই ঘোর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

ব্রাহ্মণের এই অবস্থায় কথিত শ্লোকটি এই—

"এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন এই শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন।

"চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈলা সব রাঢ় দেশে॥
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সাংবেশ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ॥

সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবনে গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

এই পথ বৃন্দাবনের পথ—কংসের পথ ইহার বিপরীত।

৬। বেদবাদ

বৃন্দাবনের প্রথম অন্তরায় কংস, আর দ্বিতীয় অন্তরায় বেদবাদী ব্রাহ্মণ। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, অনেকে ব্রাহ্মণ হইয়া পবিত্র বংশে জন্মিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বর্গলাভের কামনায় সমারোহ করিয়া যজ্ঞ করেন। তাঁহাদের ধারণা স্বর্গই চরম বস্তু। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ ও মূঢ় তাহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে আপাতসুখকর যে সমুদয় স্বর্গভোগের কথা আছে, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায় এবং মনে করে স্বর্গসুখই মানবের প্রাপ্তব্যের শেষ সীমা।

যাহারা স্বর্গকে শেষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপাসক। তাহারা ধর্ম্ম বলিতে সেই সমুদয় অনুষ্ঠান বা আচরণ বুঝে, যাহার দ্বারা অর্থলাভ হয় এবং ইহলোকে ও পরলোকে প্রচুর পরিমাণে কামভোগ হয়। এই সমুদয় লোক মোক্ষধর্ম্মই বুঝিতে পারে না, সুতরাং বৃন্দাবন বা প্রেমসেবা অনেক দূরের কথা। এই বেদবাদ বৃন্দাবনের একটি অন্তরায়। কেহ হয়ত বলিবেন, একথা সকলেই জানে। গীতায় ভগবান পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যাহারা স্বর্গের জন্য কর্ম্ম করে, তাহারা স্বর্গে যায় সত্য, কিন্তু স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে, পুণ্য ক্ষয় হইলে সেই সুরেন্দ্রলোক বা স্বর্গলোকের বিশাল ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়। যাহারা কামকাম অর্থাৎ কাম্যবস্তুতেই যাহাদের একান্ত আসক্তি, তাহারা এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত মনোময় চক্রে আরোহণ করিয়া গতাগতি লাভ করিতেছে। গীতায় একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, গীতার পূর্ব্বে উপনিষদেও একথার বহুস্থানে উল্লেখ আছে। কিন্তু মানুষের পক্ষে স্বর্গকামনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে। কত জন্ম চলিয়া গিয়াছে, কতবার নরকে ডুবিয়াছি, কতবার স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়াছি, স্বর্গের স্মৃতি লইয়া আবার সংসারে আসিয়াছি, কিন্তু স্বর্গের সেই পবিত্র স্মৃতি সংসারের ধূলার মধ্যে নির্ম্মলভাবে রাখিতে পারি নাই। এই প্রকারে কত শত শত জন্ম চলিয়া যাইতেছে,

মুখে হয়ত নিষ্কাম কর্ম্মের কথা, মোক্ষের কথা, ভগবৎ-প্রেমের কথা দিন রাত্রি বলিতেছি; কিন্তু কামনার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সুতরাং এই বেদবাদ বা স্বর্গ-কামনা, ইহাও একটি নিত্য অন্তরায়, বৃন্দাবনের গোষ্ঠভূমির নিকটে আসিয়াও বাধা পাইতে হইবে, আপনা হইতে প্রেম আসিয়া দুয়ারে উপস্থিত হইলেও তাহাকে চিনিতে পারিব না। প্রেমময়ের বাঁশির আহ্বান শুনিয়া যমুনা নদীর জল উজানে প্রবাহিত হইবে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিলাগুলি গলিয়া যাইবে, তরুলতা রোমাঞ্চিত হইয়া মধুবর্ষণ করিবে, ময়ূর ময়ূরী পেখম তুলিয়া নৃত্য করিবে, শুক সারী নয়নের জলে ভাসিয়া নাচিতে থাকিবে, পৃথিবীর বুকে পুলক জাগিয়া উঠিবে, গোপ, গোপী ও গবী প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাইবে, আর আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের জাতির অহঙ্কার, কুলের অহঙ্কার, শৌচ-সদাচার ও ক্রিয়াদক্ষতার অহঙ্কার লইয়া আমরা বসিয়া থাকিব। প্রেমের দেবতা আসিতেছেন, ভিখারীর বেশে আসিতেছেন, উপেক্ষিত হইয়াও তাঁহার অভিমান নাই। তিনি কোন্ পথে কখন আসেন, চতুর তাহা বুঝিতে পারে এবং ধরিতেও পারে। কিন্তু তিনি যে আসেন, আপনার গুণে আসেন, না ডাকিলেও আসেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলেও আসেন, এ কথা অনেকেরই জানা নাই। বিশেষতঃ, যাহারা দক্ষপ্রজাপতির বংশধর অর্থাৎ যাহারা মনে করে আমরা মন্ত্র জানি, কাল জানি, দ্রব্য জানি, প্রয়োগ জানি, সুতরাং আমরা নিজের জোরে, নিজের কল্যাণ অর্জ্জন করিয়া লইব, তাহাদের জানা নাই যে তিনি আসেন। যিনি যজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও যজ্ঞসাধন ঘৃতাদির অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা এবং যাঁহার প্রীতির জন্যই যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান, জোয়ারে উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলিয়া আপন আনন্দে নাচিতে নাচিতে তিনি যে আসেন, এ কথা তাহারা বুঝিতে পারে না। সুতরাং এই অন্তরায় কংসের মত নিত্য, চিরদিন আছে ও চিরদিন থাকিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামী "বেদ-বাদিনঃ" এই কথার অর্থ করিয়াছেন "বেদঘোষণশীলাঃ, নতু বেদমর্ম্মজ্ঞাঃ" অর্থাৎ যাঁহারা শুকপাখীর মত চিরদিন বেদের ঘোষণাই করিতেছেন কিন্তু তাহার মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারাই বেদবাদী। গীতায় "বেদ-বারতাঃ" এই কথার টীকায় বলিয়াছেন, বেদে যে অর্থবাদ আছে, সেই অর্থবাদকেই বেদের সর্ব্বস্ব বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই বেদবাদরত। মোটের মাথায়, উভয় কথারই তাৎপর্য্য এক।

৭। শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা

'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা' নামক যে লীলা আছে, সেই লীলায় 'বেদবাদ' নামক এই অন্তরায়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই ঃ—

গ্রীষ্মকাল, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাখালবালকগণকে সঙ্গে লইয়া গোচারণ করিতেছেন। রাখালেরা মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। আজ তাহারা যে কারণেই হউক, খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসে নাই। দারুণ রৌদ্র, ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া বালকেরা কৃষ্ণ বলরামের শরণাগত হইয়া বলিল,—"হে কৃষ্ণ, তুমি মহাবাহু, হে রাম তুমি দুষ্ট-নিবর্হণ, অসুর বিনাশে তোমাদের দক্ষতা সুপ্রসিদ্ধ, এখন ক্ষুধা নামক অত্যন্ত দুষ্ট অসুর আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছে, ইহার একটা সুব্যবস্থা কর!" কৃষ্ণ বলিলেন—"দেখ, অদূরে আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ করিতেছে, তোমরা কিছুদূর অগ্রসর হইলেই যজ্ঞস্থানের কোলাহল শুনিতে পাইবে; সুতরাং সেইস্থান নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইবে না। যজ্ঞের অন্ন প্রস্তুত এবং তাহা নিবেদন করাও হইয়া গিয়াছে, তোমরা সেখানে গিয়া আমাদের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা কর। বৃহৎ আয়োজন, তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।" শ্রীকৃষ্ণের কথামত রাখালবালকেরা যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল এবং বলিল —"হে ভূদেবগণ! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছেন, তাঁহারা কিছু অন্নভিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন, দয়া করিয়া কিছু অন্ন দান করুন।" ব্রাহ্মণেরা বিরক্ত হইলেন, কোথা হইতে একদল রাখাল বালক যজ্ঞশালায় আসিয়া অন্নভিক্ষা করিতেছে! কি অন্যায়! তাঁহারা বালকদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, আবার কেহ কেহ বোধ হয় ক্রোধও প্রকাশ করিলেন। ব্রজবালকেরা হতাশ হইয়া কৃষ্ণ বলরামের নিকট ফিরিয়া গেল। এইবার ব্রাহ্মণগণের চরিত্র শ্রবণ করুন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, তাঁহারা "ক্ষুদ্রাশা" "ভূরিকর্ম্মাণোঃ" "বালিশাঃ" "বৃদ্ধ-মানিনঃ।" তাঁহাদের আশা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাঁহারা ত্রিবর্গের উপাসক, স্বর্গসুখ তাঁহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। বলরাম ও কৃষ্ণের ইঁহারা কোনই খবর রাখেন না। বলরাম ও কৃষ্ণের সংবাদ আমাদের ভিতরেই আছে, ভিতরে যাঁহারা সে সংবাদ পাইয়াছেন, বাহিরের লীলা তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। ভিতরে খবর পাইয়া প্রস্তুত না হইলে, বাহিরের লীলা কেহ

ধরিতে পারে না। বলরাম অনন্ত, দেবকীর সপ্তম গর্ভে তাঁহার আবির্ভাব। প্রাচীন টীকাকার সপ্তম গর্ভের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। দেবকীর প্রথম ছয় পুত্রের নাম দিয়াছেন "ষড়্‌বিষয়াঃ"। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যে ছয় প্রকার বিষয়ের উপভোগ হয় তাহারাই এখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পৌরাণিক উপাখ্যানের দ্বারাও এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি ঋষির জন্ম হয়। মরীচির ছয় পুত্র, ব্রহ্মার অভিশাপে দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়। মনেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও অহঙ্কারের বসতি। মানুষ যতক্ষণ এই ছয়ের দ্বারা বদ্ধ, ততক্ষণ অনন্তের আভাস পায় না। এই ছয় বিনষ্ট হইলে অনন্তের বা বলরামের জন্ম হয়, তখন মানব যাহা কিছু ক্ষয়শীল, তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ভূমা ও নিত্য যে বস্তু, তাহার জন্য আকুল হইয়া উঠে! এই আকুলতার পরে আনন্দব্রহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার আবির্ভাব ও নিত্য-লীলার প্রাকট্য। সুতরাং, বেদবাদী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণেরা ক্ষুদ্রাশা—"নাল্পে সুখমস্তি" যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই, "ভূমৈব সুখম্" ভূমাই সুখ—এই তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আশা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ম্মের আড়ম্বর দেখিলে মনে হয়, না জানি কত বড় ব্যাপার লইয়াই তাঁহারা রহিয়াছেন। বাহিরে বিরাট সমারোহ—তাই ভাগবত বলিলেন—"ভূরিকর্ম্মা", সুতরাং তাঁহারা মূর্খ! কিন্তু মূর্খ হওয়ায় দোষ নাই, মূর্খ যদি নিজকে মূর্খ জানিয়া বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবান্ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্। কিন্তু এই ব্রাহ্মণেরা "বালিশ" বা মূর্খ হইলেও, নিজেদের অত্যন্ত বিজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাই ভাগবত বলিলেন—"বৃদ্ধমানিনঃ" অর্থাৎ মূর্খ, কিন্তু বিবেচনা করে তাহারা পণ্ডিত। এই প্রকারের কর্ম্মের আড়ম্বর-যুক্ত অভিমানী লোক নিকটবর্ত্তী সত্যকে উপেক্ষা করিয়া সুদূরবর্ত্তী কল্পনার উপাসনা করিয়া থাকে। স্বর্গ বহুদূরে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যে তাহার পারমার্থিক সত্যতা নাই, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই সুদূর-বর্ত্তী অপ্রত্যক্ষের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, আর এদিকে প্রত্যক্ষের মধ্যে তাঁহাদের চারিদিকে নৃত্য বৃন্দাবন প্রকট হইয়াছে--প্রেমের হাটে "নীলকান্তমণি" বিকাইয়া যাইতেছে, সেখানে জড়-চেতনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়াছে; ভূমি সেখানে চিন্তামণি, জল অমৃত, বৃক্ষ সেখানে কল্পতরু, ধেনু সুরভি, কথা সেখানে গান, গমন সেখানে নাট্য, বংশী

সেখানে প্রিয়সখী,—কিন্তু ব্রাহ্মণেরা এত কাছের জিনিষকে চিনিতে ও আদর করিতে পারিলেন না!

ব্রাহ্মণগণের নিকট উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া বালকেরা কৃষ্ণ বলরামের নিকট ফিরিয়া গেলেন ও সকল কথা জানাইলেন। কৃষ্ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বালকগণকে বলিলেন,—"তোমরা এক কাজ কর, এইবার যজ্ঞশালায় না গিয়া রন্ধনশালায় যাও, ব্রাহ্মণগণের নিকট না গিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকটে যাও, সদর দ্বার যখন রুদ্ধ, তখন নিরাশ হইও না, একবার খিড়কির দিকে যাও।" বালকেরা প্রথমে এই প্রস্তাবে বড় সম্মত ছিল না। কারণ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহার দেখিয়া তাহারা দুঃখিত হইয়াছে, কাজেই মনে হইল ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের ব্যবহার আরও তীব্র হইতে পারে। যাহা হউক, কৃষ্ণের কথা না মানিয়া উপায় নাই। কাজেই বালকেরা দ্বিজপত্নীগণের নিকট চলিল। ব্রাহ্মণগণের কথা বলা হইয়াছে, এইবার ব্রাহ্মণীগণের কথা বলিতেছি। যজ্ঞশালা ও রন্ধনশালা এই দুয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। যজ্ঞশালায় যাঁহারা আছেন, তাঁহাদেরও রন্ধনশালা প্রয়োজন, কিন্তু সে কথা তাঁহাদের সকল সময়ে মনে থাকে না। যজ্ঞশালায় যাঁহাদের সেবা হয়, তাঁহারা দূরের জিনিষ ও অপ্রত্যক্ষ; মন্ত্র, শৌচ, সদাচার, দ্বিজাতি সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদের সেবা হয়। এ অতি উত্তম কথা; কিন্তু রন্ধনশালার কথা স্বতন্ত্র। যজ্ঞশালার লোকেরা রন্ধনশালার লোকেদের খবর রাখে না সত্য, কিন্তু রন্ধনশালার লোকেরা যজ্ঞশালার খবর রাখে। রন্ধনশালার কারবার প্রত্যক্ষ বা নিকটের সহিতই বেশী, তবে অপ্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করে না। এখানে মন্ত্র, সদাচার, শৌচ, সংস্কার প্রভৃতির বাড়াবাড়ি না থাকিলেও, এখানে প্রেমের খেলা, ত্যাগের খেলা ও সেবার খেলা সর্ব্বদাই চলিতেছে। সুদূরের স্বর্গের আশায় ইহারা নিকটের ও চারিদিকের যে বর্ণ, গন্ধ, গান ও স্নেহ, প্রেম ভালবাসা, তাহার কখনই অমর্য্যাদা করে না! কাজেই আজ যে লীলা হইতেছে, তাহারও সংবাদ তাহারা কিছু কিছু রাখে! কোন্ সুদূর অতীতের লীলার স্মৃতিমাত্র নহে, কোন্ সুদূর ভবিষ্যের লীলার আশামাত্র নহে, আজ এই বর্ত্তমানের, এই চারিদিকের লীলা কি, ব্রাহ্মণেরা তাহা জানেন না, কারণ তাঁহারা কেবল গ্রন্থ-বেদ লইয়া মোহিতবুদ্ধি হইয়াছেন, গ্রন্থ-বেদকে জীবনবেদে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণীরা রন্ধনশালায় আছেন; আজিকার উষার হাসি, আজিকার মলয় বাতাস, আজিকার সন্ধ্যা-

গগন, আজিকার বনের পাখী কি কথা বলিতেছে, আজিকার নরনারী, বিশেষ করিয়া কিশোর কিশোরী কি কথা বলিতেছে, কি স্বপ্ন দেখিতেছে, কি খেলা খেলিতেছে, তাঁহারা তাহার কিছু কিছু খবর রাখেন। কেবল রাজ-সভার বড় বড় কথা নহে, কেবল ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালার পাণ্ডিত্যের কথা নহে, গোপপল্লীর ও নদীতীরের গোপগোপীর সরল প্রাণের বিমল কথা, ব্রাহ্মণীরা কিছু কিছু শুনিতে পান। কেবল সমাধি ধ্যানের উচ্চ কথা নহে, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের সহজ রসকথা তীব্রকর্ম্মী ব্রাহ্মণদের যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণীদের রন্ধনশালায় তাহার প্রবেশপথ রুদ্ধ হয় নাই। আজ ব্রহ্মণ্যদেব গোচারণের মাঠে, রাখালবালকের সঙ্গে গোচারণ করিতেছেন, তোমরা কি কুলাভিমান, শৌচ ও সদাচারের দোহাই দিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে? ব্রাহ্মণেরা উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণীরা স্বীকার করিলেন। অবস্থাটা দাঁড়াইল এইরূপ। ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণকথা শুনিয়াছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণকথা সকলের প্রাণের কথা হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা কাণ খুলিয়া থাকে, এবং সকল কথা শুনিতে যাহাদের আপত্তি নাই, তাহারা শুনিবে না কেন? ব্রাহ্মণীরা শুনিয়াছেন। কৃষ্ণকথার আজ বাহিরে অভিনয়মাত্র হইতেছে, কিন্তু ভিতরে, প্রত্যেক জীবের অন্তরের অন্তরে ইহার নিত্য-লীলা—সুতরাং ব্রাহ্মণীরা, শুনিয়াছেন, দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সকল সময়েই আলোচনা, সকল সময়েই ধ্যান। আজ সকাল হইতে কি যেন এক আনন্দের অমৃতরস হৃদয়ে রহিয়া যাইতেছে। কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিতেছে,—

"ওগো সাবধান, আজ সে আসিবে,
সেই চির-প্রত্যাশিত, প্রাণের দেবতা তোর,
আসিবে গো আজ আসিবে—"

মনে হইতেছে, অতি যত্ন করিয়া অদ্য যে চতুর্ব্বিধ অন্ন প্রস্তুত করিতেছি, এই অন্ন আজ তাঁহারই ভোগে লাগিবে। রন্ধনশালায় কাজ করিতেছেন, আর শতবার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন, ঐ বুঝি সে আসিতেছে! এমন সময়ে একদল রাখাল বালক সসম্ভ্রমে আসিয়া উপস্থিত। বেশী কিছু বলিতে হইল না, ব্রাহ্মণীগণ অন্ন লইয়া যমুনা-পুলিনে চলিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণেরা বাধা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। ব্রাহ্মণীরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পতিব্রতাগণ গৃহে ফিরিয়া

আসিলেন। ব্রাহ্মণগণেরও পরিবর্ত্তন হইল। গার্হস্থ্য জীবনের একটী সুবিধা, পতি, পত্নীর পুণ্যের কিছু অংশ পাইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা যখন চলিয়া গেলেন, তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক নূতন প্রকারের চিন্তার উদয় হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন—'এই সকল স্ত্রীলোকের দ্বিজাতি-সংস্কার নাই, ইহারা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য গুরুগৃহে বসতিও করেন নাই, ইহাদের শৌচ নাই, আচার নাই, আত্মমীমাংসা নাই। অথচ ইহারা যাহা পাইল, আমরা তাহা পাইলাম না। আমাদের কুলে ধিক্ আমাদের ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্, আমাদের ত্রিবিধ দীক্ষায় ধিক্! কারণ আমরা অধোক্ষজে বিমুখ হইলাম।"

ইহার পর ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝিলেন, আজ যে গোচারণের মাঠে, প্রেমের হাট বসিয়াছে, গোলকের নিত্যবস্তু যে আজি এই নদীতীরে কুসুমিত কুঞ্জে কিন্তু প্রকট হইয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিলেন, বুঝিয়াও কিছু হইল না। কেন হইল না, তাহার কারণ শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ 'ভয়'—কংসের ভয়। গীতায় দৈব-সম্পদ্ বর্ণনা করিবার সময় প্রথমেই বলিয়াছেন—'অভয়'। বেদ বলিয়াছেন —"অভীঃ"। যে ভীরু তাহার আবার সাধন কি? তাহার আবার পরমার্থ কি? ভিতরে বুঝিলাম, কিন্তু বাহিরে স্বীকার করিতে পারিলাম না। ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্ব মিটিল না। সুতরং উপায় নাই। ব্রাহ্মণেরা বিষয়ী লোক, অনেক দিনের বদ্ধ সংস্কার, তাই পত্নীগণের পুণ্য ফলে বুঝিয়াও বুঝিলেন না। সুতরাং, এই বেদবাদও এক নিত্য অন্তরায়। হে প্রেমময়! তুমি আমাদের জাতি, কুল, বিদ্যা, ধন, নিপুণতা প্রভৃতির অহঙ্কার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। হে কৃষ্ণ, প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন্ পথে তুমি আসিতেছ, তাহা বুঝাইয়া দাও, আজ কাহাদের মধ্যে তুমি লীলা করিতেছ তাহা বুঝাইয়া সেই লীলাস্থলীতে আমাদিগকে লইয়া চল। আজ আবার ভারতবর্ষে এক প্রেমের যুগ আসিয়াছে। সুদীর্ঘকাল যাহারা পল্লীভবনে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহারা নিত্য-সখার বংশী শুনিয়া নবজীবনে মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ তাহারা প্রেমমন্ত্রে পাগল হইয়াছে। আজ রাজার সিংহাসন কাঁপিতেছে, ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালা কাঁপিতেছে—আজ কংসের পথে মৃত্যু, দেবতাদের পথে দারুণ ক্ষতি—আজ ব্রাহ্মণীদের পথ ধরিয়া, লীলাময়ের আহ্বান শুনিয়া চলুন, আমরা পুলিন-ভোজনের সামগ্রী লইয়া অগ্রসর হই। নির্ভয়ে চলিতে হইবে—ইহাই নিত্য লীলার বার্ত্তা।

৮। দেবতা

দেবতারা সত্য, দেবপূজায় লাভ আছে। দেব-শক্তির আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলে মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে সুবিধা হয়। যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুবিধা চাহেন, যাঁহাদের লাভের প্রত্যাশা আছে, তাঁহারা অবশ্যই দেবপূজা করিবেন। কোন্ দেবতার পূজা করিলে কি পাওয়া যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার তালিকা আছে। যিনি ব্রহ্মতেজ চাহেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মার পূজা করিবেন। ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রের পূজা করা আবশ্যক। যিনি পুত্র-পৌত্র কামনা করেন, তিনি প্রজাপতিগণের পূজা করিবেন। লক্ষ্মীকাম মায়াদেবীর, তেজস্কাম সূর্য্যের, সম্পত্তিকামী বসুগণের, বীর্য্যকাম রুদ্রগণের, অন্নকাম অদিতির, স্বর্গকাম আদিত্যগণের, রাজ্যকাম বিশ্বদেবগণের, প্রজাগণের হিতকামী সাধ্যদেবগণের, আয়ুস্কাম অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টিকাম ইলাদেবীর, প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি লোকমাতা রোদসীদেবীর, রূপকাম গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রীকাম উর্ব্বশীর, আধিপত্য-কাম পরমেষ্ঠীর, যশস্কাম যজ্ঞদেবের, কোষকাম প্রচেতার, বিদ্যাকাম গিরিশের, দাম্পত্যকাম উমাদেবীর, ধর্ম্মকাম উত্তমশ্লোকের, বংশবৃদ্ধিকাম পিতৃগণের, রক্ষাকাম পুণ্যজনগণের ওজস্কাম মরুদ্গণের, রাজ্যকাম মনুদেবগণের, অভিচারকাম নির্ঋতিদেবের এবং কামকাম ব্যক্তি সোমদেবের পূজা করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আছে, ক্রিয়া আছে ও কাল আছে। দেবতত্ত্ববিৎ ঋষিগণ অন্তর্জগতের এই রহস্য জানিতেন। তাঁহাদের উপদেশানুসারে অনেকেই দেবশক্তির উদ্বোধন করিয়াছেন এবং অভীষ্টলাভও করিয়াছেন।

দেবতা সত্য, দেবপূজায় লাভ আছে। দেবশক্তির আনুকূল্য লাভ করিতে পারিলে, ইহলোকে ও পরলোকে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু মানবজীবনে দেবপূজা করিয়া লাভবান্ হওয়াই শেষ কথা নহে। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত দেবপূজার তালিকা প্রস্তুত করিয়া উপসংহারে বলিলেন,—"যিনি অকাম, তিনি পরমপুরুষের পূজা করেন।" কেবল অকাম নহে—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধি উদার, যিনি অকাম, সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষের যজন করেন। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম, একই কথা।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশটি এখনকার দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। এক ঈশ্বরের উপাসনা বা পরমপুরুষের যজন, মানবমাত্রেরই আদর্শ বা চরম লক্ষ্য। কিন্তু সেই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবার অধিকারী কে? ভাগবত বলিলেন, —অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম ব্যক্তিই এই উপাসনার অধিকারী।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে একেশ্বরবাদ নামক যে মত, দেববাদ ও দেবপূজা ধ্বংস করিবার জন্য গর্জ্জন করিতেছে, তাহা একটি ব্যর্থ চেষ্টামাত্র। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতদিন থাকিবে, ধর্ম্মের মুখোস্ পরিয়া পাঁচটা জাতি আর একটা জাতিকে ধ্বংস করিয়া তাহার রাজ্য ভাগ করিয়া খাইবার জন্য যতদিন শকুনি-গৃধিনীর মত কলরব করিবে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে এই কামকাম জগতে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হইতে এখনও বিলম্ব আছে। দেবপূজাই সকাম মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। ক্রমে ক্রমে ভগবানের কৃপায় মানুষ এই সীমা অতিক্রম করে। তখন সে বুঝিতে পারে, যে চায় সে পায় না, যে চায় না সেই পায়। যে লাভ করে সে হারায়, যে হারায় সেই লাভ করে। মানুষ যখন এই অবস্থা লাভ করে, তখন সে কামের আঁধার রাজ্য ছাড়িয়া প্রেমের সূর্য্যালোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। বৃন্দাবনে এই প্রেম প্রকট হইয়াছিল, সুতরাং এখানে দেবশক্তির সহিত সংগ্রাম অনিবার্য্য এবং এই সংগ্রামে দেবশক্তির পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

দেবতাদের তত্ত্ব একটু ভাল করিয়াই বলি। তাঁহারা মহৎ ও বলবান, সুতরাং তাঁহাদের চরণে প্রণাম। কিন্তু আমাদের বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা যে কিরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই খুব ভাল করিয়া আলোচনা করা দরকার। দেবতারা প্রজাবৎসল জমিদারের মত। প্রজা যতদিন প্রজা হইয়া থাকে, ততদিন তিনি প্রজার হিতসাধন করেন। কিন্তু প্রজা যদি জমিদারের জমিদারী বা রাজ্য ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে সহরে বাস করিতে চায়, তাহা হইলে জমিদার তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কারণ সমুদয় প্রজাই যদি এই প্রকারে চলিয়া যায়, তাহা হইলে জমিদারের জমিদারীই থাকে না। অনেক সাধনা করিয়া অর্থাৎ অনেক কষ্টে ধনোপার্জ্জন করিয়া একজন

লোক জমিদার হইয়াছে, এখন যদি তাঁহার প্রজাগুলি একে একে সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া জমিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে জমিদারের কি দশা হয়? তাঁহার জমিদারীই যে থাকে না! কাজেই এরূপ অবস্থায় তিনি ছলে বলে কৌশলে বাধা না দিয়াই পারেন না। ইহাতে জমিদারের দোষ নাই, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। দেবতারা মানুষের জমিদার। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এই ত্রিলোকে তাঁহাদের শাসন। তাঁহারা মানুষকে বলেন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উপাসনা কর। তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মের অর্থ—যজ্ঞদ্বারা দেবপূজা। সকল লোকের যিনি কর্ত্তা, তিনিই পরমপুরুষ। মানুষ যদি তাঁহার কাছে যাইতে চাহে, তাহা হইলে দেবতাদের সাহায্য লইয়া যাউক। দেবতারা বলেন—কোটির মধ্যে এক-আধ জন মানুষ পরমপুরুষের কাছে যাইবে। কে যাইবে, আমরা দেবতা, আমরাই তাহার বিচার করিব। যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে দেবতারা বলিবেন—আমরা যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা কেবলমাত্র তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য। দেবতারা নিজেদের নির্দ্দোষ, নির্ম্মল ও পরার্থপর বলিয়া ঘোষণা করেন; যাঁহারা দেবতাদের অনুগৃহীত তাঁহারাও তাহাই বলেন। কিন্তু সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, বৃন্দাবনে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

ত্রিলোকের সীমার মধ্যে, ত্রিবর্গের উপাসনা লইয়া দেবতার পূজা করিলে মানুষ বেশ সুখে থাকিতে পারে। কিন্তু অনেককে সুখে থাকিতে ভূতে কিল মারে। সে অবস্থায় এক নবজাগরণে জাগ্রত হইয়া মানুষ পরমপুরুষের অন্বেষণ করে। সেই সময় মানুষ মোক্ষ বা পরাভক্তি বা প্রেম অন্বেষণ করে। দেবতারা আসিয়া সে সময়ে প্রলোভন দেখান, তাহাতে ফল না হইলে ভয় দেখান, তাহাতেও যদি কিছু না হয়, তাহা হইলে দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। দেবতার ভয়ে, প্রলোভনে ও ছলনায় অনেক মোক্ষার্থী পদস্খলিত হইয়াছেন, পুরাণে তাহার বর্ণনা আছে। দেবতারা বলেন না যে পরমপুরুষের কাছে যাইও না। সে কথা বলিবার তাঁহাদের সাহস ও শক্তি নাই। তাঁহারা বলেন—পরমপুরুষের কাছে যাও, কিন্তু আমাদের সাহায্যে ধীরে ধীরে চল। অসহিষ্ণু বলে, আমার প্রাণ কাঁদিয়াছে, আমি ধীরে ধীরে চলিতে পারিব না। দেবতাদের সহিত বিরোধের ইহাই হেতু।

অনেকে বলেন—দেবতারা যে বাধা দেন, তাহাতে মানুষের উপকার হয়, অপকার

হয় না। কথাটা সত্য। কারণ বাধা না থাকিলে শক্তির বিকাশ হয় না। অতএব বাধাকে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। চলুন আমরা বৃন্দাবনে যাই, দেখি সেখানে দেবতারা কি প্রকারের বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। ব্রহ্মা

বৃন্দাবনে দেবতাদের মধ্যে প্রথম বাধা—ব্রহ্মা। তাহার পর ইন্দ্র, তাহার পর অগ্নি ও বরুণ। সর্ব্বশেষ বাধা—মদন। পর পর এই বাধাগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে।

ভগবানের আবির্ভাব হইবে, ব্রহ্মা ইহা জানিতেন। অসুরভার-পীড়িতা পৃথিবীকে সঙ্গে লইয়া তিনি যখন ক্ষীরোদ সাগরে গিয়াছিলেন তখন সে কথা আকাশবাণীতে শুনিয়াছিলেন। ভগবান আসিয়া কোথায় আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কি করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মা জানিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অঘাসুরকে বধ করেন, সেই দিন ব্রহ্মা হঠাৎ এই ব্রহ্ম-গোপালের লীলা দেখিলেন। তাহার পর পুলিন-ভোজন দেখিলেন। রাখালগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ একত্র বসিয়া খাইতেছেন, ইহা ব্রহ্মাকে তেমন ভাল লাগিল না। ব্রহ্মা বিধি—তিনি কতকগুলি নিয়ম লইয়া চিরদিন বসিয়া আছেন, তিনি যাহা কিছু দেখেন, এই নিয়মের সহিত মিল করিয়া দেখেন। রাখালের সহিত একত্র ভোজন দেখিয়া ব্রহ্মার সন্দেহ হইল। তাঁহার নিয়মের সহিত এই কার্য্যটি মিলিল না। তিনি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণের মণ্ডলীতে বসিয়া ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বাছুর নিকটে দাঁড়াইয়া ঘাস খাইতে খাইতে হঠাৎ দূরে চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া নিজেই বাছুরটিকে অন্বেষণ করিতে যেমন দূরে গিয়াছেন, আর অমনি ব্রহ্মা সেই বালক ও বৎসগণকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বত-গুহায় তাহাদের লুকাইয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে পর্ব্বতের গুহা হইতে রাখালগণকে ও বৎসগণকে বাহির করিয়া আনিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলে ব্রহ্মার চৈতন্য হইত না। এই জন্য তিনি নিজের অঙ্গ হইতে ঠিক পূর্ব্বের মত একদল রাখাল ও বৎস বাহির করিলেন এবং তাহাদের লইয়া যথারীতি বৎসচারণ করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিলেন। এই প্রকারে এক বৎসরকাল বৎসচারণ চলিতেছে। ব্রহ্মা সন্ধ্যা-উপাসনা

করিয়া ফিরিয়া আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালক লইয়া পূর্ব্ববৎ বৎসচারণ করিতেছেন। প্রথমে ব্রহ্মা মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ একটি বুজরুক, কোনরূপে সেই পর্ব্বতগুহার সন্ধান পাইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অপহৃত সেই বৎস ও রাখাল-বালকগণকে বাহির করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা একবার পর্ব্বতের গুহার মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন সেখানে বৎস ও বালকগণকে তিনি যেমন ভাবে রাখিয়াছিলেন, তাহারা ঠিক তেমনি অবস্থায় রহিয়াছে। আবার বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেই প্রকারের বৎস ও বালকগণকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। এইবার ব্রহ্মা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন সহচরগণকে লইয়া বৎসচারণ করিতেছেন, এই অবস্থায় ব্রহ্মা পুনর্ব্বার যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহচর ও বৎসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন—সকলেই ঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়বসন, চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শোভিত। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ।
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন কম্বু-কঙ্কণ-পাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটি সূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ॥"

কেবলমাত্র যে এই নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহাই নহে—সমুদয় তত্ত্বও দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার জ্ঞান হইল। তখন বৃন্দাবনের প্রতি চাহিলেন, বৃন্দাবন কি, প্রেম কি, তাহা বুঝিলেন। তাহার পর গোপবেশ বেণুকর মূর্ত্তিধারী শ্রীকৃষ্ণের যে নর-লীলা তাহা ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। ব্রহ্মার স্তব শ্রীমদ্ভাগবতের এক অদ্ভুত সামগ্রী, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মার ভ্রান্তিই বা কি, এবং কি প্রকারে এই ভ্রান্তি নিরস্ত হইল, তাহাই বলিতেছি।

ব্রহ্মা নিজেই বলিয়াছেন, তিনি "রজোভুব" অর্থাৎ রজঃগুণ হইতে তাঁহার উৎপত্তি এবং এই কারণে তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন—"পৃথগীশ-মানিনঃ"। সৃষ্টি বৈচিত্রময়ী, সুতরাং সমাজও বৈচিত্র্যময়। এই যে ভেদ ইহা পারমার্থিক নহে,

ব্যবহারিক। এই কথা সকলেই ভুলিয়া যায়। সমাজে উচ্চ নীচ রহিয়াছে, যে উচ্চ সে যদি বিবেচনা করে যে আমি আপনা হইতেই উচ্চ অর্থাৎ আমার এই উচ্চতা "স্বতন্ত্র," যাহারা নীচ তাহাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখাই আমার ধর্ম্ম, তাহা হইলে চৈতন্যময়ের যে খেলা বা নিত্যলীলা তাহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই লীলাস্রোত রুদ্ধ হইবার নহে, সুতরাং যে উচ্চ বলিয়া অভিমান করে, তাহাকে অধঃপতিত ও চূর্ণ হইতে হইবে। তবে তাহার যদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। একজন উচ্চ হইয়াছে, অধিকার ও সুবিধা পাইয়াছে ; কিন্তু উচ্চ হওয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকার জন্য নহে, অধিকার ও সুবিধাভোগ করিয়া স্ফীত হইবার জন্য নহে। তবে কি জন্য ? সেবা করিয়া আনন্দময়ের নিত্যলীলার সহায়তা করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে অন্ধ হইয়া যাই, প্রকৃতির রজোগুণ আর তমোগুণ আসিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করিয়া লয়। তখন মনে হয় আমি একটি পৃথক্ সত্তা। শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলিয়াছেন, এইরূপ অবস্থাতেই জগতে সেই ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়। ধর্ম্মগ্লানির জন্য যে কেবল কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ বা দুর্য্যোধনই দায়ী তাহা নহে ; তবে কি জানেন, ইহারা ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু অনেক কংস, শিশুপাল ডুব দিয়া জল খায়, তাহারা চতুর, ধরা পড়ে না। সৃষ্টিতে ধর্ম্মগ্লানি যখন হয়, তখন সেই দোষ প্রায় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সৃষ্ট পদার্থের যাহা সমষ্টিগত দোষ, তাহা ব্রহ্মারই দোষ। পৃথিবীর পক্ষ হইয়া ব্রহ্মা পরম-পুরুষকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট জানাইয়াছিলেন কংস প্রভৃতি অসুরেরা ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দারুণ দ্রোহ উৎপাদন করিয়াছে। পরমপুরুষ আসিলেন, কংস, শিশুপাল প্রভৃতিকে তিনি পরে বধ করিবেন, প্রথমে বিচার করিলেন স্বয়ং ব্রহ্মার। কেবল বাহিরের কুকুর তাড়াইয়া শুচিতা রক্ষার জন্য চেষ্টার সীমা নাই, কিন্তু ঘরের ভিতরে যে অশুচির আবর্জ্জনাস্তূপ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। কংস জন্মায় ও অত্যাচার করে, আমরা নিরীহ সাধুলোক তাহাকে গালাগালি করি, আর যখন নিরুপায় হইয়া পড়ি, তখন গলায় কাপড় দিয়া ভগবান্‌কে ডাকি আর বলি—"ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই পাপ বিনাশ কর।" মানুষ চিরদিন এমনি করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতেছে, আর দেবাসুরের যুদ্ধের সময় ভগবান্‌কে দিয়া অসুর শক্তি বিনাশ করাইয়া লইতেছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি—এই ধর্ম্ম কি ক্রীতদাসের ধর্ম্ম নহে। বাহিরে কংস

জন্মাইত না, যদি তোমার নিজের ভিতরে কংস জন্মের সম্ভাবনা না থাকিত। অত্যাচারী অত্যাচার করে কেন, জানেন? যাহারা অত্যাচারিত তাহারা ক্রীতদাস বলিয়া। ক্রীতদাসের স্বভাব কি জানেন? প্রবলের নিকট সে গোলাম, আর দুর্ব্বলের নিকট সেও একজন অত্যাচারী। অমৃতের পুত্র মানব অন্তর্মুখীন হইয়া চিন্তা করিলে ইহা বুঝিতে পারে।

"কারো দোষ নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥"

ব্রহ্মার অধীনে একটা ব্যবস্থা জন্মাইয়াছে, ব্রহ্মা সেই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব, সেই ব্যবস্থায় বেশ নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মা চাহেন পরমপুরুষ আসিবেন, ব্রহ্মার যাহারা শত্রু তিনি তাহাদের বিনাশ করিবেন; কিন্তু ব্রহ্মার এই ব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তাহাই থাকিবে। ইহার পূর্ব্বে পরমপুরুষ আসিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়া অনেকটা এই ভাবেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তপস্বী শূদ্রের মস্তক ছেদন পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদিন যাহা হইয়াছে বা চলিয়াছে, চিরদিনই যে তাহা হইবে ও চলিবে, নিত্য-লীলাবাদী প্রেমিকগণ এমন কথা বলেন না। ব্রহ্মার সে নির্ম্মল দৃষ্টি আজ আর নাই, কেবল 'বেদবাদী' বলিয়া ব্রাহ্মণদের দোষ দিই কেন, স্বয়ং বেদপতি ব্রহ্মাই গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

বৃন্দাবন-লীলায় ব্রহ্মার সন্দেহ হইল কেন? ব্রহ্মা ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা কি, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য লীলাগ্রন্থ হইতে বেশ বুঝিতে পারি। ব্রহ্মা ভাবিলেন,—ভগবান যদি আসেন রাজর্ষিদের স্বর্ণ সিংহাসনে কিম্বা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবেদীর উপর তিনি গম্ভীরভাবে বসিবেন। যাহারা অত্যন্ত প্রাচীন, শাস্ত্রবিৎ, যোগসিদ্ধ ও ক্রিয়াদক্ষ, তাহাদের সহিত তিনি গম্ভীরভাবে বড় বড় কথা বলিবেন। বালক, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, গ্রামের লোক, রাখাল বালক, ইহারা তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারিবে না। ভগবান্ দিনরাত্রি বড় বড় অলৌকিক কার্য্যের অভিনয় করিবেন, ব্রহ্মার মনে ভগবদাবির্ভাব সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। অনেক দিনের বদ্ধমূল ধারণা, ছাড়িতে চেষ্টা করিলেও

ছাড়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যখন অঘাসুর বধ করিলেন, তখন একটি বড় রকমের অলৌকিক ব্যাপার হইয়া গেল—ইহা দেখিয়া ব্রহ্মার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ভগবান্ যাহা করিবেন সকলই অলৌকিক হইবে। কিন্তু দেখিলেন, আজ বৃন্দাবনে অলৌকিক ব্যাপার ঘটিলেও, তাহার অলৌকিকতায় কেহ বিস্মিত বা স্তম্ভিত নহে। রাখালবালকগণের হৃদয়ের গঠনই এমনি যে, তাহারা অত্যন্ত অলৌকিক ব্যাপারকে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারের মত দেখে এবং তাহার অভিনয় হইলে স্তম্ভিত বা বিচলিত হয় না। তাহারা অর্থাৎ এই রাখালবালকেরা লৌকিক ব্যাপারেই মত্ত। তাহারা শিশু, সুতরাং তাহাদের ঘৃণা করা ব্রহ্মার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার পর, তাহারা বেদপাঠী ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণবালক ও নহে। নিম্নশ্রেণীর বৈশ্যবালক, এখনকার দিনে দরিদ্র ও নিরক্ষর শূদ্র বালক বলিলেও হয়। সুতরাং ব্রহ্মার নিকট তাহারা অবজ্ঞার পাত্র। ব্রহ্মা তাহাদের ছোঁয়া জলই গ্রহণ করিতে পারেন না। আর কোন কোন লোক যাহাকে ভগবান্ বলিতেছে, তিনি তাহাদের সঙ্গে বসিয়া একপাতে খাইতেছেন! অসম্ভব! অসম্ভব! ব্রহ্মা ভাবিলেন,—নারদ যেমন মূর্খ, তাই ব্রহ্মলোকে গিয়া গল্প করে, গোচারণের মাঠে ভগবান্ আসিয়াছেন। তবে যে অঘাসুর বধ হইল! ব্রহ্মা ভাবিলেন—ইহা একটি মায়াবীর বুজরুকি।

আজ জগতে শিশুদের দিন প্রবর্ত্তিত হইল, আজ প্রেমের দুন্দুভি বাজিল, আজ বেদ-গোপ্য চরম সত্য প্রকটিত হইল, আজ রাখালবালকের সঙ্গে গোচারণের মাঠে শ্রীভগবান্ বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন। অন্ধ জগৎ, যদি এই লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পার, তাহা হইলে চিরদিনের মত কংসের দৌরাত্ম্য শেষ হইবে। কিন্তু জগৎ কি এ লীলা বুঝিবে? জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মা; সেই ব্রহ্মাকেই প্রথমেই বুঝাইয়া দেওয়া দরকার।

ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ কি বুঝাইলেন? ব্রহ্মা ঐশ্বর্য্যের উপাসক। তাই প্রথমে দেখাইলেন ঐশ্বর্য্য। নারায়ণ-মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। ব্রহ্মা দেখিলেন, সকলেই নারায়ণ! প্রত্যেক রাখালবালক নারায়ণ, প্রত্যেক গোবৎস নারায়ণ। ব্রহ্মা কি এ কথা কখনও শোনেন নাই? "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"! শুনিয়াছেন অনেকবার, টীকা-টিপ্পনী সহ প্রচারও করিয়াছেন অনেকবার! কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই। তাই ভগবান্ বুঝাইলেন, এ ঐশ্বর্য্যের মূল্য নাই।

তাহার পর ব্রহ্মাকে একটি তত্ত্ব দেখাইলেন। ভাগবতের ভাষায় সে তত্ত্বটি এই।

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।"

অর্থাৎ এই যে মূর্ত্তি ইহা রসের মূর্ত্তি—ইহা আনন্দ ও সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ। এই তত্ত্ব ব্রহ্মা বুঝিলেন, তাহার পর বৃন্দাবনের ভিতরের কথা বুঝিলেন—

"যত্র নিসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।"

নিসর্গ বা প্রকৃতি যাহাদের শত্রুভাবাপন্ন করিয়াছে, এমন যে সব জীব অর্থাৎ মৃগ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি, এখানে তাহাদের মধ্যেও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখানে তাহারাও বন্ধুর মত একত্রে মিলিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে। এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা! অনেকে এখনও মনে করেন, ইহা অসম্ভব! আমাদের এক বন্ধু বলেন যে, মানুষ যদি ছাগমাংস ভোজন না করে তাহা হইলে ছাগলের সংখ্যা এত বাড়িয়া যাইবে যে পৃথিবীতে ছাগল ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। ইহার একটা প্রতিধ্বনি পশ্চিমদেশ হইতে শুনিতে পাই। পূর্ব্বদেশের রঙ্গীন মানুষগুলি যদি সত্য সত্য মানুষ হইয়া উঠে, অর্থাৎ এখন যেমন সাদা মানুষের খোরাক হইয়া আছে, যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে সাদা মানুষ বাঁচিবে কি করিয়া? তাহা হইলে রঙ্গীন মানুষে জগৎ যে ছাইয়া যাইবে! অতএব ধর্ম্মের নামে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নামে, আর বিশ্বহিতের নামে তাহাদের মানুষ হইতে দিও না, তাহাদের খাদ্য করিয়া রাখ।

কাজেই বৃন্দাবনের কথা; বড়ই নূতন ধরণের কথা কিন্তু জগৎ জানিয়া রাখুক, ইহাই সত্য কথা। যাহা হউক ব্রহ্মা বৃন্দাবন বুঝিলেন, তাহার পর বুঝিলেন নরলীলা।

"তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশ শিশুত্ব নাট্যং।
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্॥"

এই অবস্থায় ব্রহ্মা সজল নয়নে কৃষ্ণের চরণমূলে লুণ্ঠিত হইয়া স্তবস্তুতি পাঠ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার স্তব বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কথা এই, ব্রহ্মা এতদিন ঐশ্বর্য্যের ও অলৌকিকের উপাসক ছিলেন, আজ কৃষ্ণের কৃপায় তিনি মাধুর্য্যের তত্ত্ব বুঝিলেন। তাই প্রথমেই প্রণাম করিয়া বলিলেন—"তোমার শরীর সজল-জলদবৎ-স্নিগ্ধশ্যামল। তোমার বসন বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ। গুঞ্জরি কর্ণভূষণ, ও ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে তোমার বদনমণ্ডল সর্ব্বদা শোভিত। তুমি বন-

মালাধারী। কবল, বেত্র, বেণু, শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য উদ্রিক্ত হইতেছে। তোমার পাদপদ্মযুগল অত্যন্ত মৃদু, তুমি গোপরাজ নন্দের আত্মজ।" এই প্রথম শ্লোক টীকাকারগণ বিষদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, গদা, চক্র, প্রভৃতি নহে। গুঞ্জা, শিখিপাখা, বেত্র, বেণু এই সকলের মহিমা বুঝিয়া ব্রহ্মা প্রবৃতিস্থ হইলেন। বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের এই যে প্রকাশ, ব্রহ্মা ইহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ভগবানের সহিত পরিচয় বা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন বড়ই দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু এই দুরূহ ব্যাপার আজ সুলভ হইয়াছে। সুলভ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এতদিন ব্রহ্মা তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এখন শ্রীভগবানের কৃপায় তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। এই কারণে ব্রহ্মা বলিলেন—"তোমার মহিমা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার নিস্তার অসম্ভব নহে। যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান বিষয়ে অত্যল্পও প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করতঃ সাধুজন কর্ত্তৃক নিত্য-প্রকটিত তদীয় বার্ত্তা নিরন্তর শ্রবণ করে, তুমি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও, তাহারা তোমাকে অনায়াসে পাইতে পারে।"

১০। অগ্নি

এই গেল ব্রহ্মার পরাজয় কথা। তাহার পর দুই বার অগ্নির পরাজয়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। কালিয়-দমনের পর শ্রান্ত-সুপ্ত বন্ধুগণকে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল হইতে পরিত্রাণ করেন, দশম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আর একবার মুঞ্জারণ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ নিবারণ করেন। ঊনবিংশ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নির পরাজয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

১১। ইন্দ্রের পরাজয় ও গোবর্দ্ধন-ধারণ।

কেহ বলেন—দেবতার ভিতর ব্রহ্মাই প্রধান, তিনি বেদপতি। আবার কেহ বলেন—ইন্দ্রই প্রধান, তিনি স্বর্গের রাজা। বিচারে প্রয়োজন নাই, ব্রহ্মার পরাজয়ের কথা বলিয়াছি, এইবার ইন্দ্রের কথা বলিতেছি।

বৃন্দাবনের গোপগণ ইন্দ্রের পূজা করিতেন। কতকাল হইতে যে এই প্রথা চলতেছিল তাহা কেহই জানে না, তবে প্রতিবর্ষে একটা উৎসব ও যজ্ঞ হইয়া থাকে।

এবারেও উৎসবের আয়োজন হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার পিতা নন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের আয়োজন হইতেছে?"

নন্দ বলিলেন—"ভগবান্ ইন্দ্রই পর্জন্য। মেঘসমূহ তাঁহার মূর্ত্তি। মেঘে বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টিই জীবের জীবন-স্বরূপ। ইন্দ্রের কৃপায় জীবের ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সাধিত হয়। এই কারণে চিরদিনই আমাদের মধ্যে ইন্দ্রের পূজা প্রচলিত রহিয়াছে। কাম, লোভ, ভয় বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই যে অনুষ্ঠান অর্থাৎ ইন্দ্রের পূজা, ইহার অন্যথাচরণ করা উচিত নয়।"

নন্দের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, অনেকগুলি প্রাথমিক কথার আলোচনা করা আবশ্যক। মানুষ পূজা করে, অনেকেরই পূজা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির পূজা করে। মানুষ মানুষেরও পূজা করে। এই পূজা করার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং এই পূজা করার প্রবৃত্তি হইতেই মানুষের যে ক্রমবিকাশ বা উন্নতি, তাহাও সাধিত হয়। সুতরাং মানুষকে পূজা করিতেই হইবে। যেখানে মহত্ত্ব ও বিভূতির প্রকাশ, মানুষ সেখানেই মস্তক নত করিবে। বৈষ্ণবধর্ম্মে এই পূজার ভাব বিশেষভাবে সুবিকশিত হইয়াছে, বৈষ্ণব নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া থাকেন। অতিসুন্দর কথা।

কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দাসত্ব বা দাস্য বলিতে সচরাচর যাহা দেখিতে পাই, তাহাই কি কৃষ্ণ-দাস্য? বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে সচরাচর যেমন বড়লোকের পূজার প্রণালী দেখি, তাহাই কি দেবপূজার প্রণালী? ইহার উত্তর—না,—একেবারেই না। গরিব ও অত্যাচারিত মানুষের নিজের উপরে আদৌ বিশ্বাস নাই। তাহার যে কোন শক্তি আছে ইহা সে জানে না, এবং ভয় ও লোভের তাড়নায় সে বাহিরের একজনের তোষামোদ করিয়া ও পদলেহন করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইতে চায়। এই প্রকারের সেবা বা পূজা মনুষ্যত্বের অবমাননা। এই কথাটি সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া রাখা দরকার। আমরা ধনবানের পূজা করি, কিছু পাইবার প্রত্যাশায়। সেই ধনী, হয়ত অত্যাচারী, পরপীড়ক ও দস্যুস্বভাবাপন্ন। হয়ত অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থায় অন্য লোকের যাহা ন্যায্য বা ভগবদ্দত্ত অধিকার, সেই অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজে উচ্চ হইয়া রহিয়াছে, হয়ত তাহার অট্টালিকার প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড সহস্র সহস্র

দরিদ্রের বুকের রক্ত জমাট করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; এসকল কথা আমরা জানি, অথচ সেই ধনবানের আমরা তোষামোদ করি ও গুণগান করি, কারণ তাঁহার অর্থ আছে।

এই প্রকারে যে ব্যক্তি প্রবল, তাহাকে দুশ্চরিত্র ও পরপীড়ক জানিয়াও তাহার আনুগত্য করি। কারণ, তাহার আনুগত্য না করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। এই প্রকারের সেবা ও দাস্য জগতে চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, এই প্রকারের পূজা কি দেবপূজা? এই প্রকারের দাস্যই কি কৃষ্ণ-দাস্য?

গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন যে, দেবপূজার প্রণালী ইহা নহে। যে আমার ভিতরের জিনিষ নহে, যে আমার অনাত্ম, কিছুতেই তাহার নিকট মাথা নোয়াইব না। কোন লোভ বা কোন বিপদের আশঙ্কায় মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা করিবেনা, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। গীতা ও ভাগবতে, এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

অধ্যাত্মসাধনার বা ধর্ম্মজীবনের প্রথম কথা আত্ম-সংস্থা। ইংরাজীতে যাহাকে Self-determination বলে। ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ বর্ণনায় এই আত্ম-সংস্থা বা Self-determinationএর কথাই বলা হইয়াছে। মানুষ! তুমি আত্মা, তুমি অজর, অমর; তুমি নিত্য ও সর্ব্বগত। আজ তুমি প্রকৃতির ক্ষেত্রে পড়িয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছ, কিন্তু নিরাশ হইও না, দুর্ব্বল হইও না, ভয় পাইও না। ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দৈবীসম্পদ্ বর্ণনায় প্রথম গুণটির নাম বলিলেন —"অভয়"। যে ভীরু, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? সুতরাং দেবতার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু এই যে দেবতা, ইহা বাহিরের প্রবল দেবতা নহে। এই দেবতা আমার ভিতরের জিনিষ My Own Ideal Self. কেবল দেবতা কেন, কৃষ্ণও যদি বাহিরেরর জিনিষ হইতেন তাহা হইলে মানুষ হইয়া, অমৃতের পুত্র হইয়া সে কৃষ্ণেরও আমরা পূজা করিতাম না! তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

"কৃষ্ণমেনমবৈহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।"

সুতরাং কৃষ্ণ আমার আত্মার আত্মা।

"যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ"

কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যাহা সত্য, দেবতা সম্বন্ধেও তাহাই হউক, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তাহার পর দেবতাকে আত্মবস্তু বলিয়া অনুভব করিয়া তাহার পূজা করিবে। অনাত্মের পূজা করিয়া, হে মানব! তুমি পতিত হইও না! শ্রীকৃষ্ণের ইহাই উপদেশ।

কি প্রকারে গোপগণকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য। নন্দ বলিলেন—"ইন্দ্রের কৃপায় জীবের ত্রিবর্গ সিদ্ধি।" ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ, কর্ম্মের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "বাবা, তুমি ইন্দ্রের কথা বলিতেছ, কিন্তু আমি দেখিতেছি, কর্ম্মের দ্বারাই জীবের জন্ম হয়, কর্ম্মের দ্বারাই বিলয় হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল যাহা কিছু সমস্তই কর্ম্মের দ্বারা হইয়া থাকে।

"অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥"

ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ পৃথক্‌ভাবে থাকেন, তাহা হইলে তিনি কর্ম্মের ফলদাতা। যিনি যেমন কর্ম্ম করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফলবিধান করেন।

"স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাব মনুবর্ত্ততে।"
"স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুর মানুষম্।"

মানুষ স্বভাবতন্ত্র, স্বভাবের অনুবর্ত্তন করে। দেব, অসুর, মানুষ সকলেই স্বভাবস্থ।

"তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।"

অতএব স্বভাবস্থ হইয়া এবং স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া কর্ম্মের পূজা করিবে।

এই যে উপদেশ অর্থাৎ স্বভাবস্থ ও স্বকর্ম্মকৃৎ হইবে, অধ্যাত্ম-সাধনার ইহাই প্রথম উপদেশ। স্বভাবস্থ হইলেই মানুষ বুঝিবে যে তাহার এই যে "স্ব", ইহার মধ্যেই সব আছে। দেবতাতো দূরের কথা, কৃষ্ণ বা ভগবান্, তিনিও এই "স্ব"-এর মধ্যে আছেন।

এই প্রকারের কর্ম্মের কথা বলিয়া কৃষ্ণ দেবতার কথা তুলিলেন ও বলিলেন—

"অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্।"

মানুষ যাহার দ্বারা সুখে অবস্থিত হয় তাহাই তাহার দেবতা। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি তাহার একটা সফলতা অন্বেষণ করিতেছে। সেই সফলতা কি, তাহা সকলে সব

সময়ে বুঝিতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতিকে যে ভিতর হইতে অন্বেষণ করিতেছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। স্বপ্রকৃতি নিরূপণ করিয়া স্বভাবস্থ হইতে হইবে। স্বভাবস্থ না হইলে কেহ স্বকর্ম্মকৃৎ হইতে পারে না। আমার স্বপ্রকৃতিই আমার দেবতা, আমার যিনি অন্তরতম তিনিই আমার দেবতা। তাঁহারই পূজা করা আমার ধর্ম্ম। যদি তাহা না করি, অর্থাৎ যে দেবতা আমার ভিতরে নাই, যদি আমি সেই দেবতার পূজা করি, তাহা হইলে কি হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"তাহা হইলে অসতী স্ত্রীলোকের উপপতি সেবার ন্যায় তাহা গর্হিত ও পাপজনক হইবে।"

"আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিদ্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতী যথা॥"

শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিলেন ও বলিলেন, "আমরা বৈশ্য ও গোপ। আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে বনভূমিতে বাস করি, গরু মহিষ লইয়া আমাদের কারবার। সুতরাং অপ্রত্যক্ষ ও সুদূরবর্ত্তী ইন্দ্রের পূজার পরিবর্ত্তে, ইন্দ্র পূজার দ্রব্যাদির দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের যজ্ঞ কর।"

এই উপদেশকে আমরা—'প্রত্যক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন'—এই আখ্যা দিতে পারি। ইংরাজীতে বলা যায় Return to the concrete. মানুষ ধর্ম্ম করিতে করিতে অনেক সময়েই বাক্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া কল্পনার রথে চড়িয়া প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষের মধ্যে হারাইয়া যায়। মানুষ মানুষ চেনে না, মানুষ প্রত্যক্ষের মহিমা বোঝে না, কেবল দেবতা দেবতা করিয়া অপ্রত্যক্ষের পশ্চাতে ধাবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোব্রাহ্মণের যজ্ঞ হইবে।" ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ। ব্রাহ্মণ ভূদেব। আজ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ আছে কিনা জানি না, কিন্তু ব্রাহ্মণ চাই, ব্রাহ্মণের পূজাও চাই।

ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ হইল, সুতরাং ইন্দ্র রুষ্ট হইলেন। দেবতার ক্রোধ পদে পদেই হইয়া থাকে। তাঁহারা মানুষকে তাঁহাদের খাদ্য করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষ চিরকালই তাঁহাদের খাদ্য হইয়া থাকুক, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। সুতরাং, মানুষের এই অহঙ্কার বা উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিলেন না। ভগবান্ যে পূর্ণতমরূপে মানবের মধ্যে মানববেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাও ইন্দ্র বুঝিলেন না। কাজেই ইন্দ্র বলিলেন—"বনবাসী গোপ, তাহাদের এত অহঙ্কার! কৃষ্ণ একজন মানুষ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ দেবতাকে অগ্রাহ্য করে! কি অন্যায় কথা।"

ইন্দ্র তাঁহার মেঘদিগকে আহ্বান করিলেন, মেঘ-সমূহ প্রচণ্ড বিক্রমে ব্রজভূমি আক্রমণ করিলেন। বজ্রের গর্জ্জন, বিদ্যুদ্-বিকাশ আর ভয়ানক বৃষ্টি-বর্ষণ!

এইখানে একটি কথা চিন্তনীয়। বেদবাদী ব্রাহ্মণদের কথায় বলা হইয়াছে যে শেষে তাঁহারা কৃষ্ণকে চিনিলেন, কিন্তু কংসের ভয়ে কৃষ্ণকে স্বীকার করিতে পারিলেন না। কংস অবশ্য তখনও ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু পাছে কোনরূপ অত্যাচার হয় এই আশঙ্কায় তাঁহারা সাবধান হইয়া চলিলেন। এখন গোপগণের কি হইল, একবার দেখুন। গরু বাছুর লইয়া সংসার। অকস্মাৎ অসময়ে বৃষ্টি। বৃষ্টি বলিয়া বৃষ্টি নহে, ইন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। গোপগণের মধ্যে যদি অনুমাত্র দুর্ব্বলতা থাকিত, তাহা হইলে বিপৎপাত হইবামাত্র তাঁহারা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন ও ইন্দ্রকে বলিতেন—"কৃষ্ণ বালক, বালকের কথায় আমরা অন্যায় করিয়াছি। যাহা হউক আপনি দেবরাজ, দয়া করিয়া অপরাধ ক্ষমা করুন।" গোপগণ কিন্তু তাহা করিলেন না। তাঁহারা "গুঁতোর চোটে বাবা" বলিয়া নাকে কাণে খত দিলেন না। এই অতি ভীষণ বিপদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমুদয় সহ্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যদি তাঁহাদের বাহিরের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে এ অবস্থায় কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের বাহিরের বস্তু নহেন, বাহিরে আজ লীলা প্রকট হইয়াছে, এইমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তরের বস্তু, তাঁহাদের অন্তরতম বস্তু। জীবন ছাড়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণকে ছাড়া যায় না।

এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, বালকে যেমন ছাতা ধরে ঠিক সেই প্রকারে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে আহ্বান করিলেন ও বলিলেন—"তোমরা সকলে এই পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। বায়ু, বাতাস ও অনলে ভয় করিও না।"

এক সপ্তাহকাল তিনি এই প্রকারে পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন। এখন ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিলেন। কৃষ্ণকে মানুষ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সে জন্য অনুতপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া নিজের অপরাধ ক্ষমা করাইলেন।

সতীশচন্দ্র ও তাঁহার গান

সম্প্রতি এই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পল্লী-কবির কয়েকটি গান, 'বীরভূমি'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কোন মাসিক বা সপ্তাহিক পত্রিকায় ইঁহার কোন গান প্রকাশিত হয় নাই। বীরভূম-অঞ্চলে বৈষ্ণব বাবাজীদের মুখে মুখে ইঁহার অনেক গান গীত হয়। আমাদের অনুরোধ-বশতঃ সতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁহার রচিত কয়েকটি গান সংগৃহীত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আশা করি, তিনি সতীশচন্দ্রের যতগুলি গান সংগৃহীত করিয়াছেন, সেগুলি সমস্তই ক্রমে ক্রমে 'বীরভূমি'-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া সতীশচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে বিরত হইবেন না।

কবি সতীশচন্দ্র, বীরভূম জেলার অন্তর্গত চহটা গ্রামে, ১২৭৬ সালে চৈত্র মাসে মাতুলালয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিত্রালয় বোলপুরের সন্নিকট সুরুল গ্রাম। পিতা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র। ইনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন; কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র এখন বর্ত্তমান আছেন। এই দুই ভ্রাতা পৈত্রিক ভবন ত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে বাস করেন। সতীশচন্দ্র ভালকুট গ্রামে ৺মহানন্দ চৌধুরির জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গোবিন্দমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। সতীশচন্দ্রের দুই কন্যা ভিন্ন অপর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই।

সতীশচন্দ্র যথাসময়ে নিজগ্রামের বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁধগড়া হাই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন; এবং ইচ্ছানুযায়ী এইখানেই পড়া শেষ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত অভিরামপুর গ্রামে বাঙ্গালা স্কুলে হেডপণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। এই স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করিবার পর তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না—কোন রকমে দিন চলিয়া যাইত; এজন্য তাঁহাকে বড় বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে হইত না।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সাহিত্য-চর্চ্চার দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মেলায় মেলায় প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পিঠস্থানে বসিয়া গান রচনা করিতেন এবং আপন মনে গান গাহিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। অনেক বৈষ্ণব বাবাজী তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ এবং তৎপ্রতি সমধিক আকৃষ্ট হয়। সতীশচন্দ্র, এতদঞ্চলে অনেকের নিকট 'সাধক কবি সতীশচন্দ্র' বলিয়া পরিচিত।

সতীশচন্দ্রের সংসারের প্রতি একরূপ আসক্তি ছিল না বলিলেই হয়। কনিষ্ঠ তারেশচন্দ্রই

সংসারপত্র দেখাশুনা করিতেন। সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা সতীশচন্দ্র পূজাবন্দনাদি, সাধুসহবাস এবং নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন। তিনি ন্যূনাধিক পাঁচশত গান রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অনেকগুলি গান এই অল্পকাল মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রায় তিন-শতাধিক গান তাঁহার অনুজ তারেশচন্দ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের গানগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁহার অপ্রকাশিত গানগুলি প্রকাশিত হইলে, আমরা সতীশচন্দ্রকে আরও ভালরূপে বুঝিতে ও চিনিতে পারিব।

কবি ১৩২২ সালে ১৩ই অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় শয্যায় উপবেশন করিয়া ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞা ন পরপারে চলিয়া যান।

নিম্নে সতীশচন্দ্রের চারিটি গান প্রকাশিত হইল।

(১)

গৌরী—একতালা

এই ভাবনাই ভাবি।
ভব-নদীর পরপারে কেমন করে যাবি॥
ত্যজে সাধন, যেদিকে ধন, সেইদিকে মন ধাবি,
ছয় জনে সব, লুটলে পেয়ে, চোর-কুঠারীর চাবী॥
যা কিছু ধন, থাক্‌লো পরে, আসল নয় তা, বাবী,
গরদা মালের, গরব কোথা, কিসের বা গুণ গাবি॥
ফুলে ফুলে, সুদে মূলে, হলো অনেক দাবী,
যম জমীদার, জবর হুকুম, কেমনে এড়াবি॥
খিড়্‌কি দিয়ে, পলাইতে, আর কি সময় পাবি,
তখনি কি তোর, হবে চেতন, যখন খাবি খাবি॥
সতীশ ভনে, কতদিনে, হয়ে ভাবের ভাবী,
শ্যামাপদ, সরোবরের, শান্তিজলে না'বি॥

(২)

ভৈরবী—কাওয়ালী

রসনা, বলরে আমার হরেকৃষ্ণ নাম।
অলস করোনা তনু, কখন অবশ হবে
অজপা ফুরায়ে যাবে, জপ নাম অবিরাম।

কুসঙ্গ প্রসঙ্গ, রস, কেন ভালবাসরে,
রাধাগোবিন্দ নাম, রসামৃতে ভাসরে,
জুড়াতে পরাণ পান কর নিশি বাসরে;
ভব ক্ষুধা নাশরে, ভাবরে পরিণাম॥
বান্ধ হরিনামের তরি, বলি তোরে বারে বারে,
দুঃখময় সংসার পারাবার তরিবারে,
আসিতে হবে না ফিরে, ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে,
পার পেলে পরপারে, পাবিরে পরম ধাম॥
কাল করোনা গত, সতীশের গেল কাল,
করাল বদনে গ্রাস, করিবারে এলো কাল,
কাল ভয়ে বল হরি, না ভাবিয়ে কালাকাল,
(হবে) ইহকাল পরকাল, চিরকালে পূর্ণ কাম॥

(৩)

ইমন—কাওয়ালী

জাগ, মূলাধারে জননী।
জনম মরণ যন্ত্রণা-বারিণী॥
সুষুম্না-গলিত-সুধা পানে মেতে মা আমার,
অধঃমুখে আঁখি মুদে, ঘুমাবিগো কত আর,
সাপিনী রূপিণী জেগে দাও সাধকে সুধাধার,
কর পার পারাবার দিয়ে তরণী॥
অনাহত স্বাধিষ্ঠান বিশুদ্ধাক্ষ মণিপুর,
ভেদ করিয়ে খেদ মিটা মা, তোর কাছে সে কতদূর,
দু'লে দু'লে চল্ দ্বিদলে বাজ্‌বে নুপুর সুমধুর,
শ্রবণ পিপাসাতুর শুনিতে ধ্বনি॥
সোহং তত্ত্ব জানায়ে মা, অহং-তত্ত্ব করি নাশ,
সতীশ কয় সে সহস্রারে, চল্ মা পরম শিব পাশ,
(গিয়ে) শম্ভু গৃহে শম্ভু-প্রিয়ে হিয়ায় করি বাস,
পূরাও অভিলাষ কুল-কুণ্ডলিণী॥

(৪)

চোরের মতন, ও নীলরতন, এসোনা কুঞ্জে ধীরে।
মিছে এলে শুধু, ইথে নাই মধু, যাও যাও বঁধু ফিরে॥
ছিলে যথা সুখে, যাও সেই মুখে, (মোরা) মনোদুঃখে মরে যাই,
সারা যামিনী জাগিয়ে, সরমে মরিয়ে, ঘুমায়ে গিয়েছে রাই,
তোমার সরম হলোনা আসিতে কি, মধু মিলে হরি বাসিতে কি,
(আর) বাসিতে না চাও, নূতনেতে চাও, নূতন রাগের ভরে॥
আর জ্বালা কালা দিও না, হে অবলা সরল প্রাণ,
তরল বাঁশীতে বাজাইও না আর গরল মিশানো গান,
তুয়া নাম কানে তুলিব না, কপট বাণীতে ভুলিব না
এসনা এসনা, গেল গেল জানা, ভালবাসা ভাল ক'রে॥
কমল-আঁখি আঁখি দিবে নাহে, তোমার কালরূপে প্যারী আর,
যাও তার কাছে হৃদয়ের মাঝে, মুরতি এঁকেছ যার,
গোপী ভাবাবেশে সতীশ কয়, পিরীতি করার এ রীতি নয়,
যার যেবা হয়, প্রাণে বাঁধা রয়, জীবন মরণ তরে॥

শ্রীগৌরীহর মিত্র।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৩। পদকর্ত্তা—রাধামুকুন্দ দাস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ স্তবক

ষষ্ঠ স্তবকে বসন্তলীলা সুবিস্তার। বসন্ত পঞ্চমী হোরী তৃতীয় প্রকার॥
দোল-যাত্রা চৈত্র হোরী দ্বিতীয় প্রকার। দ্বিতীয় প্রকার লীলা বসন্ত বিহার॥
তৃতীয় প্রকার লীলা শ্রীবাসন্তীরাস। পুনঃ পুষ্প দোলযাত্রা হইল প্রকাশ॥
ত্রয়োদশ প্রকারেতে একশত চতুষ্পদ। গদমদনাশক প্রাপক শ্রীপদ॥

সপ্তম স্তবক

মাধবে মাধব বিলাস মাধবী মাধব। সপ্তমে পঞ্চম পদ ভব অনুভব॥

অষ্টম স্তবক

অষ্টমে অষ্টম পদে অভিষেক লীলা। জ্যৈষ্ঠেতে পূর্ণিমা দিনে বর্ণনা হইলা॥

নবম স্তবক

নবমে হিন্দোল যাত্রা শ্রাবণ মাসেতে। দিবসে শ্রীরাধাকুণ্ড দ্বাদশ পদেতে॥
পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাবনে রাত্রিতে হিন্দোলা। সুবিস্তার পঞ্চদশ পদেতে বর্ণিলা॥

দশম স্তবক

দশম স্তবকে হৈল প্রার্থনা বিস্তার। সুষড়্‌বিংশতি পদে সুপঞ্চ প্রকার॥
সমাপ্ত হইল এই উত্তর বিভাগ। যাথে ভক্ত ভক্তি হয় কৃষ্ণ অনুরাগ॥
চতুঃশত চতুরশীতি পদের গণন। ষট্‌শত নবপঞ্চাশৎ পদ বিভাগে মিলন॥
অতঃপর সুষোড়শ পদে যে লিখিল। শ্রীমুকুন্দানন্দে যাহা মুকুন্দ বর্ণিল॥
অতঃপর বর্ণিল যে অনুক্রমণিকা। পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয়ের সংক্ষেপ কারিকা॥ * *॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ তোষক মুকুন্দ। বৈষ্ণব দাসানুদাস গাইল মুকুন্দ॥
ইতি শ্রীমুকুন্দানন্দ নামক গ্রন্থঃ। শ্রীরাধামুকুন্দদাসেন বর্ণিতঃ॥ সমাপ্তঃ॥

এই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে, সঙ্কলয়িতা ৯১, জন মহাজনের ৬৫৯টি পদ পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগদ্বয়ে, ১৬টি স্তবকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫৪টি পদে কোন ভনিতা নাই। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি মহাজন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহাদের পরিচয় ও রচিত পদাবলী এখনও সাহিত্য-সেবিগণের নিকট একেবারে নূতন। আমরা ক্রমে, এই সকল পদাবলী প্রকাশিত করিব। এই গ্রন্থখানির হস্তলিপি অতি সুন্দর ও সমুজ্জ্বল—ছাপা হরফের ন্যায়। এই গ্রন্থখানি মূলগ্রন্থ—ইহার অনুলিপি হয় নাই। এই সুন্দর সংগ্রহ-গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য। এই গ্রন্থের লিপিকাল বা সংগ্রহকালের কোন উল্লেখ নাই। মূলগ্রন্থখানি সমগ্র ও অক্ষুণ্ণ আছে। (রঃ লাঃ পুঃ—১০০২)

এই গ্রন্থ হইতে, সংগ্রহকার রাধামুকুন্দ দাসের স্বরচিত সমস্ত পদগুলি উদ্ধৃত হইল—

শ্রীসুবল বেশস্থ

অম্বিকানগরে পন্থ শ্রীগৌরসুন্দর। গৌরীদাস মন্দিরেতে রহে নিরন্তর॥
গৌরীদাস কর ধরি সুরধনী তীরে। উপনীত রাধাকুণ্ড ভাবয়ে অন্তরে॥
কহয়ে সুবল সখা শুনহে বচন। শ্রীরাধিকা বিনা মোর না রহে জীবন॥
আনি দেহ প্রেমময়ী মোর প্রাণাধিকা। মুকুন্দ কয় রাইরূপে তব রূপ ঢাকা॥ ১॥

সায়াহ্ন কালস্য

খেলাইয়া গৌরচন্দ্র বেলা অবসানে উপনীত হৈলা আসি শচীর অঙ্গনে ॥
দরিদ্রেতে পাইল যেন হারাধন রত্ন। ধূলা ঝাড়ি স্নান করাইলা করি যত্ন ॥
ভোজনে বসিল প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র। বামে গৌরীদাস দক্ষিণে নিত্যানন্দ ॥
আচমন সারিয়া লইলা মুখবাস। ভাবে গদগদ বাণী অন্তরে উল্লাস ॥
ধবলি শ্যামলি কোথা শ্রীদাম সুদাম। দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম ॥
গৌরীদাস বলে আন ছান্দনের দড়ি। মুকুন্দ কহয়ে দড়ি গোপী কৈল চুরি ॥ ২ ॥

অথ শ্রীযুগলবিলাসঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মিলনং ॥

হেনই সময়ে ধনী কৃষ্ণচিত্ত বিহারিণী নন্দালয়ে সর্ব্বগুণাধিকা।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে চম্পক কলিকা রঙ্গে তারা মাঝে শোভয়ে চন্দ্রিকা ॥
উপনীত শ্রীমতি রাধিকা।
যশোমতী ক্রোড়ে করি নীলমণি গর্ব্বহারী তিহ রাই চন্দ্রের কণিকা ॥ ধ্রু ॥
নয়নে নয়ন বান পরস্পর সন্ধান হানে দুহে দুহার উপরে।
শরাঘাতে দুহু তনু কদম্ব কুসুম যনু পুলকিত নেত্রে ধারা ধরে ॥
ললিতাদি সখী সব প্রভাব হেরিয়া তব মহাভাবে ধন্য করি মানে।
যে হইল মহাসুখ কি জানে সহস্র মুখ রাধিকা মুকুন্দ নাহি জানে ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধা জন্মাষ্টমী মিলনং ॥

বৃষভানু পুন্নে তথি যোগমায়া ভগবতী আসিয়া দিলেন দরশন।
পরম আনন্দ হয়া সূতিকা মন্দিরে গিয়া রাই কর্ণে কহেন বচন ॥
গোলোক বিহারী হরি আসিবেন ত্বরা করি তোমায় আর ভক্তে সুখ দিতে।
না ভাবিহ মনে দুঃখ পূর্ণ হবে সর্ব্বসুখ পৃথিবী হইবে আনন্দিত ॥
শুনি পুলকিত তনু কদম্ব কুসুম যনু দুনয়নে বহে প্রেম বন্যা।
কহে হেন হব বিধি মিলায়ব গুণ নিধি মনে ভাবে বৃষভানু কন্যা ॥
কৃষ্ণ পদে করি ধ্যান মনে মনে অনুমান আসিবেন মোর প্রাণধন।
যশোমতী নন্দালয়ে পরম আনন্দময়ে মুকুন্দের হৈব দরশন ॥ ৪ ॥

বাৎসল্য মিলন—ধানসী ॥ সুহই ॥

নাচিছে কানাই সঙ্গে বলাই। হেনকালে তথা আয়ল রাই ॥
ললিতাদি সখী সঙ্গেতে করি। অনিমেষে হরি-মুখ নিহারি ॥

নীলগিরি কিবা রজত-গিরি। তথাই শোভয়ে সুহেম-গিরি ॥
শ্বেত নীল যনু কমল মাঝে। সোনার কমল অধিক রাজে ॥
হেম নীল শ্বেত চন্দ্র উদিত। সখীগণ তহি তারা মিলিত ॥
অদ্ভুত শোভা শ্রীনন্দালয়ে। হয় নাই কভু হবার নয়ে ॥
নয়নে নয়ন কমল অলি। চাতক পায়ল মেঘ আবলি ॥
চকোর মিলল চন্দ্র উজরে। রাধিকা রূপ মুকুন্দ নেহারে ॥ ৫ ॥

অথ গোবর্দ্ধন যাত্রা মিলন ॥

পর্ব্বত গহ্বর হৈতে সবে গেলা আলয়েতে মেঘ মুক্ত যনু তারাগণ।
রাহুমুক্ত দ্বিজরাজ তেন হৈল ব্রজরাজ আনন্দিত ব্রজবাসিজন ॥
কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ নাহি জানে নিশিদিন নাচে গায় পরম আনন্দে।
তথা গিরিবর রাজে ললিতাদি সখী মাঝে রাই চান্দ নিরখে গোবিন্দে ॥
চন্দ্র গরাসল রাহু রাই গলে শ্যাম বাহু চন্দ্র চকোরে হৈল মেল।
সখীগণ মহাহর্ষে রাধা মেঘে প্রেম বর্ষে শ্যামচাতক সুখী ভেল ॥
গোবর্দ্ধন নিকুঞ্জেতে প্রেমবন্যা বহে স্রোতে সুরপুরে হৈল মহানন্দ।
ললিতাদি সখীগণ প্রেম মগ্ন অনুক্ষণ নিরীক্ষয়ে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ৬ ॥

শ্রীগোষ্টাষ্টমী যাত্রা মিলন ॥ ধানসী—সুহই ॥

নন্দালয়ে তব আয়ল রাই। হেরিয়া চকিত ভেল কানাই ॥
অঙ্গ পুলকিত নয়নে বারি। মুখচন্দ্রে দুহু চিত্তচকোরী ॥
মহাভাব অঙ্গে উদয় রহু। প্রেমের স্বভাবে বিস্মৃত দুহু ॥
হেরি সখীগণ আনন্দে ভাসে। সুবলাদি সখা প্রেম উল্লাসে ॥
পরম আনন্দে নন্দের গৃহে। রাধিকা মুকুন্দ হেরিয়া রহে ॥ ৭ ॥

বৎসচারণ মিলন ॥

বনে গেলা শ্রীগোবিন্দ রাধিকা পরমানন্দ সখী সঙ্গে ভানু আরাধনে।
চলে ধনী ত্বরা করি ভাবে গোলক বিহারী কতক্ষণে পাব দরশনে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যেই বনে পরম আনন্দ মনে বটু সুবল সঙ্গে বিহরে।
তথা রাই কমলিনী কৃষ্ণ চিত্ত বিহারিনী কুসুমচয়ন ছলে হেরে ॥
সুবল মধুমঙ্গলে ললিতা বিশাখা বলে চল যাই পুষ্প তুলিবারে।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া কার্য্য মনেতে করিয়া স্থৈর্য্য চলিলা কুসুম সরোবরে ॥

এথা কৃষ্ণ রাধিকায় কমলে ভ্রমর প্রায় চিত্ত বিত্ত কৈল সমাধানে।
নিত্যলীলা সুখময় তুলনা দিবার নয় রাধিকা মুকুন্দ গুণগানে ॥ ৮ ॥

প্রাতর্মিলন শ্রীনন্দালয়ে ॥ শ্রীগান্ধারী ॥

যশোদা নিকটে শ্রীরাধিকা সুন্দরী। বিদায় হইয়া চলে ত্বরা করি ॥
ললিতা বিশাখা চিত্রারে লইয়া। উপনীতা যথা নাগর শুতিয়া ॥
নাগরী হেরিয়া নাগর কানাই। আনন্দে কহয়ে আইসহ রাই ॥
একাসনে দুহু করিলা শয়ন। মহানন্দ সুখে মগ্ন সখীগণ ॥
ভুজে বক্ষে দুহু প্রেম অনুবন্ধ। পরস্পর হেরে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বাহ্নে গোষ্ঠগমনে পথি মিলন ॥

শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম বলরাম সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে।
অংশুমান কিঙ্কিনী মধ্যে ইন্দ নীল মণি গোগণ চালায়ই রঙ্গে ॥
অগ্রে ধেনুবৎস সব আবা আবা হৈহৈরব পাছে শিশুশ্রেণী চলু ঢঙ্গে ॥
রামকৃষ্ণ গোষ্ঠ চলে যুগ্মশৃঙ্গ বেণু বোলে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোভঙ্গে ॥
যাবট নিকটে যায় রাধা হেরে শ্যামরায় চন্দ্রশালা উপরে থাকিয়া।
কৃষ্ণ হেরে রাই মুখ উথলে দোহার সুখ পরস্পর বদন হেরিয়া ॥
নবীন বারিদ যেন চাতকী মিলন হেন চন্দ্রে চকোর পিয়ে সুধা।
কুবলয়ে শশী তনু হেমপদ্মে অলি যনু নিরীক্ষণে না পুরয়ে ক্ষুধা ॥
ধেনু সখা চলি যায় শ্রীকৃষ্ণ অস্থির প্রায় ললিতা বিশাখা পরানন্দ।
সুবল মধুমঙ্গল বলে ভাই চল চল হেরে দোঁহে রাধিকা মুকুন্দ ॥ ১০ ॥

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ভৈষজ্য ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস্

কৃষ্ণনগর, বেঙ্গল।

অমৃতপ্রাশ ঘৃত—সের ১০৲, বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত—সের ২০৲, ব্রাহ্মীঘৃত—সের ৮৲।

কৃষ্ণনগরে ভৈষজ্য উদ্যানসহ সুবৃহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানায় অকৃত্রিমভাবে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ, তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষার নিমিত্ত এবং ভেল হইবার আশঙ্কায় এ পর্য্যন্ত আমরা কোনস্থানে ব্রাঞ্চ খুলি নাই।

কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এম, এ, এবং ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি, এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, জমিদার এবং উকীল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঔষধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এখানে পুরাতন প্লীহা লিভারযুক্ত ম্যালেরিয়া, পুরাতন প্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধ্বজ-ভঙ্গ, যক্ষ্মা, এবং ডিস্‌পেপসিয়া এই কয়েকটী পীড়ার যত্নসহকারে চিকিৎসা করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পত্রাদি গোপনে সংরক্ষিত হয়।

বঙ্গের সুপরিচিত ধর্ম্মপ্রচারক এবং 'বীরভূমি'-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরত্ন মহাশয় এই কারখানা পরিদর্শন এবং ঔষধাদি ব্যবহার করতঃ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইল।

.....“আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, যাঁহারা এই ঔষধালয়ের ঔষধ একবার ব্যবহার করিতেছেন তাঁহারাই বিশেষ উপকার পাইতেছেন। ..... আমি এই কারখানার চ্যবনপ্রাশ, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহাসুগন্ধি মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী “পরাগপ্রসূন” নামক কেশতৈল এবং বৃহৎ দশনসংস্কার চূর্ণ নামক দাঁতের মাজন ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে যেরূপ ফল পাইয়াছ তাহা অন্যত্র পাই নাই। .....আমি ইচ্ছা করি এই ঔষধালয়ের নাম, ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। আর আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই ঔষধালয়ের ঔষধ ব্যবহার করুন। আমি বেশ জোরে বলিতে পারি এই ঔষধালয়ের বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় ঔষধ সেবনে তাঁহারা উপকৃত হইবেন এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।” চ্যবনপ্রাশ সের ৪৲, শ্রীমদনানন্দ মোদক সের ৮৲, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ তোলা ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার
শ্রীকালীব্রহ্ম সান্যাল
আয়ুর্ব্বেদিক কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্ট,
ভৈষজ্য ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস্,
কৃষ্ণনগর, বেঙ্গল।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান সংখ্যা, সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যা। ১৩৩২ সালের আশ্বিন মাসে দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না, চৈত্র মাসে পূর্ণ হইবে।

দ্বাদশ সংখ্যার অর্থাৎ পূর্ণ একখণ্ডের মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ভি, পি, তে লইলে ৩৷৹ তিন টাকা চারি আনা। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

প্রত্যেক খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ (complete in itself), এক একখানি পৃথক্ পুস্তকের মত। সুতরাং যে কোন একখণ্ড কিনিয়া পড়িলে তাহা বুঝিবার জন্য, অন্য কোন খণ্ডের বিশেষ আবশ্যক নাই।

সিউড়ী, বীরভূম } শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক

নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ—"সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ"

অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী এবং বঙ্গবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে—"সুখ পাঠ্য","প্রত্যেক নরনারী পাঠ্য" প্রভৃতি মন্তব্যে উচ্চ প্রশংসিত আধুনিক কালের যোগৈশ্বর্য্যশালী অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্য সম্বলিত নূতন ধর্ম্মপুস্তক। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীবেচারাম লাহিড়ী বি এ, বি এল প্রণীত। মূল্য কাগজ বাঁধা ৸৹ ও কাপড় বাঁধা ৸৶০। ভি পি ১৲ ও ১৶০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কৃষ্ণনগর—শ্রীবেচারাম লাহিড়ীর নিকট

কলিকাতা (১) ইণ্ডিয়ান বুকক্লব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

(২) গুরুদাস চাটার্জ্জি ও সন্স পুস্তকের দোকান

(৩) ৫।৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার পোঃ

শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সিউড়ী হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, ১৩৩৩

82. 926.
4 ii. 1926.

জয়দেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

২ মনোহরসাহী কীর্ত্তন
৩ অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী
৪ প্রাচীন দপ্তর
৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ

Birbhum
20. 12. 26
BENGAL ... 20 DEC ... WRITE... CALCUTTA
21/12/26

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক
সম্পাদিত

প্রতি সংখ্যার মূল্য—চারি আনা মাত্র]

২০৫

বীরভূমি, ৮—১ কার্ত্তিক, ১৩৩৩

৫০৫/৮

জয়দেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

১। গোপীপ্রেম

সকলেই স্বীকার করিবেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিশ্চয়ই কিছু গভীর ও মূল্যবান নূতন কথা বলিয়া গিয়াছেন; মানুষের ভাবজীবনের তুষ্টি ও পুষ্টির জন্য তিনি নিশ্চয়ই কিছু নূতন উপাদান দিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে এই চারিশত বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান' ভাবিয়া, তাঁহার নামে নাচিয়া, গাহিয়া ও কাঁদিয়া নিজেদের কৃতার্থ ও ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিত না। আমাদের উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি কি নূতন কথা বলিলেন, কি কি নূতন ভাব দিলেন। একদিনে ইহার উত্তর মিলিবে না—ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথম কথা এই বলা যাইতে পারে তিনি জানাইলেন 'গোপীপ্রেম' কি? তাঁহার কৃপায়, এই 'গোপীপ্রেম' মানবের সাধনরাজ্যের বিষয়ীভূত হইল। ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান দান বা মূলদান।

নদীয়া-লীলা অবসান! শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর নদীয়া ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবেন! ঠিক্ তাহার পূর্ব্বে একদিন তিনি আত্মহারা হইয়া "গোপী, গোপী" এই কথাটি উচ্চৈঃস্বরে জপ করিতেছিলেন। পূর্ব্বে কেহ কখনও এই ভাবে এই নাম জপ করে নাই, পরিচিত কোনও শাস্ত্রে এই নাম এই ভাবে গ্রহণ করার বিধানও নাই। তাঁহার এই নূতন প্রকারের আচরণ দেখিয়া কয়েকটি ছাত্র তাঁহাকে বলিয়াছিল,—'আপনি একি ব'লতেছেন, কৃষ্ণের নাম করুন।' মহাপ্রভু তখন ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এই ছাত্রগণকে প্রহার করিয়াছিলেন বা প্রহার করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই নদীয়ার ব্রাহ্মণ-সমাজের একদল লোক শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন, এই ঘটনায় বিরোধ আরও বাড়িয়া গেল, তাঁহার ও তাঁহার দলের বিরুদ্ধে রীতিমত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। মহাপ্রভু সকলই বুঝিলেন—এবং গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। 'গোপী'

এই শব্দ জপ করাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী হওয়ার নিয়োজক ও উদ্দীপক কারণ। (Immediate and exciting Cause).

গোদাবরী-তীরের সুবিখ্যাত কথোপকথনে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ) রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে বলিলেন, "গোপীপ্রেম হইতেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের বশীভূত। (গোপালতাপনী শ্রুতি, নারদ-ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রে একথা আছে।) শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা আছে, তাঁহাকে যেভাবে যে ভজনা করিবে, তিনি তাঁহাকে ঠিক্ সেই ভাবে ভজনা করিবেন বা কৃপা করিবেন। ভগবদ্গীতায় এই প্রতিজ্ঞা সুস্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। গোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলেন, গোপীগণের প্রেমের অনুরূপ ভজনা করিতে পারিলেন না, (Could not reciprocate) গোপীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ ঋণী হইলেন। এই ঋণ চিরকালেও শোধ হইবার নহে। শ্রীমদ্ভাগবত ইহা বলিয়াছেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ কথা,—ইহাই বৃন্দাবন-লীলার শেষ কথা। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের পরকাষ্ঠা হইলেও তিনি যখন ব্রজগোপীর সঙ্গে থাকেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য বাড়িয়া যায় ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতের কথা।"

রায় রামানন্দের মুখে এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"এই গোপীপ্রেমই সাধ্যের সীমা. (The highest spiritual ideal to which man can aspire)—তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমি জানিতে চাই, ইহার পর আর কিছু আছে কিনা। যদি কিছু থাকে, তাহাই আমাকে বল।"

এই অনুরোধ শুনিয়া রামানন্দ রায় বিস্মিত হইলেন। গোপীপ্রেমের পরে কিছু আছে কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এমন লোক পৃথিবীতে নাই; ইহাই রায় রামানন্দের ধারণা ছিল। তাঁহার এই ধারণা বদ্লাইয়া গেল। মহাপ্রভুর অনুরোধে তিনি বলিলেন—"ইহার পরের কথা বলিতেছি। গোপীপ্রেমেরও তরতম (Varieties) আছে। গোপীপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমই 'সাধ্য-শিরোমণি'।"

২। শ্রীরাধার প্রেম

মহাপ্রভু বলিলেন,—"বল, এই কথাই বল। তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতনদী

বহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে চুরি করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া লুকাইয়া পলাইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা আছে, একথা শুনিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চাহেন, কিন্তু গোপীগণকে ভয় করেন। সুতরাং এই প্রেম গাঢ় নহে, নিরপেক্ষ (Absolute) নহে; ইহা সাপেক্ষ (Relative)।"

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥
রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥
প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাতে করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যদি সাক্ষাৎভাবে গোপীগণকে ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি গাঢ় বা নিরপেক্ষ অনুরাগ প্রকটিত হইত।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া রামানন্দ রায় বলিলেন—"তবে প্রেমের মহিমা শুনুন। ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই। শ্রীকৃষ্ণ, গোপীগণের রাসমণ্ডল ছাড়িয়া শ্রীরাধার জন্য বনে বনে বিলাপ করিয়া ঘুরিতেছেন। রাসমণ্ডলে শতকোটি গোপী, তাহাদের সহিত রাসবিলাস হইতেছে। এই শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও শতকোটি মূর্ত্তি ধরিয়া বিহার করিতেছেন। শতকোটি গোপীর প্রত্যেকের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। ইহার নাম সাধারণ প্রেম, সর্ব্বত্র সমতা ইহার লক্ষণ। এই সাধারণ প্রেমের অভিনয় দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেমে 'বামতা' হইল। শ্রীরাধার প্রেম কুটিল। ফলে, শ্রীরাধা ক্রোধ করিয়া মানময়ী হইলেন এবং রাসমণ্ডল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীহরি ব্যাকুল হইলেন।

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥

শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে আর রাসলীলার ইচ্ছা নাই, কাজেই শ্রীকৃষ্ণও মণ্ডলী ছাড়িয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে বাহির হইলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও শ্রীরাধাকে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কামবাণে খিন্ন হইয়া বিষাদ করিতেছেন।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধার গুণ ॥

৩। গীতগোবিন্দের প্রমাণ

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এই শেষ চিত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের চরম কথা ও বিশেষ কথা। কিন্তু, এই কথাটি জয়দেবের গীতগোবিন্দের। রায় রামানন্দ গীতগোবিন্দের দুইটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এই রহস্য ব্যক্ত করিলেন। শ্লোক দুইটি এই—

কংসারিরপি সংসার-বাসনা বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে ততাজ ব্রজসুন্দরীঃ।
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥

গীত গোবিন্দের তৃতীয় সর্গের এই শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়া রায় রামানন্দ বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিলেন—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥

গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের নাম 'মুগ্ধ মধুসূদন'। এই সর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিলে শ্লোক দুইটি বুঝিবার সুবিধা হইবে। গীত-গোবিন্দের প্রথম সর্গের নাম 'সামোদ দামোদর' আর দ্বিতীয় সর্গের নাম 'অক্লেশ কেশব'। এই দুই সর্গে শ্রীরাধামাধবের উৎকর্ষ ও শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার হেতু—শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারী-গণের সঙ্গে বিহার করিতেছেন। এই কথা শ্রীরাধা প্রথমে সখীগণের মুখে শুনিলেন

তাহার পর নিজেও তাহা দেখিলেন। তৃতীয় সর্গে কবি বলিতেছেন, শ্রীরাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়িয়াছে—তিনি অন্যান্য ব্রজনারীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনুতপ্ত, তিনি ভাবিতেছেন কেন শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিলাম। এখন কি করি? কি করিলে আবার মিলন হয়? এই প্রকারের দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনা-সমীপবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে বসিয়া বিষণ্ণ মনে খেদ করিতেছেন।

'কংসারিরপি'—শ্রীকৃষ্ণও; অথবা যদিও শ্রীকৃষ্ণ কংসারি তথাপি। কংস একটি অসুর, দ্বাপর যুগের শেষ-সময়ে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং অন্যায়পূর্ব্বক রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই কংসকে বধ করেন বা বধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ কংসারি। এই গেল ঐতিহাসিক কংস। লীলাতত্ত্ববিদ্ বলিবেন—এই ঐতিহাসিক কংস, নিত্য কংসের বা কংসতত্ত্বের প্রাকট্য বা ঘনীভূত মূর্ত্তি—Concretized form or the Eternal principle known as Kansa. এই তত্ত্ব-কংস কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি চিন্তাপূর্ব্বক পাঠ-করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাহিত্যরসিক বলিবেন, 'কম্' ধাতু হইতে 'কংস' শব্দের উৎপত্তি, সুতরাং 'কংসারি' বলিলে শব্দের ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বারা (by suggestiveness) কামজয়ী বা কামের অরি, এই ভাবটি স্বভাবতঃই মনে জাগে। অতএব 'আপ্তকাম'—এই ভাবটি মনে জাগাইয়া এই শ্লোকটির আস্বাদন করিতে হইবে। অতএব অর্থ হইল—যদিও শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম বা আত্মারাম, তথাপি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরাসলীলার প্রারম্ভেও 'অপি' পদ এই ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্'—সম্যক্ সারভূতা যা বাসনা তস্যা বন্ধে দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলা নিগড়রূপিণীং তাং—আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণেরও বাসনা আছে, যিনি পূর্ণ, তিনিও কিছু চাহেন। এই বাসনার যাহা সাররূপা অর্থাৎ সকল বাসনার যাহা মূল, সেই মূল বাসনায় শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেম লাভই শ্রীকৃষ্ণের সারভূতা বাসনা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে শ্রীরাধার কথা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গ ত্রিবিধ, লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ, আর ব্রজাঙ্গনাগণ। ব্রজাঙ্গনাগণই কান্তাগণের সার বা

মূল। শ্রীরাধা গোপীগণের মূল। শ্রীরাধা অংশিনী, অন্যান্য সকলে অংশরূপা। শ্রীরাধা হইতেই কান্তাগণের বিস্তার হইয়াছে।

৪। শ্রীরাধাতত্ত্ব

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
* * * * * *
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকার নাম পুরাণে বাখানে॥

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীরাধাকে "সর্ব্বকান্তিঃ" বলা হইয়াছে। 'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এক অর্থ—

সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥

'সর্ব্বকান্তি' শব্দের আর একটী অর্থ আছে।

কিম্বা কান্তি শব্দ কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত-পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ-বিবরণ॥
জগত-মোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী।

গীতগোবিন্দের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহার প্রথম শ্লোকটি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই স্থানে যে প্রসঙ্গে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ:

রাধাসহ ক্রীড়ারস বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ হেতু নহে গোপীগণ॥

শ্রীরাধাসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার একটি গূঢ় কথা প্রচার করিয়াছেন।

কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্তঘ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রস আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমায় করে সুশীতল।
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥

গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকের প্রথম শ্লোকটির অর্থ এইবার বিচার করা যাউক। শ্লোকটির অর্থ এই—কংসারিও 'সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলা' শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধরিয়া অর্থাৎ ব্যাকুল চিত্তে শ্রীরাধার কথা ভাবিতে ভাবিতে, অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিলেন।

৫। পুরুষবাদ বা লীলা

পূর্ণকাম ও সত্যকাম শ্রীভগবানের এই লীলা অনুভব করিতে হইবে। এই

বিশ্বব্যবস্থার মূলে একজন পরম পুরুষ আছেন—তিনিই সত্য। আর যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার জন্য। ধ্যানযোগে নয়ন মুদ্রিত করিয়া বুঝিলাম, তিনি পূর্ণ। তাহার পর নয়ন খুলিয়া যখন এই প্রকটিত বিশ্বের মধ্যে জাগিয়া উঠিলাম, এই রূপরস-গন্ধভরা জগৎ, এই স্নেহ প্রেম ভালবাসা-ভরা বিশ্বনাট্যের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়, এই হাসিকান্না দিয়া গড়া মানুষের এই সুখ দুঃখের হাট, যখন আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল; কেবল জ্ঞানের বিষয় নহে, যখন এই বিশ্বযাত্রায় মিশিয়া রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে, স্নেহে প্রেমে ভালবাসায় মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া এই হাটে বেসাতি করিতে আসিলাম, এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন মনে হইল এই সমুদয়ই সেই একের খেলা, আমার জীবনেও তাঁহারই লীলা। সেই 'এক' বদ্ধ হইয়াছেন, বহু হইয়া বহুর ভিতর দিয়া নিজেরই ঐক্য অন্বেষণ করিতেছেন। যিনি স্বরূপে নিত্যমুক্ত, তিনি সখ্ করিয়া এই অসংখ্য ও অগণ্য বাঁধনে নিজেকে বাঁধিয়াছেন, বাঁধন পড়িয়া বাঁধন ছিঁড়িতে চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহার সব আছে, তাঁহার যেন আজ কিছুই নাই, তিনি সর্ব্বস্ব হারাইয়া সেই হারানিধির অন্বেষণ করিতেছেন। বাঁধন পড়িয়া যিনি আসিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ; আর সেই হারানিধিই শ্রীরাধা। কোথায় আমার প্রাণের রাধা? ইহাই শ্রীকৃষ্ণের আকুল অন্বেষণ! শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁধন পড়িয়াছেন, নিদারুণ বাসনা-বন্ধনে যখন নিজেকে বাঁধিয়াছেন, তখন তাঁহার ভুল হইবে পদে পদে; এই ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া হাসিয়া ও কাঁদিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে; ইহাই তাঁহার লীলা। তিনি শ্রীরাধাকে ধরিয়াও ধরিতে পারেন না; চিনিয়াও চিনিতে পারেন না; তিনি যে শ্রীরাধাকে চাহেন, শ্রীরাধাই যে তাঁহার সর্ব্বস্ব, ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। বস্তু আছে, বস্তুর অংশ আছে, বস্তুর বিম্ব, প্রতিবিম্ব আছে। বস্তুকেই চাই, কিন্তু ঠিক্ বুঝিয়া ধরিতে পারি না, বস্তুর ছায়া বা প্রতিবিম্বের পশ্চাতে ছুটি। এইভাবে ছুটিতে ছুটিতে সেই বস্তুর কথা মনে পড়ে; তখন আর অংশ লইয়া বা প্রতিবিম্ব লইয়া সাধ মেটে না, আশা পূর্ণ হয় না; তখন সেই বস্তুর জন্য আকুল হইয়া তাহারই অন্বেষণ করি। সেই যে বস্তু, তাহাকে পাই কিন্তু আবার হারাই, প্রতিবিম্বে মুগ্ধ হইয়া দূরে চলিয়া যাই—আবার কাতর হই, বস্তুর স্মরণে কাতর হইয়া উঠি। ইহাই লীলা। এই যে বস্তু, ইহা আমা হইতে পৃথক্ না হইয়াও পৃথক্, ইহাকে যত পাই, তত হারাই। কেবল পাওয়া আর হারানো,—ইহাই নিত্যলীলা। জয়দেব

বুঝিতে হইলে জীবনের ও জগতের এই মৌলিক রহস্য (Mystical conception) অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভব যাহার নাই, তাহার পক্ষে জয়দেব না পড়াই উচিত।

গীতগোবিন্দ হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ এইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ মদনবাণে পীড়িত। 'শ্রীরাধাকে সর্ব্বোত্তমা বলিয়া জানিয়াও কেন প্রত্যাখ্যান করিলাম' এই ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুতাপ করিতেছেন। শ্রীরাধাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যমুনা-তট-প্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই খেদ একটি সঙ্গীতে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা স কুপিতেব॥
কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রূকোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব—রোহিণীরমণেন॥
হরি হরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥

আমি গোপাঙ্গনাপরিবৃত ছিলাম; শ্রীরাধা তাহা দেখিয়া দূর হইতেই চলিয়া গিয়াছেন।

আমি অপরাধী, এই জন্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারি নাই। হরি, হরি, আমি অনাদর করিলাম, এইরূপ ভাবিয়া তিনি কুপিতা হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। আমার সহিত এই দীর্ঘবিরহ, এ সময়ে প্রিয়া কি করিবেন, কিই বা বলিবেন? হায়, আমার এখন ধনেই বা কি হইবে, জনেই বা কি হইবে, বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি হইবে, গৃহেই বা কি হইবে? হরি, হরি, অনাদর করিয়াছি বলিয়া তিনি কুপিতা হইয়া বুঝি চলিয়া গেলেন! তাঁহার সেই মুখখানি মনে পড়িতেছে, তিনি কুপিতা হইয়াছিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার মুখখানি ভ্রমরসমূহপরিব্যাপ্ত রক্তপদ্মের ন্যায় দেখাইতেছিল। শ্রীরাধা আমার হৃদয়-বিহারিণী, প্রগাঢ় প্রেম, তাঁহার সহিত মনে মনে আমি সর্ব্বদাই রমণ করিতেছি, তবে আর বনে বনে অনুসরণ করি কেন? কেনই বা তাঁহার উদ্দেশে বৃথা বিলাপ করিতেছি?

হে তন্বি, অন্য ব্রজনারীর সহিত বিহার করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, তোমার হৃদয় ঈর্ষায় খিন্ন হইয়াছে। তুমি কোথায় গিয়াছ জানি না, এই জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও পারিতেছি না। তুমি যেন আমার সম্মুখেই রহিয়াছ, যাওয়া আসা করিতেছ; কিন্তু হায়, পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন দান করিতেছ না। সুন্দরি, ক্ষমা কর, আর কখনও তোমার অপ্রিয়াচরণ করিব না; আমাকে দেখা দাও, আমি বিরহ জন্য বড়ই কষ্ট পাইতেছি।

সমুদ্রে যেমন রোহিণীনাথ চন্দ্রের উদয় হয়, সেইরূপ কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব প্রণত হইয়া হরির এই বিরহ বর্ণনা করিলেন।

যাঁহারা ভাবসত্যবাদী ও চৈতন্যবাদী, তাঁহার ধ্যানযোগে চৈতন্যের রহস্য Mysteries of consciousness অবধারণ করিয়া, সেই রহস্যের আলোকে জীবনের ও জগতের যাবতীয় তত্ত্বের মীমাংসা করিতে চাহেন। চৈতন্যের দুইটি লক্ষণ—প্রবৃত্ত ও প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ প্রবৃত্ত-রূপ, আর শ্রীরাধা প্রকাশ-রূপ। এই দুই মূলে বা স্বরূপে এক, লীলায় দুই হইয়াছেন। ইহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্বও ইহাই—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হইলা এক ঠাঁই॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই যে প্রধান সিদ্ধান্ত, ইহা শ্রীগীতগোবিন্দের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে রহিয়াছে।

৬। যুগলতত্ত্ব

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব আর একটু বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা দরকার। বিশ্বের দুইটি অবস্থা আছে, অব্যক্ত (unmanifest) বা কারণরূপ, আর ব্যক্ত (Manifest) বা কার্য্যরূপ। সত্য কথা এই যে আমরা অব্যক্ত সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবে যে তাঁহার কথা বলি তাহার কারণ আমরা 'অব্যক্ত আছেন' ইহা না মানিয়া চিন্তাই করিতে পারি না (It is a Logical Necessity)। 'ব্যক্ত' লইয়াই আমাদের কারবার। অব্যক্ত হইলেন নির্গুণ ব্রহ্ম (Abstract universal) ব্যক্ত হইলেন সগুণ ব্রহ্ম (Concrete universal)। দুই না হইলে ব্যক্ত হয় না—(Manifestation is a Duality)। প্রাচীনতম শাস্ত্র এই দুই এর কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইই পুরুষ ও প্রকৃতি; চেতন ও জড়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (subject and object) এইভাবে অনুভূত হয়। এই প্রকাশিত বিশ্ব, ইহাকেই যদি প্রকৃতি বলা যায়, তাহা হইলে ইহাকে আমরা জড় বা অচেতন বলিতে পারি না। এখনকার দিনে সকলেই বলিতেছেন, বিশ্বে এই যে পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ হইতেছে, তাহার মূলে একটি জ্ঞানময়ী ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়ান্বিত। ইংরাজী ভাষায় এই শক্তিকে Cosmic urge বলে, evolutionary impulse বলে। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকী চিন্তা প্রকৃতির তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছে কিন্তু প্রকৃতির এই আবেগ ছাড়া পুরুষেরও ইচ্ছা বলিয়া একটি তত্ত্ব আছে। আমাদের দেশে যুগল উপাসনাই প্রধান উপাসনা। লক্ষ্মী নারায়ণ, সীতারাম, হরগৌরী, উমামহেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি।

শ্রীজয়দেবের গ্রন্থে প্রথমেই বসন্তকালের কথা। এই বসন্তকালে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের আবেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। বসন্তে ফুল ফুটিয়াছে—বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের আবেগ এই বিকশিত ফুলের মধ্যেই পরিব্যক্ত। এই ফুলগুলির শোভা ও সৌরভ একদিন একটি অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিল।

বীজ অচেতন নহে, সে বিকশিত হওয়ার জন্য,—ঐ সুন্দর ও সুরভি ফুলগুলি বাহিরের আলোবাতাসে ব্যক্ত করার জন্য, বহুদিন ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই নাম Cosmic urge বা বিশ্বের মৌলিক প্রেরণা। জয়দেব বুঝিয়াছেন ফুল ফুটিয়াছে, আর সেই বসন্তের ফুলের বনে একটি কিশোরী বালিকা; তাহার দেহখানি ঐ ফুলের সুষমার সারাৎসার দিয়া গঠিত। সেই কিশোরী বিরহ-ব্যাকুলা, বসন্তের বনে ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিতেছেন তাঁহার কান্ত কোথায়? এই কিশোরীই শ্রীরাধা। বিশ্বের প্রাণের ভিতর যে ব্যাকুলতা রহিয়াছে, তাহার উন্নততম ও পবিত্রতম মূর্ত্তিই শ্রীরাধা।

এখনকার দিনে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে বিশ্বের মর্ম্মস্থলে ক্রিয়ান্বিত সমুদয় শক্তি মানুষে আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই মানুষের মধ্যে এক নিত্যমানুষ আছে —সেই নিত্যমানুষের লীলাই সর্ব্বোত্তম লীলা, তাহাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা। এই প্রণালীতে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি শ্রীরাধাকৃষ্ণ কেবল সম্প্রদায়-বিশেষের উপাস্য নহেন, ইঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বের সকলের। কিন্তু সে কথা পরে। আপাততঃ ভারতবর্ষকে বলা যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সেই তত্ত্ব ও বিগ্রহ, যাহার মধ্য দিয়া, যাহার উপাসনা করিয়া ভারতের যাবতীয় সাধনাধারা, ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা, এক চরম ও পরম সমন্বয় অন্বেষণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে—"That principle and personality, in and through which the great Indian syuthesis was, is being and will be worked."

Humanism ও Naturalism, বর্ত্তমান যুগের এই দুইটি সাধনধারা বুঝিলে জয়দেব বুঝিবার সুবিধা হয়।

৭। মূর্ত্ত আদিরস

এইবার আর একটি মূল সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে। রায় রামানন্দের মুখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন, তাহার শেষ কথা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে, ভগবান্ সম্বন্ধে বা পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলের ধারণা (Conception) একরূপ নহে। যাঁহারা কৃষ্ণ পারম্য বাদী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব (Final principle) বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের ধারণা কিরূপ, তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ বলিলেন—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্ব-কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহো সভার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজ যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অত এব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

ইহাই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। কথাগুলি অতিশয় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ধীরভাবে বিচারপূর্ব্বক প্রত্যেক কথাটি বুঝিতে হইবে।

শ্রীভগবানের মহিমা বা ঐশ্বর্য্য অনন্ত ও ধারণাতীত। আমরা সেই ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতে পারি। ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, চিন্তা করিতে করিতে আমরা ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এই প্রকারের ভগবদ্‌চিন্তায় আমরা অনেকেই অভ্যস্ত এবং এই প্রকারের চিন্তাপ্রণালী আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, ইহাই

একমাত্র চিন্তাপ্রণালী নহে, অন্য প্রকারেরও চিন্তাপ্রণালী আছে। মানুষ ইচ্ছা করে, জানে, আর অনুভব করে—Wills, knows and feels। এই তিন প্রকারের ক্রিয়া মানবচৈতন্যে বিদ্যমান। কেবল জানার দিক দিয়া অগ্রসর হইলে মহিমা বা ঐশ্বর্য্য চিন্তাই স্বাভাবিক। সেই ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিয়া এখন আসুন, আমরা আমাদের অনুভব করিবার বা আস্বাদন করিবার (To feel, to enjoy) যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করি। আমরা কি চাই? আমরা শ্রীভগবান্‌কে চাই, না, শ্রীভগবানের আস্বাদ চাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলুন ও বুঝতে চেষ্টা করুন, আমরা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া কি করিব? বেদ বলিয়াছেন শ্রীভগবান্ মধু, শ্রীভগবান্ রস। আমরা শ্রীভগবানের আস্বাদন চাই। আমরা চাই Not God but Realization or Enjoyment of God। এই যে আস্বাদন বা উপভোগ ইহাই ভক্তের আকাঙ্ক্ষার ধন, ভক্তের একমাত্র সম্পদ্। একান্ত জ্ঞানবাদী বলিবেন, এই আস্বাদন প্রাপঞ্চিক, সুতরাং অনিত্য ও নশ্বর। একান্ত ভক্তিবাদী বলিবেন, এই আস্বাদন চিন্ময়, নিত্য ও অবিনশ্বর। এই রসই অমৃত। ভক্তমাত্রেই এই 'রসামৃত' উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক ভক্তের আস্বাদন, ঠিক্ একরূপ নহে। শ্রীভগবান্ রসামৃত-সিন্ধু—সুতরাং ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুযায়ী তাঁহাকে আস্বাদন করিতেছেন। এইবার একটি তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইবে। ভক্ত ও ভগবান্। ভক্ত ও ভগবানে সম্বন্ধ কি? ভক্ত, ভগবান্‌কে আস্বাদন করিতেছেন। তত্ত্ববিৎ বলিতেছেন, ভক্তকে দ্বার করিয়া শ্রীভগবান্ নিজেকেই নিজে আস্বাদন করিতেছেন। এইটুকু বুঝলেই বুঝিবেন—

নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥

তিনিই বিষয়, তিনিই আশ্রয়; ইহাই প্রথম কথা। তাহার পর প্রকট লীলায় দেখিবেন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, আর শ্রীরাধা আশ্রয়। শ্রীচৈতন্য লীলায় দেখিবেন—বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়াছেন—রসরাজ ও মহাভাব, একরূপ হইয়াছেন।

রস নানারূপ। এই নানারূপ রসের তত্ত্ব বিচার করিয়া সে কালের ও একালের

পণ্ডিতেরা বুঝিয়াছেন, শৃঙ্গার রসই সকলের আদি ও সকলের পরিণতি। এই শৃঙ্গার রসই আদিরস। এই রসই যখন মূল ও আদি, তখন এই রস 'আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর'। এই শৃঙ্গার রস মূর্ত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই সেই মূর্ত্ত শৃঙ্গার-রস। রসের বর্ণ আছে, শৃঙ্গার রসের বর্ণ, 'ইন্দ্রনীলমণিশ্যাম'। লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতার, লক্ষ্মী আদি নারী, এমন কি স্বয়ং রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ, এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ।

এই একটি মূল কথা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু জগৎকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'মূর্ত্ত শৃঙ্গাররস'। এই কথাটিও আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দে দেখিতে পাই; আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন গীতগোবিন্দের শ্লোকটি এই—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা শ্রীমতী রাধিকাকে একজন সখী দেখাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অদূরে অনেকগুলি গোপাঙ্গনা-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বিহার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রীমতী রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

"সাখ, বসন্তকালে মুগ্ধ হরি ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস। তিনি বিশ্ববাসী সকলকে তাহাদের নিজ নিজ বাঞ্ছার অতিরিক্ত দান করিয়া প্রীত করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ সমূহ নীলোৎপলশ্রেণী অপেক্ষাও শ্যামল, শীতল ও সুকুমার। ঐ অঙ্গসমূহ পলে পলে নূতন হইয়া উঠিতেছে। তিনি তাঁহার অঙ্গ সমূহের দ্বারা সকলেরই অনঙ্গোৎসব (কামোল্লাস) সংবর্দ্ধিত করিতেছেন। ব্রজসুন্দরীগণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতি-অঙ্গ গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতেছেন।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে দর্শন করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে শ্রীরাধিকা মহাভাব আর শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ। মহাভাবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গার-রস। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বলিয়া এই মহাসত্য জগতে প্রচারিত করিলেন।

৮। স্বরূপ দামোদর

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-কার তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ কথোপকথনে রায় রামানন্দ যে শেষ কথা বলিয়াছেন, তাহা জয়দেব হইতে গৃহীত, তাহা আমরা দেখিলাম। এইবার স্বরূপ দামোদরকর্ত্তৃক প্রচারিত বলিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে সমুদয় শিক্ষা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়, সেগুলিও যে জয়দেবের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বরূপ দামোদরের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা জগতে প্রচার করাইয়াছেন, তাহা অতিশয় গূঢ়, বেশ চিন্তা পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে হইবে। ভগবান্ সম্বন্ধে সকলের ধারণ একরূপ নহে। কেহ বোঝেন শ্রীভগবান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় রাজ-রাজেশ্বর, গদা ও চক্রহস্তে তিনি অসুর বিনাশ করিতেছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্ত্তা, নিজের অমিত বিক্রমের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে সুনীতি ও সদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কেহ বোঝেন ভগবান্ কর্ম্মফলদাতা, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে ফলভোগ করে, তাহা তাঁহার ব্যবস্থা। ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার সম্বন্ধে সমুদয় কথা কেহই জানে না এবং কেহই বলিতে পারে না। মানুষ ক্রমে ক্রমে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করিতেছে। এই প্রকারে উন্নত হইতে হইতে মানুষ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া ফেলিল। এখন এই মানুষের চরিত্রে বা জীবনে কামের গন্ধমাত্রও নাই এই প্রকারের মানুষের নিকট ভগবান্ কিরূপ-ভাবে প্রকাশিত হইবেন, ইহাই প্রশ্ন। এই যে মানুষ, ইহারা ভবের মানুষ নহে, ইহারা ব্রজের মানুষ। ইঁহারাই কৃষ্ণ-উপাসক। কেবল কৃষ্ণ-উপাসক নহেন, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের উপাসক। স্বরূপ দামোদর যাহা শিখাইয়াছেন, তাহা এই প্রকারের অধিকার-সম্পন্ন অনুরাগী ও রসিক ভক্তের জন্য, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাই সর্ব্বত্তোম। এই ব্রজলীলায় তিন প্রকারের লীলা আছে। কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। কৌমার লীলায় বাৎসল্য, পৌগণ্ড লীলায় সখ্য, আর কৈশোর লীলায়—

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
তাঁহা তাঁর আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥
কৈশোর বয়স কাম, জগত সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥

জয়দেব ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের বয়োধর্ম্মানুযায়ী এই ত্রিবিধ লীলার মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহাই অর্থাৎ কৈশোর লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই যে লীলা, এই লীলার মর্ম্মকথা বা তত্ত্ব কি? দামোদর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলিতেছেন—

দামোদর কহে— কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর॥
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

এই উক্তি আশ্রয় করিয়া তত্ত্বালোচনা করা যাউক। আমি ভাবিতেছি আমি দ্রষ্টা, আমি দেখিতেছি। আপনি ভাবিতেছেন, আপনি দ্রষ্টা, আপনি দেখিতেছেন। এই প্রকারে প্রত্যেকেই ভাবিতেছে আমি দ্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একজন দ্রষ্টা। আমাকে আপনাকে, আমাদের সকলকে আশ্রয় করিয়া বা নিমিত্ত করিয়া তিনিই দেখিতেছেন। তিনিই পরম পুরুষ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রকারে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা ও কর্ত্তা। এখন শেষ কথা বুঝিতে হইবে, তিনিই একমাত্র ভোক্তা বা আস্বাদক।

৯। রস-আস্বাদ

মহাভারতে আছে, শ্রীভগবান্ কেমন?

যজ্ঞে যজ্ঞপতির্যজ্ঞা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ।

আবার

যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভুপ্ যজ্ঞসাধনঃ॥

শ্রীভগবান্ নিজেই যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যজ্ঞকারী, যজ্ঞের অঙ্গ ও যজ্ঞবাহন। তিনি যজ্ঞের পোষক বা ধারক, যজ্ঞকারী, যজ্ঞী, যজ্ঞের ভোক্তা ও যজ্ঞের সাধন।

এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌কে বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম পুরুষবাদ। বেদে এই পুরুষবাদ আছে। ইহাই লীলাবাদ, পুরাণ-সমূহে লীলাবাদ বিস্তারিত হইয়াছে। কবি জয়দেব এই লীলাবাদেরই অন্তরতম গূঢ় কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম এই গূঢ় কথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীভগবানের এই পরিচয় হৃদয়ের দ্বারা উত্তমরূপে গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নের শ্লোকগুলি ধীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহ মৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯ম অঃ ১৬।১৭।১৮

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতিশাস্ত্রের পঞ্চযজ্ঞ, আমিই শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম আমিই ঔষধ, আমিই হোমাদির সাধন, আমিই আহবনীয়াদি অগ্নি, আমিই হোম। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলবিধাতা এবং পিতামহ। আমিই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, আমিই পবিত্র ওঙ্কার, ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ। আমিই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু, পোষণ-কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার ও লয়-স্থান, আমিই অক্ষয় বীজ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই প্রকারের অনেক উপদেশ আছে। এই প্রকারের উপদেশ কেবল গীতায় নহে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ শাস্ত্রেই পরিদৃষ্ট হইবে। এই উপদেশগুলি লইয়া ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা ভগবচ্চিন্তায় অভ্যস্ত হইব ও লীলা-রহস্য বুঝিতে পারিব। এই লীলা-রহস্যের চরম কথা শ্রীভগবান্‌ই সকল রসের একমাত্র আস্বাদক।

বেদে ও গীতায় শ্রীভগবান্‌কে 'ভোক্তা' বলা হইয়াছে। সেখানে 'ভোক্তা' কথার অর্থ 'আস্বাদক'। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের একালের কথায় 'ভোক্তা' বলিতে যাহা বুঝি, 'আস্বাদন', তাহা হইতে একটু পৃথক্। কথাটা বুঝিয়া লইলে ভাল হয়। আমরা

দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ভোগ করি, তাহা 'রস' নহে, তাহা 'রসাভাস' অর্থাৎ রসের ঈষৎ প্রতিবিম্ব (Fragmentary reflection)। এই ভোগের দ্বারা আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হই। বেদে আছে ভগবান্‌ই রস, তিনিই রসের ভোক্তা। শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় শ্রীভগবানের রমণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, এই বিহারে দৈহিক ক্ষয় নাই। 'দৈহিক ক্ষয় নাই' এই বাক্য শ্রীধরস্বামী অন্তর্জগতের কোন গূঢ় সত্যের দ্যোতক বা প্রতীকরূপে (Symbolically) ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীভগবানের বিহার আত্মারামের রমণ, ইহা আস্বাদন মাত্র। এই কারণে শ্রীবৃন্দাবনে কৈশোর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, যৌবনের প্রসঙ্গ নাই। মানুষেরও কৈশোর বয়স পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আস্বাদনের ও ভালবাসা গ্রহণের সময়। এইবার লীলার রহস্য চিন্তা করা যাউক।

সংসারে আমার পুত্র, আপনার পুত্র, আমাদের প্রত্যেকেরই পুত্র রহিয়াছে। আর, আমরা পিতারূপে মাতারূপে পুত্রকে ভালবাসিতেছি, অর্থাৎ আমাদের উদ্বেলিত বাৎসল্য রস প্রদান করিয়া ধন্য হইতেছি। কিন্তু এই যে পুত্রগুলি ইহারা কে? আকাশে এক সূর্য্য। এই সূর্য্যের রশ্মি যেখানে পড়ে সেইখানেই সূর্য্য দেখা যায়। নদীর প্রত্যেক তরঙ্গের মধ্যে একটি একটি সূর্য্য, থালার জলে সূর্য্য, ঘটির জলে সূর্য্য। সেইরূপ সত্য করিয়া এক নিত্য পুত্র আছে One Eternal Son। সেই নিত্য পুত্র নিত্যমাতার কোল আলো করিয়া নিত্য লীলায় চিরবিরাজিত। নিত্য মাতার অসীম হৃদয়ের বাৎসল্য রসসিন্ধু সেই নিত্য শিশুকে অবলম্বন করিয়া নিত্য উচ্ছ্বসিত হইতেছে। আমাদের মাতৃত্বও যেমন সেই নিত্য মাতার প্রতিবিম্ব, আমাদের পুত্রত্বও তেমনি সেই নিত্য পুত্রের প্রতিবিম্ব। সেই নিত্য পুত্রই মা যশোদার ননিচোরা। বন্ধু-সম্বন্ধেও ঠিক্ এই কথা। এক বন্ধু, নিত্য বন্ধু আছেন; তিনি ব্রজের রাখালরাজা। সংসারের বন্ধু আমার আপনার বন্ধু, সেই নিত্যবন্ধুর প্রতিবিম্ব। তেমনি এক পরম প্রেমিক আছেন, (One Supreme Lover) সংসারের প্রেমের খেলায় প্রেমিকের বা নায়কের সাজ পড়িয়া যাহারা মুগ্ধ হৃদয়ে হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে, তাহারা সকলেই প্রতিবিম্ব; অথবা তাহাদের সকলের অনুভূতি ও আস্বাদনের মধ্যে সেই এক পরম প্রেমিকেরই প্রেমলীলা প্রকটিত হইতেছে। স্বরূপ দামোদর ইহাই বলিতে চাহেন, কবি জয়দেবও ইহারই আস্বাদন দিয়াছেন।

১০। গীতগোবিন্দের আস্বাদন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ-সম্বন্ধে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দ কোন্ অবস্থায় আস্বাদন করিলে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, অথবা গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিবার অধিকারী কে? গীতগোবিন্দ গ্রন্থেই এই প্রশ্নের উত্তর আছে। জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, যদি বিলাস-কলায় কুতূহল থাকে, তাহা হইলে এই গীতগোবিন্দ শ্রবণ কর। হরি-স্মরণে মন সরস হওয়া আর বিলাস-কলায় কুতূহল হওয়া কি, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে বেশ সুন্দররূপেই বুঝিতে পারা যায়।

অন্ত্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যে সময়ে নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, নিম্নের ঘটনাটি সেই সময়ের।

একদিন বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লইয়া ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুকসারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান॥
'ললিত লবঙ্গ লতা' পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥

হৃদয়ের একটি বিশেষ প্রকারের জাগরণ না হইলে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রকৃত প্রভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে আমরা এই

জাগরণের পূর্ণাবস্থা দেখিতে পাই। রসিক ভক্তগণের মধ্যে এই জাগরণের পূর্ণাবস্থা না হইলেও বহুল পরিমাণে এই জাগরণ আছে। হৃদয় যে সকল সময়েই এইরূপ জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাহা নহে; তবে যাঁহারা সহৃদয়, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত উদ্দীপনের সাহায্যে তাঁহাদের হৃদয়ে এই জাগরণ আসিয়া থাকে। পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনায় আমরা দুইটি জিনিষ দেখিলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অনুগত ভক্তগণের সঙ্গ। ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই এই দ্বিতীয় উপাদানটি অধিক প্রবল। এই অবস্থায় গীতগোবিন্দের সুবিখ্যাত পদ 'ললিতলবঙ্গ-লতা' গীত হইতে লাগিল। সেই অবস্থায় সেই গানের ফলে কি হইল, তাহারও বর্ণনা আছে।

প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাস কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধে ভরিয়াছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হইলা অচেতনে॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখিকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

মানুষের যে সব ইন্দ্রিয় রহিয়াছে ও ক্রিয়া করিতেছে, তাহাদের অবস্থান্তর হয় বা তাহাদের শক্তি খুব বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এই প্রকারের অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎ স্বপ্নের মত মিলাইয়া যায় এবং আর এক জগৎ, যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক জগৎ বা নিত্য জগৎ বলিতে পারি, তাহা আস্বাদনের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। জয়দেবের কবিতা তাহার ছন্দ, সুর, শব্দ ও অর্থ মানবকে এই প্রকারের চিন্ময় অনুভূতিতে লইয়া যায়। ইহাই গীতগোবিন্দের প্রয়োজন'। সকলে ইহার অধিকারী নহেন। যাঁহারা রসিক ও ভাবুক', তাঁহারাই ইহার অধিকারী।

জয়দেব বলিয়াছেন হরিস্মরণে যদি মন সরস হয়, আর শ্রীভগবানের বা শ্রীহরির বিলাসকলা আস্বাদন করিবার জন্য যদি ঐকান্তিক আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এই গ্রন্থ শ্রবণ করুন। জয়দেবের উক্তিতেও এই অধিকার ও প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। চিরসুন্দর ও চিরমধুর, লীলারসবিভোর শ্রীভগবান্ শ্রীহরি আমাদের সহিত খেলা করিতেছেন। আমরা জানিনা, কিন্তু তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া আমাদের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। শ্রীহরির এই আকর্ষণ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের আর দুঃখ নাই, শোক নাই, অবসাদ নাই, নৈরাশ্য নাই। তাঁহারা বেশ জানেন সংসারের এই দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা, নিতান্তই সাময়িক, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তাঁহারাই গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিবার অধিকারী।

গীতগোবিন্দের পদ মহাপ্রভু কিরূপ অবস্থায় আস্বাদন করিতেন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহা আর একস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও অন্ত্যলীলার অন্তর্গত এবং নীলাচলেই ইহা ঘটিয়াছিল।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তাহাঁ দেখি আচম্বিতে॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাহাঁ কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি-পড়ি চাহ বুলে যথা যথা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যানে আছে, যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া নিরতিশয় বিরহকাতরা ও উন্মাদিনী হইলেন এবং তরুলতা প্রভৃতির নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই যে কৃষ্ণান্বেষণ, ভক্তের অনুভূতিতে ইহা একটি নিত্য সত্য। বৃন্দাবনও নিত্য সত্য। আমাদের পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের মেলা বসে, ফুল ফুটে, পাতা কাঁপে, মলয় পবন বহিয়া যায়, পাখীকুল মধুস্বরে গান করে। এই সৌন্দর্য্যের হাটে আমরা মুগ্ধ ও আত্মহারা

হই। কিন্তু কিছুই থাকে না। ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী থামিয়া যায়, আমরাও শুকাইয়া মরিয়া যাই। সকলই নশ্বর। কিন্তু এই নশ্বরের ভিতরেই অবিনশ্বর নিত্য সুন্দর লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নিত্যলীলা হইতেছে, লীলাময় শ্রীগোবিন্দ বিশ্বানুগ বা বিশ্বগত, কেবল বিশ্বাতীত নহেন। ফুলের বাগানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন, গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রাণেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে হারাইলেন এবং বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকগুলি তিনি আবৃত্তি করিতেছেন নিজের ভাষায় তাহা গান করিয়া বলিতেছেন, আর অন্বেষণ করিতেছেন। ইহাই প্রকৃত আস্বাদন।

আম্র পলাস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সভে কর পর উপকার॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা—পাইলে দর্শন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এসব পুরুষজাতি— কৃষ্ণের সখার সমান॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমার।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীর প্রায়॥
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পাঞাছে দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে॥
তুলসি মালতি যুথি মাধব মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে॥
তুমি সব হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণে দেহ কহি সভে রাখহ পরাণ॥
উত্তর না পাঞা পুন ভাবেন অন্তরে।
'এ ত কৃষ্ণদাসী' ভয়ে না কহে আমারে॥
আগে মৃগীগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিয়া॥
কহ মৃগ, রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা, নাহিক অন্যথা॥

রাধার প্রিয় সখী আমরা ; নহি বহিরঙ্গ ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ সঙ্গ ॥
রাধা অঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত ।
কৃষ্ণ কুন্দ মালা সঙ্গে বায়ু সুবাসিত ॥
‘কৃষ্ণ ইহাঁ ছাড়ি গেলা, ইঁহো বিরহিণী ।’
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্প-ফলভরে ॥
শাখা সব পড়ি আছে পৃথিবী উপরে ॥
‘কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার ॥’
কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥
প্রিয় মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্য চিত্তে ॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান ?
কিবা নাহি করে ? কহ বচন প্রমাণ ॥
‘কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ।
কিবা উত্তর দিবে ? ইহার নাহিক সংবিত ॥”
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে ।
দেখে তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥
কোটি-মন্মথ মথন মুরলী-বদন ।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র মন ॥
সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা ।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রভুর সাত্ত্বিক সকল ।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥
পূর্ব্ববৎ সভে মেলি করাইল চেতন ।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করে দরশন ॥
কাহাঁ গেল কৃষ্ণ, এখনি পাইলুঁ দর্শন ।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরিল নেত্র মন ॥

পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলী বদন ।
তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন ॥
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥

*　　　*　　　*　　　*

প্রভু কহে—কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইলুঁ ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইলুঁ ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় এক স্থানে ।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥
স্বরূপ গোসাঞিকে কহে, গাও এক গীত ।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ত সংবিত ॥
শুনি স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া ।
গীত গোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্ ।
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসম্ ॥
স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা ।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল ।
হর্ষাদি ব্যাভিচারী সব উথলিল ।
ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য ।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ—সভার প্রাবল্য ॥
একেক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন ।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, বাঢ়য়ে নর্ত্তন ॥
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ ।
স্বরূপ গোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥
‘বোল বোল’ বলি প্রভু কহে বার বার ।
না গায় স্বরূপ গোসাঞি শ্রম দেখি তাঁর ॥

'বোল বোল' প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিগে সভে মিলি করে হরি ধ্বনি॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥
প্রভু লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুন লঞা আইলা ঘরে॥
ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি সভে গেলা নিজস্থান॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত অংশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ও তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্যাষ্টক স্তবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হইতেও আমরা বুঝিলাম গীতগোবিন্দের পদ কিরূপ অবস্থায় যথার্থরূপে আস্বাদন ও উপভোগ করা যায়।

প্রকৃত কথা শ্রীগীতগোবিন্দ কাবতা হইলেও লৌকিক কবিতার ন্যায় সমাজে গৃহীত হয় নাই। যাঁহারা অধ্যাত্ম-জীবনকেই সত্যজীবন বলিয়া মনে করিতেন, সেই অধ্যাত্ম জীবনের তুলনায় এই প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা সেই অধ্যাত্ম-জীবনের চিন্ময় রস সম্ভোগের উদ্দীপনরূপে গীতগোবিন্দের আস্বাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং আমরা এই অমর কাব্য গীতগোবিন্দ এবং তাহার কবি শ্রীজয়দেবের চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেছি।

পরিশিষ্ট

(১) সমাজ-জীবনে আত্মদর্শন

একজন মানুষের বা ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যেমন 'আত্মদর্শন' বলিয়া একটি ব্যাপার বা ঘটনা আছে, অনেকগুলি মানুষের বা একটি জনসমাজের জীবনেও সেইরূপ 'আত্মদর্শন' হইয়া থাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে একবার এইরূপ 'আত্মদর্শন' ঘটিয়াছিল। এই 'আত্মদর্শন' কি?

ব্যক্তিবিশেষের জীবনে অর্থাৎ আমার বা আপনার জীবনে, এই আত্মদর্শন কি, প্রথমে তাহাই বুঝা যাউক। আমি একজন মানুষ, আমি অনুভব করি, আমার একটা মূল্য আছে। এই মূল্য কত? প্রত্যেকেই হিসাব করে, এবং হিসাব করিয়া নিজ নিজ মূল্য অবধারণ করে। আমিও যাহা হউক একটা কিছু মূল্য ঠিক করিয়াছি। এই মূল্য খুব বেশী নহে। কেহ টাকা দিয়া, কেহ মান দিয়া, কেহ বিদ্যা দিয়া, কেহ বা ভোগ দিয়া এই মূল্য অনুভব করে। অধিকাংশ লোকই এই প্রকারের হিসাবী ও দাম-বাঁধা মানুষ। ইহারা ভাল মানুষ, সংসারে ও সমাজে গৌরবান্বিত মানুষ। এই প্রকারের মানুষের ভিতর হঠাৎ একজন লোক মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়—সে বে হিসাবী। সে মনে করে তাহার দামের পরিমাণ নাই, সে মনে করে আমার দাম অনন্ত, আমার দাম 'সর্ব্ব'। অন্যান্য মানুষ মিতব্যয়ী, নিজেকে বাঁচাইয়া চলে; সে অমিতব্যয়ী, সে সাধারণ মানুষের মত নিজেকে বাঁচাইতে চাহে না, সে নিজেকে বিলাইয়া ও ছড়াইয়া দিতে চায়। তাহার কামান নাই, বন্দুক নাই, হাতি ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত, রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই; কিন্তু তাহার মাথা যেমন উঁচু তেমন উঁচু মাথা কোনো সম্রাটের নাই; তাহার বুক যেমন চওড়া তেমন পাটাওয়ালা চওড়া বুক কোন দিগ্বিজয়ী মহাবীরেরও নাই। সে বুঝিয়াছে আমি, আমি; আমি নিত্য, আমি ফুরাইব না, ফুরাইতে পারি না। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে যদি এই প্রকারের অবস্থা কখন হয়, তাহা হইলে আমরা বলি—ইহার আত্মদর্শন হইয়াছে।

প্রত্যেক দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায় কখন কখন এক একটি জনসংঘের বা সমাজের জীবনে এই প্রকারের পূর্ণতা-বোধের এক অপরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে বাঙ্গালাদেশে এই প্রকারের অবস্থা হইয়াছিল। তখন পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াছিল, বোবায় কথা কহিয়াছিল, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইয়াছিল। সে যুগে অকস্মাৎ আপনা হইতেই ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোলাকুলি করিয়াছিল; প্রবল পরাক্রান্ত রাজা কাঙ্গালের পায়ের তলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল; বড় বড় রাজমন্ত্রী, রাজগুরু ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভিখারী সাজিয়াছিলেন, কৌপীন পরিয়াছিলেন। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, পরিবারে, সমাজে এক নবভাবের বন্যা আসিয়াছিল। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগ।

কোনও জাতির শুভাদৃষ্টবশে এই প্রকারের যুগ আসিয়া যখন উপস্থিত হয়, তখন

অনেকের মনে হয়, এই জাগরণ আকস্মিক। কিন্তু ইহা আকস্মিক নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বুঝিতে গেলে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। এই ভাবধারার মধ্যে শ্রীজয়দেবের ভাবধারাই প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কবি জয়দেব তাঁহার জীবনে একটি মহাসত্য পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজার সভাসদ্ ছিলেন জয়দেব, তিনিই গীতগোবিন্দের কবি। হিন্দুজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকিবে না, কিন্তু তাহার ভাবজীবনের স্বাতন্ত্র্য অন্ততঃপক্ষে সুদীর্ঘকাল থাকিবে ও মানব-জীবনের হিতসাধন করিবে, ইহা গীতগোবিন্দের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহারা যে ভাবধারায় সিদ্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচনদাস, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরও সেই ভাবধারারই মানুষ। মহাপ্রভুর অনুগত সকলেই এই ভাবধারার অন্তর্গত নহেন। অন্যপ্রকারের ধারাও আছে। কিন্তু এই ধারাটিই প্রধান। অন্যধারার লোকেরাও এই ধারার দ্বারা অভিভূত ও প্রভাবান্বিত; ইহাতেই বুঝিবেন জয়দেবের স্থান কত উচ্চ।

সমাজের জীবনে ও ব্যক্তির জীবনে একবার আত্মদর্শন হইলেই যে তাহা চিরস্থায়ী হইবে, তাহা নহে। আলোকের পরেই অন্ধকার, জাগরণের পরেই নিদ্রা। আত্মদর্শনের পরেই একটা অন্ধতা, চাতুরী ও কৃত্রিম অভিনয়ের যুগ আসে। এই যুগকে গোঁড়ামি বা ব্যবসাদারীর যুগও বলা যায়। তাহার পর আসে অবিশ্বাস ও সংশয়ের যুগ। তাহার পর সদ্ব্যাখ্যা ও সাধুসমালোচনার যুগ। এই তিনটি যুগকে তমঃ, রজঃ ও সত্বগুণের যুগ বলা যায়। তাহার পর, যদি ভাগ্যে থাকে তাহা হইলে আবার আত্মদর্শনের যুগ ফিরিয়া আসে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগের সেই 'আত্মদর্শন' আজ আর আমাদের সমাজজীবনে নাই। এখন পরবর্ত্তী তিন যুগেরই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজ এক বিস্মৃতি আসিয়া আমাদিগকে অবসন্ন করিয়াছে। মনে হয়, আবার আত্মদর্শন' হইবে, সৌভাগ্যের যুগ আবার আসিবে বা আসিতেছে। এবারকার 'দর্শন' আরও ব্যাপক হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে দিনের সেই দর্শনকে অবলম্বন করিয়াই তাহা হইবে। কাজেই সেদিনের সেই আত্মদর্শনের প্রকৃতি বেশ ভাল করিয়া জানা দরকার।

(২) গোপীপ্রেম

"গোপীপ্রেম সাধ্যশিরোমণি। ইহাই যুগধর্ম্ম।" এই কথাটি নানাপ্রকারে বুঝিতে পারা যায়। পুরুষ ও নারী মূলে এক। প্রাচীনতম উপনিষদ্ বৃহদারণ্যকে আছে—প্রথম পুরুষ প্রজাপতি—স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। প্রজাপতি একেবারে একাকী বলিয়া প্রীতি অনুভব করিলেন না, কেহই একাকী থাকিতে ভালবাসে না। তিনি নিজের প্রীতির জন্য স্ত্রী কামনা করিলেন। শাস্ত্রানুসারে পুরুষে চিদংশ, আর নারীতে আনন্দাংশ অধিক। মানুষের অনেকরূপ বৃত্তি বা শক্তি আছে। তাহার মধ্যে দুইটি সকলের উপরে। একটি আধ্যাত্মিক (Spiritual), আর একটি মানসিক (Intellectual)। বিশ্ব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতেছে। এক সময়ে মানসিক শক্তির উৎকর্ষসাধন (Evolution of the Intellect) প্রধানরূপে প্রয়োজন। তাহার পর আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশ দরকার। এই আধ্যাত্মিক বৃত্তি নারীতে অধিক। To seize the Spiritual অর্থাৎ অন্তরতম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের অধিক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালাদেশে যে নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহা ক্রমশঃ ভারতবর্ষে এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই যুগের সাধ্যসীমা বা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শ গোপীপ্রেম। যাঁহারা পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পৌরুষ নষ্ট করিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি, বিশেষতঃ প্রজ্ঞা (Intuition) উত্তমরূপে বিকশিত করিবেন। রসাস্বাদন-সামর্থ্য,—সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায়, নৃত্যকলায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-উপভোগে, বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত মানবের সহিত এবং সর্ব্বজীবের সহিত সঙ্গের দ্বারা ও সর্ব্বজীবের প্রেমপূর্ণ সেবার দ্বারা যাহা বিকশিত হয়, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে। মানসিক শক্তির, বা দৈহিক শক্তির প্রয়োজন আছে, সেগুলি থাকিবে ও বাড়িবে, ম্লান হইবে না, ধ্বংশ হইবে না, কিন্তু সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যে আনিতে হইলে এই আনন্দবৃত্তির বা গোপীভাবের সাধনা করিতে হইবে। "গোপীপ্রেম' সাধনাদর্শ," ইহার এইরূপ অর্থ।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের যুগ আসিয়া প্রায় উপস্থিত হইয়াছে। সাহিত্যে,

ধর্ম্মে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, জনসেবায় স্ত্রীলোকেরা উচ্চাধিকার লাভ করিতেছে। আমরা জানি ক্রমে আরও উচ্চাধিকার পাইবে। স্ত্রীলোকের যুগ (The Age of Woman) আসিয়াছে। চিন্তা করিয়া বলুন, মহাপ্রভু সমগ্র পৃথিবীর যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কি না।

(৩) বিভিন্ন ভাবধারা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, একটি সুবৃহৎ সমন্বয়ের ধর্ম্ম। আজকাল বাঙ্গালাদেশে ও অন্যত্র ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যে সব চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহার মূল প্রেরণা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, বিভিন্ন প্রকারের ভাবধারা বা সাধনপ্রণালী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই বিভিন্ন ভাব-ধারার মধ্যে দুইটি প্রধান—একটি আর্ত্তভক্তের ধারা—The spiritual culture of the sick soul। আর একটি রসিক ভক্তের ধারা—The culture of the healthy-minded। জয়দেবকে এই দ্বিতীয় ধারার প্রধান বা প্রথম ব্যক্তি বলিয়া ধরিতে পারা যায়। প্রথম ধারায় শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতিকে ধরিতে হইবে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

কেবা আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।

ক্রমশঃ এই উভয় ধারার মিলন হইয়াছিল এবং অনেকের ভাবান্তরও হইয়াছিল; এই দুই ধারার প্রথমটিতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, দ্বিতীয়টিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। এই উভয় ধারার মিলনই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম।

প্রথম ধারার সাধক যাঁহারা, তাঁহারা অনুভব করেন, এই রক্তমাংসের দেহ অপবিত্র, এই সংসার অশাশ্বত ও দুঃখালয়, সুতরাং এই সব ছাড়িয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। দ্বিতীয় ধারার লোক বলেন, এই দেহ শ্রীভগবানের সেবার জন্য, এই বিশ্ব ভগবানের লীলাস্থলী, সুতরাং ছাড়িব কেন?

উভয় ধারার যখন মিলন হইল, তখন বুঝা গেল এই দেহ দিয়া নিজের সুখ খুঁজিও না, শ্রীকৃষ্ণের সুখ অন্বেষণ কর। বড় কঠিন কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইহাই সত্য।

—০—

মনোহরসাহী কীর্ত্তন

যে সমুদয় বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ে—বৈদেশিক প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলে—প্রধানতঃ রাঢ়, বরেন্দ্র ও শ্রীহট্টের কথা আলোচনা করিতে হয়। রাঢ় বলিতে যেমন প্রাচীন উড়িষ্যা ও কলিঙ্গের প্রত্যন্ত-সন্নিহিত সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ বুঝিতে হইবে, বরেন্দ্র বলিতে মিথিলাকে সীমান্তে রাখিয়া যেমন উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গ ধরিয়া লইতে হইবে, শ্রীহট্ট বলিতেও তেমনি সেকালের বঙ্গ (সমতট বা হরিকেল) এবং আসামের কথা মনে রাখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচণ্ড প্রবাহ যদিও বাঙ্গালাকে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের পথে বহুদূরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, যদিও এই অগ্রগতি আরো কতদূর গিয়া সীমারেখা নির্দ্দেশ করিবে কেহ বলিতে পারে না, এবং এই পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে বাঙ্গালার প্রাচীনরূপ বিপর্য্যস্ত হইতেছে, বিপুল ভাঙ্গনে অতীত সভ্যতার বেদী ধ্বসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি এই দুঃসময়কে অসময় কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখনো সময় আছে; জাগ্রত আত্মচেতনা, সুবিকশিত অনুভূতি, অনুশীলিত শক্তি, পরিণত বিচারণা, এবং মার্জ্জিত রুচি ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন কোনো সাধক চেষ্টা করিলে দেশমাতৃকার পীঠ-বেদীর স্রোতোভগ্ন উপকরণগুলি এখনো সংগৃহীত হইতে পারে। এখনো বাঙ্গালার প্রাচীন রূপের সন্ধান মিলিতে পারে।

দিগ্‌দর্শন হিসাবে আমরা রাঢ়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি। বাঙ্গালার সভ্যতায় রাঢ়ের অবদান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, তক্ষণশিল্প, সাহিত্য অথবা দর্শনের কথায় মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে—তথা যাত্রা ও কীর্ত্তনে রাঢ়ের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব বর্ত্তমানেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গীত ও সঙ্গতের আসরে বনবিষ্ণুপুরের নাম আজিও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। অবশ্য 'সঙ্গীত' শব্দ কীর্ত্তনে সুপ্রযুক্ত হইবে কিনা, প্রশ্ন উঠিতে পারে, কারণ সঙ্গীতে সুরেরই প্রাধান্য থাকে। 'গীতে' ভাবই প্রধান স্থান অধিকার করে বলিয়া অনেকে কীর্ত্তনকে "গীত" সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আমাদের মনে হয় ভাব এবং সুরের অপূর্ব্ব সমাবেশে কীর্ত্তন-গানের সৃষ্টি হইয়াছে, কীর্ত্তনে কথা এবং সুর, কেহ কাহাকেও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই।

যাত্রাগানে পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ যোগ্য, তিনি রাঢ়দেশেরই অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দ অধিকারী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাত্রাগানে অন্যতম বিশিষ্ট রীতির প্রবর্ত্তক মতিরায়কে লইয়া রাঢ়দেশই গর্ব্ব করিতে পারে।

রাঢ়দেশই কীর্ত্তন গানের জন্মভূমি। বড় বড় কীর্ত্তনীয়া রাঢ়দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। আজিও দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণ রাঢ়দেশে জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। এখনো বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদের গায়কগণই কীর্ত্তনের আসরে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। 'রাঢ়দেশে গান শিক্ষা করিয়াছি', 'ময়নাডালে খোল শিখিয়া আসিয়াছি' এই পরিচয়ই শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সম্পূর্ণতার পরিচয়,—সে কালেও ছিল আজিও আছে।

কোন সময় কীর্ত্তন গান সৃষ্ট হয়, কেহ বলিতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ দিয়া বলিতেছেন—"সেকালে কীর্ত্তন গান ছিল, তখনকার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য রাঢ়দেশের নাড় পণ্ডিত সদলে কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইতেন, সেকালে মাদলে 'সঙ্গত' হইত, মৃদঙ্গ মহাপ্রভুর আমলের সৃষ্টি।" 'বৌদ্ধগান ও দোহায়' পুরানো কীর্ত্তন গানের একটা আদ্‌রা পাওয়া যায়, কিন্তু নাড় পণ্ডিতের পর হইতে চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত মাঝখানে প্রায় পাঁচ শত বৎসরের কোনো খবর পাওয়া যায় না। তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে বৌদ্ধাচার্য্যগণ ঐ সমস্ত গানে আপনাদের সাধনার কথা,—তথা বৌদ্ধধর্ম্মের বিবিধ তত্ত্ব ও মহিমার কথা জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে প্রতি-উত্তরে হিন্দুসমাজের নেতৃগণও ঐরূপ গানের মধ্য দিয়াই আপনাদের পক্ষের বক্তব্য সমূহ প্রচারের ব্যবস্থা-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, এবং এইরূপ ধর্ম্মান্দোলনে ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস সুগায়ক এবং সুকণ্ঠ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু স্ব-রচিত সুধা-সুমধুর পদাবলী তিনি কি সুরে এবং কোন্ তালে গাহিতেন, সেই সুর ও তাল তিনি কোথায় কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই। তবে অনতি-পরবর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় এই গান যেরূপ উন্নত, সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হইয়া উঠে তাহাতে মনে হয় চণ্ডীদাসের সমকালে ইহার অবস্থা নিতান্ত অনুন্নত ছিল না।

এদিকে শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে বুঝিতে পারা যায়, কেন্দুবিল্বের কবি-কেকিলের কণ্ঠে যেন বঙ্গবাণীকুঞ্জে বাসন্তী ঊষার গৌরব-পূর্ব্বাভাষ ঘোষিত হইয়াছে।

"ধীর সমীরে যমুনাতীরে
বসতি বনে বনমালী"

বাঙ্গালায় "ত্রিপদী" রূপে দিব্য চলিয়া যাইতে পারে। আবার—

"সরসমসৃণমপিমলয়জপঙ্কম্"
"নয়ননলিনমিববিদলিতনালম্"
"চঞ্চলকুণ্ডললিতকপোলা"

প্রভৃতি পদ যে "পয়ারের" পূর্ব্বরূপ, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মনে হয়—

"সঞ্চর দধর সুধা মধুর ধ্বনি
মুখরিত মোহন বংশম্"

এইরূপ পদের মাত্রা অনুসারেই—কীর্ত্তন গানে—

"শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী
শ্রবণে নিবারনু তোর"

প্রভৃতি পদ রচনার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীগীতগোবিন্দের অনেক সুর তালও যে কীর্ত্তন গানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

মহাপ্রভু যখন সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করেন, তখন তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ গানের সুরে এবং তালে যে রাঢ়ীয় পদ্ধতিরই অনুসরণ করিতেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। অন্ততঃ তাঁহার সমকালে কীর্ত্তনের কোন শ্রেণী-বিভাগ প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় না। শ্রীবাস-অঙ্গনে নাম-কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, পরে নীলাচলে অবস্থিতিকালে স্বীয় প্রিয় পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরকে অনন্যসাধারণ অধিকার দান করিয়া মহাপ্রভু রসকীর্ত্তন-গান প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাই অনেকে শ্রীপাদ স্বরূপকে রসকীর্ত্তন গায়কগণের গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দেবীদাস, নীলাচলে গিয়া স্বরূপের নিকট কীর্ত্তন-গান এবং মৃদঙ্গবাদ্য শিক্ষা করিয়া আসেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে ইহাঁরই প্রিয় শিষ্য দাস-গোস্বামীর নিকট সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশেও তখন গায়ক, বাদকের অভাব ছিল না। আকাইহাটের স্বনামখ্যাত কীর্ত্তনীয়া কৃষ্ণদাস, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও গোকুল দাস দুই ভাই, তদ্ভিন্ন কুলীনগ্রাম, শ্রীখণ্ড, কাঁদরা, খেরাকুলি প্রভৃতি গ্রামের বহু কীর্ত্তন-গায়ক এবং ঠাকুর গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি বাদকগণ এদেশে সেকালে স্বাধীনভাবে গীতবাদ্য চর্চ্চায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রস-কীর্ত্তনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি এবং পালাবন্দী গানের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়,—মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে,—রাজসাহী জেলায় খেতরীর মহোৎসবে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব সম্মিলনে রাজা সন্তোষ দত্তের আলয়ে। রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, প্রেমিক, ভক্ত, সুকবি, সুগায়ক ঠাকুর নরোত্তম,—বাদক দেবীদাস ও গৌরাঙ্গদাস এবং গায়ক শ্রীদাস ও গোকুলদাস প্রভৃতির সহায়তায় এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। এদেশের প্রাচীন পদ্ধতিতে নূতন নূতন সুর তাল সংযোগে তিনি কীর্ত্তনের যে বিশিষ্ট রীতির প্রচলন করেন, খেতরীর মহোৎসবে অনুমোদিত হইলে, পরগণার

নাম-অনুসারে তাহা 'গরাণহাটী'রীতি নামে পরিচিত হয়। পরগণার নামে কোনো প্রথা, সম্প্রদায় বা জাতির 'থাকের' নামকরণ সেকালের অন্যতর বিশেষত্ব ছিল।

খেতরীর মহোৎসবে—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলা দেবীদাসে॥

* * * *
* * * *

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস তাল পাট আরম্ভয়ে।
প্রথমেই কিবা মন্দ মন্দ বাদ্য বায়ে॥
তদুপরি নব্য নব্য বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে।
অমৃত অঙ্কুর যৈছে বাড়ে ঘণে ঘণে॥

* * * *
এথা সর্ব্ব মোহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম দ্বারে॥

* * * *
* * * *

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদ দ্বয়ে।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়ে॥
অনিবদ্ধ গীত বর্ণালাপ স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥"

খেতরীতে গিয়া দেবীদাসের বাদ্য ও গোকুলের গান শুনিয়া বীরচন্দ্র প্রভু—

"শ্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে।
কি অপূর্ব্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে॥

* * * *
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বুলাইয়া।
কহিলা কতেক তারে অধৈর্য্য হইয়া॥"

সংগীতজ্ঞগণ বলেন, সুরের গতি আপন পরিমিত কালের মধ্যে আদ্যন্ত সমভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিলে, তাহাই 'লয়' নামে অভিহিত হয়। এই লয় প্রদর্শনের নামই 'তাল'। সঙ্গীতশাস্ত্রে তালকে

'ছন্দ' বলে। ছন্দ আবার কতিপয় সমানুপাতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি 'মাত্রা' নামে পরিচিত। আমরা সংগীতজ্ঞগণের ভাষায়—সুরের কারিগরী, বিলম্বিতলয়, ছন্দের দীর্ঘতা ও মাত্রার জটিলতা, গরাণহাটী গানের বিশেষত্বরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। অনেকের মতে, বৈঠকী গানে ধ্রুপদের স্থান যে পর্য্যায়ে, কীর্ত্তনে গরাণহাটীও সেই পর্য্যায়ে অবস্থিত। আমাদের কোনো গায়ক-বন্ধু বলেন—'অনুকূল রুচি ও শিক্ষাসম্পন্ন শ্রোতা বিশেষ ধৈর্য্যশীল হইলে, তবেই তাঁহার গরাণহাটীর আসরে উপস্থিত হওয়া উচিত। সেকালে বারকুলি বা বোরাকুলিতে (মুর্শিদাবাদ জেলা) এই গানের সবিশেষ চর্চ্চা এবং উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গৌরগোপাল দাস প্রভৃতি এই ধারার স্বনামধন্য কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। অধুনা, বৃন্দাবনবাসী নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবাবাজী মহাশয়, এই সুরের একজন অনন্যসাধারণ গায়ক।

খেতরীর পর, শ্রীখণ্ডে ও কাটোয়ার মহোৎসবে এই গান শুনিয়া রসজ্ঞগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেন। কিন্তু ইহা সাধারণের তেমন চিত্তগ্রাহী না হওয়ায়, কাঁদরার গায়কগণ অন্য একটী নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। মঙ্গল-বংশীয় বংশীবদন ঠাকুর ইহাদের অগ্রণী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় কীরিট-কোণা গ্রামে মঙ্গল ঠাকুরের পূর্ব্বনিবাস ছিল; পূর্ব্বাশ্রমের উপাধি পালধী, এই জন্য ইহার বংশধরগণ 'কীরিটকোণার পালধী, শূলপাণি মহাপাত্রের সন্তান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঙ্গল, শৈশবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান কাঁদরার পশ্চিমস্থিত রাঢ়ীপুরের ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন, সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পণ্ডিত গদাধর ইহাঁকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ময়নাডাল গ্রামের কোনো অধিকারী কন্যাকে বিবাহ করিয়া ইনি তিনটী পুত্র লাভ করেন। এই তিন পুত্রের নাম রাধিকাপ্রসাদ, গোপীরমণ ও শ্যামকিশোর; বংশীবদন শ্যামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র। বদনের প্রবর্ত্তিত সুর, পরগণার নামানুসারে 'মনোহর সাহী'-সুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। কথিত আছে—বাবা আউলিয়া মনোহর দাস বদনকে অতি যত্নে কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছিলেন; এবং সেই শিক্ষাবলেই তিনি 'মনোহর-সাহী' সুর প্রবর্ত্তনে সমর্থ হন। আউলিয়া মনোহর দাস দীর্ঘজীবি ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। বৈরাগীর 'আখড়া' বাঁধিয়া বাসের প্রথা, এ-অঞ্চলে তিনিই প্রচলিত করেন। সেইজন্য আজিও এ দেশের বৈরাগীর আখড়ায় যে কোনো পক্ষাহে, উৎসবে, এমন কি কোনো সামান্যতম অনুষ্ঠানেও, অগ্রে মনোহর দাসের ভোগ দিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। খেতরীতে রস-পর্য্যায় অনুযায়ী পালা-গান শুনিয়া ইনি ঐরূপ একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থের অভাব অনুভব করেন, এবং বহু শ্রমে, নানাস্থান ঘুরিয়া বিপুল যত্ন ও অতুল অধ্যবসায়ে 'পদসমুদ্র' নামে পদাবলী-সংগ্রহের এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেন। অনেকের মতে, মনোহরসাহী সুর ইহাঁরই সৃষ্টি। প্রিয় বন্ধু জ্ঞানদাস ও মঙ্গলের সঙ্গে খেতরী, শ্রীখণ্ড ও কাটোয়ার মহোৎসব হইতে কাঁদরায় ফিরিয়া (ইনি কাঁদরার অধিবাসী

ছিলেন) গরাণহাটী হইতে এ দেশের রীতিকে চিহ্নিত করিবার জন্য রাঢ়ের প্রাচীন পদ্ধতির কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ইনি তাহাকে 'মনোহরসাহী' নামে অভিহিত করেন। পরে, ইহাঁর সঙ্গীত শিষ্য বদনের দ্বারা এই ধারা দেশে প্রসার লাভ করে।

মাধুর্য্যে, প্রসাদগুণে, সুর ও তালের অপেক্ষাকৃত সারল্যে, মনোহরসাহী ধারা জন সমাজে ও যেমন, রসজ্ঞ সমাজেও তেমনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ দেশের অধিকাংশ কীর্ত্তনীয়া প্রায় মনোহরসাহী ধারার গায়ক বলিয়াই পরিচিত। বীরভূম ইলামবাজারের নিমাই চক্রবর্ত্তী, দীনদয়াল চক্রবর্ত্তী, মনোহর চক্রবর্ত্তী, ময়নাডালের রসিকানন্দ, বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতি, কাঁদরা গ্রামের শ্যামানন্দ ঠাকুর, বনমালী ঠাকুর এবং বলদেব দাস প্রভৃতি দেশ-প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। অধুনা গণেশদাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ধারার খ্যাতনামা গায়ক।

গরাণহাটী ও মনোহরসাহী ভিন্ন, কীর্ত্তনগানে আরো তিনটী ধারা প্রচলিত আছে,—যথা—রেনেটী, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্গত (অধুনা বর্দ্ধমান সাতগাছিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত রেনেটী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম) পরগণা রাণীহাটী হইতে 'রেনেটী'-ধারার নামকরণ হয়। রেনেটীর নিকটবর্ত্তী দেবীপুর নিবাসী বিখ্যাত পদকর্ত্তা বিপ্রদাস ঘোষ এই সুরের প্রবর্ত্তন করেন। রেনেটী সুরের 'গোষ্ঠ'-গান দেশ বিখ্যাত। এই গানের বিশেষত্ব—'আখর' খুব কম। অনেকের মতে, বৈঠকী গানে যেমন খেয়াল, কীর্ত্তন গানে তেমনি মনোহরসাহী, এবং রেনেটী প্রায় ঠুংরীর সামীল। কিন্তু বন্দীপুর নিবাসী আখঁরিয়া গোপালের ভাগিনেয়, বাসুদেবপুরের (হুগলী) বেনীদাস কীর্ত্তনীয়ার গান শুনিয়াছেন, এ কালে এমন অনেক লোক এখনো বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা বলেন—রেনেটী সুর মনোহরসাহীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত হালকা হইলেও, মিষ্টতায় এবং সৌন্দর্য্যে কোনো অংশে ন্যূন নহে। বেনীদাস রেনেটী সুরের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন।

'মন্দারণী' সুর সরকার মান্দারণের অন্তর্গত কোনো উড়িষ্যা-ঘেঁসা স্থান হইতে প্রবর্ত্তিত বলিয়া শুনিয়াছি। সেরগড়বাসী গোকুল, ঝাড়খণ্ডী সুরের সৃষ্টি করেন। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবীন্দ্র'।

মনোহরসাহী গানের—কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট এই পাঁচটী অঙ্গ।

কথা—সঙ্গীত শাস্ত্রেও, লক্ষ্য লক্ষণের সমাবেশ আছে। লক্ষ্য অর্থে গান অর্থাৎ 'কথা', আর লক্ষণ তাহার (রাগ ও নিয়মাদি) শাস্ত্র। এখানে কিন্তু 'কথা' মানে কেবল গান নহে, 'কথার' অন্য অর্থও আছে। শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণের কিম্বা সহচরীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি, এক গান হইতে অন্য গানের যোগসূত্র, গানের কোনো একটী চরণের অর্থ—অনেক সময় মূল গায়ককে কথা কহিয়া বিশদ করিয়া দিতে হয়। কীর্ত্তনে ইহাকেও 'কথা' বলে।

দোঁহা—ছন্দে বদ্ধ দুই বা চারি চরণে সূত্রাকারে অভিব্যক্ত বিষয় 'দোঁহা' নামে পরিচিত।

'দোঁহা'-শব্দ কতদিনের পুরাতন বলিতে পারি না। বৌদ্ধদের রচিত হাজার বৎসরের আগের লেখা পুঁথির 'দোঁহাকোষ' নাম পাওয়া গিয়াছে। দোঁহা হইতেই "দোহার" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। সঙ্কেতে গানের সূত্র ধরাইয়া দেওয়া, গানে মূল গায়কের অনুসরণ ও সহায়তা করা, এবং আসরে সুরের রেশ্ জমাইয়া রাখা দোহারদের কাজ। 'চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থের পয়ার বা ত্রিপদীর দুই এক চরণ, অথবা 'উজ্জ্বল নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থের শ্লোকের অংশ-বিশেষ, কীর্ত্তনে দোঁহা-আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আখর—কীর্ত্তনে 'আখর' কাহাকে বলে, শুনিয়া বুঝিতে হয়। ইহাকে কীর্ত্তন গানের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাই পদকর্ত্তাগণের বিনা সূতায় গাঁথা মালার রহস্য-গ্রন্থী উন্মোচনের অমৃত-মন্ত্র। ইহা রসের ভাণ্ডারের চাবী, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্ত্তিক।

তুক—অনুপ্রাসবহুল, ছন্দোময়, মিলাত্মক আখর 'তুক' নামে পরিচিত। কোনো কোনো তুকে গানের মত দুই চারিটী কলিও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি সাধারণত 'তুক' বা 'তুক গান' নামেও পরিচিত। এগুলি কোনো পদকর্ত্তার নিজস্ব নহে, সাধারণত কীর্ত্তন গায়কগণই পুরুষানুক্রমে শিষ্যানুশিষ্য পর্য্যায়ে তুক গানকে পুষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য প্রণেতাগণের রচিত গানেরও দুই এক চরণ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে তুক গান, অজ্ঞাত পদকর্ত্তার পদ বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ছুট—বড়তালের গান করিতে করিতে ছোট তালের 'ফেরতা' বা 'কাটান' দেওয়ার নাম 'ছুট'।

বাঙ্গালার অন্যান্য প্রাচীন সম্পদের মত, কীর্ত্তন গানও লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশের রাজা জমিদার ও সমাজ নেতৃগণের উৎসাহের অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। এখন পিতৃশ্রাদ্ধে বাইজীর কীর্ত্তন নহিলে অনেকের তৃপ্তি হয় না। কীর্ত্তন গান চাই, নহিলে হয় তো সমাজে একটা নিন্দা হয়—তাই বাইজীর কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। পুত্র পৌত্রের অন্নপ্রাশনে উপনয়নে বাইজী, ছেলের বিদ্যারম্ভে বিদ্যাচর্চ্চার সাফল্যে বাইজী, বন্ধু বান্ধবের সম্মান-ভোজে বাইজী! তার উপর সর্ব্বনেশে গ্রামোফোনের জ্বালায় কণ্ঠ-সঙ্গীত প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাহা আছে, হারমোনিয়মে গলা সাধিবার সোহাগে তাহাও বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। এই অগ্নি-মূল্যের বাজারে, এ হেন দুর্দ্দিনেও অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কল্যাণে, আজিও যে কয়জন কীর্ত্তন গায়ক কোনো রকমে বাঁচিয়া আছেন, কয়েকজন পরলোকগত কীর্ত্তনীয়ার স্মৃতি তর্পণের সঙ্গে, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা আলোচনারও ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী

৮ পদকর্ত্তা—গোকুলচন্দ্র

[গোকুলচন্দ্রের একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে—রঃ লাঃ পুঃ—২১৯০]

উঠ মোর ভাইরে কানাঞি।
প্রভাত হইল নিশি, খগ গেল দশ দিশি
আঁখি মেল আর ঘোর নাঞি ॥
বয়ান মার্জ্জনা কর, খাও দধি দুগ্ধ সর
কটিতটে পর পীতবাস।
বৎস গাভী করি সঙ্গে, নানা খেলা রস রঙ্গে
চল আজু বৃন্দাবন পাশ ॥
বৃন্দাবন নিরমল, আছে কত পদ্মফুল
আম জাম পনস পিয়াল।
তুলিব সে সব ফল, সিঙ্গা ভরি লব জল
সুখে খাব সকল রাখাল ॥
বলরাম দাদা আগে, নিতুই বিহানে জাগে
তোরে কেনে জাগাইতে হয়।
এ গোকুল চন্দ্রে কয়, আর নিদ্রা ভাল নয়
তোর মুখ চাঞা সভে রয় ॥

৯ পদকর্ত্তা—লালু নন্দলাল

[এই সুবিখ্যাত কবি-সঙ্গীত রচয়িতার একটি মাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছি—রঃ লাঃ পুঃ—২১৭১ তাঁহার কয়েকটী কবি-সংঙ্গীতও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, পরে করিবার ইচ্ছা আছে]

তথাচ তাঁহার প্রেম ছাড়িতে নারিব।
যে বলে সে বলুক লোকে ছাড়িতে নারিব ॥
শ্যামকে মিনি সূতে হার গাঁথি গলেতে পরিব।

তথাচ ॥ সুখের ভ্রমরী হঞা, দুঃখের কাননে গিঞা
গুণ গুণ গুণ রবে প্রিয়ার তব গুণ গাইব ॥
শোন বলি প্রাণ প্রিয়া, জাহ্নবীর তীরে গিয়া
গোপীকান্ত আরাধিঞা, তনু তেয়াগিব ॥
লালু নন্দলালে রটে, যা বল তাই বটে
শ্যামের লাগিয়া আমরা যোগিনী হইব ॥

১০ পদকর্ত্তা—নিকুঞ্জবিহারী গোসাঞী

[এই পদকর্ত্তার একটি মাত্র পদ সংগৃহীত হইয়াছে—রঃ লাঃ পুঃ—২১৭১]

তারে কত সাধিব ওগো, যার কথায় কথায় অভিমান।
অধন যতন করি, ধন তেয়াগলাম
পাইঞা পরশমণি হেলায় হারালাম।
বিরহিণী হঞা সই আমি কত কান্দিব।
চোরের রমণী হঞা আমি কত কান্দিব ॥
গলে প্রেম কান্দ, গগনের চাঁদ, আনি দিতে মোর হাতে।
আমা দেখিবারে, কত যতন করিঞা, দাড়াঞা রহিতে পথে ॥
আদর আরতি, বাড়াইলে নাথ, নবীন পীরীতি খানি।
চূড়ার ফুলেতে, চরণ সেবিতে, ঘাটে হঞা মহা দানী ॥
এ সকল কথা জানএ ললিতা, বিশাখা তাহাতে সাখী।
যমুনা যাইতে পথ আগুলিয়া, দানখত দিলে লিখি ॥
সেই খত লঞা দিব ফেলাইঞা, যত ব্রজাঙ্গনার মাঝে।
পড়িঞা শুনিঞা বিচার করিঞা যার মনে যেবা লাগে ॥
কহেন গোসাঞী নিকুঞ্জ বিহারী শুন বিনোদিনী রাই।
আপনে গড়িলে আপনে ভাঙ্গিলে দোষ দিব বল কায় ॥

১১ পদকর্ত্তা—গোপাল দাস

[মুর্শিদাবাদ অন্তর্গত খাগড়ার অপর পারে, বুঁধুইপাড়া নামক পল্লীতে, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা গোপাল দাস বাস করিতেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। গোপাল দাস, সুন্দররূপ কীর্ত্তন

গান করিতে পারিতেন। পদকর্ত্তা গোপাল দাসের ৯টি পদ 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদের স্বচয়িতা সম্ভবতঃ অভিন্ন ব্যক্তি—রঃ লাঃ পুঃ—২২৯৬]

ভাণ্ডির তলা অতি রম্য স্থান।
সেইখানে বসিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥
রামকৃষ্ণ সখা সহ বিশ্রাম করিঞা।
নানাবিধ খেলা খেলিলেন তাহাই রহিঞা॥

ঘনশ্যাম শরীর কলা রস ধীর বিহার বনি।
শ্রীদাম সুদাম ভায়্যা বলরাম সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী॥
নানা বেশ ধরে শিখিচাঁদ শিরে বনমাল উরে করে কঙ্কনা।
নবরঙ্গ ধটী পহিরণা কটি সব আঁচর ডোল ডোলে পবনা॥
ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল অঙ্গে গির লাল কিয়ে চলনি।
বাজিছে কিঙ্কিণী নিপিছে পাঁচুনী পদ নপূর ঝন্ ঝন্ন শুনি॥
কত সিংহ অজে করতাল বাজে সব মণ্ডল বেণু বিনা মুরলি।
কত গান সুতান বাজাওত মান রুলারস গান করি সুমেলি॥
কেহ নাচত রঙ্গ দোলাওত অঙ্গ তাহে কত রঙ্গ ত্রিভঙ্গ কলা।
মৃদু মন্দহি হাস মিঠি মিঠি ভাস তাহে করু লাস পরাগ ধূলা॥
ভ্রম এক ডালে নানা ফুল ফলে তাহে শুক বলে কুহলে কুহুলি।
নব লোল লতা তাহে কৃষ্ণ মাতা খেলে ফুল পাতা শ্রম এত বলে॥
যব বেণু পুরে মৃগ পাখি ঝুরে পুলকে তরুগণ পাঁচ ফুলে।
রঙ্গিণী ঠাঠ দেখি রঙ্গ নাট প্রেমানন্দ অন্তর ডোল ডোলে॥
কেহু রূপ চায় কেহু গুণ গায় কেহু কালক প্রেম বোল কহে।
গোপাল দাস মনে অভিলাষ ওরূপ হৃদি জাগি রহে॥

ত্রয়োদশ দণ্ডে ভাণ্ডির কাম্যবনেতে বিহার।
দাসগণ করে সেবা যার যেই অধিকার॥

শ্রীশিবরতন মিত্র

প্রাচীন দপ্তর

[১৭৪৮—১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা *]

(১)

কড়ি—ইংরাজ আগমনের প্রথমাবস্থায় এদেশে, মূল্য বিনিময়ে সাধারণতঃ কড়ি ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদিতে, এই কড়ির কথা প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আমলের বহু নথিপত্রাদিতেও এই কড়ির উল্লেখ আছে। ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় (১৭৬১ খ্রীঃ) প্রতি টাকার বিনিময়ে ২৮৵০ কড়ি গৃহীত হইত। তদানীন্তন কলিকাতা বোর্ডের আফিসে প্রচুর পরিমাণে কড়ি মজুত থাকিত—জেলার কর্ম্মচারিগণ তথা হইতে আবশ্যক মত কড়ি আনাইয়া লইত। ১৭৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজস্ব বিনিময়ে কড়ি গ্রহণের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে জাহাজের তলদেশ ভারী করিবার জন্য যেমন লবণ, কয়লা প্রভৃতি বোঝাই করা হয়, সেকালে তদ্রূপ প্রতি বিলাতযাত্রী জাহাজে ১০ টন বা ৩০০ শত মন করিয়া কড়ি বিলাতে প্রেরিত হইত। কিন্তু বিলাতে প্রেরণ কালে জাহাজে চুরি, ধৌত করার ফলে ওজন কমতি ও ভাঙ্গতি প্রভৃতি জন্য নানারূপ অসুবিধা অনুভব করিয়, ১৭৫৩ খ্রীঃ কলিকাতায় একটি টাকশাল স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখন টাকশালের সমস্ত কারবারই জগতশেঠের করগত। তাহা নিজ হস্তগত করিতে হইলে বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে ভাবিয়া, ইংরাজগণ তখন এই চেষ্টা হইতে বিরত হন। তাহার পর ১৭৬০ খ্রীঃ ইংরাজগণ দিল্লীর বাদশাহগণের নিকট হইতে স্বতন্ত্র টাকশাল স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। ইহার পর হইতে কড়ির প্রচলন ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে। পরবর্ত্তী কালে কড়ির প্রচলন উঠিয়া গেলেও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কেননা, অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এদেশের স্থানে স্থানে, এবং এমন কি, রাজধানী কলিকাতায়ও মূল্য বিনিময়ে কড়ির প্রচলন দেখা গিয়াছে। চলিত কথা বার্ত্তায়—'ধন-কড়ি,' 'টাকা-কড়ি', 'পয়সা-কড়ি', 'কড়ি-কপালে' প্রভৃতিতে 'কড়ি' আপনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

* ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায়, ১৭৪৮ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৭ খ্রীঃ মধ্যে লিখিত যে সকল ঐতিহাসিক বা সামাজিক তথ্যমূলক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র আছে, তৎসমুদয় হইতে তদানীন্তন বঙ্গের অবস্থা-বিজ্ঞাপক কতকগুলি পত্র সংগৃহীত করিয়া, ১৮৬৯ খ্রীঃ রেঃ লঙ্ সাহেব, গবর্ণমেণ্টের আদেশ মত একখানি বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলিত করেন। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইল।

(২)

ভিক্ষুক বা ফকীরের দল—ইংরাজ কোম্পানীর প্রথম আমলের প্রাচীন দপ্তর মধ্যে দেখা যায় যে, কলিকাতায় একটি প্রায় দুই শত ব্রাহ্মণাদি ভিখারীর দল ছিল। তাহারা ফকীর বা সন্ন্যাসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কোম্পানীর আমলের প্রথম হইতেই তাহারা প্রতি দোকান হইতে পাঁচটি করিয়া কড়ি, 'তোলা' স্বরূপ সংগৃহীত করিত। এই জন্য তাহারা, তদানীন্তন কাউন্সিলের নিকট সনন্দ বা অনুমতি-পত্রও লাভ করিয়াছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দোকানদারগণ এই অযথা কর বা 'তোলা' বন্ধ করিয়া দিলে, তাহা আদায় করিবার অধিকার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য, জীবন দাস বৈরাগী, বাসুদেব ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ স্বাক্ষরিত কোম্পানীর কাউন্সিলের নিকট একটি আবেদন করিয়াছিল। প্রাচীন দপ্তর মধ্যে এই আবেদন পত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তদানীন্তন বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র সন্ন্যাসী বা ফকীর দলের কথা শ্রুত হওয়া যায়। তাহারা দলবদ্ধভাবে দেশে অবাধে লুটপাট করিয়া বেড়াইত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান হোয়াইটের সহিত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে এইরূপ এক ফকীরের দল, বীরভূম ও বর্দ্ধমান রাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিবার কথা উল্লিখিত রহিয়াছে। ১৭৬৩ খ্রীঃ ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ বাখরগঞ্জ অঞ্চলে একদল মুসলমান ফকীরদলের লুটপাট করিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঢাকাতে এইরূপ এক ফকীর দলকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগকে দুর্গ মেরামতের জন্য কুলীরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

(৩)

দণ্ড-প্রণালী—কোম্পানীর আমলের প্রথমাংশে ইংরাজগণ এ দেশে যে কয়প্রকার দণ্ড-ব্যবস্থার অনুসরণ করিত, তাহার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) 'শূল'—১৭৬৪ খ্রীঃ সুন্দরবন অঞ্চলে জলদস্যুর প্রভাব বৃদ্ধি হইলে, ধৃত দস্যুদিগের প্রতি শূল দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের নিকট জলদস্যুগণ, রোজ নামক এক ইংরাজকে হত্যা করিয়া তাহার যাবতীয় অর্থাদি লুট করিয়া লয় এবং সীতারাম রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নিমিত্ত কোম্পানীর সিপাহীগণদ্বারা জল দস্যুগণকে ধৃত করাইয়া, শূলারোপে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়।

(২) নাসা-কর্ণচ্ছেদ—১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, রঙ্গপুরের গবর্ণর ভান্সিটার্টের কুঠীলুণ্ঠনের পর, তথাকার ফৌজদার গবর্ণরের পরিচারকগণের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকৃত হয়। এই জন্য

কাপ্তেন ডাণ্ড, গবর্ণরের যাবতীয় দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে, তাহাদের নষ্ট বা লুণ্ঠিত দ্রব্যের ঠিক্ হিসাব দিতে আদেশ প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অতিরিক্ত লাভ করিবার প্রত্যাশায় ভুল হিসাব প্রদান করে, তাহা হইলে তাহারা ত কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবেই না—প্রত্যুত, কৃতকর্ম্মের দণ্ড স্বরূপ, তাহাদের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করা হইবে।

(৩) কাষ্ঠ খণ্ডে আবদ্ধ রাখা—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ইজারদারগণের প্রতি উপদেশাবলী মধ্যে অন্যতম একটি এই—ভূমি-সংক্রান্ত বিবাদকালে যদি কেহ বল প্রয়োগ করে, বা কাহাকেও আঘাত করা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৩৲ টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। যাহারা এই অর্থদণ্ড দিতে অসমর্থ হইবে, তাহাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে, একটি কাষ্ঠখণ্ডের ছিদ্রমধ্যে হস্ত পদ প্রবিষ্ট করাইয়া সমস্ত দিন দণ্ডায়মান অবস্থায় তৎসহ বিলম্বিত রহিতে হইবে।

(৪) কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া—মোগল-আমলে এই দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত হত্যা অপরাধের জন্য, ইংরাজ কোম্পানী তাহাদের ২৪ পরগণা জমীদারী মধ্যে, বেত্রাঘাত দ্বারা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিত। কিন্তু বোর্ডের মেম্বরগণ, এই প্রকার ব্যবস্থা তাদৃশ ফলপ্রসূ নহে ভাবিয়া, কামানের মুখে গোলা দ্বারা উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করে। নয়ান নামক এক সূত্রধরকে সর্ব্বপ্রথম এই ব্যবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৭৬১ খ্রীঃ একজন ডাকাইতের সর্দ্দারকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার কথার উল্লেখ আছে।

(৫) ফাঁসী—জালকরা অপরাধে ইংরাজগণ, ১৭৭৫ খ্রীঃ মহারাজ নন্দকুমারের সর্ব্ব প্রথম ফাঁসীর আদেশ প্রদান করেন বলিয়া অনেকের ধারণা। কিন্তু তাহার প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬৩ খ্রীঃ কাশীমবাজারের মিঃ গ্রের গোমস্তাকে হত্যাকরার জন্য হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। আবার, ১৭৬৬ খ্রীঃ একটি দান-পত্রের জাল করা অপরাধে গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসীর আদেশ হয়। এই হত্যাদেশ রহিত করিবার জন্য কলিকাতা এবং বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে, তদানীন্তন গবর্ণর ও প্রেসিডেণ্ট জন স্পেন্সারের নিকট প্রেরিত হয়। ইংরাজের আইন ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ, তাহার দেশীয় ভাষায় কোনরূপ অনুবাদ নাই,—তাহার মর্ম্ম এ দেশবাসী অবগত নহে—এবং ইংরাজের বিচার-প্রণালীও দেশবাসীর অজ্ঞাত—ইত্যাদি কারণ, তাহাদের আবেদনের হেতু। এখানে কোন ফলের প্রত্যাশা না রহিলে, তাহারা তাহাদের আবেদনপত্রখানি বিলাতে রাজার নিকট প্রেরণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

(৬) বিলাতে নির্ব্বাসন।

(৭) কারাবাস—দেনার দায়ে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজের ইজারদারগণ সময় মত

খাজনা আদায় দিতে না পারিলে, তাহাদের কারাবাসের আদেশ এবং তাহাদের ও তাঁহাদের জমিদার-গণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। ইহাতেও দেনা পরিশোধ না হইলে, ইজারদার বেত্রদণ্ড ভোগ করিত। বলা বাহুল্য, এই দেনাদার ইজারদারগণ, পরবর্ত্তী বৎসরে আর খাজনা আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইত না। তখন কলিকাতা-লালবাজার পল্লীতে সামান্যমাত্র একটি জেলখানা ছিল। কোন কোন জেলে, স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীগণের স্বতন্ত্র বাসের ব্যবস্থা ছিল না।

(৮) জলমগ্ন নৌকা হইতে নিক্ষেপ করিয়া, বস্তার মধ্যে পুরিয়া অপরাধীকে জলমগ্ন করিয়া হত্যা করা হইত। মুঙ্গেরের অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে এইরূপভাবে নিক্ষেপ করিয়া মীরকাসীম, জগৎশেঠের প্রাণনাশ করিয়াছিল।

(৯) বেত্রাঘাত—কারাদণ্ডিত অপরাধীকে, অপরাধের গুরুত্বানুসারে, দুই তিন মাস ধরিয়া প্রতি শুক্রবার ১০১ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। কলিকাতায় কাউন্সিল-গৃহের সম্মুখেই একজন ইংরাজ, এক ব্রাহ্মণসন্তানকে হস্ত পদ বান্ধিয়া বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া চাবুক মারার কথার উল্লেখ আছে। আবার, এই ব্রাহ্মণের মুখে গো-মাংস প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার জাতিনাশের চেষ্টার কথাও বর্ণিত রহিয়াছে!

শ্রীশিবরতন মিত্র

সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ

আত্মকথা—'বীরভূমি', মাসিক পত্রিকার অষ্টম খণ্ড আরম্ভ হইল—বাঙ্গালা ১৩৩৩ সাল, কার্ত্তিক মাস। 'খণ্ড'—বর্ষ নহে। কারণ, আমরা নিয়মিতভাবে এখনও এই পত্রিকা বাহির করিতে পারিতেছি না। ইহার একমাত্র কারণ, আমাদের অক্ষমতা। চেষ্টা চলিতেছে, শ্রীভগবান্ সহায় হউন, কৃপা করুন, যেন নিয়মিতভাবে মাসের মত করিয়া পত্রিকাখানি বাহির করিতে পারি। আমাদের কাগজ অনিয়মিত হওয়ায় গ্রাহকদিগের কাগজ পাইতে বিলম্ব হয় সত্য, কিন্তু গ্রাহকগণের আর্থিক ক্ষতি কখনও হয় নাই এবং কখনও হইবে না। অধিকাংশ গ্রাহকই, ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিচিত, অধিকাংশ গ্রাহকেরই নিকট অগ্রিম মূল্য লওয়া হয় না। কিন্তু এখন হইতে অগ্রিম মূল্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। নিয়মিত করিতে হইলে, অনেকস্থলে অগ্রিম মূল্যের ব্যবস্থাই ভাল।

'বীরভূমি' মাসিকপত্রিকা প্রথম বাহির হইয়াছিল, সন ১৩০৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কীর্ণাহার গ্রামের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সৌরেশ-চন্দ্র সরকার. এই দুই ভ্রাতার অর্থসাহায্যে, চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রাহক স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায়, এই পত্রিকা প্রথম বাহির হয়। আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, বীরত্বের একবিন্দুও আমাদের নাই; 'বীরভূমি' থামিয়া থামিয়া চলিতেছে। ১৩০৬ সালের কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হইয়া 'বীরভূমি' তিন বৎসর কয়েক মাস চলিয়াছিল, তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ থাকার পর, আবার ১৩১১ সালের পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হয়। এবারে এক বৎসরের কিছু অধিককাল চলার পর আবার বন্ধ হইয়া যায়।

১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে 'বীরভূমির' নবপর্য্যায়। সেই সময় হইতে আবার নূতন করিয়া বর্ষ বা খণ্ড গণনা আরম্ভ হয়। সেই নবপর্য্যায়ই চলিতেছে। এবারে আর পৃষ্ঠপোষক নাই, জনসাধারণের প্রতি, বা নারায়ণের প্রতি চাহিয়া আমরা এই পত্রিকা চালাইতেছি। ইহাও মধ্যে কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ছয় মাস করিয়া বন্ধ রাখা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা আমাদের অক্ষমতার পরিচায়ক। দেশে সাহিত্যানুরাগী লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে; সুতরাং আমরা পরিশ্রম করিলে ইহার উন্নতিই হইবে। শ্রীভগবান্ জয়যুক্ত হউন।

প্রথম হইতেই একটি সাধুসঙ্কল্পের প্রেরণা, 'বীরভূমি'-পরিচালনার পশ্চাতে আছে। স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা ও আমাদের ভূমিকা, যাহা ১৩০৬ ও ১৩১৭ সালে লেখা হইয়াছিল, আগামী সংখ্যায় তাহা পুনর্মুদ্রিত হইবে; তাহা পড়িলে আমাদের প্রাণের কথা সকলেই বুঝিবেন।

১৩০৬ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র একজন সাহিত্যসেবক, এই 'বীরভূমি'র সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। 'বীরভূমি' প্রচারের প্রথম সঙ্কল্পের সময়ে তিনি ছিলেন, প্রথম সংখ্যা হইতে বরাবর নিয়মিতভাবে লিখিয়াছেন; নবপর্য্যায়ের সঙ্কল্পকালেও তিনি ছিলেন, এখনও আছেন এবং প্রবন্ধের দ্বারা, পরামর্শের দ্বারা, সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেছেন। তিনি শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহকার্য্যে তিনি যত কাজ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে কেহই তত কাজ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' নামক অভিধান খানির কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাভাবে ইহার প্রকাশ এখনও সম্পূর্ণ হইল না! বড়ই দুঃখের বিষয়! আমাদের আশা, শীঘ্রই ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইবে। এ বিষয়েও শ্রীভগবান্ সহায় হউন।

কত মূল্যবান্ পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ধন্য দেশে এই বীরভূম! কত রত্নই ইহার গর্ভে এখন লুক্কায়িত! শিবরতনবাবু এই পুঁথিগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। কবে যে এগুলি

প্রকাশিত হইবে, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। তবে তাঁহার করুণার জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। সাধু উদ্দেশ্য, নিশ্চয়ই সফল হইবে।

প্রথম হইতেই 'বীরভূমি' এই নষ্ট রত্ন উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলও হইয়াছে। সাফল্যের দুইটি প্রকৃষ্ট পরিচয়—স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী," আর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "উজ্জ্বল চন্দ্রিকা"। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি নয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহিগ্রামের; তাঁহার গ্রন্থ "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-রসকদম্ব" বীরভূমির নবপর্য্যায়ের তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। নয়নানন্দ ঠাকুরের সমগ্র গ্রন্থাবলী তাঁহারই সম্পাদকতায় অচিরে প্রকাশিত হইবে। কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও কত লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে, তাহার তালিকা পরে প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্য-সম্মিলন—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন বীরভূম জেলার সদর সিউড়ি সহরে হইয়া গেল—২০শে চৈত্র ও ২১শে চৈত্র ১৩৩২, শনিবার ও রবিবার। মূল সভার সভাপতি প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সাহিত্য-শাখায় শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীফণীভূষণ তর্কবাগীশ, ইতিহাস-শাখায়—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান-শাখায়—শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত সভাপতি হইয়াছিলেন। শেষদিন যখন ধন্যবাদদান, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ প্রভৃতি চলিতেছিল, সেই সময়ে কলিকাতার দাঙ্গার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সকলেই অতিশয় চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, এমন অনেক লোক সভায় ছিলেন; কাজেই অতিশয় ব্যস্ততার মধ্যেই সভার কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

বীরাষ্টমী-সমিতি—২২শে চৈত্র ১৩৩২, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া সিউড়ি সহরে এক বক্তৃতা করেন, তাহার ফলে বীরাষ্টমী সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্যের এবং দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধান এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতির কার্য্য বেশ ভালরূপ চলিতেছে।

৺ধর্ম্মদাস বসু—অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় গত ৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম আশী বৎসর হইয়াছিল। চাকুরী করার সময় ইনি সিউড়িতে ছিলেন, সিউড়িতে 'হল্‌ভিউ' নামক সুন্দর বাড়ী করিয়া জীবনের শেষ সময় সিউড়িতেই থাকিবেন মনে করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর সিউড়িতে ছিলেন। সিউড়িতে একটি শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর, সিউড়ির বাড়ী বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ

মহাশয় আমাদের দেশের ছেলেদের বিদেশে পাঠাইয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সিউড়ি টাউন হলে যে-সভা হয়, তাহাতে বসু মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের প্রথম বৎসর ৩০শে আশ্বিন সিউড়িতে যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, তিনি নগ্নপদে সেই শোভাযাত্রার সহিত সমগ্র সহর পর্য্যটন করিয়াছিলেন, জনসাধারণের সভাতেও উপস্থিত ছিলেন। ইনি কলেরার ঔষধরূপে ইন্দ্রযবের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। উহা ব্যবহার করিয়া অনেকেই ফল পাইয়াছেন। তিনি সাহসী, দেশহিতকর প্রত্যেককার্য্যেই উৎসাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। সিউড়ি সহরে ব্রাহ্মসমাজের একখানি ঘর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই ঘরখানি যাঁহাদের চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার একখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে। 'নব্যভারত' পত্রে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন।

দুবরাজপুরে গুণ্ডামী—সিউড়ির উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়ের একখানি পত্র কলিকাতার 'নায়ক' ও রামপুরহাটের "রাঢ়দীপিকা" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, ইহা কেবলমাত্র একটি সামান্য ঘটনা নহে, ইহার মূলে এমন একটি বড় কথা আছে, যাহার জন্য দেশে বিশেষভাবে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। এই যুগের নাম—জনসাধারণের জাগরণের যুগ। জনসাধারণকে শিক্ষাদান করিয়া এমন অবস্থায় আনিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া ও শক্তিশালী হইয়া নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া লইতে পারে। এই সংগ্রাম, শান্তির উপায় অবলম্বন করিয়া যাহাতে হয়, দেশের প্রত্যেক লোকের হৃদয়ের যাহাতে পরিবর্ত্তন হয়, বিজ্ঞ নেতৃগণ সেজন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। আমরা পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। 'প্রতিকার কি'—সে সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

"গত ২৬শে অক্টোবর ৯ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার আমি, 'কংগ্রেস'-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মণিলাল ঘোষ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, মহাশয় দুবরাজপুর গিয়াছিলাম। পূর্ব্বদিন দুবরাজপুরে প্রচার করা হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুবরাজপুরে আসিয়া সভা করিবেন ও ভোটারদিগের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিবেন। কোন কারণে জিতেনবাবু যাইতে না পারায় আমরাই গিয়াছিলাম। দুবরাজপুরের হাটতলায় সভা করার কথা ছিল। আমরা দুবরাজপুরে প্রবেশ করিয়াই সংবাদ পাইলাম যে, এই সভা যাহাতে হইতে না পারে, তাহার জন্য হেতমপুরের রাজা বাহাদুর রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা মোটরে চড়িয়া হাটতলায় উপস্থিত হইবামাত্র ৪।৫টী ঢাক, কয়েকটী ঢোল চড়চড়ি সজোরে বাজান হইতে লাগিল। কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর

ভাড়াটীয়া লোক মদ খাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা 'হল্লা' করিয়া তুমুল গোলযোগ সৃষ্টি করিল। বাজারের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া গেল। চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। স্থানীয় মুন্‌সেফবাবু ও কয়েকজন উকিলবাবু ব্যাপার কি, জানিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। আমি অনুভব করিলাম, এই সমুদয় লোক মারামারি করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বহু লোকের সমাগম হওয়ায় তাহারা মারামারি করিতে পারে নাই। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল অতি ভয়ঙ্কর হল্লা করিল। সভা হইল না। আমরা মোটর লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া আসিলাম। বক্তৃতা করিবার ও বক্তৃতা শুনিবার অধিকার, বর্ত্তমান সভ্যজগতে মানুষের প্রাথমিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আমাদের কোন দুঃখ নাই। কিন্তু দুবরাজপুরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী স্থানের ভদ্র অধিবাসিগণ এই অধিকার কেমন সুন্দরভাবে ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমার প্রশ্ন—ইহার প্রতীকার কি ?"